বিমল সিংহ

রচনা সংগ্রহ

ত্রিপুরা দর্পণ

আমার কথা

জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বিমল সিংহকে খুব অন্তরঙ্গভাবে দেখার অধিকার আমি পেয়েছিলাম। তাঁর স্বপ্ন, রাজনীতি এবং সাহিত্যের মধ্যে কোন দূরত্ব ছিলনা। তারা প্রায় একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এখন অনেকেই বলছেন, বিমল সিংহের সাহিত্যে এখানকার জীবনচর্যা অনাবিলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এই জীবনের মধ্যেই সম্পৃক্ত ছিল বিমল সিংহের সত্তা। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন পাহাড়ে সমতলে নিপীড়িত মানুষজনের মধ্যে মিশে ছিলেন তাঁদের একজন হয়ে, বিপ্লবের এক সৈনিক হয়ে সেই জীবনকে মূর্ত করতেই তাঁর সাহিত্য। তাই জীবনের রক্তমাংস এত প্রবল তার সৃষ্টিতে। ত্রিপুরা দর্পণের সঙ্গে বিমল সিংহের নিকট সম্পর্ক সুবিদিত। বিমল সিংহের রচনা সংগ্রহ প্রকাশের দায়িত্ব তাঁদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। বিমল সিংহের সাহিত্যে জাতি উপজাতি আত্মিক সম্পর্কের যে প্রকাশ ঘটেছে তা শুধুমাত্র সাহিত্যিক রচনা নয়, তা এক উজ্জ্বল বাস্তব। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সেই আত্মীয়তার সেতুবন্ধকে রক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই বন্ধনকে ধ্বংস করতে উদ্যত যে গণশত্রুরা তাদেরই হাতে নিহত হয়েছেন বিমল সিংহ। যেন নিজের রক্ত দিয়ে ভালোবাসার নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা করে গেলেন।

জানুয়ারী, ১৯৯৯ইং
আগরতলা

বিজয়লক্ষ্মী সিংহ

(বিজয়লক্ষ্মী সিংহ)

সূচিপত্র

ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে

(এক)

ধলাই নদীর বাঁকের পূর্বদিকে শিয়াল কাঁটার বন পেরিয়ে এক কল্কি তামাক টানার পথ হাঁটলেই এই গাঁয়ের মন্ডপ। গ্রামের নাম জাংথুম। সারা গাঁয়ে সাড়া পড়েছে, মন্ডপে কাপড় বোনার প্রতিযোগিতা হবে। ইঙেল্‌লেই সোনাতম্বি চাউনি প্রভৃতি গ্রামের যুবতী মেয়েরা প্রতিযোগিতা করবে। পড়শী গ্রামের যে মেয়েটি গেল সন প্রথম হয়েছিল সেই নিংথৌকে নিয়েই এই গ্রামের মেয়েদের চিন্তা।

খুব ভোরে উঠান ঝাট দিয়ে স্নান সেরে ইঙেল্‌লেই সূতা কাটার চরকি নিয়ে বারান্দায় বসেছে। চরকির নাম জতর। জতরের চাকায় তেল দিয়ে সে চাকা ঘুরার পথটা সহজ করে দিল। মন্ডপের পশ্চিমের বাড়ীটা চাউবিদের। উঠানের এক কোণে বাঁশের কারুকাজ করা ঝুড়ি থেকে কয়েকটা লানটুম বেছে বের করে নিল। চাউবির ঠাকুরমা লেইফ বুড়ি। লানটুম বা বাবন শক্ত না হলে ফেটে যাবে। অথবা পেছনে গেলে সূতা ভরতে সময় নেবে।

বট গাছের কাছেই সুপারি গাছে ভরা বাড়ীটি সোনাতম্বিদের। সোনাতম্বির মা কাপকনু কাঁঠালের আঠার সাথে তেল মিশিয়ে একটা কচু পাতায় রাখল। তারপর শক্ত পাকানো সূতায় সেই তেল মেখে নিল। এই শক্ত সূতা জতরের চাকা থেকে লানটুম ঢোকানোর দন্ডে বাঁধা হবে।

আজকের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে উৎসাহী হচ্ছে এই গাঁয়ের বুড়ি মাইনু। মাইনু বুড়ির এককালে কাপড় বোনার খুব নাম ডাক ছিল। নতুন নমুনা বের করে কাপড়ের সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এই বুড়ি অতুলনীয়। আজও কাপড় বোনার উৎসব এলে বুড়ির মন প্রাণ মেতে উঠে। উৎসবের নানা কাজে এগিয়ে আসে। বুদ্ধি পরামর্শ দেয় যুবতী মেয়েদের কাপড়ের নক্সা বুঝিয়ে দেবার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘোরে। এটা যেন বুড়ির রক্তের নেশা। উৎসবে ব্যবহার করার জন্য ফেমারূক নামক কারু কাজ করা ঝুড়িতে বিরনি ধানের খইগুড় মিশিয়ে রাখল বুড়ি।

গাঁয়ের অধিবাসীরা মণিপুরী। ক্ষেত গিরস্তির উপরই নির্ভরশীল। কাপড় বোনা এদের জাতীয় কুটির শিল্প। এই শিল্পের প্রভাব এদের রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় প্রবাহিত। হাল চাষের জামা, পরণের যাবতীয় কাপড়, গামছা, মশারি, জাল, বিছানার চাদর— সবই হাতের তাঁতে তৈরী হয়। এবার কাপড় বোনার প্রতিযোগিতার ব্যাপারে পাড়ার প্রবীণ, মাতব্বর, ছেলে, বুড়ো উৎসাহী নারী পুরুষ সবাই মন্ডপে এসে সভা করেছে। সেই সভায় মাইনু বুড়ি বলেছে, যত অসুবিধাই হোক প্রতিযোগিতা হবেই। কাপড় বোনার উৎসব না হলে মণিপুরীদের আর রইল কি? বুড়ি বলল, যতদিন উৎসব চলে তার সমস্ত পান গুয়ার খরচ বুড়ি চালাবে। জাংথুমের মণিপুরী বস্ত্রের খুব প্রসার। শহর থেকেও ভিন জাতির বাবুলোকেরা জাংথুমের মণিপুরী তাঁতের কাপড় ফরমায়েস দেয়। পাড়ার মোড়ল বললেন, জাংথুমের বস্ত্রের একটা আলাদা ইজ্জত আছে। শহর থেকে এখানে লোক আসে কাপড় কেনার জন্য। ঘটা করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বয়ন শিল্পকে ঘরে ঘরে উৎসাহ দেবার কথা হল। এই উৎসবে প্রবীণারা যেন নবীনাদের হাতে তুলে দেন মণিপুরী

তাঁত বস্ত্রের যাবতীয় কলা-কৌশল, কারুকার্য ও অতুলনীয়তা। তাই উৎসবের কয়েকদিন মন্ডপে সাড়াটা গাঁ এসে হাজির হয়। গানে গানে মেতে উঠে মন্ডপ। এ যেন নবীনাদের হাতে প্রবীণারা তাদের শিল্পের উত্তরাধিকার তুলে দিচ্ছেন। তাই এত আনন্দ এত উল্লাস এত গান।

পুরুষরা কাপড় বোনে না ঠিক, কিন্তু তারাই বন থেকে কাপড় বোনার সামগ্রী— লানটুম, উটঙের জন্য বাঁশের লম্বা চুঙ সংগ্রহ করে আনে। মাত্র কয়েক দিন হল চাউবির দাদা সেংকম পাহাড় থেকে মৃতিঙ্গা বাঁশের কয়েকটা উটঙ নিয়ে এসেছে। ইঙেল্‌লেইকেও কয়েকটা দিয়েছে সে। এই উটঙ লম্বালম্বি দুই ভাজ সূতার সারির মধ্যে প্রস্থের দিকে ঢুকিয়ে সূতার বাইন তৈরী হয়।

(দুই)

নদীর বুক থেকে উঠে কড়ুই গাছের ছায়াটা পুবের শিয়াল কাঁটার বনে লম্বা হয়ে পড়েছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের মাঠে গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের দাড়িবান্দা খেলা শুরু হয়েছে। গাঁয়ের যুবকরা মন্ডপ সাজিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আজ কাপড় বোনার প্রতিযোগিতা শুরুর দিন। শংখ বাজল। ঘন্টা বাজল। গাঁয়ের অবিবাহিত মেয়েরা এক এক করে বসে পড়ল নিজ নিজ তাঁতে। প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে এক এক জন বয়স্কা মহিলা লানটুম থেকে সূতা টেসে তাঁতে সাজিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর মন্ডপে কাপড় বোনার হট্টগোল পড়ে যায়। যার কাপড় আগে শেষ হবে সেই-ই প্রথম হবে। তবে কাপড় খুব পালিশ হতে হবে। কোথাও ভাঁজ বা কুঁচকুঁচ থাকলে হবে না। সকলে একই রঙের একই ধরণের কাপড় বুনতে হবে। হয় মেয়েদের 'লাঙাই' অথবা বিছানার চাদর 'মাঠা' বুনতে হবে। বিচারের ভার নিজেদের নিজেদের হাতে। নিজেদের দোষ ত্রুটি অকপটে স্বীকার করা এদের মজ্জাগত। তৃতীয় দিন বিকেলেই ইঙেল্‌লেই-র কাপড় শেষ হল। তখনও অনেকের শেষ হতে দু-তিন ফলেই বাকী। ফলেই বলতে লম্বায় এক গজের চার ভাগের এক ভাগ বুঝায়। ইঙেল্‌লেই প্রথম হল। বাবা খাম্বাতল ভীষণ খুশী। গৌরবে তার মায়ের বুক ভরে গেল। প্রতিবেশী গাঁয়ের মেয়েদের মহলে ছড়িয়ে পড়ল ইঙেল্‌লেরই সুনাম।

ইঙেল্‌লেরই বাবা খাম্বাতল এ বছর বর্গা চাষ করে আউস ফসলে বেশ কিছু ধান পেয়েছে। আউস দিয়ে এবার আমনের নাগাল পাবে তারা। তার উপর চার পাঁচ মণ বীজ ধানও বেচতে পারবে। ইঙেল্‌লেই গত বছর থেকে দাবী তুলছে এ বছর তাকে মামার বাড়ী পাঠাতে হবে। এদিকে কাপড় বোনায় প্রথম হওয়ায় খাম্বাতল মেয়ের দাবীকে যেন আর বরবাদ করার সাহসই পেল না। আধমন ধান দশ টাকা বেচে মেয়েকে গাড়ী ভাড়া ও পথ খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিল মামার বাড়ী। কৈলাসহর মহকুমার মশাউলী গ্রাম। এসে শুনল এখানেও তার কাপড় বোনার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে।

(তিন)

ধনবাবু মশাউলী গ্রামের সেরা মৃদঙ্গ বাদক। ভেটবা বুড়ীর একমাত্র ছেলে। এই কচি বয়সেই

দারুন বাজায়। ভবিষ্যতে সে বাপের নাম অম্লান রাখবে। ভেটবা মন্ডপে উপস্থিত হলে কারো মৃদঙ্গ ধরতে সাহস হত না। ভেটবা মৃদঙ্গ বাজালে দেবতারাও নাকি স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসেন আসরে। তার ছেলে ধনবাবু। বায়েনের ছেলে সেরা বায়েন হবে। এখনই ডাক পড়ে গেছে। বেশ কিছুদিন হয় ধনবাবু ইঙেল্‌লেইর সুনামের কথা শুনেছে। শুনেই যেন তার প্রতি খানিকটা অনুরক্ত ও মুগ্ধ হয়ে আছে ধনবাবু। মশাউলী গ্রামের তনুবাবু সিংহের ভাগ্নী। যেমন রূপ তেমনি গুণ।

ইঙেল্‌লেইর বয়স আর কত হবে। যে বছর পোকায় ধান কাটল, সেই থেকে হিসাব করলে পনের বছরের মেয়ে সে। দেখা হয়ে গেল ধনবাবুর সাথে। মেয়েটার মামার বাড়ীর তমাল গাছটার নীচে বান্ধবীদের সাথে গল্প করছিল। ইঙেল্‌লেরই টানা চোখ, সুবিন্যস্ত খোঁপা, খোঁপায় চাঁপা ফুল, কপালে আঁকা তিলক, পরনে কমলা রঙের লাঙই, ওড়নার নীচে বেগুনী রঙের মখমলের জামা। মেয়েটির অতুলনীয় রূপে ধনবাবু আকৃষ্ট। যেতে যেতে মহিষের পিঠে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে বার বার চোখ ভরে মেয়েটিকে দেখল। সন্ধ্যায় দাওয়ায় মৃদঙ্গ বাজানোর ফাঁকে বন্ধুদের সাথে এই নিয়ে আসর জমজমাট। ধনবাবুর বন্ধু থাম্পাল। ঠিক হল সে-ই প্রস্তাবটা নিয়ে এগিয়ে যাবে ধনবাবুর মার কাছে। এনিয়ে সারা মশাউলী গ্রাম জানাজানি হয়ে গেছে। ধনবাবুর মা, ইঙেল্‌লেরই মামা, বন্ধু থাম্পাল বসে বসে যুক্তি করছিল। মন্দ কি। পাত্র চাষাবাদে যেমন মৃদঙ্গ বাজানোতেও ওস্তাদ। ঘরের ভাত, পুকুরের মাছ। মেয়েটারও রূপগুণ শান্ত স্বভাব। আড়ে দাঁড়িয়ে ইঙেল্‌লেই ও তার বান্ধবীরা মুচকি হাসছে। একটা মুগ্ধ লজ্জায় ইঙেল্‌লেই বার বার কুঁচকে যাচ্ছিল।

শেষে মামার সাথে ইঙেল্‌লেই জাংথুম ফিরে এল। মনু নদী। মশাউলী গ্রাম। কাঞ্চনবাড়ীর বাজার মাঠ ভরা অঘ্রাণের পাকা ধান। মশাউলী গ্রাম যেন তাকে বার বার ডাকছে। সন্ধ্যায় মোষের পিঠে চড়ে যে যুবকটি যাচ্ছিল, বার বার দেখছিল। তমালতলা। মাথায় বাবড়ি চুল সেই যুবকটি দারুণ মৃদঙ্গ বাজায়। ইঙেল্‌লেই ওর বাজনা শুনেছে। কি তার ভংগি, কি চমৎকার তার বোল, যেন খই ফোটে। বাড়ী ফেরার সময় ধনবাবুর মা মেয়েটিকে আদর করে দুটি লাঙই'র ছয় মুঠা টিয়া রঙের সূতো দিয়েছিল। তাই দিয়ে কাপড় বুনতে বসে ইঙেল্‌লেই কি সব ভাবছিল আর গান গাইছিল দীর্ঘ টানা মণিপুরী সুরে।

এর মধ্যে ইঙেল্‌লেইর বিয়ের কথা হয়ে গেছে। খাম্বাতল নিজে গিয়ে ধনবাবুদের বাড়ীঘর জমিজমা দেখে এসেছে। ইঙেল্‌লেইর মা ঝাঁপি ঝাঁপি রঙ বেরঙের কাপড় নামিয়ে দেখছিল। মা ও মেয়ের হাতে বোনা কত কাপড়। কোন্ রঙে কোন্ নক্সায় মেয়েকে বিয়ের দিন সাজাবে এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল অন্যান্য পড়শী মেয়েদের সাথে। আগামী ফাল্গুনে বিয়ে। ইঙেল্‌লেই তখনই লাঙই বুনে যাচ্ছে। টিয়া রঙের সূতা। মশাউলী গ্রাম। ট্রাকে যেতে কষ্ট হয়। চারধারে বন পাহাড়ে উঠা নামা মোটর রাস্তা। আমের ফুলে একটা কোকিল মাতাল হয়ে ডেকে যাচ্ছে অবিরাম।

(চার)

ইঙেল্‌লেই এখন মশাউলী গ্রামের একটি বউ। ধনবাবুর ঘরের একজন দায়িত্বশীল মহিলা। মশাউলী গ্রামেরও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের বাসিন্দারা এখন কেবল মণিপুরী নয়। পূর্ব বাংলা থেকে অনেক বাঙালী রিফিউজী এসে এখানে ঘর বেঁধেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে লেখা

পড়া জানা বাবুও আছে। তাদের অনেকেই চাষাবাস করেনা। ব্যবসা বাণিজ্য লেখা পড়ার কাজ করে। তারা বেশী দাম দিয়ে জমি কিনতেও রাজী। বিয়ের বছর এসে ইঙেল্‌লেই উৎসবে পার্বণে পালায় গানে নাচে গ্রামটিকে যে মাত্রায় ভরাট দেখেছিল, অভাবে দারিদ্রে তা ক্রমশই যে ভেঙে পড়ছে। এখানে বাঁচতে না পেরে প্রতি বছর দু এক ঘর করে লোক গ্রাম ছেড়ে চেলে যাচ্ছে। অনেকের জমিজমাই কাঞ্চনবাড়ী বাজারের মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। মণিপুরীদের জীবন যাত্রায়ও নবাগত বাঙালীদের প্রভাব পড়ছে। ইঙেল্‌লেই, চাউবি, কাপকনু, থাম্পাল প্রভৃতি মণিপুরী ভাষার নামগুলোও তাদের আদিম পরাজিত জীবনযাত্রার সাথে ছুটি নিচ্ছে। তাই বোধ হয় ইঙেল্‌লেইর মেয়ের নাম রাখা হয়েছে রীতা।

ইঙেল্‌লেইর বোনা কাপড় চমৎকার। বাইরে থেকেও অনেক ফরমায়েস আসে। মাঝে মাঝে অনেক রাত অব্দি তাকে কাপড় বুনতে হয়। তখন তাঁত আর গান তার সঙ্গী। কাপড় বুনতে গিয়ে প্রত্যেক কাপড়ের সাথে হাত দেড়েক সূতার গুচ্ছ থাকে। সেই সূতাকে হিস বলা হয়। হিস জমিয়ে আসন তৈরী হয়। ছোট মেয়েরা হিস দিয়ে খেলনা কাপড় বোনে। রীতার বিয়েতে সম্মানিত লোকদের বসতে দেওয়া হবে। তাই খুব যত্ন করে ইঙেল্‌লেই হিসগুলো জমিয়ে রাখে।

রীতার বয়স ন'য়ে পড়েছে। মা যখন সকালবেলা জমিতে ধান কাটতে যায় সে দাওয়ায় বসে খেলনা কাপড় বোনে। মাঝে মাঝে রোদে ছড়ানো ধানে পাখী পড়লে তাড়ায়। দুপুরে কোন দিন গ্রামের প্রাইমারী স্কুলেও যায়। তবে বেশীর ভাগ সময় ঢেঁকি ঘরের পাশে ছোট একটা বাঁশের খেলনা ঢেঁকিতে ধানের তুষ দিয়ে সংসারের খেলায় মত্ত থাকে। প্রতি বছর পৌষে আধ মন করে ধান চাঁদা তুলে পাঠশালায় মাস্টারকে দেওয়া হয়। মাস্টারবাবুও আগের মত ধান পায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও বছর বছর কমে যাচ্ছে। ধনবাবু স্কুলের চাঁদা দিতে না পারায় রীতার স্কুলে যাওয়া শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

রীতা আর স্কুলে যায় না। বিকেলে বান্ধবীদের নিয়ে ঘরের পেছনে জলপাই গাছটা থেকে জলপাই পেড়ে নুন-মরিচ দিয়ে জল পাই খায় আর নানা খেলাধূলায় মেতে থাকে। মাঝে মধ্যে পড়বার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বছর ধান হয়নি। খোরাক কিনতে হবে। আর বছর ভাল ধান হলে আবার স্কুলে যাবে। এখন ঘর সংসারের কাজে মাকে বাবাকে সাহায্য করে রীতা। সন্ধ্যায় খড়ের বেণীতে আগুন জেলে গোয়াল ঘরে মশা তাড়ায়, বাপের পুরনো মৃদঙটায় ধূপধুনা দেয় পূজা করে। সবশেষে তুলসী তলায় তেলের সলতে জ্বেলে দেয়, মাঝে মাঝে ভাত রাঁধে, চমৎকার পালটই বানাতে পারে। পালটই মানে শুকনা মাছের তরল ঝাল।

(পাঁচ)

রীতার বয়স এখন চৌদ্দ। সে আর স্কুলে যেতে পারেনি। পরের বছর ধান ভাল হলেও জিনিষপত্রের দরদস্তুর বেড়ে যাওয়ায়, ধনবাবুকে আধকানি ক্ষেত বন্ধক দিয়ে চৈত্র মাসের অভাব সারতে হয়েছিল সেই যে ধনবাবু বিপাকে পড়েছে আজও দাঁড়িয়ে সোজা হতে পারেনি। দিন দিনই যেন তারা পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। কোন দিন তারা রেশান খায়নি। রেশানের চালে বমি আসে। তবু বছরে তিন মাস রেশান নিতে হয়। ইঙেল্‌লেইর স্বপ্ন রীতাকে মোটামুটি ভাল ঘরে বিয়ে দেবে। বেশি না হোক বছরে অন্ততঃ খোরাক কিনতে হবে না। গায়ক বা বাদক হলে আরো ভাল হয়।

আর দু-এক বছরের বেশি রীতাকে ঘরে রাখা যাবে না। সেজন্য ইঙেল্‌লেই প্রস্তুত হতে চাইছে। প্রতি বছর ঝাঁপি ঝাঁপি কাপড় বুনে জমিয়ে রাখছে। সূতার দামে দিন দিন আগুন লাগছে। এক সাথে সমস্ত কাপড় বোনা সাধ্যাতীত হয়ে পড়বে । পাড়া পড়শীদেরও দিনকাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। এই বছরও তিন ঘর লোক গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। কি করেই বা থাকবে। এখন লাকড়ি কিনতে হয়, ছন-বাঁশ কিনতে হয়। গরু মোষ চরানোর মাঠটাও জমিন হয়ে গেল। মহাজনরা একটার পর একটা জমি কিনে গ্রামটাকে ঘরছাড়া করছে। বাজারে পাঁচশের চাউল বেচে এক মুঠা সূতা কেনা যায় না। সব সূতা নাকি আজ ব্লেকে যাচ্ছে। এই বছর শ্রাবণ মাসেই ধনবাবুর ঘরে খোরাকীর টান পড়ে। বাধ্য হয়ে আরো একখানি জমি বন্ধক দিয়ে বীজ, খোরাকির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তারপর এক বছরের ছেলে বিক্রমজিৎটার ঠান্ডায় নিমোনিয়া হল। গাঁয়ের কবিরাজ একটা ছারপোকা মেরে কি এক পাতার রসের সাথে মিশিয়ে বাচ্চাটাকে খাইয়ে দিল। তবু তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল না। কাঞ্চনবাড়ীর সরকারী ডাক্তারকে পঁচিশ টাকা ভিজিট দিয়ে ডাকা হয়েছে। ভিজিট, ঔষধ পথ্যের খরচের জন্য ইঙেল্‌লেই রীতার বিয়ের জন্য রাখা কাপড়গুলো জলের দরে বেচে দিল। ইঙেল্‌লেই মনে মনে কাঁদল। তার চোখে ভবিষ্যৎ ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসছে।

রীতাও এখন কাপড় বোনার জন্য তাঁতে বসে। মায়ের কাছে বসে বসে সূতার ভাঁজ, নক্সা ইত্যাদি শিখে নিচ্ছে। তার হাত দ্রুত দক্ষ হয়ে উঠছে। মেয়ের কাজ দেখে ইঙেল্‌লেই তার সেই ফেলে আসা যৌবনের কথা মনে করে। ঠিকমত শেখাতে পারলে ওর হাত আরো পরিষ্কার হবে। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। সূতার বাজারে অকাল নামছে। মায়ের তাঁত নিয়ে টানাটানি চলে না। আলাদা তাঁতের আসবাব চাই। রীতাও বাপের কাছে বায়না ধরে পাহাড় থেকে ওর জন্য আলাদা উটঙ এনে দিতে। একদিন সকালে দা নিয়ে পশ্চিমের পাহাড়ে গেল ধনবাবু। মেয়ের ইচ্ছা মত উটঙ বানিয়ে দেবে সে। কিন্তু উটঙ হলেই কি, সূতার জন্য এখন লাইসেন্স করতে হয়। সেজন্য দালালকে, অফিসারকে, অফিসের বাবুকে ঘুষ দিতে হয়। লম্বা লম্বা পাকা মৃত্তিঙ্গা বাঁশ কাটতে কাটতে ভাবছিল ধনবাবু। ভাবছিল কিন্তু বাঁশ বেশি নিতে পারলে ঘরের থাংদাল পালাখিলা হয়ে যেত। তাও ফরেস্টারের জ্বালায় নেয়া যাবে না। ভাবতে ভাবতে এক আঁটি বাঁশ নিয়ে ফিরছিল ধনবাবু। পথে রেঞ্জারের হাতে পড়ল সে। ভয়ে কাঁপতে লাগল তার বুক। যেখানে বাঘ সেখানেই রাত। কয়েক চিলতে বাঁশ আনতে গিয়ে এমন বিপদে পড়তে হয় এটা তার নতুন অভিজ্ঞতা। ফরেস্টার গার্ড ধনবাবুর কানে কানে কি বলল একটু দূরে ডেকে নিয়ে। ধনবাবু বলল বাঁশে তার কাজ নেই। গার্ড বলল, তা হলে মামলা হবে। মামলার জন্য মাসে দু'বার কৈলাশহর কোর্টে যেতে হবে। তার চাইতে পঞ্চাশ টাকা বিকেলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? এর সাথে মাত্র সের চারেক খাঁসার চাল দিলেই চলবে। পরদিন বাড়ীর পেছনের চারার জমিটা কাঞ্চনবাড়ীর মহাজনের কাছে আশি টাকায় বন্ধক দিয়ে ধনবাবু রেঞ্জার সাহেবের আইন থেকে আত্মরক্ষা করল। তারপর থেকে দিব্যি করেছে ধনবাবু আর পাহাড়ে যাবে না।

এদিকে বাজারে সূতার দাম আরো বাড়ছে। জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। নূনে ভাতে টানাটানি। তাঁতের কাপড়ে খরচ বেশি। বাজার ভরে গেছে মিলের কাপড়ে। মণিপুরীরাও

এখন কম দরের মিলের কাপড় পরে। অভাবে দারিদ্রে মহাজনদের তাড়নায় মশাউলী গ্রামের মণিপুরী পাড়াও শ্রীহীন সম্পদহীন রক্তহীন হয়ে পড়ছে। দেনার দাদনে শোষণে জমি হাতছাড়া হচ্ছে কৃষকদের। ধনবাবুর এখন কেবল ঘর ভিটাটি আছে। সে এখন বর্গাচাষ করে। তাতে বছরে দু'মাসের খোরাক হয়না। মন্ডপে মন্ডপে রাস দোল ও অন্যান্য উৎসবও কমে গেছে। তবু প্রতি সন্ধ্যায় পুরনো অভ্যাস মতো মৃদঙ বাজায় ধনবাবু। নতুবা আঙ্গুল বোল ভুলে যাবে চলতি ভারী হয়ে পড়বে, এমন কি বাতেও আক্রমণ করতে পারে। প্রতি সন্ধ্যায় যতই মহড়া হোক, ধনবাবুর মন আর ভরে না। ইঙেল্‌লেই যেন অল্প বয়সেই বুড়া হয়ে যাচ্ছে। রীতার দিকে তাকালে ধনবাবুর মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। রীতাকে বিয়ে দিতে পারলে তারা খালাস।

(ছয়)

অবশেষে রীতার বিয়ে ঠিক হল। রাতাছড়ার চন্দ্রজয় সিংহ জীপের ড্রাইভার খেয়ে দেয়ে মন্দ নয়। বরের দাবী থাল, বাসন, কাপড়-চোপড় ছাড়া একটি ঘড়িও দিতে হবে। ধনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসল। ইঙেল্‌লেই চিন্তিত। তিন ঝাঁপি কাপড় করেছিল রীতার বিয়ের জন্য। এক চিলতেও নেই। ধনবাবুর সাথে বিয়ের পাকা কথা হয়ে যাবার পর প্রথম যেদিন ইঙেল্‌লেই র মা তার বিয়ের জন্য কাপড়গুলি ঝাঁপি থেকে খুলে আলনায় সাজিয়েছিল— সেদিনের কথা মনে পড়ায় ইঙেল্‌লেইর বুক ফেটে যাচ্ছিল। বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা সেই পুরনো আলনাটার দিকে চোখ পড়তেই ইঙেল্‌লেই চোখ ফিরিয়ে নিল। শত হলেও বিয়ে। এখানে তো আর সামাজিক প্রথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিয়ের কাপড় বুনতে হবে। যে কাপড় বোনার জন্য ইঙেল্‌লেই প্রথম হয়েছিল, সেই কাপড়, বোনার সঙ্গতি নেই তাদের। দুঃখে বুক পাথর হচ্ছিল তার।

এদিকে সূতার উপর দারুণ কড়াকড়ি। বিনা লাইসেন্সে সূতা নেই। শহরে নাকি একদল লোক সূতা নিয়ে কালোবাজারী করছে। তাই এত কড়া ব্যবস্থা। ফলে বাজার থেকে সূতা উধাও। কিছু পাওয়া যায় তাও নিম্নমানের এবং অগ্নিমূল্যের। ধনবাবুর কেনার মত শক্তি নেই। না হোক দুটো লাঙইর সূতা সংগ্রহ করতে পারলেও হয়। পাশের দুধপুর গ্রামের বাঙালী তাঁতীদের কাছে সূতা খুঁজতে গেল ধনবাবু। গিয়ে দেখল ওদের তাঁত বন্ধ। পুরুষ মেয়ে বুড়ো সবাই দুর্দিনে টেষ্টরিলিফের মাটি কাটতে গেছে। এসে বউকে বলল, বনে যখন আগুন লাগে কাঁচা শুকনা মানে না।

নজর পড়ল ছোট বাঁশের মাচার মৃদঙটার উপর। লাল কাপড়ে মোড়ানো। চন্দনের ফোঁটায় পবিত্র। বলল, ফেরার পথে বাঙালী পাড়ার মথুরা সরকারের কাছে থেকে মৃদঙটার দাম চল্লিশ টাকা নিয়ে এসেছে। ওরা হরিসভার জন্য কিনে নিয়েছে। ইঙেল্‌লেইর কিছু বলার নেই। তবে ওরা রীতার বিয়ের পরেই মৃদঙটা নেবে। আগে নিলে ভাল দেখায় না। ধনবাবুর মুঠোয় কাগজের নোটগুলো ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। কি একটা আহত যন্ত্রণায় ধনবাবু ঘামছে। কাঞ্চনবাড়ীর শ্রেষ্ঠ মণিপুরী মৃদঙ ওস্তাদের গলদেশে আজ থেকে আর সম্মানের প্রতীক হয়ে গামছাগুচ্ছ ঝুলবে না। তার মনে হল সমস্ত মন্ডপগুলি যেন এক সাথে চিৎকার করে বলছে, বিধর্মী তুমি মন্ডপে আর এসো না। একটা অপরাধ ও পাপ বোধ থেকে থেকে সাপের শীতল শরীরের মতো যেন তার উপশিরাগুলি বেয়ে ধনবাবুর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। একজোড়া হালের বলদ

ছিল। গত কার্তিকে একটা বিক্রি করেছে। এখন এটা বিক্রির জন্য বাজারে তুলল। তাতেও বিয়ের পয়সা জোগাড় হল না। অবশেষে ঘরভিটার পোকায় কাটা কাগজপত্র দলিল পর্চা নিয়ে কাঞ্চনবাড়ীর মহাজন রমাপতি পোদ্দারের ঘরে গেল ধনবাবু।

কোন ক্রমে টাকা জোগাড় হল। বেগুনি রংঙের কয়েক মুঠা সুতা নিয়ে ইঙেল্‌লেই আবার তাঁতে বসল। লানটুম, উটঙ, জতর, সুতার ভাঁজ নক্সা জাংথুমের মন্ডপ, যুবতী মেয়েদের উল্লাস, মাশউলী গ্রামের সেই তমাল গাছ, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা যুবক, খই ভাজার মতো মাদলের বোল। ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন সূতা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। মনটা বসেও বসছিল না। বুকের ভিতর যেন একটা দারুণ অসুখ।

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁতে কাপড় বুনছিল ইঙেল্‌লেই। ধনবাবু পাশেই বসে কল্কি কল্কি তামাক শেষ করছিল টেনে। বিক্রমজিৎ আর মেয়েটা কেমন নির্ভাবনায় ঘুমাচ্ছে। কুপীর আলোয় তার মুখটা কেমন থমথমে দেখাচ্ছে। ওদের ঘুম দেখলে লোভ হয়। আজ থেকে এই বাড়ি রমাপতি পোদ্দারের। ফলন্ত লাউ মাচায় ফুলগুলি জ্যোৎস্নার আলোকে দারুণ লোভনীয় মনে হয়। সুপারি গাছগুলি ধনবাবুর বাবার হাতের লাগানো। ধনবাবুর জন্মের সনে কৈলাশহরের বাজার থেকে এনে নারকেলের চারাগুলি পুঁতে ছিল তার বাপ। তিনটা গাছেই নারকেল ধরে। ইঙেল্‌লেইর হাতে পোঁতা কাঁঠালগাছটি গেল সন থেকে ফল ধরতে শুরু করেছে। সরবতী লেবু, জাম্বুরা, দুধসাগর আম, উঠানের কোণে শিউলির গাছ,কামিনীফুল— বাড়ীটার মোহ তারা ছাড়তে পারছে না। সারাটা বুক জুড়ে একটা বাড়ী।

(সাত)

আজ রীতার বিয়ে। সন্ধ্যায় বর আসবে। বরযাত্রীরা বাড়ী মাতিয়ে তুলবে। গাঁয়ের সম্মানী লোকেরা আসবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই লেপে ঝুপে ঝাট দিয়ে ইঙেল্‌লেই বাড়ীটা সাজিয়ে তুলছে। আর মনে মনে ভাবছে বিয়ের পর মাত্র এক মাস থাকতে পারবে এখানে তারা। কাঁঠালছড়ার ধনবাবুর এক মামাতো ভাই বলেছে, এক হাল গরু দেবে, সেখানে বাগীতে জমিও ঢের পাওয়া যাবে। ইঙেল্‌লেই-র অকস্মাৎ মনে হল এসব কথা ভাবতে নেই। আজ আনন্দের দিন। আজ শুধু রীতার জন্য, মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গল কামনা করতে হবে। নিজেদের দুঃখের কথা তুলে আর মনকে ভারী করতে চাইলনা ইঙেললেই।

বিকেলে দেখতে দেখতে পাড়াপড়শীদের আগমনে বাড়ী ভরে গেল। রীতা এখনো সাজে নি। এলোমেলো চুল। পরনের ময়লা লাঙই সে ছাড়ে নি। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বান্ধবী উর্মিলাকে মৃদঙের আসনটি দেখিয়ে বলল, কাল থেকে ওখানে সন্ধ্যা দীপের সলতে জ্বালানোর কেউ থাকবে না। রীতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে এই বিয়ে ওর মা-বাবাকে ঘর ছাড়া করেছে। সে কথা বলতে ইচ্ছা হলেও বলতে চাইলনা। অদূরেই উঠানের এক কোণে ছোট ভাই বিক্রম হতভাগ্যের মতো দাঁড়িয়ে। বড় বোনের বিয়ের দিন ওর জন্য নতুন জামা প্যান্ট আসেনি। দু'হাতে রাখীর মত করে ইঁদুরে কাটা লাল নীল সূতা বাঁধা। ঘুনে ধরা মাকড়সার জাল ঝুলিয়ে ময়লা একটা ফাটা উটঙ নিয়ে আনমনা হয়ে ভোঁ বাজিয়ে চলছে। সেই শব্দে একটা বিষাদ নামছে তার বাড়ীতে। রীতার ইচ্ছা হচ্ছিল বিক্রমের গলা জড়িয়ে চিৎকার দিয়ে কেঁদে এই বিষাদকে হাল্কা করে।

রীতার বিয়েতে সানাই বাজল না। বাদক আসেনি। রীতার মা ঝাঁপি খুলল না। সদ্য বুনে শেষ করা লঙই দিয়েই মেয়েকে সাজিয়ে আজ পরের বাড়ীতে তুলে দেবে। এই ব্যথায় ইঙেলেই বার বার কাতর হল।

ধনবাবু বিয়ের সাদেয় আনতে কাঞ্চনবাড়ীর বাজারে গেছে। সে এলেই রীতাকে সাজানো হবে। সন্ধ্যার পর বরযাত্রীরা আসবে। দেরী দেখে পাশের বাড়ীর একজন বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুড়ীর চোয়াল দুটো ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেছে; কুঁচকানো চামড়ার নীচে একজোড়া লক্‌লকে ঘোলাটে চোখ। রীতাকে কাছে ডেকে বললো, নাতিন, বিয়ের পর জামাইকে নিয়ে পানগুয়া খেয়ে আসবি।

রীতা হাসলও না কাঁদলও না। থমথমে প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তখন আমের ডালে একটা কোকিল থেকে থেকে কান্নার মতো সুরে ডেকে যাচ্ছিল।

আলোর ঠিকানা

দীঘির নাম কাঞ্চন। কবেকার কোন জমিদার বা প্রজা এই দীঘি তৈরী করিয়েছে। এখানকার মানুষ সেকথা প্রায় ভুলে গেছে। দু'একজন তিন মাথার বুড়ো হয়ত বলতে পারে এর কিংবদন্তী, কিন্তু তা কেউ শুনতে চায় না। দীঘির জল স্বচ্ছ। সেই জলে রোজ একদল হাঁস শামুক খুঁজে বেড়ায়, আর আয়না দেখে পালকের মাঝে সিঁথি কাটে। মেঘলা আকাশ, তারা ভরা আকাশ যেমন এই গহন কালো জলে রূপের বাহার দেখে, তেমন পূর্বপারে বাজারের আলকাতরা মাখা ফাটা ফাটা টিনের চালগুলোর মুখ দেখে সুপারিগাছের আড়াল দিয়ে, একটা লাজুক কুৎসিত মেয়ের মত।

মাশাউলী, দুধপুর, নালীছড়া, সায়দাবাড়ী ও আরও দূর দূরান্তের পাহাড় বাঙালী, মণিপুরী অনেক লোক সপ্তাহে দু'বার এই হাটে আসে। হাট বসে বুধবার ও শনিবারে।

হাটে কয়েকটা স্থায়ী দোকানও আছে। তাছাড়া আছে যামিনী পালের দোকান, নিবারণ দাসের টেবিলের পান বিক্রি, তবলজয়ের শুয়োরের মাংসের দোকান, বকসাল সাধুর আনাজ সব্জীর দোকান। বাজারের একদিকে ইঙেল্‌লেই, তঙক, ভানুমতী ওরা প্রত্যেকে হাটবারে চাল বিক্রি করে, বাতাসে নিভু নিভু পাঁচ পয়সার মোমবাতি হাতের আড়াল করে। অন্যদিকে থাঙ্গাল মঙ্গল, জয়চরণ ও আরও অনেকে খুন্তি দিয়ে খোঁড়াখুড়ি করে টিনের গুড়ের ব্যবসা করে, আর মঙ্গলের নতুন মোষের ধীরে ধীরে লাঙ্গল টানার কথা বলে।

বাজারের দক্ষিণ কোণায় পুতুল ডাক্তার হোমিওপ্যাথির পুরিন্দা বাঁধে আর মুখে মুখে অভিরামের মেয়েকে নিয়ে বিষ্ণু সাধুর বড় ছেলের পালিয়ে যাওয়ার গল্প বলে। বলতে বলতে মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে রমাপতির গদিতে ইঙেল্‌লেই এর জমির কবলা নাকি আজ হবে।

ওদিকে কেতকী দাসের চায়ের দোকানে বাসী মিষ্টি খেয়ে দুধপুরের সেন সাধু পয়সা না দেওয়ায় কেতকী দাসের বড় ছেলে সেনা সাধুর ছাতি আটকায় খোকামালি মাছ বেচা সেরে কেরোসিনের কালো বোতলটা খুঁজে খুঁজে হয়রান রমাপতির গদিতে লোকজনের ভীড়ে বোতল বুঝি হারিয়ে যাবে। গজেন শীল, অমর শীলের মেয়ের জামাই চুলওলা খদ্দেরকে ইটে বসিয়ে চুল কাটে। মাঝে মাঝে কালি-ঝুলি মাখা লণ্ঠনটা এদিকে ওদিকে ঘোরায় আর অমর শীল গত রাতের বড় বড় শিং মাগুর জালে আটকানোর কৃতিত্বটা জাহির করে। গজেন মণিপুরী পাহাড়ীদের দাড়ি নেই বলে ঠাট্টা করে। অবিনাশ রায়ের চায়ের দোকানের বারান্দায় খালি চৌকিতে লেখাপড়া জানা দুটো বেকার ছেলে আর পাট কারবারীর দালাল মধু ঘোষ এবং প্রতাপ ইস্কার রঙের তাসটা ওলটায়। ট্রামকার্ড পেতেই বলে রমাপতির জমির ক-ব-লা।

অবনী পালের শুকনো মাছের দোকান। সে এইমাত্র ঠাসা কলসী থেকে তেল চটচটে শুকনো পুঁটি মাছ বের করে ঝুড়িতে রাখে। তার গন্ধ মণিপুরী পাহাড়ীদের ডেকে আনে। তারপর ময়লা চায়ের কাপে নকসা করে চুমুক টানে। নিক্তি নিয়ে ওজন করে পুঁটি মাছের সিঁদল। মনে হয় রতিপাথরে মণিমুক্তা ওজন করে। নিকয় বুড়ী কোমরের পানের বাটা থেকে কাঁচা সুপারী, পানের খিলি এগিয়ে দেয় অবনীকে। মুখে পানটা পুরে, বাটখারা নামিয়ে বলে- বুড়ী একটুখানি সরে

দাঁড়াও, মহাদেবের ষাঁড়টা তোমায় গুঁতো মারবে। নিকয় বুড়ী সরে দাঁড়ায়। মহাদেবের ষাঁড়টা হেলতে দুলতে স্বাধীনতার বোঝা নিয়ে চলে যায় হরিশনাথের হলুদ পাকা চাঁপা কলার ছড়াটা ছিনিয়ে নিতে। কলার কাঁদিটা ইঙেললেই এর বাড়ী থেকে কেনা।

সুধীর দাসের মেঝো ছেলে জয়াদাস চাল কারবারী মুকুল ঘোষকে চুপিচুপি বলে-আজ কিছু টাকা দাও, কাল বাবা যখন মাঠে যাবে তখন গোলা থেকে ধান সরিয়ে নেব। ইঙেল্‌লেই -এর কাছে পাওয়া টাকা আর পাচ্ছে কই? কালাচানের ভোরবেলা তুলে আনা শিশির ভেজা বেগুনগুলো রোদে হাতে ঘামে, ঠিক যেন হৃদয় শশির বুড়ো বাপের চোখের কালো ভাঁজ পড়া পাতা বিক্‌ছে তখন বিকেল বেলায় দরে। কালাচানের মনে মনে তাড়াহুড়া কখন যাবে, রমাপতির গদির জম্-জমাট বিচার ফয়সলায় আসরে। নালীছড়ার পাহাড়ীগুলো চিত্ত দর্জির ছেঁড়া কাপড় নিয়ে বাঁশের মশালে সলতে ভরে। অন্যদিকে চিত্ত দর্জি বনমালার নতুন জামাইয়ের হালের জামার জন্য বুকের পাটা জরীপ করতে বলে, তোমাদের গ্রামের ইঙেল্‌লেই এর জমির ঝামেলা কি হলো? প্রতি হাটবার সকালবেলা শশী শব্দকর বাজার শেষে গোটা বাজারে মুঠো মুঠো চাল, কুঁচকে যাওয়া বেগুন, এক আধটা বিড়ি সবকিছু কোচরটাতে ভরে। যেতে যেতে সে থম্‌কে দাঁড়ায় গুণমণির পানের দোকানের পাশে। গুনমণি চেঁচিয়ে ওঠে, আগের পয়সা ঝটপট মিটিয়ে দাও হে।

অমর দাসের দোকানের পাহাড়ী মেয়েদের ভীড়। অমরের শুক্‌নো ঠোঁট দিয়ে পানের খয়েরী পিক্ ঝরে। সে হাসতে হাসতে দাঁত খিঁচিয়ে পাহাড়ী মেয়েদের ঘামে পিচ্ছিল কব্জিগুলোতে লাল, নীল, হলুদ চুড়ি পরিয়ে লাভালাভ হিসেব করে। অন্যদিকে ওদের সিকি, আধুলির মালার নীচে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর দিকে আড় চোখে চায়। ফিক্ করে হাসে খাসিয়া মেয়েটা। পাশ দিয়ে রমাপতির কর্মচারী ধনবাবু ও ইঙেল্‌লেইকে হাঁকাতে হাঁকাতে যায়।

মহাজন রমাপতি পোদ্দার গদীতে বসে ইঙেল্‌লেই-এর স্বামী ধনবাবুকে ডেকে পাঠায়। পেট্রোমেক্স বাতিতে পাম্প করার জন্য মাঝে মাঝে কর্মচারীদের ধমকায়। কখনো দু-একজন খদ্দেরের সাথে পয়সা হিসেব করে। গদির সস্তা সাদা সালুর ওপরে বসে রসিয়ে আলাপ করে গাঁও প্রধান বিপিন পাল আর তহশীলদার অনঙ্গবাবু। আমীনউল্লা থানে সাজানো কাপড় নামিয়ে সস্তা দামের ডোরাকাটা লুঙ্গি দেখে।

ইঙেল্‌লেই বাজারে চাল বিক্রি শেষ করে ধন বাবুর সাথে রমাপতি পোদ্দারের গদীতে চলে যায়। ধনবাবু চৈত্র মাসের গরমে জামা খুলে ঘুরিয়ে বাতাস করতে করতে পায়ের ফাটায় একপথ ধুলো নিয়ে গদীর পাশে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ে। ওর গালের একপাশে দাঁতের মাড়ির কোণায় জর্দা দেওয়া পানের খিলি। ওদিকে দোকানের কর্মচারী মণীন্দ্র পাহাড়ী মণিরামকে বাঁশের চোঙে কম তেল দেওয়ায় তর্ক শুরু হয়।

গাঁও প্রধান বিপিনবাবু চায়ের পেয়ালায় ফুর -র-র আওয়াজ তুলে চুমুক টানে। রমাপতি পোদ্দার আসন করে বসে পায়ের কালো চেটোয় সোনার আঙটি পরা হাতে চাপড়ায়। ওর খালি গায়ে ঘামে ভেজা লোমের সাথে সাদা সূতোর পৈতেটা লেপ্টে রয়েছে। আরমান আলির মোকদ্দমায় বিপিন বাবুর কেরামতির ব্যাপারটা হচ্ছে এই রসের আলাপের বিষয়বস্তু। ইঙেল্‌লেই এর মেয়ে রীতার বিয়ে হল- সে প্রায় বছর খানেক আগের কথা। সেই বিয়েতে ইঙেল্‌লেই-এর স্বামী ধনবাবু

পাঁচশো টাকায় ভিটে বন্ধক দিয়েছে। আজ অবধি সে বন্ধক মুক্ত করতে পারেনি। আর কর্তা-গিন্নিতে মোটামোটি এটাই পাকাপাকি করছে যে হয়ত পাঁচশো টাকা পেলে রমাপতি পোদ্দারের কাছে সাব কবলা করে দেবে। ধনবাবু সেই উদ্দেশ্যে কাঁঠালছড়া গাঁয়ের অনাবাদি জঙ্গল থেকে একবার ঘুরেও এসেছে। হঠাৎ রমাপতি বাবুর হাতের তালপাতা থেমে যায়। সে গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে—কি ধন সিং, চৈত্র মাস প্রায় শেষ, তোমার খবরই যে মিলছে না। ধনবাবু নিরুত্তর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে যেন জজের সামনে রায় শোনার অপেক্ষায় কত বছর মেয়াদের হাজত খাটা আসামী।

ইঙেল্‌লেই মেঝের ওপর দরজার পাশে বসে গলার কাঠের মালাটা আনমনে দাঁত দিয়ে খোঁটে। ধনবাবুকে চুপচাপ থাকতে দেখে ইঙেল্‌লেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলতে শুরু করে—বাবু, এই বছরটা দেখে নিন, আগামী আউস ফসলটা তুলতে দিন। এই দুঃসময়ে ধান চলে গেলে খোরাকী পর্য্যন্ত হবেনা।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই রমাপতি পোদ্দার গর্জে ওঠে- ও রকম কথা অনেক শুনেছি। গত বছরও তোমরা বেশ কয়েক মণ ধান কম দিয়েছ। গরীব মানুষ বলে কিছু বলিনি।

ধনবাবু চুপ থাকতে পারেনি। সে বলে উঠে-বাবু, একি কথা বলছেন? গত বছর আমরা বরং আপনাকে বেশী করে ধান দিয়েছি। নিজের খোরাকী টানাটানি করে আপনার জমির পাওনার সাথে দোকানের পাওনা পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছি।

রমাপতি পোদ্দার দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে লাল কাপড়ে মোড়া একটা খাতার সাথে জমির কিছু পুরোনো দলিল বের করে। নাকের ডগায় চশমাটা লাগিয়ে বলে—দেখুন তহশীলদার বাবু, বিপিনবাবু আপনিও দেখুন-আপনি একজন গাঁওপ্রধান, আপনার এই কাগজপত্রগুলো দেখা উচিত। দূর থেকে কমল সাধুর গাঁজার কলকের গন্ধ সন্ধ্যার বাতাস ঘন করে দেয়, বাতাসে ভেসে আসে।

তহশীলদারবাবু দেশলাইয়ের একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলে- ধন সিং তোমার জমি বন্ধকী পাঁচশো টাকা ছাড়াও তোমার বাবার আমলের তিনশো টাকার ঋণ আছে। সব মিলিয়ে সুদে-আসলে বারশো টাকার কিছু বেশী।

গাঁওপ্রধান বিপিনবাবু বললেন- থাক, সব মিলিয়ে রমাপতিবাবু তোমার কাছে বারোশো টাকাই পাবেন বলে ধরি।

রমাপতিবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলে— আপনারা বিশিষ্ট মানুষ আপনারা যা বলেন তাই হবে।

ধনবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এতদিন তার ধারনা ছিল বন্ধকী পাঁচশো টাকাই ঋণ। ভিটে ছেড়েও দেয় তাহলেও মহাজনের কাছে ও অন্ততঃ আরো পাঁচশো টাকা দাবী করতে পারে।

ইঙেল্‌লেই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, সে বলে--বাবু আপনি লক্ষ্মীমায়ের ভান্ডার হাতের পাশে রেখে কেন মিছে কথা বলছেন? আমার শ্বশুরের ঋণ তিনি জীবিত থাকতেই চারাজমি আপনার নামে দলিল করে শোধ করেছেন। এরপর এত বছর কোনদিনও আপনি সেই ঋণের

কথা বলেননি। আজকে হঠাৎ আমাদের অসুবিধায় ফেলে জায়গা-জমি গ্রাস করার জন্য এই মিথ্যে হিসেব তৈরী করেছেন?

রমাপতি পোদ্দার ধমক দিয়ে ওঠে- তুমি চুপ করো-তোমার সাথে কথা হচ্ছে না। ধনুবাবু প্রতিবাদ করে বলে-- কি চুপ করবে? আপনি খুশিমত যা বলবেন তাই হবে নাকি?

বিপিনবাবু মোলায়েম সুরে বলে— কি ধন সিং, রাগ করছ কেন? তুমি মোড়ল মুরুব্বি মানুষ দশজনের বিচারে আসা যাওয়া কর। অথচ এখানে রাগ করে কথা বলা কি ঠিক ? রমাপতিবাবুর তোমাকে ঠকানোর কোন উদ্দেশ্য নেই। তোমরা গরীব মানুষ, সুবিধা অসুবিধায় পড়লে উনি সাহায্য করেন ।

ইঙেল্‌লেই কথা লুফে নিয়ে বলে— সাহায্য ! বাড়ীঘর, ভিটেমাটি ছাড়াতে উনি খুব সাহায্য করেন।

দোকানে লোকজনের ভীড় জমাতে শুরু করে । ইঙেল্‌লেই কোমরে পানের ডিবে আটকানোর গামছাটা শক্ত করে এঁটে উঠে দাঁড়ায়। সে এই অবিচার মিথ্যা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থিত কৌতূহলী জনতার কাছে নালিশ জানায়। ইঙেল্‌লেইকে হয়ত গাঁয়ের দু'একজন মুখরা মহিলা বলেই জানে। তবু ইঙেল্‌লেই-এর সাধারণ পরিচয় গৃহস্থের লাজুক বৌ। সে নিজের বুকের ভেতর স্তরে স্তরে জমে ওঠা বঞ্চনার বেদনা লুকিয়ে চোখ কচলিয়ে কাঁদে। আবার সেই বেদনা সৌজন্যের বেড়া ভেঙ্গে উন্মত্ত মোমের মত শ্লীল, অশ্লীল ভাষা বাংলায় প্রতিবাদে রমাপতি মহাজনের মেকী ভাল মানুষীর মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে পারে । একথা কেইবা জানত? এমন কি ধনবাবুও অনুমান করতে পারেনি।

লোকজনের ভীড় দেখে গাঁও প্রধান বিপিনবাবু বলে— তোমরা এখানে অযথা ভীড় করছ কেন? ইঙেল্‌লেই বাধা দিয়ে বলে— না বাবু, ওদের তাড়িয়ে দেবেন না। সবাইকে শুনতে দিন । দশজনের কাছে আমি বিচার চাইব।

জনতার ভীড়ে গুঞ্জন ওঠে—'এযে দিনে ডাকাতি। রমাপতি মহাজন কোন উপায় না দেখে বলে— বিপিনবাবু, আপনি একটা সুরাহা করে দিন ।

ইঙেল্‌লেই আকাশের দিকে চেয়ে নিজের নালিশ জানায়— 'ভগবান' এর বিচার করো । তোমার কাছে যদি সত্যি হয়ে থাকি, তবে যেন দু'চোখে দেখি কব্জি দিয়ে চোখের জল মুছছে । নির্ব্বংস করো এই মহাজনকে ।

ইঙেল্‌লেই এর চোখের তারা দু'টোতে উত্তপ্ত ঘৃণা। ওর মুখের প্রতিটি কথায় রমাপতির গায়ে জ্বালা ধরে। ইঙেল্‌লেই এর কথা শুনে মনে হয় চুলা থেকে গরম লাল ছাই এর গাদা যেন কেউ রমাপতির মুখে ঢালছে।

রমাপতি উত্তেজিত হয়ে ভয় দেখায়— ধনবাবু, তোমার বৌকে সামলাও; নইলে মোকদ্দমা করে তোমাদের সকলকে হাতকড়া পরাব । যেই তোমাদের ভিটেতে দুর্ব্বাঘাস গজিয়ে ছাড়ব অমনি বাপ বাপ করে আমার কথা মানবে। ইঙেল্‌লেই- এর কিছু নেই বটে, তবে যেটুকু আছে তা হারাবার ভয়ে মরিয়া হয়ে ইঙেল্‌লেই জবাব দেয়— যাওনা বাবু, কাছারীতে কেইস কর । থানায় না হয় কদিন থাকব, তাকে কি হবে? কিন্তু আমি যদি কৈলাশহরে হাকিমবাবুর কাছে গিয়ে

বেইজ্জতি করেছ বলে নালিশ করি, তোমাকেও জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। দেখি কেমন করে তোমার সম্পত্তি ছেড়ে কত রাত থাকতে পার।

সরল গৃহস্থ চাষীর বৌ জানত না, যাঁদের গদী আছে হাকিম তাদের বিচার করতে চায় না।

রমাপতিবাবু বলে— দেখুন বিপিনবাবু অভাবে কেমন স্বভাব নষ্ট হয়।

—হ্যাঁ বাবু, আমাদেরই অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু মহাজন বেইমানি করলেও স্বভাব ভাল থাকে, ইঙেল্‌লেই জবাব দেয়।

রমাপতিবাবু খয়েরী দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠে— শোন সবাই শোন, খান্‌কী মাগীর কথা শোন, আমি নাকি বেইমান।

সবাই হেসে ওঠে। যাদের অভাব নেই তাদের বেইমানি সমাজে সহজে স্বীকৃতি পায় না। তারা অন্যকে অভাবের নর্দ্দমায় ফেলে দেয়। সেই ধাক্কা খাওয়া মানুষের স্বভাব হাত থেকে খসে পড়লেই মাটির কলসের মত ভেঙ্গে যায় না। ইঙেল্‌লেই-এর এই অভিজ্ঞতা, জন্মলগ্নেই মহাজনের কাছে যারা ঋণী, সেইসব গ্রামের ভীরু মানুষদের কাছে হাসির খোরাক হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সবার হাসি দেখে রমাপতিবাবু ভাবে সবাই বুঝি তার পক্ষে নুয়ে পড়েছে। তাই সে চীৎকার করে গদী থেকে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে ইংঙেল্‌লেই-এর চুলের মুটি ধরে বের করে দেয়। ধনবাবুকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে বলে— যা এখান থেকে বেরিয়ে যা। আমাকে আর আইন দেখাতে হবে না। দেখব, কি করে ভিটে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকিস্।

ইঙেল্‌লেই ধনবাবুকে টানতে টানতে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে— কুকুরের বাচ্চা। দেখি কি করে জমিতে পা ফেল। ঝাড় দিয়ে পেচ্ছাপ করে ঝাঁটিয়ে তাড়াব।

লোকের ভীড় কমে। সকলে ফ্যালফ্যাল করে দেখতে দেখতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যায়।

বিপিনবাবু গম্ভীর হয়ে বলে— দেখলেন রমাপতিবাবু, মণিপুরী মেয়েরাও চালাক হয়ে গেছে। এইভাবে চললে তো আর ব্যবসা করা যাবে না..........।

বাজার শেষে ধনবাবু ইঙেল্‌লেই চলছে পাশাপাশি বাড়ীর দিকে। মুখে তাদের কথা নেই। নিঃশ্বাসের কম্পনে অসহায়তা, দীনতা বুক থেকে ভয়ে ভয়ে বেরুচ্ছে। রাস্তার আশে পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, ফিস্ ফিস্ করে বলছে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। নবকিশোর শূন্য গুড়ের টিন নিয়ে হন্ হন্ পাশ কেটে এগিয়ে গেল। ইঙেল্‌লেই লুকোতে চাইছে এই অন্ধকারে। মনে হচ্চে তার এই অন্ধকারে মিশে যাবার মত মন্ত্র জানা থাকলে ভাল হতো। ঘরে ফেরা মানুষের অনেক চোখ তাদের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যাচ্ছে ব্যস্ত হয়ে। কেউ ফ্যাল ফ্যাল চাহনীতে বিদ্রূপ উপহাস ছিটিয়ে যাচ্ছে। সবশেষে গাঁয়ের ডানপিটে ছেলেটা এল ওদের পেছনে পেছনে। নাম তার লেইমনি। খুড়ী চিন্তা করোনা বলে একটা মশাল জ্বেলে পথ দেখিয়ে চলে। সহানুভূতির স্পন্দন শোনা যায় তাঁর নিঃশ্বাসে, উজ্জ্বল চোখে দেখা যায় এক প্রাগৈতিহাসিক ঘৃণা। খুড়ী বাঁচতে

হলে আমার কথায় কান দাও।

বৈশাখি মাসের দিন। প্রচন্ড গরমে আম পাকা গন্ধ বাতাসে গা ভাসিয়ে আসে। চকচকে নীল মাছি পাকা কাঁঠালের খোঁজে ভন্ ভন্ করে উড়ে যায় ইঙেল্‌লেই এর ছেলে মানুং এর এঁটো কাঁঠালের আবর্জনায়।

সন্ধ্যা হলো, আকাশের লক্ষ লক্ষ অগুণতি তারা হাওয়া খেতে বেরিয়ে এল দল বেঁধে। ইতিমধ্যেই মশাউলী গ্রামের এবড়ো- থেবড়ো রাস্তার ধারে জোনাকীর হরিলুঠ শুরু হয়েছে। থাম্পাল দু-দুবার মনু নদীতে ডুব দিয়ে এসেও প্রচন্ড গরমে বারান্দায় মাটির ওপর শুয়ে আছে। মানুং উঠোনে জোনাকী ধরে একটা পেঁপে পাতার লম্বা ডগায় ভরে নীল আলোর স্তম্ভ নিয়ে ও বাড়ীর নিতাই-এর সাথে খেলা করছে। তগুকদের মোষটা লেজ নেড়ে মশা তাড়ায়। দুধবাবু মিস্ত্রি গরমে খালি গায়ে বসে চৌকির তক্তাপোষে র‍্যাঁদা চালায়। যমুনা, দেবকী, কেতু সব ছেলেমেয়েরা উঠোনে চাঁটাই পেতে কেরোসিনের কুপীর আলোয় চীৎকার করে নামতা পড়ে।

ওদিকে ইন্দ্রজিতের বাঁশের বাঁশি শুনে গরমের অছিলায় মাকে ফাঁকি দিয়ে চন্দ্রজিনি পথের ধারে আসে, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে প্রেমের কথা কয়। চুলার ধোঁয়া ছেড়ে কৃষ্ণভানু উঠোনে এসে বৌদির মাথার উকুন ধরে টিপে মারে। নীলমণি ঠাকুরের শাশুড়ী নাতি- নাতনিদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাখার বাতাস করে। গুন্ গুনিয়ে আপন মনে গান ধরে--- যেন ইঙেল্‌লেই এর সাথে বৃষ্টির গানে কোরাস্ ধরার প্রস্তুতি।

দুধবাবু মিস্ত্রির ছেলের বৌ এর ভাতে অরুচি। সে বেশ কয়েকবার বমি করে লুকিয়ে ধূপের গুড়ো চিবোয়। এই গরমে পবিত্র ভাবটা নিয়ে চুলার কাছে যেতে ইতঃস্তত করে। তবুও বুড়ী শাশুড়ীটার কি পাষাণ প্রাণ। শুধু পীড়াপীড়ি করে।

এই গরমেও ডালিমের গর্ভবতী বৌ পাশের বাড়ীর বাচ্চাটাকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে আদর করে। নন্দবাবুর বৌ সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে বৃষভানুর দাদার সাথে কথা বলছে এই নিয়ে সন্দেহ। তাই লাজুক বৌটা এই অসময়ে নাইতে যাবার জন্য শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া করে। এই গরমে গিরি, লেইমনি দু-জনায় মিলে খোল বাজায়। কি জানি অভ্যাসের অভাবে যদি চলন বলন ভারী হয়ে যায়। অন্যদিকে পূর্ণমাসি এই দুর্দিনেও সূতো কিনে মনের মতো একটা বিছানার চাদর বুনতে বসেছে। মুখে তার রাসযাত্রার শুক সারির গান।

ইঙেল্‌লেই এর ভয় হচ্ছে--- রমাপতি মহাজন কর্মচারী পাঠিয়ে লাঠিয়াল খুঁজছে দুধপুর, নীলছড়া গ্রামে। স্বামী ধনবাবু বারান্দায় বসে জামাই চন্দ্রজয় ড্রাইবারকে সব খুলে বলার জন্য ইঙেল্‌লেই এর সাথে শলাপরামর্শ করে। আসন্ন বিপদে গাঁয়ের আরও পাঁচজনেক ডেকে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে । বৃষ্টি পড়লেই নাকি রমাপতি ভিটের সামনের জায়গায় জোর করে হাল দেবে। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীতে ঢুকবে।

এমন সময় নিকয় বুড়ী এক রাশ ঘামের গন্ধ নিয়ে এল। ইঙেল্‌লেই বলে খাওয়া - দাওয়া করে শিগ্‌গীর চলে এসো। দুধবাবুর আমলকী গাছের নীচে সবাই থাকবে। বৃষ্টির গান গাইব।

গাঁয়ের পশ্চিমে দু-দুটো ডোবা। একটায় কচুরি পানার সবুজ বন, অন্যটায় জল নেই। দিনের বেলায় ওই ডোবার ফাটা ফাটা কাঁদার তলানী কুকুরে চাটে। দুপুর রোদে কচুরি পানার স্তুপ

সরিয়ে গাঁয়ের বুড়ো কুঞ্জবিহারী লাটিমাছ ধরে কোঁচড়ে ভরে, সঙ্গে ধনবাবুও। আলাপ চলে এই আকালে জমি চলে গেলে খাবে কি!

বৈশাখের দিনে বৃষ্টি না হলে ধান বোনা যাবে না। জমির পাথুরে মাটিতে লাঙ্গল ভেঙ্গে যাবে। গত সন থেকে রাজাবাবুর জমিতে পাটের চাষ করার ইচ্ছা তাও ভেস্তে গেছে। হাওয়া দিয়ে আগুন ছোটে। কচুবনের ধানে শুকনো তামাক পাতার রং ধরেছে। ওদিকে লেইমণি, গিরি দুজন যুবক গতকাল দুপুরে উলঙ্গ হয়ে তেঁতুল গাছের ঘন ঝোপে ওঠে ডিম সমেত ফিঙে পাখীর বাসা উপড়ে এনে কচুরী পানার নীচে লুকিয়ে রেখেছে। তাতেও বৃষ্টি হল না। গজিন, পকারা দুজন গত পরশু বুড়োর সাথে বারান্দায় বসে গল্প করে। সেই ফাঁকে সোনাচাউবা, জয়কুমার দুজন যুবক মিলে বুড়োর হাঁড়ি কড়াই সমেত ইলিশ মাছের তরকারি, ভাত চুরি করে নিয়ে কচুরিপানার নীচে লুকিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ বাদে টের পেয়ে বুড়োটা একেবারে উলঙ্গ হয়ে অশ্লীল খিস্তির ঝড় তোলে। তবুও আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘ নেই। মানুং, যমুনা, মালতী, দঙ্গ সব ছেলেমেয়েরাও আজ সন্ধ্যাবেলা একটা ব্যাঙ ধরে এক পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে কচুপাতার করতাল বাজিয়ে গান গায়। যমুনা এক হাতে তেলের সলতে নিয়ে ঘন্টা বাজায়। তবুও কচুবনে ব্যাঙের ডাকে বৃষ্টি ভেজা মাতাল হাওয়ার গন্ধ নেই।

এক সপ্তাহ ধরে নীলমণি ঠাকুরের ধানের ঢেঁকির পাত্তা নেই। রোজ সকালে বিকালে নীলমণির শ্বাশুড়ী বিড় বিড় করে উপড়ে দেয় অকথ্য ভাষার মহাভারত। গাঁয়ের যুবকদের যেখানে পায় শোনায়। তবুও বরুণ দেবতা খুশী হল না।

পাশের গাঁয়ে আব্দুল মৌলবি একদল সাদা টুপিধারী ডেকে এনে ভীড় জমায়। মাঠের মাঝে আজান পড়ে গাঁয়ের ইমাম, আরমান আলি। ফজরওয়াক্তের নামাজ থেকে মুগরীবের নামাজ, আবার মুগরীবের নামাজ থেকে আশরওয়াক্তের নামাজ পড়া হলো। মর্জিনার নানী আক্ষেপ করে বলে, নীল আশমানে আল্লাতালার দোয়া হলো না।

এতবড় মনুনদীতে এক কোমরও জল নেই। নদীটা আছে বলেই মশাউলি গ্রামের মত অনেক গ্রামের মানুষ বেঁচে গেল। গরু মোষগুলো শুকিয়ে মরে যায়নি।

গভীর রাতে মশাউলি গ্রামের যুবতী, বধূ, বৃদ্ধা সকলে মিলে এল দুধবাবু মিস্ত্রির বাড়ীর সামনের আমলকী গাছের নীচে। এই বিশেষ জমায়েতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ; কেননা,নিকয় বুড়ী, কুলবুড়ী, গিরিজা এখানে সারা রাত উলঙ্গ নৃত্য করবে। এতে বরুণ দেবতা খুশী হয়।

বৃষ্টি আনার পুরোনো গান, যা বহু আগের পূর্বপুরুষ থেকে আজও অপরিবর্তিত হয়ে চেলেছে, সে গান ইঙেলনেই এর মিষ্টি গলাতেই মানায়। সাথে সাথে সব মেয়েরা গলা মিলিয়ে কোরাস ধরে। গানের সুর বাতাসে গা ভাসিয়ে হারিয়ে যায় পাকা আম, কাঁঠালের মাতাল গন্ধ ছুঁয়ে। সে গান মনুনদীর পারের কুশবন পেরিয়ে অপর পারে স্বপ্ন বিভোর হৃদয় মাঝির ঘুমে নাড়া দেয়। হৃদয়ের ঘুম ভাঙ্গে। খেয়ানৌকোর মাঝি হৃদয় ওদিক থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে, বাচ্চাটাকে বাইরে পেচ্ছাব করিয়ে বিড়ি ধরায়। বিড়ি টানতে টানতে হৃদয় মনুনদীর পারে মেঘনার ভাটিয়ালী সুর তোলে। গানের শেষে মনে মনে ভাবে, এবার বুঝি খেয়া দিয়ে পাটের বোঝা আসবে না।

ধনবাবু বাচ্চাটাকে পাখার বাতাস করে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। এখনও আকাশে অভিমানী

মেঘের হৃদয় গলে না। গানের সুরে পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া গভীর রাতে ইঙেল্‌লেই এর চোখে জল এল। হয়ত এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার গভীর ব্যথায়। কিছু দিন বাদে ইঙেল্‌লেই এর সুর ঘরে ঘরে কাউকে কাঁদাবে না।

দঙ্গের মা এলো চুলের খোঁপা বেঁধে বলে, ওগো নিকয় বুড়ী, উপোস করে রয়েছে। আর দেরী কেন? কবে মরবে?

লেইমনি এই গাঁয়ের একজন শিক্ষিত যুবক। কাঞ্চনবাড়ী স্কুলে, ম্যাট্রিক পাশ করে সে কৈলাশহর কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়তে যায়। গরীবকৃষক ঘরের ছেলে, সেখানে বেশীদিন থেকে বার্ষিক পরীক্ষাও দিতে পারল না। তবে কৈলাশহরে থাকার সময় দু-একজন ছাত্র এবং অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসায় তার অনেক নতুন চিন্তার দুয়ার খুলেছে। মণিপুরীরা মাংস খায় না। না খাওয়ার যুক্তি সে খুঁজে পায় না। তাই সে মাংস খায়। এই নিয়ে গাঁয়ে অনেক হৈ চৈ। কিন্তু সে সবার বিপদে আপদে থাকে, তাই ওকে সমাজ থেকে পতিত করা হয় না। তা ছাড়া গাঁয়ের যুবকগুলো ওকে ছাড়া এক পা চলতে রাজি নয়।

অধ্যাপকের সাথে প্রতিদিন তার তর্ক হোত। যুক্তি সঙ্গত আলোচনা সে মনোযোগ দিয়ে শুনতো। দেশী-বিদেশী ইতিহাস, দর্শন পড়ে সংস্কার ও ধর্ম সম্পর্কে তার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের ভীরুতার জন্ম নিয়ে অনেক বাদানুবাদ, তর্কের ঝড় বইয়েছে। ধর্ম হলো জনা কয়েক লোভী মানুষের সৃষ্টি— এ সম্পর্কে তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সে আজ রাতে তার নিত্যসহচর মোহনকে নিয়ে মন্দিরে গেল। মন্দিরের বারান্দায় তখন নীলমণি ঠাকুর ঘুমিয়ে। লেইমণি চুপি চুপি মন্দিরে দুয়ার খুলে রাধামাধবের মূর্তিটা নিয়ে ডোবার কচুরিপানার নীচে রেখে দিল।

পরদিন ভোরে সারা গ্রামের চারদিকে দেবতা চুরির খবর রটে গেল। নীলমণি ঠাকুর বলে, অমঙ্গলের চিহ্ন। ধর্ম নেই পাপে দেশটা ভরে গেছে। বৃষ্টি এবার হতেই পারে না।

নীলমণি ঠাকুর শাস্ত্র ঘেঁটে প্রায়শ্চিত্তের বিধান স্থির করল। কিন্তু কে চুরি করেছে জানে না। কাকে শাস্তি দেবে? তবু কয়েক দিন বাদে এই অমঙ্গলের মধ্যেই বৃষ্টি নামল মুষলধারে। কচুবনের শুকনো পাতার নীচে ঝোপে রাতভর ব্যাঙের গানে গানে কলরব। বৃষ্টির সাথে শিল পড়ায় যমুনা, মালতি কাঁচা পাকা আম ঝুড়ি ভরে চুরি করে কুড়িয়ে আনে। খাল, বিল থৈ থৈ। চারিদিকে মাটি ভেজা গন্ধ। শালিকগুলো ঠোঁট খুঁচিয়ে পালক ঝাড়ে ঝাপসা গাছ পালায়। সকাল বেলায় কালো আকাশে ভেসে যাওয়া সাদা বকের সারিবদ্ধ ডানা আকাশের বুকে মালা দোলায়। বৃষভানুদের বেড়া ভেসে উত্তরের গাঁয়ের একটা গাই ঝিঙের সবুজ পাতা চিবোয়। বৃষভানুর বাবা অচল, তবু বৃষভানু বৃষ্টি ভিজে গাই খেঁদাতে গেল না।

ক্যাবলা মোহনটা প্রেমের কথা বলতে গিয়ে বৃষভানুকে দেবতাবিগ্রহ চুরির সব কথা খুলে বলে দেয়। প্রথমে এই নিয়ে মন্ডপে বেশ গুঞ্জন উঠে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় সব অভিযোগ কচুরিপানার নিচেই রয়ে গেল। গুনচান গাঁয়ে বলে বেড়ায় দেবতা টেবতা কিছুই নেই। সব বাজে কথা।

ইঙেল্‌লেই-এর মেয়ে রীতা এখন জিপ ড্রাইভারের বৌ। স্বামী চন্দ্রজয় ড্রাইভার আজ এত রাত অবধি ফিরলো না। রীতা এখনও বাতি জেলে ভাতের থালা ঝুড়ি চাপা রেখে গালে হাত

দিয়ে বসে। তার কেবল দঃশ্চিন্তা, কোথাও গাড়ীর কোন দুর্ঘটনা ঘটল কিনা, নাকি ও খুব দূরের ট্রিপে চলে গেছে অথবা চোলাই মদ টেনে রাস্তার ধারে কোন খালে পড়ে আছে।

এদিকে চন্দ্রজয় 'ভাটিখানায় চানাচুর, লঙ্কা, লবন সহযোগে দু'বোতল চোলাই সাবাড় করে। রাখাল বলে, আমার কথা শুনে তোমারা কিন্তু মনে করোনা নেশা ধরেছে।

ভক্ত কোন কথা না শুনে সিগারেটটা ঠোঁটে রেখেই বলে, আমার সাইলেন্স বক্সটা ফেটে যাওয়ায় বড় খারাপ লাগে।

মন্টু ড্রাইভার হেলতে দুলতে বলে, শালা তোর সাইলেন্সের বক্স কি, আমার গাড়ী নতুন কাজ করে লাইনে উঠিয়েছি তবু ডিষ্ট্রিবিউটার পয়েন্টে কারেন্ট আসে না।

চন্দ্রজয় নেশা জমার আগেই শ্বশুর বাড়ীর বিপদের কথা বলে। নেশার পরে রাখাল বলে, চন্দ্র, গুলি মার তোমার রমাপতি; দু'বোতল খরচ করবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলে বন্ধুর কাজে আবার বোতল কিরে? এই ফূর্তি, শালা ফূর্তির চোটে মনু থানার দারোগাকে লাভের টাকা এখনও দিইনি। চন্দ্রজয় এল। রীতা দুয়ার খুলেই ভুর ভুর গন্ধ পায়। ওর কপাল কুঁচকে যায়। চন্দ্রজয় রীতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ডারলিং রাগ করেছ? তুমি অমন করে থেকোনা। সারাদিন খাটুনির পর এক গেলাস না টানলে শরীর বড় খারাপ লাগে।

রীতা আব্দারের সুরে বলে, রোজ রোজ তোমার এসব ভাল লাগেনা।

ঠিক অছে কাল থেকে আর খাব না। হ্যাঁ ঠিক? বিশ্বকর্মার দিব্যি করে বলছি— চন্দ্রজয় জবার দেয়।

— ঠিক আছে এবার তাহলে তুমি খেয়ে নাও।

—তুমি একটু হাসো, তাহলে খাব।

রীতা ফিক্ করে হাসে। দু'জনে গাঢ় আলিঙ্গণে বিলম্বিত চুম্বন উপভোগ করে। আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে রীতার বুক দ্রুত তালে ওঠানামা করে। নীচু গলায় সে বলে,কি এবার খুশী তো যাও খেয়ে নাও।

খেতে বসে চন্দ্রজয় বলে, বন্ধুদের সবাইকে বলেছি। ভক্ত, রাখাল, মন্টু সকলে বলেছে— রমাপতিকে মজা দেখিয়ে দেবে।

রীতা সামনে বসে, হাত পাখায় বাতাস করে। হঠাৎ ক্ষণিকের গভীর চিন্তায় পাখার আন্দোলন স্তব্দ হয়। চিন্তার অতল গভীরতা থেকে সে বলে উঠে, বুকটা আমার দুর দুর করে, কি জানি কি হয়।

মশাউলি গাঁয়ে মন্ডপের পাশের বাড়ীর বুড়ি তম্বকি হঠাৎ মারা গেল। সম্পর্কে সে থাম্পালের পিসী। তার আর কেউ নেই! শ্রাদ্ধ শান্তি থাম্পালকেই করতে হবে।

বিরাট তেলের পিপার মত একটা ঘন্টা গম্ভীর নাদে ঘম্‌ঘম্ আওয়াজ তোলে। এটাকে সেলপুঙ বলা হয়। সেলপুঙের গুরুগম্ভীর আওয়াজ রাতাছড়া, বেতছড়ার মানুষদের লাকড়ি নিয়ে আসতে আহ্বান জানায়। নারী ও বৃদ্ধারা চটপট এক এক মুষ্টি ধানের খই কলাপাতার ঠোঙ্গায় ভরে করবী ফুলের পাতা পাপড়িতে সাজিয়ে দলে দলে আসেন।

মনুনদীর বালুচরের শ্মশানের চিতা সাজানো হলো। মেয়েরা জলে নেমে চান করে।

গাঁয়ের যুবক লেইমনি হাতের ইঙ্গিতে খোল, করতাল থামিয়ে বলে, গাঁয়ের খোলবাদক ধনবাবুর বিপদ আসতে পারে। যদি বিপদ আসে তবে এই সেলপুঙ বাজানো হবে। তখন কেউ যেন মরা পোড়ানোর লাকড়ি না এনে সবাই লাঠি নিয়ে আসে। ওরা যদি আজ ইঙেল্‌লেই, ধনবাবুকে হঠাতে পারে তবে একে একে গাঁয়ের সবাইকে হঠতে হবে।

চিতা জ্বলে দাউ দাউ করে। ধূয়ার কুন্ডলী আকাশে উঠে। আত্মীয় স্বজনের চোখে বিষণ্ণতার কুয়াশা নেমে আসে। সে কুয়াশা চিরস্থায়ী নয়। এই কুয়াশার গভীরতায় আগামী সকালের মোকাবিলার স্বপ্ন নামে সেলপুঙের গুরুগম্ভীর ডাকে মড়া পোড়ানো মানুষের উজ্জ্বল চোখে চোখে।

কুমারঘাট আগরতলার বড় পিচঢালা কালো রাস্তাটা একে বেঁকে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই বেয়ে চলে গেছে। মনে হয় বিংশ শতাব্দির নাম না জানা দুর্ব্বাশা মুনি অভিশাপ দিয়ে একটা নদীকে অচল, কঠিন করে দিয়েছে। রাস্তার পাশে ঢালু পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধরে একটা ছনখোলা। এই ছন খোলার ছন বিক্রি করে পাশের এলাকার পাহাড়ী গ্রামের মানুষ জীবন ধারণ করে। দিন দিন পাহাড় জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে ঘর ছাউনির ছনের অভাব নিত্যই বাড়ছে।

গোটা ছনখোলার মালিক রমাপতিবাবু নন। অর্ধেকের বেশী সরকারী খাস জায়গা ফরেস্ট অফিসের তত্ত্বাবধানে থাকে। কিন্তু রমাপতিবাবু ফি বছর ইজারা নিয়ে এই এলাকার ছনের ব্যবসা করেন। এখানকার পাহাড়ীদের নাম মাত্র খয়রাতি সাহায্য দিয়ে পাহাড়ী এলাকাটা আমিনবাবু তহশীলবাবু ও আরও অনেক বাবুদের সাহায্যে নিজের নামে নাম জারী করেছেন।

এলাকার পাহাড়ী সর্দ্দার জানিয়া মোক্তার এক সময় সামান্য অর্থের লোভে রমাপতির ডান হাত ছিল। গাঁয়ের লোকদের জমিছাড়া করতে রমাপতির সঙ্গে জানিয়া মোক্তার ছিল মাণিক জোড়।

ইতিমধ্যেই ছনখোলার ঘাস ফড়িং এর রঙ পাল্টে টাটকা বাদামী রঙ ধরেছে। আজকাল জানিয়া মোক্তার গাঁয়ের অন্যদের মত নিজেও খেতে পায়না। গাঁয়ের লোকেরা তাকে ঘৃণা করে, আবার রমাপতিবাবুর সাকরেদ বলে ভয়ও করে। আগে রমাপতিবাবু জানিয়া মোক্তারের যে প্রয়োজন অনুভব করতেন, আজ আর তা করেন না। এখন আর জানিয়া মোক্তারের বৌ মধুতী আগের মত এক ঝুড়ি করুল নিয়ে তার পুরানো সেই রমাপতিবাবুর বৌ এর কাছে নিয়ে যায় না। আর নিয়ে গেলেও পুরানো সই আর তাকে বলে না, ও বৈনারী, আজকে তুমি থাইক্যা যাও। ইঙেল্‌লেই, ধনবাবুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কলেজ ফেরৎ লেইমণি, বনবাদাড়ের পুরানো অন্ধকার পেছনে ফেলে হন্‌হনিয়ে হাঁটছে। সামনে পড়লো একটা বিরাট বটগাছ। বনের পাশে এই বটগাছের পেছনে একটা ইটপাথরে বাঁধানো শিবলিঙ্গ। ইঙেল্‌লেই ধনবাবু দু'জনেই গড় করে প্রণাম করতে বসলো। লেইমণি অসহ্যের ঢেউ কপালে এঁকে ভ্রুক্ষেপ না করেই চললো পাহাড়ের চূড়ার দিকে, সেখানে নালিছড়ার বিরাট চামল গাছটা পাহাড়ের চূড়ার সবুজ ঠোঁট মেলে নীল আকাশে চুমু খায়। তার নীচে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ ওড়নী পরা পাহাড়। পাহাড়ের গাছে গাছে থোকা থোকা আমলকীর গুচ্ছ। দেখলেই বুঝা যায় দস্যি রাখাল ছেলেরা এই বনানীর নিশ্চুপ অভিমান ভাঙতে কোন দিন আসেনি। বনহরিণীরা হয়তো বা কোনো জোনাক জ্বলা রাতে চুপি চুপি হরিণ শিশুদের পিঠ চাটে, আমলকি গন্ধের আতর মেখে। এখানে অনেক মানুষ। সবাই

মূলত পাহাড়ী নারী পুরুষ যুবক। পুরুষদের মাথায় লাল টুপি। কারো হাতে চক্‌চকে টাক্‌কল্‌ । পড়ন্ত রোদের ঝিলমিলে মনে হয় শীতের সন্ধ্যার মনুনদীকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে হাতে নিয়েছে। কারো হাতে পুরানো বন্দুক। দীর্ঘদিন ঝিমিয়ে থাকায় মরচে পড়ার লালাভ আবেশ। লোকজন সব মিলে প্রায় দুশো।

দুটো আমলকি গাছে দড়ি দিয়ে লটকানো বিরাট একটা লালশালু । শালুর গায়ে সাদা কপোতের ছবি । শালুতে লেখা গণমুক্তি পরিষদ।

মনে হয় লেখাটায় সবগুলি পাহাড়ী মানুষের জোড়া জোড়া চোখ মিলেছে। জ্বলছে যেন একটা নীল আলোর ফোয়ারা— বহু বছর পিছিয়ে পড়া অন্ধকার পৃথিবীর কোন একদিকে আলো করে। থম্‌কে দাঁড়ায়। লেইমণি, ধনবাবু ও ইঙেল্‌লেই। লেইমণি মুষ্টিবদ্ধ হাতে সেলাম জানায় দলপতি শক্তিরাম দেববর্মাকে।

ধনবাবু ইঙেল্‌লেই এর অনভিজ্ঞ চোখে এই ধরণের সেলাম নূতন। জানিয়া মোক্তারকেও এখানে দেখা গেলো। ওর অপরাধীর মতো চোখ থেকে অবিশ্বাসের চাহনি— ছুটে এসে ঝিলিক খেয়ে লুকিয়ে গেল। ময়লা প্রজাপতির ডোরাকাটা পাখনার রঙে কাপড় পরা দু'জন পাহাড়ী মেয়ে উঠে এলো মেয়েদের পাশ থেকে। তারা আপন করে নেয়ার দু-জোড়া হাতের আলিঙ্গনে ইঙেল্‌লেইকে টেনে নিয়ে গেল নিজেদের ভিটে।

ধনবাবু বসে পড়লো লাল টুপিওয়ালাদের পাশে। শুরু হলো বাঁশের হুঁকোয় গড় গড় তামাক টানা। তামাকের পাতলা সাদা ধোঁয়া উড়তে থাকে। যেন শরতের আকাশের ছিটে ফোঁটা মেঘ। সেই টুকরো মেঘের মধ্য দিয়ে দেখা যায় শক্তিরাম দেববর্মা হাত দৃঢ় করে বলতে থাকেন অনেক কথা। ইঙেল্‌লেই, ধনবাবু ভালো বাংলা বুঝেনা। তবু যা বুঝতে পেরেছে তাতে মনে হয় শক্তিরাম যেসব কথা বলেছেন সে কথা যেন তাদের মনের কথা। মহাজনদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে আনার কথা হলো। এলাকায় এলাকায় 'গণমুক্তি পরিষদ' গোপনে গড়ে তোলার কথা হলো। সবশেষে ইঙেল্‌লেইর জমি রমাপতি পোদ্দার যে ভাবে অন্যায় দখল করার চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য শক্তিরাম মতামত চাইলেন। এক সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলোতে উপর দিকে উঠলো অনেক অনেকগুলো টাক্‌কল্‌ । শুরু হলো নারী পুরুষের মিলিত চীৎকার। চুপকরা বনানীর ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গে ধনবাবুর, ইঙেল্‌লেইর অসহায় নিঃসঙ্গতার। চোখে তাদের অবাক সুরমা লাগে যখন দেখে অনেক জোড়া হাত আসছে সহযোগিতার টাক্‌কল্‌ এগিয়ে দিতে।

সহযোগিতার মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা মানুষগুলোর অনেককেই ইঙেল্‌লেই চেনে। অনেকেই জুমিয়া চাষী - জমি বাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে দিশেহারা। অনেক অনেক বছর ধরে রমাপতির মতোলোকরা এদের চাবুক মেরে তাড়িয়েছে অনাবাদি গভীর জঙ্গল খুঁজতে। আদিম জীব জানোয়ারের মতো ওরা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। আজ পালাতে চেয়েও পালাবার জঙ্গল - খুঁজে পায়না। তাদের দিশেহারা চোখের সামনে নূতন দিশা এই গণমুক্তি পরিষদ। এই গণমুক্তি পরিষদের চীৎকারে থরো থরো কাঁপে আমলকী গাছের ছোট ছোট পাতা। প্রতিধ্বনি জাগে পাহাড়ে পাহাড়ে। দুঃখ রাত্রির অবসানে যেন ভোরের বাতাস শন্‌ শন্‌ করে বইছে। ইঙেল্‌লেই'র চোখে জল এলো। এই জল হতাশার বা বেদনার নয়। হঠাৎ উদ্দীপনা - সহযোগিতা দরদ - ভালোবাসার উজ্জ্বল শিক্ষা চোখে উচ্ছাসের ধাঁধাঁ লাগায় । মানুষের আদিম সহজাতঘৃণা - ভালোবাসা সঠিক পথে রূপ পেতে চলেছে, অনেক দুঃখ-উপত্যকার পাশ দিয়ে চলা আশায় বিছানো পথ দিয়ে।

ধীরে বহে ধলাই

পুরানো লাল হলুদ, ধুসর রঙের শাড়ীর টুকরো দিয়ে কাঁথাটা তালিমারা, তবুও ছেঁড়া ফাটা ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস ঢোকে, ঘাম, তেল বাচ্চাদের পেচ্ছাপের উগ্র অম্ল-কটু গন্ধে কাঁথাটা ভারি। তিনটে শিশু গল্প শোনে, কাঁথাটা চিবুক পর্যন্ত ঢাকা, মাথার তলায় লম্বা তেল চিটচিটে বালিশ একটা। ঘুম আর রহস্যের গন্ধমাখা গল্পের মাঝে চোখগুলো পলক ফেলতে ভুলে যায়। কেরোসিনের কুপিটা ভীত গ্রাম্য শিশুর মত মিট মিট করে জ্বলে।

কুঁড়ে ঘরের বেড়ার গোবর মাটির প্রলেপ খসতে শুরু করেছে - ফাঁক দিয়ে বাইরের ঠান্ডা হাওয়া শির শির করে ঢোকে। মনে হয় বাতাসেরও গল্প শোনার কত ইচ্ছা।

গল্প বলা বুড়ীর কোমর পর্যন্ত কাঁথার ভেতরে। বুড়ীর কুঁচকানো চামড়ায় ঢাকা শীর্ণ আঙ্গুলগুলো অস্থিরভাবে মাথার সাদা পাটের মত চুলের ঝরনায় উকুঁন খোঁজে। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিড়ে অনেক দূর থেকে শেয়ালের মিলিত চীৎকার ভেসে আসে। শিশুদের মধ্যে সবার বড় নুনিয়া, বুড়ীর বড় আদরের নাতি। যে বছর এই গাঁয়ে গরুর মড়ক লাগে সেই বছরে ওর জন্ম। সেই থেকে হিসাব করলে বছর দশেক হবে।

শেয়ালের ডাক শুনে বুড়ীকে জোরে আঁকড়ে ধরে ভয় পাওয়া গলায় ফিসফিসিয়ে বলে 'ঠাকুমা সেই মাছমারা বুড়োর ডুগডুগি বাজিয়ে শেয়াল ডাকার গল্পটা বলো না!' মাথায় চুলের জঙ্গলে আঙ্গুল চালিয়ে নিপুণ হাতে উকুঁনগুলি নখের ডগায় রাখে, পট করে একটা শব্দ তুলে বুড়ী বলতে শুরু করে। বুড়ীর দাঁত সময়ের ইঁদুরটা টুকটুক করে খুলে নিয়ে গেছে বহুদিন। তাই গালের ভেতরে দুটো গুহা হয়েছে। সেই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো অস্পষ্ট মনে হয়, নাতি নাতনীরা ছাড়া অন্য কেউ সহজে বুঝতে পারে না। গভীর রাতে নিপুণ কথক-বুড়ী গান গাওয়া মৌমাছির মত গুন্ গুনিয়ে বলে চলে, -

মাছমারা বুড়োটার নাম হল গিয়ে রুস্তম আলী। মাথায় একটা মস্ত জটা, তাও আবার লাল, দূর থেকে দেখলে মনে হয় শুকনো কচুরী পানা উল্টিয়ে মাথায় ঢেকে কেউ আসছে। মাছমারা বুড়ো কোনদিন চিরুনি দিয়ে আচড়ে জট ভাঙার কোন চেষ্টাই করতো না। মুখের ওপরে লম্বা দাড়ি একেবারে বুকের ওপর জমানো। ধলাই নদীতে নেমে চান করার সময় ছোট ছোট চিংড়ি মাছ দাড়ির জঙ্গলে আটকে যেত, পরে মরে শুকিয়ে শুটকি হয়ে যেত। নাতি নাতনিরা দাড়ির জঙ্গলে আটকানো শুঁটকি চিংড়ির দৃশ্য কল্পনা করে খিল খিল হাসিতে ভেঙ্গে পরে, বুড়ী হাসে। ফোকলা দাঁতের মাড়ির হাসি, ডাইনীর মত দেখায়।

তারপর রাত বাড়লে সবাই যখন খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন ওই মাছমারা বুড়ো মেয়ের হাত ধরে চুপি চুপি হাঁটতে থাকে আখ ক্ষেতের পাশে ধলাই নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে, মেয়েটা ছিল এই [illegible] নুনিয়ার সমবয়সী। বালিয়াড়ি, যেখানে গাঁয়ের লোক মারা গেলে পোড়ায় - নবীনের মাকে গতবার ধান কাটার সময় যেখানে পোড়ালো। বাধা দিয়ে নাতনী বলে 'নবীনের মাকে পোড়াতে আমিও দেখছি।'

বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে,'একদিন ঐ বালিয়াড়িতে সবাই মিলে তোরা কাঁদবি
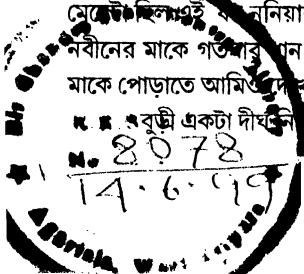
আর বাঁশ কাঠ দিয়ে আমাকেও পোড়াবি।' নুনিয়া একটু ব্যথিত হয়, 'না ঠাকুরমা তুমি মরবে না, কই তুমি ওই মাছমারা বুড়োর মেয়েটার নামটাতো বললে না?'

বুড়ী আবার ডাইনির মত আলু থালু সাদা চুলে উকুঁন খুঁজতে খুঁজতে বলে, 'ঠিকই তো, নামটা হচ্ছে, নামটা হচ্ছে সো-ফি-য়া, হ্যাঁ হ্যাঁ সোফিয়া, ওই সোফিয়া বালিয়াড়িতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতো আর মুঠো ভরে বালি নিয়ে বিড় বিড় করেমন্ত্র পড়তো তিনবার তারপর বালি বাতাসে ছিটিয়ে দিত। তারপর রুস্তম আলী দাড়ি' জটা চুলে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আরও তিনবার মন্ত্র পড়তো। তখন নদীর ওপর থেকে চারটে ভূতের বাতি দপদপ করে চারিদিক আলো করে শূন্যে উড়তে উড়তে বালিয়াড়ির উপর আসতো। তখন বালিয়াড়িটা দেখাত দুর্গাপূজার মন্ডপের মতো ঝলমল ঝলমল করতো। তারপর রুস্তম আলী আকাশের দিকে চেয়ে ডুরু ডুরু ডুম্ ডুম্ ডুরু ডুরু ডুম্ ডুম করে তার ডুগডুগি বাজাতো। এই ডুগডুগি বাজার আগে শ্মশানে শেয়ালগুলো মরা মানুষের আধপোড়া হাড় মাংস নিয়ে মারামারি খামচা খামচি করতো। ডুগডুগি যখন খুব মিষ্টি তালে বাজে অমনি শেয়ালগুলো মরা মানুষের ছেঁড়া পোড়া কাপড় ঘাগরার মত কোমরে জড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। এসেই ওরা ডুগডুগির তালে তালে নাচতে শুরু করে। ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে নাচে এক, দুই, তিন, - তাদি্ নাদিন। তাদিন্ নাদিন্। কখনো সামনে দু 'পা তুলে নখ দুলিয়ে দুলিয়ে কখনো মাথা ডানে কখনো বাঁয়ে কাত করে নাচতো, মাঝে মাঝে লাফাতো, তালে তালে ঘাগরা মেলতো সুন্দর করে। বুড়ী একটু থামল, তারপর বিরাট করে হাই তুলে জিজ্ঞেস করে, ''তোরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিস? নুনিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয়, না ঠাকুমা আমি ঘুমোইনি, ওরা সবাই ঘুমিয়েছে, থামলে কেন বলে যাও।'' বুড়ী দু'হাতের নখ দিয়ে মাথা তীব্রভাবে চুলকাতে চুলকাতে মুখ কাঁচু মাচু করে আবার বলতে শুরু করে - ''রুস্তম আলীর ডুগডুগি থামতো না, শেয়ালগুলো ক্লান্তিতে জিব বার করে, লম্বা জিব দিয়ে লালা ঝড়ে তবু ওরা নাচে। তখন তোর বয়সী ঐ সোফিয়া নামের মেয়েটা মুঠোভরে বালি ছিটিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়তো তারপর সোফিয়া নিজেই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে ঘুরতো। ঘুঙুরের রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু শব্দে কোথা থেকে চিল, বৌ-কথা-কও, গাঙ শালিক, কবুতরসেখানে উড়ে আসতো। পাখীর ছানারা টেরও পেত না কখন তাদের মা-বাবারা রুস্তম আলীরডাকে নাচতে যেত -বকম -বকম - বকম-বকম। কিচির মিচির করে পাখীগুলো নাচত। সবার সামনে বৌ কথা কও এক পায়ের থাবা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে গান গাইত। আর পেছনে অন্য পাখীরা ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে সোফিয়ার হাত তালির সাথে নাচতো। সকালে মোরগ না ডাকা পর্যন্ত, বা রুস্তম আলীর ডুগডুগি না থামা পর্যন্ত ওরা নাচত, নেচে চলতো। ভোরের তারা লুকিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত কোন মতেই ওরা কেউ থামতো না।''

এই গল্প একটা বাসি গল্প। প্রতিদিন রঙ মিশিয়ে বুড়িটা শুধু বলে যায়। মন্ত্র মুগ্ধের মত এই শোনা গল্পটা নুনিয়ার ভাল লাগত। এক গভীর দাগ কাটা প্রাচীন কোন লোক গীতির মত এ পাড়ায় ও পাড়ায় ছড়ানো ছেটানো রূপকথার কাহিনীটা চলতো যতক্ষণ না নুনিয়ার চোখ দুটো বুঁজে আসতো।

নুনিয়া একদিন বড় হলো। নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ মাঠে বিকেলে গরু চরাতে যায়, আর পাঁচটা রাখালের মত তার হাতে বাঁশী। মাঠে আপন মনে গরু চরে। আকন্দগাছের ঝোঁপে ঝোঁপে

লুকোচুরি খেলে। কখনও উলঙ্গ হয়ে দল বেঁধে ধলাই নদীর উঁচু পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপাই ঝাঁপি খেলে। কখনও জিয়ল গাছের রস কচু পাতায় ভরে। ঘাসের শীষে গিঁট বেঁধে কচু পাতার কষে ডুবিয়ে ফুঁ দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ ওড়ায়। কখনও তন্ময় হয়ে বাঁশীতে রূপবানের মনমাতানো গানে সুর তোলে। ছেলেবেলার রূপকথা শৈশব থেকে হেঁটে আসে নতুন করে। এত মধুর বাঁশীর সুর তবু কেন ঘাগরি পড়া শেয়াল ছুটে আসে না, বৌ-কথা -কও তবু কেন ডানা মেলে নাচতে আসে না। মাছমারা জটাধারী বুড়োর মত মন্ত্র জানে না, তাই কি? এখনও মাছমারা জটাধারী বুড়োকে রোজ নদীর ধারে দেখা যায়। তার মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে আসে। কই কেউ তো দেখেনি সত্যি সত্যি শেয়াল আসতে? এমনি করেই হাজারো প্রশ্ন কিশোর মন ভরিয়ে তোলে অথচ তার সমাধান কেউ দেয় না।

মেঘের ঘোমটা মাথায় দিয়ে উঁচু সবুজ পাহাড়টা আজও দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরার উত্তর জুড়ে। পাহাড়টার নাম লঙতরাই। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ঐ পাহাড় দিয়ে ছুটে চলা নদীটির নাম ধলাই। পাঁচ বছরের ছোট মেয়ের মত। মাকে না বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ফিরবার নাম ভুলেও করবে না। শাল, চামল, গামাইয়ের শিকড়ে আলতো চুমু খেয়ে দুপারে গাঁয়ের মানুষের চোখের দুঃখ-সুখের নোন্‌তা জল নিয়ে কতদূর একলা চলে গেছে সিন্ধু পারে গল্প বলা বুড়োর কাছে। নদীর দু'পারে দুটি দেশ। পূর্বদিকে পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) পশ্চিমে পড়ে ভারতবর্ষ। দু'দেশের সহস্র মানুষের মধুময় মিলনের পথে একটা প্রাচীর। এই প্রাচীর লক্ষ অসির লোহায় তৈরী। নুনিয়াদের গরু চরানোর মাঠের পাশে ছোট্ট একটা চালা ঘর। উঠোনের একটা অংশ ধলাই নদীর বুকে তলিয়ে গেছে। ভাঙ্গা উঠোনে মোরগছানার দাপাদাপি। কুঁড়ে ঘরের চালা লতাপাতায় ঢাকা, লতা পাতায় ঘাসফড়িং এর ঝিলিকমারা পাতলা ডানার ছন্দ। আম, বাতাবী লেবু, কলা গাছের নিবিড় কোলাকুলি ডালে ডালে বুনো পায়রা আর শালিকের সুখ দুঃখের মনমাতানো সংসার। সবমিলিয়ে সেখানে এক বিঠোফেন সঙ্গীত করুণ নিঃসঙ্গ ঝংকারে বাজে। নুনিয়াদের বাড়ী থেকে এই বাড়ী তিন কল্‌কে তামাক টানার পথ।

এই ছোট বাড়ীটাতে মাছমারা জটাধারী বুড়ো রুস্তম আলী একমাত্র মেয়ে সোফিয়াকে নিয়ে থাকে। এদের প্রতিবেশী বা আত্মীয় বলে ধারে কাছে কেউ নেই। জটাধারী বুড়োটা যখন একা ছেঁড়াফাটা জামা সেলাই করে বা ছিপের জন্য লম্বা বাঁশের কঞ্চি চাঁচতে বসে মেয়েটা তখন মোরগ বাচ্চাদের উড়িয়ে তাড়িয়ে হেসে খেলে দিন কাটায়। মোরগ বাচ্চারাই ওর খেলার পুতুল। সোফিয়া মুরগী বাচ্চাদের ভাষা বোঝে, ওরাও সোফিয়ার ভাষা বুঝে। শ্রাবণ সন্ধ্যায় নদীর বড় টান। একেবারে পাগল, একুল ভাঙ্গে মেঘের গর্জনে, ওকুল গড়ে নিঃশব্দে থরে থরে পলিমাটি সাজিয়ে। রুস্তম আলী বেরিয়ে পড়ে জাল নিয়ে। বাপের হুঁকো এক হাতে, অন্য হাতে মাছ রাখার বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে সোফিয়া। শিকারীর মত সতর্ক চোখেজলের গভীর মীন চক্ষুর সন্ধানে। জড়সড় শীতে কাঁপা, বৃষ্টি ভেজা মেয়েটার দিকে তাকায় স্নেহকাতর গাভীর মত গভীর দৃষ্টি মেলে জটাধারী মাছমারা। আবার জটাধারীর চোখের মত নদী যখন শান্ত, অলস, ধীর রুস্তম আলী বগলে ছিপ নিয়ে বেরোয়। নদীর পাড়ে বড় তেঁতুল গাছটার নীচে বসে ছিপ ফেলে। সোফিয়া বাপযানের পিঠের ঘামাচি চুলকোয়, বকবক করে, হাজারো প্রশ্ন করে। বাপজানকে হাসায়, বোবা

বানায়।

পাশে গরু চরায় নুনিয়া আর সঙ্গী সাথী রাখাল ছেলেরা। কাঠফাটা তৃষ্ণায় গরুগুলো নামে নদীর ভাঙ্গনে কাটা পথ দিয়ে। কখনও আনমনা হয়ে জাবর কাটে ধুতুরা গাছের ঝোঁপে ঝোঁপে শুয়ে ।

বেশ দূর থেকে অপার বিস্ময়ে বিস্ফোরিত চোখে নুনিয়া জটাধারী মাছমারা আর তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জটাধারীর বিবর্ণ অথচ সরল চোখে এমন কিছুই খুঁজে পায় না যা রূপকথার গল্পে শুনেছে। দেহের পেশী দেখে মনে হয় লোকটা পরিশ্রমী। মুখ ভরা লাল দাড়ির জঙ্গল। গলায় একটা তামার মাদুলী। দাড়ির জঙ্গলে অর্ধেক লুকানো। বুকের পাটা বিরাট বিস্তীর্ণ। ডোরাকাটা লুঙ্গি হাঁটুর উপরে তোলা। মাথার জট ও দাড়ির জঙ্গল ছাড়া অবাক হবার মত কিছুই নেই।

জটাধারীর চোখের দৃষ্টি চলে যায় ঐ পুঁচকে মেয়েটার দিকে। চুলে কোন দিন চিরুনি যায়নি। মাথায় দাঁড় কাকের মত নোংরা বাসা। ভোঁতা নাকে একটু বড় রকমের নাকছাবি। ঝলমল করা নাকছাবির নীচে ঠোঁটের কোণে হাসির লুকোচুরি। গলায় লাল নীল একটা পুঁতির মালা। নুনিয়া ভাবে এই মুখে ভূত ডাকার মত শক্তি, মায়া কই! শুধু ভালো লাগে কাজল কালো ডাগর ডাগর চোখ দুটি। ঐ চোখ দুটির দিকে চাইলে মনে হয় কত আপন, কত নিরিবিলি, একেবারে বসে বসে চেয়ে দেখার মত।

সেইদিকে চেয়ে নুনিয়ার চোখের পিপাসা মিটত না। বারবার সেই রূপকথা তারমনে হতো। মাছমারার জীবনের দিকে চেয়ে রূপকথার মাছমারাকে ডাকতো কিন্তু পেত না। তবু সে কোন দিন সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করতেও যায়নি।

একদিন চুপি চুপি দুপুরবেলা এগোয়। ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করে। তেঁতুল গাছের পেছনে চুপ করে দাঁড়ায় ।কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে জটাধারী মাছমারা বুড়োর মন্ত্র।

সোফিয়া ওকে দেখতে পায়, না দেখার ভান করে বাপজানের কানের কাছে মুখদিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'আব্বা, আব্বা! একটা রাখাল মাছ চুরি করতে এসেছে।'

রুস্তম আলী অন্য মনস্ক হবার ভান করে হঠাৎ লাফ দিয়ে নুনিয়ার হাত ধরে ফেলে। নুনিয়ার মনে হল কামারের সাঁড়াশি দিয়ে হাত চেপে ধরেছে। নুনিয়ার দিকে তীব্র দৃষ্টি ছিটিয়ে মেঘ গর্জনের মত চিৎকার করে জটাধারী, ভেবেছ আমি দেখিনি, আমার পেছনে দুটো চোখ আছে, মাছ চুরি করার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ খুঁজছো, আর অমনি সুযোগ পেলেই মাছ নিয়ে চম্পট দেবে। বল কেন এসেছিলি? চুপ করে রইলি কেন? দূর থেকে অন্য রাখাল ছেলেরা পালিয়ে যায়। ঝোঁপ ঝাঁড়ের আড়ালে লুকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে থাকে।

নুনিয়ার ভীত চোখ দুটিতে ঘন ঘন পলক পড়ে। চোখের জল ঘামের ধারা এক হয়ে মিলে গাল বেয়ে মুখের ভেতর ঢোকে। গামছার নীচে থর্ থর্ করে হাঁটু দুটো কাঁপে। ঘুরন্ত লাট্টুর মত মাথা ভন্ ভন্ করে। চোখে সরষে ফুলের ক্ষেত ভাসে। দুরু দুরু মনে ভাবতে থাকে, এই বুঝি ডুগডুগি বাজিয়ে শেয়াল ডাকবে। গলা শুকিয়ে যায়, মনে হয় গলায় একটা পাথর আটকে গেছে। চিৎকার করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ঠোঁট দুটো ছোট চড়ুই পাখীর পালকের মত কাঁপে। নুনিয়ার

ভীত কম্পিত চেহারা দেখে সোফিয়া হেসে লুটোপুটি খায়। তার গভীর চোখের তারা দুটোতে একটু সহানুভূতির রেখা ভাসে। রুস্তম আলী ঠোঁট টিপে হাসে।

জটাধারী রুস্তম আলীর স্বর নীচু হয়ে আসে, নুনিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে - 'কেন মাছ চুরি করতে এসেছিস? একটা মাছ চাইলেই দিয়ে দিতাম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞেস করে দেখিস্ কেউ চাইলে আমি কোন দিন না করিনি। পয়সা কেউ দিলে দিল, না দিলে না দিল। তাতে আমার কিছু যায় আসে না' - বলতে বলতে মাছের ঝুঁড়িটা সামনে ধরে জিজ্ঞেস করে - 'বল কোনটা নিবি?' নুনিয়া মাছমারা জটাধারীর বিচিত্র ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যায়। মাছমারার এত মহিমা। লোকটাত ভাল। আবার রূপকথার সেই কাহিনী মনে হতেই নানা রকম সন্দেহের মেঘ মনের মধ্যে একটু একটু জমে। নুনিয়া জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজায় লালায়, ঢোক গিলে, শুকনো গলা ভেজাতে চেষ্টা করে। পায়ের ঠক্ঠক্ কম্পন থামল। আস্তে আস্তে ঠাকুরমার মুখে শোনা রূপকথার কাহিনী বলতে থাকে। কাহিনী শুনে জটাধারী প্রাণ খুলে হাসে, সোফিয়াও হাসে।

সেদিন থেকে তেঁতুল গাছের নীচে নুনিয়া আসতো। গল্প করত, হাসত, খেলত। ধীরে বহে যাওয়া ধলাই নদীর ঢেউ - এর পিঠে চড়ে সময়টাও চলে যেত সবার অলক্ষ্যে।

আস্তে আস্তে গ্রামের অন্য রাখাল ছেলেরাও আসে। নদীর পারে পাখীর কাকলীর মত এক কলরব ওঠে। কখনো কপাটী, কখনো নোনতা,কখনো দাড়িবান্দা, কখনো লুকোচুরি হরেক রঙের খেলায় নদীর পারে, শ্মশানের পাশে নতুন করে প্রাণ আসে।

নোনতা খেলায় - নোনতা আঃ আঃ আঃ ....। এক, নোনতা আঃ আঃ দুই, নোনতা আঃ আঃ ...,,,. তিন। নোনতা ছো ঃ বলার আগে পর্যন্ত, সোফিয়া দুই, তিন বলে সবার সাথে আওয়াজদেয়, আর সতর্ক দৃষ্টিতে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে কখন নুনিয়া এসে ছুঁয়ে দেবে। নুনিয়ার নাগালের বাইরে যাওয়ার জন্য, গাছের ঝোঁপে, প্রাণপণে ছোটে।

প্রতিদিন খেলার শেষে দু'জনে তেঁতুল গাছের নীচে বসে । সোফিয়ার কালো চোখের চাহনী মায়া মমতার মত নুনিয়ার সর্বাঙ্গ লেহন করে যায়। আর বলে, 'বল না তোর ঠাকুমার গল্পটা, না হলে তোদের কালো গাইটার বাছুরটা কেমন করে মারা গেল।' মাঠে তখনো গরু চরে, পট্ পট্ ঘাসের ডগা ছেঁড়ে, খুরে খপ খপ শব্দের মৃদু আওয়াজ, দূরে দূরে রাখালদের কাকলী কিছুটা তাদের গভীর ঘনিষ্ঠতায় বাধা দিতো না। এই নদীর জলে নৌকা প্রায় দেখাই যায় না। পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে ভেলা সাজিয়ে প্রতিদিন নিয়ে আসে লোকে। ওরা মাঝি নয়, ওরা বাঁশ কামলা। গঙ্গার মত, মেঘনার মত ওদের ভেলায় পাল ওড়ে না । তবু ওঠে রাখালিয়া সুরে চড়া গান বাঁশের ভেলায় দু'কুলের কুশবনে, লোকালয়ে নাড়া দেয়। নুনিয়া সোফিয়ার ভালবাসায় উপচানো উজানী টান আসে। তেঁতুল পাতার ঝিরি ঝিরি কম্পনের সাথে, সোফিয়ার দখিন হাওয়ায় ভেসে চলা মৃদু নিঃশ্বাসের সাথে দুনিয়ার বাঁশি গান গায়। নদীর চরে এক পায়ে দাঁড়ানো প্রেমিক সাদা বক তন্ময় হয়ে শোনে - প্রেয়সীর বিরহ ব্যথায় নদীর স্বচ্ছ আয়নাতে চোখের জল টুপটাপ ঝরে।

জটাধারী মাছমারা এদিকে আসে না, জাল ফেলে ছপাৎ ছপাৎ করে অনেক দূরে। খুশী হয় মনে মনে সোফিয়া - নুনিয়ার তন্ময় ভালবাসা দেখে। ধীরে বহমান ধলাই নদীর স্রোতের মত ওদের প্রেম সময়ের হাত ধরে এগোয় অজানা সমুদ্রের দিকে। দিনের শেষতম বেলায় মাঠের গরু

জড়ো করে নুনিয়া ঘরের দিকে হাঁটে । গরুর পায়ের ধুলোয় গেরুয়া রুমাল উড়িয়ে বৃদ্ধদিন চলে যায় যেখানে যাওয়ার। নুনিয়া যেতে যেতে শুনতে পায় মাছমারা মেয়েটার প্রাণখোলা 'রূপবানের' গান । দূরে থেকে শুধু শোনা যায় গানের টুকরো টুকরো কলি।

ঈদের দিন, বা কোন ইসলামী উৎসব দিনে কলাপাতায় মোড়ক বেঁধে তেঁতুল তলায় চাঁদনী রাতে লুকিয়ে আনে সোফিয়া, চালের পিঠে, বিরণী ক্ষীর। নুনিয়া পরিবর্তে মাথার খোঁপায় গুঁজে দেয় এক গুচ্ছ ফুল। কখনো তারা অভিমান করে, কথা বন্ধ থাকে। দু'দিন পরে মান ভাঙে, তেঁতুল তলায় খিল খিল করে হাসির খঞ্জনি বাজে।

কৈশোরের এ'কুল ভেঙে ওই কুলের যৌবন থরে থরে সাজায় একটা বর্ষা, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত ও শীত । সোফিয়া দেখতে সুন্দর হল। দেহের সামনে পেছনে জাগে উত্তাল তরঙ্গ। চোখের পারে সুরমা আঁকে । নুনিয়া এখন রাখাল নয়। এক চাষী। মাঠে হাল চাষ করে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে একটা ছোট ঘর বাঁধবে। সোফিয়ার কোলে ছেলে আসবে। দেহের ছলা কলা নক্সা নমুনা সোফিয়ার আরও বাড়ে। ধলাই নদীর পারে নির্জন মাঠে আলো করে বসে থাকে তার যৌবন।

এদিকে গ্রামে গ্রামে ফিস্ ফাস্ গুঞ্জন ওঠে, জাত গেল, নুনিয়া মুসলমান হবে, একঘরে করতে হবে। মোড়লদের চোখে ঘুম নেই। নুনিয়া ভ্রুক্ষেপও করে না। হলে হবে মুসলমান -আপত্তি নেই।

একদিন একটা কুৎসিত শকুন পচামাংসের দুর্গন্ধ নিয়ে উড়তে উড়তে এদিকে এলো। নদীর ওপারে হিন্দুর মন্দির ঘন্টায় নাকি মুসলমানের গুনাহ্ হয়। আর এপারে মুসলমানের মসজিদ আজানে হিন্দুর দেবতা নাকি পালায় । যারা গো হত্যা পাপ মনে করে ওদের কিছু লোক নরহত্যার জন্য খড়্গ শানায়। অন্য পারেও কিছু লোক হিন্দুর কাঁসর ঘন্টা ভেঙে আল্লার রাজ্যে দোজখ্ আনে।

এমনি একদিনে মহাজন এল, রুস্তম আলী তখন মাছ ধরা বাঁশের ঝুড়ি বুনছিল। রুস্তম হিম্‌সিম্ খেয়ে যায় মহাজনের পদার্পণে, ইতস্ততঃ করে কিভাবে বাবুকে আপ্যায়িত করবে, বসতে দেবে। নিজের পরণের গামছার খুঁট দিয়ে মুছে একটা বিড়ি এগিয়ে দিলো বারান্দায়। বাবু বসে বারান্দায়। ইচ্ছে হয় নিজের হুকোটা বাবুকে এগিয়ে দিতে। কিন্তু বাবু যে হিন্দু, আবার জাতের কথা বলে মুস্কিলে ফেলবে। যাক পান সুপারী দু'কলকে তামাক ভরে দেওয়া যাবে, ব্যস্ত হয়ে সোফিয়াকে ডাকে - ''সোফিয়া, অ সোফিয়া, বাবুর জন্য ভালো করে একটা আস্ত সুপারী কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে আয়, আর বড় দেখে একটা পান ধুয়ে নিয়ে আসিস্।''

মহাজন নিকেল রিমের ভারী চশমা দিয়ে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কুঁড়ে ঘর, গাছপালা, উঠোনের হাঁস, মোরগ সব যেন তার নিজের। ভরাট মুখটা পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছতে মুছতে বলে - 'এলাম তোমার কাছে. আমার নিজের কোন কাজ নেই, শুধু তোমার একটা ভাল করার জন্যই ।'

বাবুর বিনম্র কথাবার্তা শুনে রুস্তম আলী হাত জোড় করে, দাঁড়ায়, বহু বছর হাজত খাটা আসামী যেমন রায় বেরোবার দিন বিচারকের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তেমনি বিনীত কণ্ঠে বলে - 'বাবু দয়া করে বলুন, আপনি নিজে কেন কষ্ট করে এলেন. আমাকে খবর দিলেই তো আপনার

সাথে গিয়ে দেখা করতাম। যাক খোদার বড় দয়া আপনি নিজেই এসেছেন।'

মহাজন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মহাজন বলতে আরম্ভ করে - 'দেশের যে অবস্থা দেখেছি , এতে কোন মুসলমান এদেশে থাকতে পারবে না। বাজারের হাবিব মিঞা পর্যন্ত পাকিস্তানে বিবি বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমাকে তাই বলছি, সময় থাকতে তুমিও ব্যবস্থা কর। তোমার ভিটেটা বেশ ভালো, কিছু টাকা নিয়ে সাফ দলিল করে আমার নামে দিয়ে যাও, কম কথা না, তুমি কিছু টাকাও পাবে। অনেক লোকই তো এদেশ ছেড়ে যাচ্ছে, তারা যাবার সময় ছেঁড়া কাঁথাটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারছে না।' জটাধারী রুস্তম আলী মাথা চুলকায়, জড়োসড়ো হয়ে বলে - 'বাবু আপনাদের দয়ায় আমি বেশ ভালোই আছি, আপনারা আছেন বলেই বিপদে আপদে হাত পাতলেই পাঁচ/দশ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু বাবু আমি আল্লার কসম খেয়ে বলছি - কোন দিন পাকিস্তানে যাব না ।যতদিন বেঁচে আছি এই দেশেই থাকব। মারা গেলে যেন এই দেশেই সাড়ে তিন হাত কবরের মাটি পাই। এটাই আল্লার কাছে দিনরাত চাইছি। সবাই চলে গেলেও আমি এখানে থাকব। এই দশটা গ্রামে আমার কোন শত্রু নেই। কোনদিন কারও গরু খোঁয়াড়ে পর্যন্ত দিইনি যে কারও সাথে ঝগড়াঝাটি দায়-দরবার হবে। বাবু গোঁসা করবেন না, আমাকে শেষদিন পর্যন্তএখানে থাকতে দিন।' মহাজনের চোখে মুখে বিরক্তির বক্ররেখা ফুটে ওঠে। বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে থাকে - 'শালা, বুঝলাম সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না। কেমন করে ভিটে মাটি আঁকড়ে থাক দেখি।'

মহাজন এবার বেশ গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করে - 'রুস্তম আলী, যে কারণে এলাম তাতো বলা হোল না, পেটের ভিতর কথা পাকিয়ে লাভ নেই, সোজাসুজি বলাই ভাল। তোমার পশ্চিমের গ্রামের লোকজন, মাতব্বর সবাই আমার কাছে নালিশ দিয়েছে। তোমার মেয়েটার সাদির বয়েস হলো, তবু দিচ্ছ না কেন? শুনলাম তোমার মেয়েটা নাকি গ্রামের ছেলেদের নষ্ট করছে। হাজার হলেও হিন্দু তো।'

জটাধারীর ভ্রু'রাগে বিস্ময়ে সঙ্কুচিত হয়, চোখে প্রচন্ড বিরক্তির ঝাঁঝ ফোটে, তবু অনেক সংযমে বিনীতভাবে বলে ''বাবু জানি না কোন কাফের আপনার কাছে যত ফালতু কথা বলে ঝগড়া বাঁধাতে চায়। সব জাতের মধ্যেই, সব গ্রামের মধ্যেই দু'একজন কাফের থাকে যারা মানুষের ভাল চায় না। ওরা ওই রকমই কথা রটায়। সোফিয়া ঘরের ভেতর থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব কথা শুনছিল। তার চোখ অজানা আশঙ্কায় বিস্ফোরিত হয়ে আসে । লজ্জায় মুখ রক্তিম হলো, নিঃশ্বাসে হঠাৎ বিলম্বিত টান আসে। মহাজনের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। নির্বিকার ভাবেই উঠোনের একটা লাল ঝুটিওয়ালা মোরগের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে - 'রুস্তম আলী, ওই মোরগটা ধরে দাও তো। বাজারে গিয়ে আমার কথা বলে গদী থেকে দাম নিয়ে এসো।'

জটাধারী মহাজনকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে যেন, মোরগটা ধরে ঠ্যাং দুটো আড়াআড়ি করে বাঁধলো। মোরগটা কয়েকবার চিৎকার করে ডানা ঝাপটিয়ে থমকে গেল। ঘরের ভেতর চুপি চুপি সোফিয়া কাঁদে। বুক ঠেলে আবেগে নিঃশ্বাস কাঁপে। এই মোরগ তার খেলার পুতুল। গত ঈদের সময়ে বাপজানকে ওই মোরগটাকে জবাই করতে দেয়নি। আজ চোখের সামনে বিনা প্রতিবাদে মোরগটাকে দিতে হলো। ঠ্যাং বাধা মোরগটার চোখ আতঙ্কিত, বোধ হয় মহাজনের গা

থেকে কসাইখানার গন্ধ পেয়েছে ! ছোট ছোট চোখ দুটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে কি যেন খুঁজছে - বোধ হয় সোফিয়ার একটা শেষ স্পর্শ। মোরগ নিয়ে মহাজন উঠে দাঁড়ায়, জটাধারীর দিকে ক্রোধতপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে - 'যাক্ রুস্তম আলী, শেষবারের মত আমার কথা শুনলে না কোন বিপদে যদি পড়ো তা হলে কিন্তু আমাকে দোষ দিও না। আমি চলি, তবে একটা কথা মনে রোখো মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে বেশ্যাগিরি করানো এদেশে চলবে না। ওই ছেনালপনা যদি করতে চাও তো পাকিস্তানে চলে যাও।'

জটাধারী পাথরের মূর্তির মত উঠানে দাঁড়িয়ে রইল। তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। মহাজনের শেষ কথাগুলো হাতুড়ির মত মাথায় আঘাত করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

সেদিন বুধবার, ধলাই নদীর পারে কমলপুরের হাট বসার দিন। জটাধারী কাকডাকা ভোর থেকে চিল ডাকা দুপুর পর্যন্ত মাছ ধরে একটা বাঁশের ঝুড়ি ভরে বিকালে বাজারে নিয়ে এলো। নুনিয়াও এলো মিষ্টি আলু বোঝাই ঝুড়ি মাথায় নিয়ে। কেউ বেগুন, কেউ পটল, কেউ বাঁশের জোয়াল, কেউ চাল নিয়ে হাটে বসে। হিন্দু - মুসলমান সব জাতের লোকের গম্‌গম্ সমাগম। বাজারে এক কোণায় নবনিহারী কর্মকার দা, কুড়ুল, কাস্তে নিয়ে আসে, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকর এক কলরব। দেনাপাওনা নিয়ে তর্ক বিতর্ক, তেলের বোতল নিয়ে কাড়াকাড়ি নাপিতের ইটে বসিয়ে খদ্দেরদের চুল কাটা আর লম্বা চওড়া গল্প বলা।

ঘরে ঝাঁট না পড়ায় আবর্জনার গন্ধ, শুঁটকি মাছের গন্ধ, কোথাও খইলের গন্ধ, একদিকে মিঠাই বাতাসার মিষ্টি গন্ধ, হিন্দু মুসলমান পাহাড়ী চাষীর গ্রামের কটু অম্ল গন্ধ - সব মিলিয়ে পাঁচ মিশেলি শ্রমজীবী গ্রাম্য গন্ধে বাতাস ভারী।

হঠাৎ হাটের কোণে যেখানে ঝুরিঝুরি রূপালী মাছ চক্‌চক্ করে, সেখানেই শুরু হয় গোলমালটা। হঠাৎ সব হাঁক ডাক বোবা করে চীৎকার আসে। "নুনিয়া আ-আ-আ ছুটে আয় .... রুস্তম আলীকে মেরে ফেলল.......।" নুনিয়াদের গ্রামের লোকজন ছুটে যায় সেদিকে। নবনিহারী কামারের পসরা থেকে একটা ধারলো দা নিয়ে ছুটে আসে নুনিয়া।কেউ গুড় খুঁড়বার খুন্তি, কেউ বাঁশের বাঁক, কেউ ওজন করাবার সেরি পাথর। যে যা পারে তাই নিয়ে ছুটে যায়।

ভীড়ের ভিতর দেখা যায় কয়েকজন বাজারের গুন্ডা জটাধারীর মাছের ঝুড়ি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই মহাজন ধূতি গুটিয়ে ওদের নির্দেশ দিচ্ছে। একজন জটাধারীর ঠোঁটে প্রচন্ড ঘুঁষি মারে, দাঁত ভেঙ্গে রক্ত ঝরে। একজন গুন্ডা জটাধারীর দাড়িতে দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রুস্তম আলী অর্ধদগ্ধ মুখে আকুল প্রার্থনা করে যাচ্ছে - 'বাবু ! বাবু ! বাবু ! দোহাই! বাবু! আল্লা ! আল্লা!'

সে কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হলো না। গ্রামবাসীরা আর ভীরুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হোক্ মুসলমান তবু প্রতিবেশী, ধলাই নদীর হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ। ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ নেচে ওঠে তীব্রবেগেহাতের বাঁকগুলো। সেরি পাথরগুলো মাথায় ঠুক্‌ঠুক্ আগাত করতে থাকে। চারদিকে হৈ হৈ রব ওঠে, আগুনের আংরার মত ঝলসে ওঠে গ্রাম্য সরল বিবর্ণ চোখগুলো। নুনিয়ার হাতের দা সান্ধ্য অন্ধকারে ঝলকে ঝলকে ঘোরে। মহাজনের একজন গুন্ডার হাত দ্বিখন্ডিত হলো,

রক্তের ধারা বইতে লাগল। বহু লোকের মাথা ফাটল। মুমূর্ষু মানুষের গোঙানির করুণ ধ্বনিতে গ্রাম্য হাটের নির্মল হাওয়া কলুষিত হলো। ছোট ছোট দোকানদাররা ঝাঁপ বন্ধ করে। যে যেদিকে পারে পালায়। রাস্তায় ছুটন্ত মানুষের হাতের কেরোসিন বা তেলের বোতল পড়ে ভেঙ্গে কাঁচের টুকরো ছড়ায়, কারো পা কাটে, তবু টের পায় না। মুহূর্তে পুলিশে হাট ভরে গেল। কাছেই থানা আসতে দেরী হয়নি, লাল টুপী দেখেই গ্রামের অসংগঠিত জনতা ছত্রভঙ্গ হলো। অনেকে ছুটে পালালো। যারা পালাতে পারলো না পড়ে রইল। নুনিয়া সহ তার গ্রামের তিনজন গ্রেপ্তার হলো। রুস্তম আলীর পাত্তা পাওয়া গেল না।

নুনিয়া হাজতে থাকলো তিন মাস, জামিন পেল না। দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত লো।

দীর্ঘ দু'বছর তিনমাস পরে একদিন বিকেল বেলা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এল। পথে পথে গ্রামবাসীদের সাথে দেখা হলো। কুশল, মঙ্গল জিজ্ঞেস করলো। জটাধারী সম্পর্কে কেউ কিছু বলল না।

বাড়ীতে এসে ঠাকুমার বুকে মুখ লুকিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। এক থালে ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়ে বসল খেতে। হাঁপুস হুঁপুস শব্দ ওঠে ভাতের থালায়। উৎসুক হয়ে ওঠে মন।

যেমনি শেয়াল নাচানো গল্প শুনে চোখগুলো বিস্তারিত হতো, তেমনি হাঁস মোরগের মত একসাথে খাওয়াতেও একটা আদিম আনন্দের হিল্লোল জাগে প্রাণে প্রাণে।

নুনিয়া খাওয়া শেষ করেই একটা বিড়ি টানতে টানতে হাঁটতে থাকে জটাধারী রুস্তম আলীর কুটিরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখে বাড়ীটা পুড়ে ছাই হয়ে আছে। পোড়া আংড়াগুলোতে শ্যাওলা ধরেছে। উঠোনে আধপোড়া ছিপ, আসবাবপত্রগুলো ছড়ানো ছেটানো। মনে হলো প্রিয়জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পড়ে আছে। গভীর দুঃখে তার চোখে জল আসে। চারদিকে চেয়ে দেখে পোড়া ভিটেটার ওপর কয়েকটা দুর্বা ঘাস গজিয়েছে।

অনেক দূরে একজন গ্রামবাসী এই বিকেল বেলায় নদীর পাড়ে একটা শুকনো কাঠ কুড়ুল দিয়ে কাটছে। তার গলা ভারী হয়ে এল। লোকটাকে ডাকতেও কষ্ট হয়। আবেগ সিক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে - 'অ- খুড়ো বলতে পারো, জটাধারী খুড়োটার কি হলো?'

ওদিক থেকে চীৎকার আসে - ' আগে বল কখন ছাড়া পেলে?' তার পর লোকটা কুড়ুল থামিয়ে এক করুণ হাসি হাসলো। নুনিয়া জবাব দেয় - এই মাত্র ছাড়া পেয়ে এলাম, কিন্তু এদের খবর কি?'

কুড়ুলটা কাঠে আঘাত দিয়ে রেখে বলতে থাকে লোকটা। 'জটাধারী বুড়ো তার মেয়েকে নিয়ে নদীর ওই পারে পাকিস্তানে চলে গেছে। যেদিন হাটে ঘটনাটা হলো তার পনের দিন পরেই গভীর রাতে চীৎকার শুনে আমরা বেরিয়ে দেখি জটাধারীর ঘরে আগুন।'

তারপর?

-তারপর আমরা সবাই ছুটে এলাম, এসে দেখি রুস্তম আলী নেই - তার মেয়েটাও নেই। যারা আগুন দিয়েছে তারা গ্রামের অনেক লোকজন দেখে পালিয়ে যায়।

স্পন্দনহীন, প্রাণহীন পাথরের মতো কিছুক্ষণ থমকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নুনিয়া

এদিক, ওদিক অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওই পারে ঘাড় উঁচু করে কি যেন দেখে। ব্যাকুল মন মানে না, মনে হয় ঝোপ ঝাঁড়ে সোফিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখছে।

পোড়া ভিটেতে জটাধারী বুড়ো নেই, সোফিয়া নেই। সাথে সাথে বুনো কবুতর আর শালিকের বাসা ভেঙ্গে গেছে। জাম, বাতাবীলেবুর পোড়া ডালে তখনও নতুন পাতা আসেনি। নদীর ভাঙনে ভাঙ্গা উঠোনের ভাঙন তখনও থামেনি, মুরগি ছানার কলরব নেই; বাতাসের মর্মরে একটা শব্দই ভেসে আসে শুধু নেই নে-ই নে-ই।

আকাশের কোণে দু'একটা তারা ফুটতে থাকে। অনেক দূরে গ্রাম্য বধূরা কলসী ভরে চলে যায় লাজে-ঘোমটা মাথায় দিয়ে! দূর থেকে ভেসে আসে চৈ-চৈ-চৈ-চৈ হাঁস ডাকা সন্ধ্যা। মাঠ থেকে লেজ তুলে ঘরে ছুটে যায় গরু ধূলো উড়িয়ে। কুড়ুল দিয়ে কাজ করা লোকটা একটা ডাল কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরে। নুনিয়া ওকে চীৎকার দিয়ে ডেকে বলে - 'অ-খুড়ো- ও-ও...ঠাকুমাকে বলে দিও- আমি চললাম ওই পাড়ে জটাধারীকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আমি ফিরব না - আ - আ...। ' ওদিক থেকে ওই লোকটার উত্তর হাওয়ায় ভেসে আসে, - 'যেতে হয় গ্রামের দু'একজনকে জানিয়ে যেও, এখন ফিরে এসো।' সে কথা নুনিয়ার কানে পৌঁছায় না। নুনিয়ার শেষ চিৎকার নদীতে ধ্বনিত - প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ,- ঘুরে ঘুরে সে চীৎকার আকন্দ গাছের ঝোঁপে সোফিয়াকে খুঁজে খুঁজে চলল। নুনিয়া আস্তে আস্তে কোঁদালে কাটা নদীর ভাঙন দিয়ে নামতে থাকে, সপাং সপাৎ জলের ঢেউ ঠেলে দৃঢ় পদক্ষেপে। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, তবু সে চোখ দু'টি বলিষ্ঠতম আশার আলোর মধ্যে তারার মতো উজ্জ্বল । এক পা এক পা এগোয়, জীবনের অতলে ঝিনুক খুলে সত্যিকার জীবন কুড়িয়ে আনতে । মনের অতলে টুকরো টুকরো অতীতের বাসী মধুস্বপ্নগুলো বুদ্‌বুদের মত একটার পর একটা আসে। সেই বাসী স্বপ্ন রোমন্থনের নিঃসঙ্গ এক কাতর বেদনা বুকের মধ্যে ঘুঙুরের মত বাজে। নদীতে বাঁশের ভেলায় বাঁশ কামলার রাখালিয়া করুণ সুর দূরান্তরে মিলায়, তখনও নদীর চরে সেই এক ঠ্যাং - বকটা দাঁড়িয়ে। প্রেয়সীকে বোধহয় কোন দুষ্টু ছেলে গুল্‌তি দিয়ে মেরেছে। তাই আজও সেই বক নদীর জলে টুপটাপ চোখের জল ফেলে। এখনও তেঁতুল গাছের ঝিরিঝিরি পাতার কম্পন থামেনি। ব্যথা, বেদনা মিলিয়ে মিশিয়ে বুকের গভীরে গামছার খুটে বেঁধে দূর তীর্থ যাত্রীর মত নীরবে, নিঃশব্দে ধলাই নদী ধীরে ধীরে বয়ে যায়।

গোলাপের ছেলেবেলা

দারাগাঁও বাগানে ছিলাম । প্রথম লেবার চালানের সাথে কিছু জমি পায় বাবা । পাক্কা পিলার, টিনের ছানি দেওয়া ঘর । সঙ্গে এক ফালি জমি মঞ্জুর করে কোম্পানী । আমি দেখিনি । বাবার মুখেই শোনা । দুটো দুধের গাই আর এক জোড়া বলদও ছিলো । লোকে বলতো, মদ খেয়ে সব কিছু বেচে দিয়েছে বাবা । তবুও, একটা দুধের গাই ছিল শেষ অবধি । এটা ঠিক । বাবা খুব মদ খেতো । খাওয়া হতো না মদ খেলে । পূবের অংশে ছিলো তাসা উড়িয়ার বাড়ী । একই ঘরে দুই পরিবার । পশ্চিমে কে ছিল এখন আর মনে নেই । অস্পষ্ট মুখ মনে পড়ে । এটুকুই । নাম আর মনে আসে না । তাসা উড়িয়া মাতাল হয়ে বউ পিটতো রাতভর । বাড়ীর আসবাবপত্র উঠানে ছুঁড়ে ফেলত । পাশের বাড়ী এত গোলমাল -- বাবা কিন্তু কোন দিন বাইরে বেরিয়ে দেখেনি । এত গোলমাল কানে পৌঁছত কিনা কে জানে ! পৌঁছলেও কি করবে । কার গোয়ালে কে ধূয়া দেয় । নিজেই শুয়ে থাকত চটের থলি বিছিয়ে । নেশায় অঘোর ঘোরে । নুন নেই, কেরোসিন নেই, কাপড় নেই । কত অভাব আমাদের সংসারে । বাবার সব অভাব ছিল গা-সহা । বিশ্বভুবন অভাবের তাড়নায় জ্বলছে জ্বলুক । বাবার তাতে কিছু আসে যায় না । এমনই নির্বিকার ও উদাসীন । ওই বাগানেই কাজ করতো । সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে দেখতো -- বাবা বেহুঁস । মা বলতো আক্ষেপের সুরে, 'সংসারে কি আছে কি নাই চোখে কোনদিন কুছু নাই ভালছে ! তুই মরছিস মরছিস লেরকা বাচ্চা গিলান মরবেক কেনে । হামেশা মদ খাই করে দেহীটা শেষ করে ফেললে ।'

বাবা অনেক কথার পরে নেশার ঘোরে জবাব দিত । 'সারাদিন কোদালি করে মদ খাই । তাতে তোর বাচ্চা গিলানের মাথা খাই করে দিয়েছি নাকি ।'

ভোরে বাগিচার ঘন্টা বাজতো । বাবা দুধ দোহাত বালতি ভরে । বালতি নিয়ে ছুটতাম দিদির সাথে ইষ্টিশান মাষ্টারের ঘরে । সামনেই, মাইল খানেক গিয়ে ইষ্টিশান । লেংটা, খালি গায়ে যেতাম । মাথায় ছিল লম্বা চুটকি । রেল গাড়ীর বাঁশি বাজত অনেক দূর থেকে । বাঁশির শব্দে মাথার চুটকি বাতাসে উড়িয়ে দৌড়তাম । দিদি ডাকত পিছু পিছু । গোলাপ, গোল আ-আ-প । আমার কানে সে ডাক পৌঁছত না । দিদি কেবল চিৎকার করতো -- যাচ্ছিস ভাইয়া যা কিন্তুন রেলের সামনে যাবি না । কালী কাছে টানে লিবেক । ইঞ্জিনের ভিতর কয়লার আগুনে লাল শিখার মধ্যে দেখতাম কালীর জিহ্বা । রেলের বাঁশি সামনের টিলা পেরিয়ে । সে বাঁশির ভাষা মন বুঝে, অন্যকে বোঝানো যায় না ।

রেলগাড়ি রোজ আসে । থামে আর চলে যা । অসীম কৌতূহলে আমি কেবল তাকিয়ে থাকতাম । ইঞ্জিনের ঘট ঘটাং ! ঘট্ ঘটাং ! ঘট্ ঘটাং ! শব্দে দেহমনের শিরা-উপশিরায় বিচিত্র চঞ্চলতা । মাটি মানুষ যন্ত্রের মাঝখানে খুঁজতাম অদৃশ্য অচেনা শক্তির উৎস । অনেকদিন দিদিকে জিজ্ঞেস করতাম -- 'দিদি ওটা কেমনে চলে ?'

'তুই নাই জানেছিস ।' দিদিও বিজ্ঞের মতো বুঝিয়ে দিত । 'কালীপূজা যে দেখেছিস, সেই কালীর জোরেই ওটা চলছে ।'

কালীর মূর্তি কোথায় বসানো দেখার জন্যে রেলগাড়ীর নীচে বিরাট বিরাট লোহার মধ্যে

উঁকি দিয়ে খুঁজেছি। দেখতে পাইনি। কেবল ইঞ্জিনের ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘটাং শুনতাম। যেন কালীপূজার ঘন্টা বাজছে। জানালা দিয়ে বসা অসংখ্য মানুষের মুখ দেখতাম। কোথা থেকে এত মানুষ আসে! কোথায় যায়! কত সুখে রেল চড়ছে। বিচিত্র মুখ, বিচিত্র পোষাক।

রেলগাড়ী পুল পার হয়। সাপ্তাগঞ্জে বাঁক নিয়ে হারিয়ে যায়। বিন্দুর মতো। তখনো দাঁড়িয়েই থাকতাম। তারপর রেলের লাইনে কান পেতে শুনতাম কালীপূজার বাজনা। ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘটাং।

ওই ইষ্টিশানে কোন লেবার যদি নামে! নিশ্চয় বাগানের কারো কুটুম হবে। দিদিকে জিজ্ঞেস করতাম, 'দিদি! বাগানে কত লোকের কুটুম আসে। হামদের কেনে নাই আসছে?'

'আছে।' দিদি বলতো। 'সাগরনল বাগানে হামদেরও অনেক কুটুম আছে।'

'আছে তবে আসে নাই কেনে?'

'আসবেক। দরকার থাকলে জরুর রেলগাড়ী চড়েই আসবেক।'

দিদির কথা শুনে মনে মনে প্রতিদিন ইষ্টিশানে কুটুম খুঁজেছি। কেউ কোনদিন আসেনি। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করতাম, 'হামদের মতো ছোট লেরকা কুটুম থাকলে ওরা রেলে চড়ে আসবেক নাই, দিদি?'

এত কথায় চটে গিয়ে মাথায় ঠোকর মারতো দিদি। একই প্রশ্ন বাড়ীতেও করতাম। মা বাবা দুজনকেই।

রেল চলে গেলে ইষ্টিসান মাস্টারের বাড়ীতে দুধের বালতি দিয়ে দাঁড়াতাম। ইষ্টিসান মাস্টারের ছেলেমেয়ে ছিল আমারই বয়েসী। তারা কত সুন্দর জামা কাপড় পড়ে। খাট, আলনা, ঝকঝকে কত আসবাবপত্র। প্রত্যেক খাটে তাদের মশারী টাঙানো। আমাদের সারা বাড়ীতে একটিও মশারী নেই। ছেলেমেয়েরা দেখতে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঈশ্বরের দুনিয়াতে আমরাই শুধু নোংরা।

কিন্তু সুন্দর হলে কি হবে। বারান্দায় উঠলেই ওরা আমার চুটকী ধরে টানতো। রাগ করে ওদিকে তাকালেই পেছন থেকে আর একজন টানতো। এই টানাটানির কী মজা। এতেই হেসে ঢলে গলে পরত সবাই. ব্যথা লাগতো, ব্যথার চেয়েও লাজিয়ে উঠত সারা মুখ। কানের কাছে গরম লাগতো। লাজিয়ে উঠলে রাঙিয়ে যেতো না কালো কুচকুচে মনুর রঙ। অপমান আর অবজ্ঞায় জ্বলতাম নীরবে। প্রতিবাদ বা প্রতিকারের ভাষা থাকত না। ওদের খেলার জন্যই বোধ হয় চুটকীর রেখে দিয়েছিল বাবা।

মনের দুঃখে বাবাকে বলতাম "কেনে এই চুটকী রাখে দিয়েছিস বাবুর বাচ্চা গিলান ওটা লিয়ে রোজ টানাটানি করে, হামার বড় সরম লাগে" বাবা তখন কাছে ডেকে সযত্নে বড় সোহাগ করে চুটকী আমার পিঠ বেধে দিয়ে বলেছিলো -- হিন্দু ধর্মের নিয়ম ওটা কাটে দিলে লোক মুসলমান বলবেক।

তখন জিজ্ঞেস করেছি -- ইস্টিশান বাবুর বাচ্চা গিলান তবে কি জাত?

বাবা উত্তর দিয়েছিল -- ওরাও হিন্দু, তবে বাবু। মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, হিন্দু, মুসলমান আর বাবু এই তিন জাতিই হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। আর এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বাবু।

ওরা যে পরজাত, আমাদের জাত ওদের নয়, দেখেই বোঝা যেতো ।

সকালেই কাজে চলে যেতো মা বাবা । ঘরে থাকতাম আমি দিদি আর ছোট বোন শিবদাসীয়া । খিদে পেলে ছোট বোন কাঁদতো চিৎকার করে । মাকে খুঁজতো । কত রকম সুর, ছড়া আর ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে দিদি চেষ্টা করতো কান্না থামাতে । শিবাদাসীয়াকে ভোলাতে । চোখে ঘুম এলেও পেটের খিদে বশ মানতো না ঘুমপাড়ানি গানে । শুকনো চা পাতা সিদ্ধ জলে মাড়ের সাথে নুন গোলা বাটি শিবদাসীয়ার মুখে তুলে ধরতো দিদি । এতে কোনদিন কান্না থেমেও যেতো । ঘরে দুধ ছিলো না । দুধের গাই অনেক আগেই বেঁচে দিয়েছিলো বাবা । মাড়ের বাটি মুখে নিয়েই বড় হয়েছি । দুধের স্বাদ মিঠা না তিতা আমি কিছুটা বুঝলেও শিবদাসীয়া বোঝেনি । ঘরের পাশে কাঁঠাল ডালে দোলনা বেঁধে ঝুলতে ঝুলতে শিবদাসীয়ার কান্না থামায় দিদি । নুনু ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে । দিদির ছড়া শুনে মনে মনে দেখেছি বিরাট গোঁফওয়ালা বর্শা হাতে বর্গীর চেহারা । ধানের পাকা ডগায় বুলবুলির রাঙা লেজের চঞ্চল নাচ ভাবতে গিয়ে বুলে গেছি লুঠেয়া বর্গীর লুণ্ঠনের নিষ্ঠুর ছবি । শিবদাসীয়ার ঘুম চোখে স্বপ্নের ঘোড়ায় বর্গীর ছবি ভাসত কি না কে জানে । বর্শার চেয়েও তীক্ষ্ণ ক্ষুধা শিবদাসীয়ার ঘুম চোখের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো । দিদি পিঠে শিবদাসীয়াকে কাপড়ে বেঁধে দাঁড়িয়ে তাকত উঠানে । মায়ের জন্য অধীর অপেক্ষায় চেয়ে থাকতাম আমরা তিনটি বাচ্চা । বাগিচার উঁচু টিলা বেয়ে মা আসবে । বিকেলের সূর্য ডুবে যায় । গরু ছাগল গোয়ালে ফিরে । গরু রাখালের বাঁশি মিলায় বস্তীতে । হাঁস মোরগ কবুতর সবাই ঘরে ফিরে । মা আসে না । পাখীরা গাছে গাছে নিজ আস্তানায়, ঘরে ঘরে ছানাপোনা পাখীদের মমতা মুখর কলরব । আমি কষ্ট পাই । মা আসে না । বুক মোচড়ে দুমড়ে দিতো গভীর উৎকণ্ঠা ।

দেখতে দেখতে অন্ধকার । মাথায় পাতি তোলার ঝুরি নিয়ে ফিরতো মা । দূর থেকে 'মা' বলে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকাতাম । বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতো অসহায় কান্না । আকাশ বাতাস বোবা হয় ''মা'' চীৎকারে । মাথার বিড়ে উঠানে নামিয়ে বসত মা । পা চড়িয়ে কোলে নিত শিবদাসীয়াকে । দোক্তা মিশানো চিবানো পান জিভ দিয়ে আমার জিবে দিত পুরে । একটা স্তন মুখে পুরে অন্য স্তন হাতে আগলে রাখতো । ওই এক জায়গায় যেন আর কারো কোন অধিকার নেই । ডাগর কালো চোখ মেলে চারদিকে তাকাতো অপূর্ব মমতাময় অহংকারে ।

আমার নাক মুছে, গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিত বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচলে । আমার নখে টিপতে দিত দিদির মাথার উকুন । সংসারের সেই সোহাগী ছবি আজও মনে ভাসে ।

মায়ের স্তন খেতো শিবদাসীয়া । তার উপর একটু ঈর্ষা জাগতো আমার । মাকে বলতাম, 'শিবদাসীয়াকে হামি আর দিদি দিনভর খেলাই করে রাখি । হামি যখন শিবদাসীয়ার নিয়ত বুনি খাইতাম তখন হামকে কে ভাতের মাড় খাওয়াই দিত ?'

মা চুপ করে থাকতে পারতো না । বলতো, 'তোকে নিয়ে বাবা বহুত কষ্ট হয়েছে । তুই যখন ছোট লেরকা ছিলি, তোকে আর তোর দিদিকে নিয়ে যেতাম চারা বাড়ীতে । যেখানে পাতি তুলতাম কাছেই গাছের নীচে তোর দিদিকে তোকে গুম করাই বসে থাকতো । লোহা চিমটি কামড় দিলে তুই তো বাগান ফাটায় নিতিস কান্দে করে ।'

লোহা চিমটি মানে লাল বড় বড় পিপড়ে।

'তখন কি হইল বলে করে দৌড় দিয়ে আসতাম। দেখতাম লোহা চিমটির কামড়ে লাল হয়ে ফুলে গেছে সারা দেহীটা। বারে বারে তোকে লোহা চিমটি কামড়াইত। হামি কাম ছাড়ে করে তোকে বুনি দিয়েছি বলে সর্দার কত গোঁসা করেছিল। হামকে গালি দিত। কাছেই যাইতে দিত না। কোন কোনদিন হাজিরেও কাটে করে দিয়েছিল। কুছু বলতাম না। তোর বাপকে বলেছি -- হামকে ছুটি করাই দে না হলে গোলাপ শুখায়ে শুখায়ে মরবেক। সাহেব তোর বাপকে হুকুম করেছিল। লম্বা ছুটি লিতে পার। তবে বাগান ছাড়ে করে যাতে হবেক।'

বুকের পিয়াস মিটায়ে তুইত দুধ কোনদিন নাই পেয়েছিস। তোর পিয়াস নাই মিটিছে, অন্যদিকে আবার পাতির নিরীখ পুরা করে পুরা হাজিরি নাই পেয়েছি।

বুনি নাই খাইতে খাইতে পেট ঢাকের মতো ফুলে গিয়েছিল। পা সরু হলো। বুকের হাড় গনতি করতে পারতাম। তুই তখন হাঁটতে নাই পারতিস। কত দাওয়াই খাওয়াইলাম, ডাক্তার দেখেছিল কুছু ভাল করতে নাই পারে। একদিন তোর বাপ লিয়ে এল পূরণ কবিরাজকে। কবিরাজ দেখে কয়ে লাল মোরগা, এক বোতল মদ, কলা বাতাসা কত কিছু দিয়ে তোকে ভাল করল। তোর গলায় যে তাবিজটা ঝুলছে ওটার গুণেই তো আজও বাঁচে আছিস!

মায়ের গল্পো শুনে নিজের জীর্ণশীর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, মায়ের দুধ পেলে বোধহয় এত লিকলিকে হতো না। অসুখের কথা মনে নেই। তবে কালো সুতায় ঝুলানো গলার মাদুলীটা বড় হয়েও রয়েছিল।

আমাদের লাইনের সোজা পূবে ছিল ছোট সাহেবের বাংলো। ঘোড়া থাকত ওই বাংলোর পাশে। ঘোড়া বুড়ো হলে বা অসুস্থ হলে সাহেবরা গুলি করে মারতো। কবর দিত বাংলোর টিলার পাশেই। দিদির মুখে শুনেছিলাম -- ঘোড়া মার করে জিন ভূত হয়। জিন ভূত কেমন দেখতে। কালো লম্বা লম্বা চুল। দিদি বলতো এক হাত লম্বা জিব। মাথায় শিং, জিনের কথা শুনে সারা শরীর শিউরে উঠত।

এরা থাকে কোথায়। হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকে। একলা কোন লেরকা বাচ্চা দেখলে আবার জিনভূত তৈয়ারী হয়ে যায়। সেই ভয়েই তো দিদির সাথে ছায়ার মতো থাকতাম সারাক্ষণ। বাবা কাজে যেতে দিদিকে বলতো গোলাপকে যখন যা মাঙবে তা খাওয়াবি। দিদি শুধু নুন চা আর চাল ভাজা খাওয়াত। প্রতিদিন ভালো লাগে না। বাগানে অনেকেই সকালে ভাত খেতো। রাগ করতাম রোজ চাল ভাজা খাওয়াছিস, ভাত কেনে খাওয়াছিস নাই। হামরা গরীব মানুষ তিনবার ভাত তোকে কোথা লে দিব। আমরা গরীব কেন দিদি?

দেনেওয়ালা ভগবান, না দিলে পাবি কোথা লে। আমি চুপচাপ থাকি। বাবা যখন কোদালি কাজ থেকে বেলা বারোটায় ঘরে আসে বললাম, দিদি বলছে ভগবান দেনেওয়ালা আমাদের বেশী করে চাল দিচ্ছে নাই। তো একদিন যা না বাবা! ভগবানের কাছে বেশী করে চাল মাঙবি। তিন বেলা খাতে পারব তা হলে।

সবাই খিল খিল করে হেসেছিল। আকাশের দিকে দেখিয়ে বাবা বলে -- ভগবান ওই স্বর্গে থাকে।

ভগবান স্বর্গে কোদালী করে না চালের দোকান করছে ।

বাবা বলেছিল না রে না । মানুষের জন্মের দিন ভগবান ছেনী মারতুল লিয়ে কপালে টাকী (লিখে) মারে কে গরীব আর কে ধনী । বাবা তোর কপালে কেনে নাই দেখছি । বলল ওটা নাই দেখা যাবেক চামড়া দিয়ে ঢাকা । আর দেখলেও কেউ ওটা পড়তে পারে না ।

বললাম, দিদির কপালে বা আমার কপালে লিখবার দিন তুই কেনে ভগবানকে নাই বললে ধনী লিখে দিতে ।

হাসতে হাসতে বাবা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল ।

শিবদাসীয়া যেদিন জন্ম নেয় । আমি ছিলাম আতুর ঘরের পাশে লুকিয়ে । দরজা বন্ধ । কাছে পিঠে পুরুষ লোক নেই । মা তখন হামাগুড়ির ভঙ্গীতে । দু'চোখে জলের ধারা । সারা মুখ যন্ত্রণায় কাতর । গোঙানির সাথে বিকট খেঁচুনীর শব্দ । দেহটা মোচরে উঠছিল থেকে থেকে । চোখ দুটি বেরিয়ে আসার মতো । দাঁত কামড়ানো । ঘরে তিন চারজন বয়স্কা মহিলা । পাশে ধূয়া উঠা গরম জলের গামলা । কাছেই ঠাণ্ডা জলের বালতি । বেরিয়ে এলো শিশু উঙা উঙা কান্নায় । সে কপালে ধনী লিখে দেওয়ার আকুল আবেদন কিনা কে জানে । বিস্ফোরিত চোখে ভগবানকে খুঁজলাম ছেনী মারতুল ওয়ালা কাউকে সেখানে দেখিনি ।

কেঁদে কেঁদে হাত পা ছুঁড়ছিল । বুঝলাম । দুটি পাতা একটি কুড়ি তোলার জন্য দুটি কচি হাত এল অগণিত আধ পেটা মানুষের পৃথিবীতে ।

বসনের ঠাকুরমা

দুধ দোহায় বুড়ী। বালতির ভিতর সশব্দে ফেনিয়ে উঠে দুধের ঝরা ধারা। গাভীর পেছনে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষে বাঁশী। বাঁশী মানে বাঁশীরাম। সহজ করে কেউডাকে বাঁশী কেউবা ডাকে বসন। আকাশ জুড়ে প্রখর রোদ। ড্যাবা ড্যাবা ভরাট মুখে রোদের ঝলক। আপেল রাঙা ফুলা গাল দুটি ঘামে চিক্ চিক্। পাতলা ভুরুর নীচে গোল গোল চোখ। পাতা পলকহীন। শুধু নীল তারা দুটি চঞ্চল হয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে। নাকটা এত বোঁচা দুটি ছিদ্র ছাড়া কিছু আছে বলে মনে হয় না। রবারের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। গাভীটা লাথি মারতে পারে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

নাদুস্ নুদুস্ মোটা বুড়ীটা হঠাৎ দুধের বাঁট পিছনে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে দিল। গাভীর পেছনে পায়ের ফাঁকে বাঁশীর চোখে মুখে দুধের ধারা পিচকারীর মতো পৌঁছে। কলের পুতুলের মতো দুধভিজা চোখের পাতা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে কিছুক্ষণ। জিভের আগা ছুঁচালো হয়ে বেরোয় বিস্ফোরিত ঠোঁটের ফাঁকে। বোঁচা নাক বেয়ে দুধ মুখে ঢুকে। ঠোঁটের কোণে টোল তুলে দুষ্টুমি ভরা হাসি। তামাসা দেখে খল খল করে বুড়ী হাসে, গলায় শিরা উপশিরা ফুলিয়ে ফোকলা দাঁতে শব্দটা বিকট হলেও মুখে ছলানো অনাবিল আনন্দের ছটা। ঘাড়টা দুলে উঠলো চঞ্চল বালিকার মতো। এই তামাসা রোজ ঘটে।

কৃষ্ণনীল বড়মুড়া। পাদদেশে বাঁকা নদী হাওড়া। শান্ত দিন বাঁশীর চোখের মতোই নীল। একটু উজানে চিকনতুইছা ছড়া আর বেলফাং ছড়া মিলিত হয়ে হাওড়া নদীতে মিশেছে। দুই পাহাড়ী ছড়া বড়মুড়া পাহাড়ের উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে কল কল করে বইছে। দুই ছড়া নয় এ যেন বড়মুড়ার শিখরের কোন বনবালার দুই চোখের দুই ধারা। কি নাম কে জানে সেই বনবালার। চম্পা না চামেলী কোন বুড়ো আদিবাসীরও মনে নেই ? না থাকলেও সবুজ বনানীর দিগন্তে লোকালয় শুরু। সেই বিস্তীর্ণ হাওড়া নদী বিধৌত অঞ্চলের নাম চম্পকনগর। চম্পা ফুল ফুটে কিনা কে জানে। তব বনবালিকার হাসি ফুটে। রূপিনী নামে এক আদিবাসী জাতি। রূপের বাহার তাদের থাক বা না থাক। চম্পক শব্দের মতো ছন্দময় রূপিনী উপজাতিদের জীবনের কলকলানী নিয়ে ছুটছে হাওড়া নদী। পাশে সমান্তরাল হয়ে দূরন্ত বেগে আগরতলা মুখী আসাম আগরতাল রোড। বাঁশ কামলার বাঁশের ভেলা সাজানো হাওড়া নদীর বুকে। বাঁশ কামলার আসে উত্তরের রক্তিয়া পাড়া, কমলানগর, পদ্মমোহন বাড়ী, চিন্তারাম কবড়া পাড়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। তেমনি আসে দক্ষিণ পাড়ের গ্রাম থেকেও। দক্ষিণে বলরাম বাড়ী, বিদ্যামোহন সাধুপাড়া, মহারাম সর্দার পাড়া, বিশ্বমুনি পাড়া পার হয়ে সুদূর জাঙালিয়া পর্য্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক আসে। বাঁশের পাইকার, কাঠ কারবারী, বাঁশ দালাল, ছোট ছোট চায়ের দোকান, বন দপ্তরের কিছু কর্মী সব মিলিয়ে জায়গাটা বেশ গমগমে। লরী আসে। থামে। বাঁশ, কাঠ লাকড়ী নিয়ে আবার ছুটে শহরের পানে। পাহাড়ী বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখময় এক বিচিত্র কলরবে মুখর চম্পকনগর।

রাস্তার উত্তরে 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের' এক লাল পাহাড়ী পথ। একটু এগিয়ে ঢালু নেমেই চন্দ্রসাধু পাড়া। চন্দ্রসাধুপাড়া পার হয়ে আরো উত্তরে নিস্তব্ধ একটা পাড়ায় এলোমেলো কিছু টিলা। নাম মংকুরুই সাধু পাড়া। মংকুরুই মানে হচ্ছে নামহীন। একই আকাশ একই

বাতাসের নীচে দশ বারোটি ছিন্নমূল পাহাড়ী বাঙালী ভূমিহীন পরিবার । আগের নাম ঠিকানা তারা ভুলে গেছে । নাম ঠিকানার পুরনো রোমন্থন করে লাভ নেই । শুধু তা ব্যথা বাড়ায় । তাই বোধ হয় মংকুরুই নামটারও একটা তাৎপর্য্য আছে ।

এক টিলায় দুধ দোহানী মোটা বুড়ীর ঘর । ছেলের নাম সুরেন দাস । আদি নিবাস ছিল মেঘনার পারে । যৌবন অতিবাহিত মেঘনার কালোগহীন জলে । পনের বছর আগে মেঘনার তীর ছেড়ে ছোট পরিবারটাকে নিয়ে ছুটে এসেছিল দুর্গম পাহাড়ে । দেশান্তরী পরিবার যাযাবরের অনেক জীবন কাটিয়ে ছুটছে কিছু জমি আর একটা নিরুপদ্রব কুটীরের সন্ধানে । বছর দশেক আগে এসে পৌঁছায় এই মংকুরুই বাড়ীতে । এতদিনে বুড়ীর মেঘনার মতো গহীন কালো চোখে বর্ষার ঘোলাটে হাওড়া নদীর রঙ ধরে । আবাদ করে লুঙ্গা, টিলা । চামল গাছের গুঁড়ি, কড়ই গাছের শিকড় উপড়িয়ে উতলা কেটে দেড় কানির মতো চাষের জমি বানিয়েছে । যক্ষের ধনের মতো ওইটুকু সম্পদ পাহারা দিয়ে থাকাই হচ্ছে বুড়ীর কাজ । সুরেন দাসের ঘরে বৌ, বাচ্চা, আর মাকে নিয়ে সবশুদ্ধ আটজন । লোকেও গুনে আট । বাঁশী মানে ওই পাহাড়ী শিশুটা, ওকে নিয়ে বাড়ীর লোকে গুনে ন'জন ।

আগে ওরা জাল বুনত মাছ ধরত । রাতদিন দিশেহারা নৌকো নিয়ে ছুটত মেঘনার রহস্যময় অতল গহ্বরে মীন চক্ষুর নেশায় । 'নদী আপন বেগে পাগল পারা' সেই ধারার জীবন এখানে রুদ্ধ । মাতাল হয়ে ছুটন্ত নৌকার পাল বড়মুড়ার পাথরে পাহাড়ে ছিন্ন ভিন্ন । সব হারিয়েও জীবনে লাগাতে চায় নতুন গতি । সেই গতি যতোই মন্থর হোক ! বন্ধুর হোক পাহাড়ের চাষ বাস । তবু পাথর পাহাড় অরণ্যের সাথে দাঁতে দাঁত কামড়ে বেঁচে থাকার একটা কঠিন চেষ্টা চলছে নিরন্তর । এখানে জাল দিয়ে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না । কোদাল, দা, টাক্কাল দিয়ে আদিম মানুষের মতো জীবনযুদ্ধের কৌশল রপ্ত করতে হচ্ছে সুরেন দাসের পরিবারকে । আত্মীয় স্বজন কে কোথায় ছিটকে গেছে দেশ-দেশান্তরে কে কার খবর রাখে ! নতুন পড়শীই হচ্ছে চলার সাথী । চাইলেও না চাইলেও এই সম্পর্ক কেউ উপেক্ষা করতে পারে না । পারে না বলেই স্নেহ কাতর কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বাঁশী এই পরিবারের আপনজন হয়ে গেলো । সেই সন তারিখ কেউ মনে রাখেনি ।

বাঁশীরামের বাড়ী পাশের টিলায় । ওর বাবা ললিত রূপিনী, পরিবারের ছয় জন লোক নিয়ে এখানে আসে । আগে বাড়ী ছিল জিরানীয়া । ওর বড় মেয়ে জিরানীয়াতে বিয়ে দিয়েছে । এখনো ওখানেই থাকে । ললিত যখন এখানে আসে বাঁশীর জন্মও হয়নি । কিছু জুম করে সংসার চালাতো । এখন কাছে পিঠে গভীর বন নেই তাই জুম হয় না । যে বন আছে তাও আবার বন দপ্তরের সংরক্ষিত এলাকা । দিন মজুরী না করলে উনুন ধরে না । বাঁশীর মা, বাবা, ভাই সবাই আসাম আগরতলা রাস্তায় বর্ডার রোডের কাজে । এক ভাই শুধু পাহাড়ে গিয়ে লাকড়ি আনে । চম্পকনগর বাজারে বেচে ।

সবাই যখন কাজে যায় বাঁশীর মা বাঁশীকে সুরেন দাসের মায়ের কাছে রেখে যায় । বাঁশী যখন হামাগুড়ি দিতে শিখে তখন থেকেই বুড়ী ওকে কোলে পিঠে মানুষ করছে । সুরেন, সুরেনের বৌ, ছেলে তারাও যায় বর্ডার রোডের কাজে । শুধু বুড়িটা ঘর পাহারা দিয়ে বসে থাকে পাহাড়ী নাতিটা কোলে নিয়ে ।

বুড়ীর আছে নিজের নাতি নাতনী। বয়সে ওরা সবাই বাঁশীর চেয়ে বড়। বড় বলেই বুড়ীর কাছে ভিড় করে না তা ঠিক নয়, ওই পাহাড়ী ছেলেটা বুড়ীর কোল দখল করেছে। যদিওবা কেউ বুড়ীর কোল ঘেষতে চায়, ঠোঁট বাঁকিয়ে, গাল ফুলিয়ে ধূলোর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদে বসন। সুরেন একদিন ওই দৃশ্য দেখে ঠাট্টা করে গালে চিমটি কেটে বলেছিলো -- হায়রে পাহাড়ী পোলা, তুই যেমন বুড়ীর কোলটা ডিসটিক কাউন্সিল বান্যাইয়া লইছস। ঠিক যেন তাই। বুড়ীর কোলে তার অবাধ অধিকার। যেমন খুশী চলার এক মুক্ত বাতায়ন। এই কোলেই সে বেড়ে উঠেছে। বুড়ীর স্তনে বসিয়েছে জন্মগত দখল স্বত্বের মত মালিকানা। স্তনে দুধ থাক না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। বাঁশীর মা কাজে যখন যেতো কান্না পেলে থামানো যেতো না। না গেলেও শিশুটা মানুষ চিনতে শিখেনি, মানুষের উষ্ণ কোল বুঝতে শিখেছিল। শিখেছিল বলেই বুড়ীর কোলে ভারী মোটা হাত পা ছুঁড়ে মাতিয়ে তুলত। বুড়ীই তার শুকনো স্তন মুখে পুরে থামিয়ে দিতো। সে অভ্যেস এখনো যায়নি। বুড়ীও এমন, তার বিশাল বক্ষ উদাস করে বাঁশীকে নিয়ে বসে থাকে। বুড়ী যেন মাতৃত্বের এক খোলা পসরা সাজিয়েছে। স্নেহ মুগ্ধ চাউনির ভাষা অন্তত তাই বলতো।

বাঁশীর আধো আধো কথা। হৃষ্ট পুষ্ট দেহ। ফর্সা শরীরের কোমরে কালো তাগা। শূয়রের দাঁত ছিদ্র করে কটা ঘুঙুর সহ তাগায় বাঁধা। ছুটে চলার সময় ঝুমুর ঝুমুর বাজে। চেপ্টা মুখে ফুলা গাল। সেই পার্বত্য মুখে ছোট ছোট ফাঁক ফাঁক দাঁতে এক টুকরো নির্মল হাসি উদ্ভাসিত। বড়দের সবকিছু অনুকরণ করে। সুরেনের মা যখন গোবর তুষ পাটকাঠি দিয়ে ঘুঁটি তৈরী করে সেও তখন ছোট ছোট মুষ্টি দিয়ে ঘুঁটে বাঁধে। কখনো বা বাপের মতো টাক্কাল হাতে নেয়। বিরাট টাক্কাল তুলতে না পারলেও দু হাতে তুলে পাহাড়ী কামলার মতো এলোপাথারি মারে। টাক্কাল ধরা পাহাড়ী জীবনের অনিবার্য অভ্যাস। সেই অভ্যাস থেকে সেও ব্যতিক্রম নয়। কখনো বা বাপের মদ খেয়ে টলতে টলতে চলার ভঙ্গিমা দেখিয়ে হাসায়। নিজের মা-বাপকে সুরেনের ছেলে মেয়েরা কাকা কাকী ডাকে, সেও তেমনি কাতা কাতি ডাকে। সেই গোলমেলে উচ্চারণই সবার স্নেহ আদর আদায় করে। বুড়ি নিজের মুখের চিবানো পান বাঁশীর মুখে দেয়। ঠোঁট লাল করে সবাইকে দেখায়। বুড়ীর ডালা দিয়ে ধান ঝাড়ার ভঙ্গীর অবিকল অনুকরণ সবার কাছে চমকানো।

চমকানো শুধু নয় বলা চলে দুটি সংসারকে মাতিয়ে তুলছে অদ্ভুত মমতার নেশায়। বুড়ীকে নাতি নাতনীরা ডাকে ঠাম্‌মা। বাঁশীর মুখে ঠাম্‌মা উচ্চারণ আসে না। আসে টাম্‌মা। টাম্‌মা শব্দের ধ্বনিতে বুড়ীর মনে দুর্বোধ্য এক মমতাময় যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়। বাঁশীর মা মাঝে মধ্যে পাহাড়ে যায় মুখমিলতই কুড়িয়ে আনতে। মুখমিলতই হচ্ছে মুলিবাঁশের বনে গজানো ব্যাঙের ছাতার মতো এক ধরণের সব্জী। মুখমিলতই দিয়ে পাহাড়ীরা বাঁশের চোঙায় ভরে শুটকী মরিচ, নুন একসাথে পুড়িয়ে গুতিয়ে গোদক নামে তরকারী করে। বাঙালী রুচির প্রভাবে মুখমিলতই এখন ওরা তেল দিয়ে ভাজে। যেদিন মুখমিলতই দিয়ে ভাজা বা গোদক রান্না হয় সুরেনের বাড়ীতে এক বাটী যেমন করেই পৌঁছে দেয় ললিত বৌ।

এমনি একদিন মুখমিলতই ভাজা পৌঁছে দিতে গিয়ে, বাঁশীকে বুড়ীর কোল থেকে ডাকতে

গিয়ে বাঁশীর মা ব্যর্থ হলো । কিছুতেই বুড়ীর স্তন ছাড়াতে পারেনি । শুধু নিষ্পাপ চোখের দীপ্ত তারা থেকে বিচ্ছুরিত এক চাউনি ছাড়া । হাসে সবাই । শুধু বাঁশীর মা বলে উঠে খুড়ী গো খুড়ী এই পোলা আগের জন্মে তোমার পোলা অইব ! না অইলে জামাই অইব । বাপরে বাপ্ ! নিজের পেতের (পেটের) ছাওয়াল অত আদর পায়না । এক কাম কর । ছোত (ছোট) ছোত লাউ সিদ্ধ কইর‍্যা খাও । আমার তিপরা মানু বুনিত দুধ আনবার অইলে লাউ বেশী বেশী খায় ।

সারা বাড়ী জুড়ে হাসির রোল উঠে । বুড়ীও জানে কাঁচা লাউ সিদ্ধ বুকের দুধ বাড়ায় । লুকিয়ে লাউ সিদ্ধ খেতেও চায় । বুকে দুধ আনার তাড়নায় চিংড়ি দিয়ে লাউ তরকারী ঘন ঘন খেয়েছে তবু দুধ আসেনি । মনে মনে বুড়ী ভাবে তরকারী না করে সিদ্ধ খেলে বোধহয় দুধ আসত। কিন্তু সকলের সামনে ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে চায় না । বাঁশীর মায়ের কথাটায় বুড়ীর বুকে অদৃশ্য এক মোচড় দেয়। বাঁশীর উপর স্নেহের অধিকার একচেটিয়া করতে চায় । সেই অবাধ স্নেহের উপর পাহাড়ী বউ এর হস্তক্ষেপ বুড়ীর অবচেতন মন সহ্য করতে পারে না । তাই বুড়ীর ক্ষোভ প্রকাশ পেলো অন্য এক ভঙ্গিমায় । বুড়ী বলে উঠে ছড়ার সুরে । পরের পুত ! কুকুরের মুত ! উড়ন শিকলে কোহিলের ছাল্যা (ছেলে) কি কাকের বাসায় থাকব !

মুখে যাই বলুক, কোকিল ছানা উড়ে যাবে নিশ্চিত তবুও মায়ার বাঁধন খুলতে পারেনি বুড়ি । যত দিন যায় মাকড়সার জালে আটকে পড়ে পতঙ্গের মতো বুড়ী জড়িয়ে যাচ্ছে রহস্যজনক অদ্ভুত এক মায়াজালে । সন্ধ্যে বেলা সুরেন দাস রাস্তার কাজ সেরে ঘর ফেরে । ললিত ফেরে একই সাথে । দুজন বসে ললিতের বারান্দায় । ললিত বৌ ঘরে তৈরী জুমের চালে মদ ঢেলে দেয় বাঙালী ভাসুরের সামনে । ললিত সুরেন এক সাথে মদ খায় । সারা দিনের ক্লান্ত দেহে অবসাদ ঝরে খানিকটা । কখনো সুরেন বৌ সুঁটকীর তরকারী পাঠিয়ে দেয় পাহাড়ী দেওরের সান্ধ্য আসরে । গভীর রাতে বৌ কথা কও পাখী ডাকে । একই সুরের পরশে দুই প্রতিবেশী ঘুমিয়ে পড়ে আগামী নিষ্ঠুর সকালের অপেক্ষায় ।

ভালবাসা, সন্তান পালন, আনন্দ, খুশী নিয়ে যেমন বিশ্ব সংসার আবর্তিত, তেমনি ভয় ক্রোধ, হিংসা, ঝগড়া বিদ্বেষ সংসারের রথের চাকায় অনিবার্য্য ভাবে সঞ্চালিত এক শক্তি । দুই সংসারের কেবল ভালবাসার মিলই থাকে না ঝগড়া কলহও আছে ।

আছে বলেই একটা ছাগী নিয়ে ঘটল তুমুল কাণ্ড । দুই পরিবারের কেউ সেদিন কাজে যায়নি । শুধু ললিত গেছে দুদিন আগে জিরানীয়ায় জামাইবাড়ী । ললিতের একটা ছাগল সকাল বেলা দড়ি ছিঁড়ে সুরেনের বাড়ীতে সিমগাছ খেয়ে ফেলে । সুরেন বৌ ছাগলটাকে ধরে নিয়ে ললিতের বাড়ী পৌঁছে দিল ! আর বলল, বসনের মা, অ-বসনের মা, ছিমগাছের কি করছে দেইখ্যা যাও । একটা ছইও তুলন যাইত না, বান্দ ছাগলটা বান্দ । ছই দুইলা গাছে ধরলে তোমরা তো খাইবা ! বান্দ ! ছাগলটা বান্দ ! সময় থাকতে বান্দ ! বেঁধেও ছিলো । দড়িটা জলে ভিজে নরম । কখন যে আবার দড়ি ছিঁড়ে চলে গেছে কেউ খেয়াল করেনি । খেয়াল করেনি বলেই সুরেনের বাড়ীর ঝিঙে গাছ, ডুগী গাছ, সিম গাছ সব কাঁচি দিয়ে কাটার মতো শেষ করেছে । ললিত বৌ তার নিজের টং ঘরে বসে চরকী চালিয়ে কার্পাস থেকে বীচি ছাড়াচ্ছিল ।

সুরেন বৌ দু-তিনবার ললিত বৌকে ডাকে । অ-বাঁশীর মা, অ-বাঁশীর মা, তোমরা মনে

করছি কি ! ললিত বৌ চরকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজে সেই ডাক শুনেনি । সুরেন বৌ উঠোনে একটা মুলি বাঁশের চেলা টুকরা ছুঁড়ে মারে ছাগীটার দিকে । চেলা বাঁশ ছাগীর পেছনের পায়ে লেগে কেটে রক্ত ঝরায় । হাঁটুর উপরে রক্তের একটা শিরার উপর আঘাতটা লেগেছে । সুরেন বৌ এতটা হয়েছে জানতে পারেনি । ছাগীটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে । অপ্রত্যাশিত এই দুর্ঘটনার জন প্রস্তুত ছিল না সুরেন বৌ "কেউ দেখেনি" ভাব করে ঘরে ঢুকে । রক্ত ঝরা আহত ছাগীটা ম্যাএ ম্যাএ এ শব্দে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ললিতের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায় । ছোট ছোট পাহাড়ী চোখ বিস্ফোরিত কাতর মুখে ছুটে বেরোয় ললিত বৌ । রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে তখনো । দ্রুত নিঃশ্বাসে পেট কাঁপছে ছাগলের । রাগের রক্তিম ছটায় ললিত বৌ এর মুখ রাঙিয়ে উঠে । ছোট পার্বত্য চোখের গোড়ায় নিমেষে আগুন জ্বলে । সোজা ছাগলটাকে বুকে তুলে ধেয়ে যায় সুরেনের উঠোনে । চি চি চি ! ভিতরে অত হিংসা ! কাচা কামড় দিয়া ছাগল খাও । বেজান হিংসা ! সরম নাই । তোমরা মানুও কাতত (কাটত) পারব । চোখ মধ্যে তোমার দয়ামায়া নাইনি । শুয়র বাচ্চা ! ছাগল আমি নিত না । তোমার ক্ষেতি (ক্ষতি) করাল, ফসল কাইলে খোয়াড় যায়না কেরে । এর লাইগ্যা ছাগল কাতত নি । চোখে অগ্নি ঝলক । চেপ্টা নাকের পাটা ফুলালো রাগে ।

সুরেন বৌ মাথার খোঁপা সজোরে বেঁধে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে বেরোয় ।

না দেইখা খামাখা মানষেরে কইস না ।

ললিত বৌ গর্জে, তুমি না কাতলে কে কাতব । তেলিয়ামুড়ার মানু আয়া কাতব নি ! আমি বুঝে নানি কে কাতব !

সুরেন বৌ -- যা বালা করছি, ফসল খাওয়ালে কাটুম, আরও কাটুম ।

ললিত বৌ ধৈর্য্য ধরতে পারে না -- কাত ! দেখি কাত ! বলতে বলতে সুরেন বৌকে ধাক্কা দেয় ।

সুরেন বৌ হঠাৎ চীৎকার দিয়ে উঠে । মাইর‍্যা লাইল, মাইর‍্যা লাইল । ঘর থেকে সবাই ছুটে বেরোয় । সবাই কেমন যেন বিব্রত । চট করে মুখ তেকে কারো কোন কথা বেরোয় না ।

সুরেন বৌ ধাক্কা সামলে, নাচের ভঙ্গীতে নিতম্ব দুলিয়ে হাতের তর্জনী নেড়ে সংহাররূপিনী ক্রুদ্ধ স্বরে বলে বাইর অ । বাইর অ ! বেটী বাইর অ । ভিটিত থাইক্যা বাইর অ ! বলতে বলতে গলায় ধাক্কা দেয় । -- বিশাল চোখে ক্রোধ ফুটে, কপাল জুড়ে রাগের বলিরেখা ।

চকিতে ললিত বৌ ছুটে আসে নিজের উঠোনে । ঝাড়ু হাতে উদ্যত ভঙ্গীতে, প্রায় উলঙ্গ ভবে বিশ্রী অঙ্গ ভঙ্গী করে, রাগের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে । রাগে, অপমানে, ক্ষোভে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নি দৃষ্টি । সুরেনের ছেলে মেয়ের সবার ঝগড়ার চীৎকারে এক কোলাহল । উঠানের মধ্যেই লম্ফ ঝম্ফ । খোঁটা দেওয়া । শানিত সব বাক্য বাণ । ধাতব শব্দের মতো ঝনঝনায় । ললিত বৌ এর ক্রুদ্ধ নৃত্য । সুরেনের বাড়ীর লোকরা সহ্য করতে পারে না । সর্বনাশা এক ধ্বংস দৃশ্য । নিমেষে বিদ্বেষ আর কলুষতার, অবিশ্বাসের কালো মেঘ গ্রাস করে প্রকাণ্ড এক বাসুকীর উদ্যত ফণার মতো ।

বুড়ীটা এল । অনেকক্ষণ থেমে ঝগড়ার কথা সাজিয়ে গুছিয়ে । হাঁটুর উপর কাপড় । মোটা উরু দুটি ভীমবলে লাথি মারার জন্য প্রস্তুত । ছিনালীরে ! ছিনালী ! লজ্জা সরম নাই !

নির্বংশীয়ার বৌ ! ছাগল সামাল দিতে পারসনা । খোয়ার দেখাস আবার । টেহা (টাকা) রাখবার জাগা যেমন পাইছস না । ছাগলের পায়ে লাইগ্যা গেছে ! কেউ তো আর ইচ্ছা কইরা মারছে না । বালা মতন কথা কওয়া চিনস্ না । সকাইল্যা বেলাও তোর ছাগলে ছুই গাছের কি গতি করছে ।

ললিত বৌ চড়া সুর খানিকটা নামিয়ে বলে -- বুড়ী তোরে মনে করছে বালা । তোর ঘরে আমায় ধেক্কা দিসে তুই কিছু মাতছে না । আয়অ না ! আমার ঘরে দুইকা না । (দুইক্য) আইলে আমি পিসা মারব । ক্ষোভে অপমানে জ্বলে উঠে বলতে বলতে ।

বুড়ীও ছাড়ে না । হায়রে মাগী ঘর লয়া যেমন ফুটানি মারস্ । তোর ঘরে কি আছেরে ! সাকাইল্যা বেলাও লবন নিছস্ মনে নাই ! ওয়াক থু ! চি চি চি বুড়ীর গলা ফাটা বাঁশের মতো চেরচেরিয়ে উঠে । শননুড়ির মতো মাথার সাদা চুল উড়ানো উঁচানো ।

বুড়ি বেশী ফুতানী কইর না । তোর নাতি আমার কোদাল নিসে ফিরত দিসে নি ! সরম পায় না ! বড় ফুতানি মার ।

সুরেন বৌ ঘর থেকে ছুটে গিয়ে কোদালটা এনে ছুঁড়ে ফেলে । নে কোদাল. লয়া ভাজা খা! তোর পোলা যে কুড়াল লয়া সারা বছর কাম করে তখন তোর কপালে পিছা বাইন্দা হাটস্ নি ! কোদাল নেই সুরেনের বাড়ী । তেমনি আবার ললিতের বাড়ীতে কুড়াল ছিল না । উভয়ে ধার হাওলাত করে চলে । সুরেনের বৌ যে খোঁটা দিল । ললিতের মেঝো ছেলে সুবীন্দ্রের মনে তীরের মতো বিঁধে তীব্র অপমানে । চকিতে ঘরে ঢুকে কুড়ালটা নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করে সুরেনের উঠোনে । লম্বা দেহে ইস্পাতের দৃঢ়তা । কুড়াল একতা লয়া বড় ফুতানি অইছে । কুড়ালের আছার আমি লাগাইছে মাগনা লাগাইছে নি ? নেও ! নেও ! কুড়াল ছাড়া আমি বাচত পারব ।

বিদ্রুপে বুড়ী ফোকলা দাঁতে বিকট রকম ভেংচি কাটে । সুবীন্দ্রের কথায় পুনরাবৃত্তি করে বিকৃত উচ্চারণে -- কুড়াল ছাড়া আমি বাচত পারব ! বড় বাচইন্যারে । তোরে কেডা কইছিল মানষের কুড়ালে আছার লাগাইতে । .

ঘরেই ছিল সুরেন । শরীর ভাল না. না উদাসীন কে জানে ! ফল ফসল নষ্টের ব্যথায় সেও সংক্রামিত । তবু রহস্যজনক ভাবে নীরব । থামতে বা লাগতে বাড়ীর লোকদের কিছু বলেনি । এই নীরবতা ফসলের ভালোবাসায় না গেঁয়ো সংকীর্ণতার জন্য বলা কঠিন । গাম্ভীর্য ! নাকি ললিত বৌ-এর চোখাচোখি হওয়ার দুর্বলতা । বাড়ীর লোকরা বুঝে উঠে না । সুরেন বৌ বিলাপ করে কাঁদে, তবু সুরেন নির্বিকার । বৌ-এর পক্ষে সহানুভূতি সূচক একটি কথাও বলেনি । কয়েকবার গলাখাকারি দিয়ে বুঝিয়ে দিল ব্যক্তিত্ববান মানুষের জ্যান্ত অস্তিত্ব । ঝগড়া সাময়িকভাবে শান্ত হলেও ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে ধিকি ধিকি ।

হঠাৎ কোন কথা না বলে বেড়ার একটা বাঁশের টুকরা উপড়ে দমাদম বৌ ছেলে, মেয়েকে কয়েকটা ঘা মারে । চটে গেলে বিপদ । কোন কথা না বলে যে যেদিকে পারে পালায় । তারপর কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় । গম্ভীর বজ্র নিনাদের মতো বলে -- বসনের মা আগুন জ্বালাইসনা, ললিত আইয়া কি করে দেখতাম । হয় আমি থাকুম নয় হে থাকব ! এই রকম কইর‍্যা পাড়া পড়শী হয়্যা থাকন যায় না ।

কোলাহল অস্তাচলে । বেলা গড়িয়ে পড়ে মংকরুই টিলায় বিষাদের ছায়া মেলে ।

বিকেলের ঘুম ভাঙে বাঁশীর । ঝগড়ার কথা সে জানে না । বাঁশের একটা কঞ্চি ধরে উপরে চড়ে ঘোড়া চড়ার ভঙ্গীতে ছুটে দাস বাড়ীর পানে । ওর মা ওকে টেনে আনে । আনলে কি হবে কে আটকায় তাকে । দাস বাড়ীর বাঁশ ঝাড়ের 'আয় আয়' শিশু মনে উঁকি দিচ্ছে । জড়িয়ে ধরে তার মা আটকায় । টামমা মা .... চীৎকারে বিষাদ বনানীর স্বপ ভাঙে । ফুলাগাল ফুলিয়ে উঠোনে গড়ায় বিকট চীৎকারে ।

সন্ধ্যে নামে চামল গাছের নরম ডালের চামর দুলিয়ে । আকাশ জুড়ে খই ফোটা লক্ষ তারা । ব্যাকুল শিশু বুঝ মানে না । কলা দিয়ে, মকাই পুড়িয়ে খাইয়েও শিশুকে বুঝানো যাচ্ছে না । শূয়র মুরগী ঘরে তুলে তাড়িয়ে খেদিয়ে জন্তু জীবের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়েও শিশুর মন আনমনা করা যাচ্ছে না । দুর্বার টানে শিশুর বুক মোচড়ে উঠে । দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় চীৎকার তুলে হঠাৎ সাপের ছোবল খাওয়া আর্তনাদের মতো । তার মা গল্প শোনায় । পাছড়া দিয়ে পিঠে বাঁধে । অন্য ভাই-বোনেরা উঠোনের কোণে আতঙ্ক সঞ্চারী পাখীর বিচিত্র ডাক ডাকে । কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভয়ে শিউরে । অবারিত ঘরছাড়া মন ভয়ও মানে না । আকুল আগ্রহে মেলে দু চোখ । উৎকর্ণ কান ডানা মেলা মন । খাঁচায় পাখী থাকে, সঙ্গীত কেউ খাঁচায় বেঁধে রাখতে পারে না । পাখীর মতো শিশু মায়ের পিঠে বন্দী । পাশের ঘরে টামমার নরম কোলের অদৃশ্য হাতছানি তার মনটাকে দূরন্ত সঙ্গীতের মতো নিয়ে গেছে । অনেক রাত বাঁশী ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের পিঠে । স্বপ্নের ডানায় উড়ে টামমার কোলে ফিক্ ফিক্ হয়ত হাসে । বাঁশীর মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে বাঁশের হুঁকোতে মুখ দিয়ে তামাক টানে ।

উঠোনের এপাশে ওপাশে পায়চারি করে সুরেনের মা । নির্বাক বাঁশীর চীৎকার বুড়ীর বুকে ধারালো বল্লমের মতন বিঁধে । খেতে বসে খেতে পারেনি । গলায় কী যেন কঠিন কিছু আটকে গেছে । বুকের আবেগ সাপের মতো পেঁচিয়ে উঠে গলাটা জড়িয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে । ছানি পড়া চোখে ঘুম আসে না । মায়াজালের এত জ্বালা আগে অত বুঝেনি । ঘন ঘন চোখে ভাসে ওই পাহাড়ী শিশুর গোল চোখের দীপ্ত তারা । অবচেতন মনে অনুভব করে বুকের কাছে, পুষ্ট কোমল শিশুর হাতের আঁকড়ে ধরার বেদনা । অনুশোচনা জাগে অবাঞ্ছিত কলহের জন্য । নিষ্পাপ শিশুর কি দোষ ! কেন পারবে না বুকের কাছে ছুটে আসতে । নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ওদের বাড়ী গিয়ে ওর পাশে শুয়ে বুকে পিঠে সস্নেহে হাত বুলাতে কিসের আপত্তি !

বুড়ী আবার ভাবে পরের শিশু । তাকে নিয়ে অত ভাবনায় লাভ কি । ওর মা আছে বাপ আছে । ভাবনার দায়িত্ব নিয়েই ওরা মা বাপ । তবু যেন কোথায় একটু ভাবার দরকার । বিশ্ব সংসার তো স্নেহ আর ভালবাসার মধুর অথচ ভয়ঙ্কর মরীচিকার পিছনে ধাবিত । বিচিত্র পৃথিবীর মাঝে অহেতুক বুড়ীর স্নেহের উৎসের আর এক নাম বোধ হয় মানবতা । বুড়ী জানে চিনে দুই জীবন প্রবাহের আকাশ-জমিন ফারাক, পরিবেশের বিভিন্নতা, ভাষার তফাৎ, মুখের আদলের দিক দিয়ে বাঙালী পাহাড়ীর প্রকট অমিল, তবু যেন দুই জীবন ধারার মাঝে একই জীবনের মূর্চ্ছনার সূত্র আঁকড়ে ধরেই ধীরে ধীরে মানুষের মিলন সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছে বুড়ীর অবসন্ন ব্যথাতুর মন বিচিত্র বিশ্বের মাঝে এই মহান অনুভূতি আছে বলেই মানুষ সবার উপরে । ধান ভানার ঢেঁকী সুরেনের বাড়ীতে নেই । এই পাড়ায় একটা ঢেঁকী তাও আবার ললিতের বাড়ীতে ।

গোটা পাড়াটায় দিন মজুরের বাস । চাল কিনে খায় প্রায় সবাই । ধান ভানার প্রশ্ন উঠে না বললেই চলে । কিছু জুম আর কিছু গিরস্তি করে এই দুই বাড়ীতে । সুরেনের বৌ, সুরেনের বড় মেয়ে অনিমা দু জনের দুঃশ্চিন্তা । কোথায় গিয়ে ধান ভানবে । এতদিন ওরা ললিতদের বাড়ীতে ধান ভানতো । গতকালের রাগ সবার মনে বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে । তবুও একটা সঙ্কোচ, লজ্জা । কেমন করে ললিতের উঠোনে ধান ভানবে । যদিও বা যায়, ললিত বৌ এর সাথে কি বলেই বা আলাপের সূচনা হবে ।

বেলা বাড়ে । অনেক সাত পাঁচ ভেবে প্রায় নির্লজ্জের মতো মা ঝি (মেয়ে) মাথায় ধানের টুকরী আর ডালা নিয়ে যায় ললিত বাড়ী । উঠোনের পাশে গোয়ালে বসানো ধানের ঢেঁকি । উৎকর্ণ কান, মনটা দুরু দুরু । নিশ্চিত অপমানের অপেক্ষায় । যেমন ভাবনা তেমনি ঘটনা । ঘরে বাঁশের হুঁকো নিয়ে ললিত বৌ । সুরেনের বৌ, ঝি তাকে চমকে দিলো । ঘর থেকেই চোখের তারা ঘুরিয়ে এক জ্বলন্ত চাউনি ছুঁড়ে ওদের দিকে । চাউনি বললে ভুল হবে, কুড়ালের আঘাত হানলো ।

মাথা থেকে ধানের টুকরী নামাতে না নামাতে ললিত বৌ মৌনী ভাঙে, মেঘহীন দিনে বজ্রপাতের মতো । ধনি মানুর বৌ ফুতানি করিয়া মানুষের দেকি (ঢেঁকি) মধ্যে আয়, তুমি সরম পায় নানি । আমার ঘরে ঢুইকনা । কাইল কতবার কইছে । নিজের দেকি নিজে বানাইতে পারে না । বলতে বলতে বিচিত্র ভঙ্গিমায় কেঁপে উঠে ললিত বৌ-এর সেই পার্বত্য থুতনি । গতকালের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারায় চোখে দীপ্ত বিজয়িনীর উল্লাস ।

সুরেন বৌ কটমটিয়ে তাকায় ঝি এর দিকে । দোষটা সম্পূর্ণ যেন ঝি-এর । ঝিও অগ্নি দৃষ্টি হানে মায়ের দিকে । অপমানে ভীষণ মেঘলা মুখ দুটি । গলা শুকিয়ে কাঠ । মন হাতড়ে হাতড়ে কোন উত্তর খুঁজে পায়না । ঝি-এর চোখের পাড়ে টলটলিয়ে ওঠে জল । নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছা করে । টলটলানো চোখের ইশারায় মা ধানের টুকরী মাথায় তুলে । নিঃশব্দে দু'জনে বেরিয়ে এলো চকিতে । পাহাড়ী বৌ-এর সরম পায়নানি শব্দটি খচ্ খচ্ করে টাক্কাল দিয়ে জুম খুঁচানোর মতো সুরেন বৌ-র মনটা তীক্ষ্ণ জ্বালায় খুঁচায় ।

বিকেলে সুরেনের বড় ছেলে হরেকৃষ্ণ ধানের বস্তা রিক্সায় নিয়ে ছুটল মংকরুই থেকে চম্পকনগরে ধানের মিলের দিকে । জিরানীয়া থেকে জামাইবাড়ী হয়ে ফিরছে ললিত । পথে দেখা হরেকৃষ্ণের সাথে । একে একে সব ঘটনা শুনে । ধানের বস্তা প্রায় জোর করে রিক্সা থেকে নামায় । হন্ হন্ করে ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এল সোজা সুরেনের বাড়ী । সুরেন বৌ মুখোমুখি দাঁড়ায় নিশ্চল পাথরের মতো । কিছু বলার মতো খুঁজে পায়না । কপালে চিক্ চিক্ করে কয়েক ফোঁটা ঘাম । মৌন মুখে রাগের চেয়ে অভিমানের গাম্ভীর্যই বেশী ।

ললিত কাতর । আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বলল, বৌদি ! আমার মুখ চায়া তুমি গোসা ফালাইতে পারেনা নি ! পোলাপানের লগে গোসা করিও না । আমি সরম পাইছে ! যা অইবার অইছে, আমার মন্দ কপাল ! তুমি বুঝে না । আমার দেকি (ঢেঁকি) তোমার অইতে পারে না । ছাগলতা পশু বুঝত পারছে না । মানু ত বুঝত পারে । ইশ মানুষ শুনলে কিতা কইব । তোমার দিয়া আমার এত মিল ! অত মিল মাঝে কেমনে মারামারি করছে ! সুরেন বৌ কথা বলার ফুরসৎ

পেলো না। হাত সজোরে চেপে ধরে ললিত হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসে একেবারে নিজের উঠোনে। সুরেন বৌ প্রতিবাদ করতে পারে না। অনেক করেও বাধা দেওয়ার মতো শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে না। ললিতের মুখে সারল্যের দ্যুতি। ছোট ছোট চোখ জোড়াতে বিকীর্ণ হচ্ছে অকপট বুন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা।

কি জানি উঠোনে দাঁড়িয়ে ককবরক ভাষায় ক্ষুব্দ কণ্ঠে কি বোঝাল বৌটাকে। চোখ মুখের দৃঢ়তায় বুঝিয়ে দিলো তার সিদ্ধান্তে সে অটল। সুরেন বৌ ককবরক বুঝে। বলতে পারে না। বুঝল ললিত বৌকে সুরেন বৌ-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলছে। ললিত বৌ ঠোঁট কামড়ে কামড়ে এগোয়। ললিত বৌ পায়ের দিকে নুইয়ে এগুতেই, সুরেন বৌ জাপটে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। বুড়ীও এসেছিল পেছনে পেছনে। সবার অলক্ষ্যে বাঁশী বুড়ীর কোলে কখন গেছে কেউ জানে না। চারদিকে মুখরিত এক মিলন মধুর কান্নার রোল। একটি দুঃস্বপ্নের মতো দিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি, বিদ্বেষের কালিমা ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ধারায় নিমেষে ধুয়ে যায়। ললিতের মুখে হাসি তবু কিসের যেন আবেগ চিক্ চিক্ করে চোখের কোণে।

মংকুরুই টিলায় এমনি ধারায় বহে পাহাড়ী-বাঙালীর আবাদ বিবাদ সুবাদের কলরোল। কল্লোলিনী হাওড়া নদীর মতোই বিচিত্র। বড়মুড়ার শিখর বিধৌত বর্ষায় যেমন এর সর্বনাশী রূপ তেমনি পাহাড়ী ঢল হারিয়ে গেলে বিস্তীর্ণ বুকের চর ভাসিয়ে হাজারো মানুষের পায়ের ছাপ এঁকে চলে নিরন্তর। দেশান্তরী, জমিহারা মানুষ অরণ্যের কোল সাফ করে জীবনের এক নতুন ঠিকানার সন্ধানে এখানে জড়ো। তারা চায় নিরুপদ্রব জীবন ধারা। দেহ যতক্ষণ আছে খাটবে। তবু যেন অশান্তির কালো কলুষতা তাদের স্পর্শ না করে। হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে গহীন অন্ধকার জালে এক মধুময় আবগের দীপ শিখা। তারই নাম বোধহয় উৎসব। আজকে তাই ঠিক হলো সুরেনের বাড়ীর চামলতলায় কীর্ত্তন হবে। আনারস কাঁঠাল সবই আছে। খোল করতাল নিয়ে মদন বৈরাগী তার ভাগ্নে রাখালকে আনতে পারলেই হয়। সুরেনের ছেলে ছুটল হাওড়া নদীর ওপারে দক্ষিণে মহারাম সর্দ্দার পাড়ায়। ললিত ছুটল প্রতিবেশী পাড়া চিন্তারামকবড়া পাড়ায়। যেখানে বলরাম দাস একতারা বাদক থাকে ওখানে। ললিতের ছেলে ছুটে চন্দ্রসাধু পাড়ায় লোকজন নেমন্তন্ন করতে। কীর্তনের প্রস্তুতি নয়, যেন সান্ধ্য আসরে মিলনগীতির এক বিচিত্র সমারোহ। বুড়ী পাহাড়ী কায়দায় পাছড়া দিয়ে পিঠে বাঁধল বাঁশীকে। গুন গুন করে ঘুম পাড়ানী গান গায়। মেঘনার তীরে নিঃসঙ্গ মাঝির গাওয়া গানের মতো। দীর্ঘ একদিন পরে হারানো মানিক খুঁজে পেয়েছে। বিরহ অভিমান স্নেহের বন্ধনটা যেন আরো দৃঢ়। এই বিরহ বিলম্বিত হলে মানুষের জীবনধারা কোন ধারায় বইত কে জানে! আঁকাবাঁকা হাওড়া নদীর মতো স্নেহের বিগলিত বেগ। কখনো মানুষকে কাঁদায়, কখনো বা হাসায়। আঁকাবাঁকা হোক ক্ষতি নেই, চলার পথে ছিটকে গেলেই বিপদ। কোথায় মরা নদী নাম নিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবে কে জানে। শ্যাওলা জমবে, স্রোত থামবে, কোনদিন গতি সঞ্চারিত হবে না।

ভালবাসার নদী গতিপথ ছিটকে যায়নি বলেই মংকুরুই পাড়ার লোকরা দুদিন পরে বর্ডার রোডের কাজে ছুটে এক সাথে চম্পকনগর থেকে বড়মুড়া। পাহাড়ের গভীরে কাজ। মাইল তিনেক হেঁটে গিয়ে একটা পাহাড়ী বস্তীর নাম বনকুমারী। বনকুমারীর পাশে যে উঁচু পাহাড়ী

খাদের মতো টিলা, সেই টিলার নাম খামতিং বাড়ী । খামতিং বাড়ী টিলার পেট কেটে তৈরী হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোডের সংক্ষেপ গতি ।

যেতে যেতে কেউ ছুটছে হাসির নিক্কনে বন মুখর করে । কেউবা বিগত ঝগড়ার গল্পে গুনগুনিয়ে । পুরুষ আছে নারীও আছে । নারীদের মধ্যে পাহাড়ীই বেশী । চোখে মুখে কর্মঠ রুক্ষতা, তবু যাচ্ছে বুনো ফুল খোপায় কানে গুঁজে । কেউ গাইছে উদাসী গান । বনের হাওয়ায় উদাস তাদের মলিন ধূসর ওড়না । তেমনি উদাস তাদের বুনো সুর । আগের দলকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষিপ্রতা চলার বেগে । কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে । বিবাহিত অবিবাহিত অনেকেই । ছুটছে দুরন্ত বেগে । কাজের তাগিদ যত বেশী তার চেয়েও ভয় দেবেন্দ্র মেটের । লজ্জা সরম লোকটার কিছু নেই । কেউ দেরীতে গেলে হাজিরা খাতায় নাম তুলে না । যে সব মেয়েদের চাউনীতে ধার ওরা কোনদিন বাদ যায় না । কেউ হাজির না হয়েই খাতায় নাম উঠে । যারা ওর ওইসব আচরণের প্রতিবাদ করে তাদের বিপদ ।

আস্তে আস্তে সামনে আসে আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ । শামুকের মত পেঁচিয়ে ওঠা কখনো । পর্বত শিখর থেকে কখনো বা তরতরিয়ে নামা । আসাম-আগরতাল রোড । পর্বতের নাম বড়মুড়া । মুড়া শব্দের মানে পাহাড় । এই পর্বতমালায় সবচেয়ে বড় পাহাড় । এর চূড়াটা আছে কিনা কেউ কোনদিন মেপে দেখেনি । কালো আর ঈষৎ পীত মানুষের ভীড় । নরনারী দুই-এরই কলবর । আজকে চোখে তাদের ভয়ঙ্কর বিস্ময় । কেউ কেউ রাখালিয়া দাবা খেলছে রাস্তার উপর কোঠা ঘর এঁকে । তাদের চোখেও নির্বাক আতঙ্ক । অন্যদিনের মতো তেমন উচ্ছ্বাস নেই । কোথাও পা ছড়িয়ে কলাপাতরমোড়ক খুলে খেতে বসে । তাদের চোখে মুখেও পাহাড়ের স্তব্ধ গাম্ভীর্য । কোদাল, টাক্সি, শাবল এদিক ওদিক এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো । কেউবা পাহাড়ের গায়ে কোনারক মন্দিরের বিস্মৃত শিল্পীর মতো লাস্যলীলার ছবি আঁকছে । নির্বাক নির্জন পাহাড়ে এলে মানুষের অবচেতন মনের লাস্যলীলার ছবিই প্রকাশ পায় কিনা কে জানে ।

বন্ধুর পথের রেখা ওদের শিল্পী পরশে কখনো সোজা কখনো মসৃণ । পাহাড় কেটে সারা অরণ্য জুড়ে আনছে ক্রমাগত প্রকৃতির পরিবর্তন । বন্য হস্তীর চারণভূমি আজ মানুষের কলরবে মুখর । চারধারে বিস্তীর্ণ উপত্যকা । উপত্যকায় জুম ক্ষেত । ধানের কিশোরী ডগা বাতাসে ঝিরি ঝিরি নাচে । বাতাসে পালের মত উড়ছে বাঙালী মজুরিনীর শাড়ী বা বনবালার আঁচল । মেটে দেবেন্দ্র শুনিয়ে যাচ্ছে দাঙ্গার ভয়াবহ গল্প । -- চম্পকনগর অমর মহাজনের গদিত শুইন্যা আইলাম লেম্বুছড়া রাণীরবাজার মান্দাই এক রাইতে বেটাইনতে তিন হাজার বাঙালী কাইট্যা লাইছে । বাড়ীই বলে পুড়ছে কমসে কম পঞ্চাশ হাজার । দেশে আর থাকন যইত না ।

সুরেনের বৌ একটা পাহাড়ী বৌ-এর মাথার উকুন খুঁজছে । নখের উপর নখ চেপে একটা উকুন মেরে বলল - মন্টুর বাপ আন্দাজ্যা গপ ছাইর‍্য না । নিজে দেখছনি কও ! পঞ্চাশ হাজার বাড়ী পুড়ছে যে কইলা আগরতাল সর্বমোট বাড়ী অইব ক'হাজার । লেম্বুছড়া আমার বইনপুতের বাড়ী । দুই তিনবার গেছি ।

বিজ্ঞের মতো চটে গিয়ে দেবেন্দ্র প্রায় ধমকের সুরে বলে -- হারে বেটী ! তুই কি জানস্ । পত্রিকা পড় না, রেডিও শুনো না । তোর সঙ্গে কী কমু । দেশের খবর যারা জানে তারা কইতে

পারব, আমার কথা ঠিক না মিছা। এই রাস্তাদা (দিয়া) তিনদিন ধইর্‍্যা কোন গাড়ী চলছে নি। ক নিজের চোখে দেইখ্যা থাকলে ক। দুনিয়ার খবর রাখলে না জানবা।

গাড়ী চলাচল তিনদিন ধরে বন্ধ সুরেন বৌ নিজে দেখছে। তাই আপত্তি করতে পারে না, নীরব থাকে।

দেবেন্দ্র বলে চলে -- বাড়ী ঘর ছাইর‍্যা দুই তিন লাখ লোক আগরতলায় ঢুইক্যা গেছে। যাইবার সময় একটি ঘটিও লইয়া যাইত বলে পারছে না। কেমনে নিব। মানষে জান বাঁচাইব না জিনিস নিব! মাগ পোলা দূরের কথা! নিজের জানটা লয়া বাঁচনই দায়।

আস্তে আস্তে কৌতূহলী লোকরা ভীড় জমায় দেবেন্দ্রকে ঘিরে। ছোট এক জনসভা। একটা থান ইটে বসে দেবেন্দ্র। সবার বিস্মিত দৃষ্টি-শলাকা তার উপর নিবদ্ধ। ভীড় যত বাড়ে গলা কেশে সাফ করে বলে নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী। মাইয়্যা মানষেরে গাছে দড়ি দিয়া বাইন্দ্যা শতে শতে বুনি কাইট্যা দিছে। এক টুকরী ভইর‍্যা পোলাপানের মাথা পাওয়া গেছেদুই তিন হালি। ভয়ঙ্কর বিস্ময় রাস্তার কামলাদের চোখে মুখে। চোখের পাতা কুঁচকে, ঠোঁটে গালে অসহ্য সহানুভূতির ভাঁজ ফুটে।

-- নদীর জলে হাজার হাজার মানষের লাস ভাইস্যা যায়। কোনটার মাথা নাই। কোনটার নাভি থাইক্যা উপর দিক আছে, নীচের দিক কই রইছে কে কইব। পাহাড়্যারা কুপাইতে কুপাইতে বড়মুড়া পার অইয়া কোনদিন যে তেল্যামুড়া পর্য্যন্ত যাইব কে জানে। যাওয়ার পথে আমরারে ছাড়ব? ভীড়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে, অত বাঙ্গালী ক্যাইট্যা লাইল, বাঙালী বেটাইন শাড়ী পরে না কেরে।

বাঙ্গালী বেটাইনতে কী করব খালি হাতে। টাক্কাল, বন্দুক, কামান লয়া আক্রমণ করে পাহাড়্যারা। প্রশ্ন কর্তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে দেবেন্দ্র -- অবশ্য পরে দিয়া শোধ লওয়া আরম্ভ করছে। আগরতলার বাঙ্গালীরা বোমা লয়া, রামদা লয়া আক্রমণ করে পাহাড়্যা মারণ আরম্ভ করছে। বাস থাইক্যা গাড়ী থাইক্যা টাইন্যা টাইন্যা কুপাইয়্যা কুপাইয়্যা কম মারছে না। আগরতলা খুঁইজ্যা একটা পাহাড়ী পাইবা না। বস্তা ভইর‍্যা কাইট্যা কাইট্যা পাহাড়্যা শালারারে ঢুকায়্যা নদীর মধ্যে কম ছাড়ছেনি। নাক চেপটা দেখলেই সারে, অক্করে টুমায়্যা লাইব। লড়ী ভইর‍্যা বাঙালীরা পাহাড়্যা খুঁজত বাইর অইছে। এদিক দিয়াও আইব। তখন আমরাও ছাড়তাম না। তিপরা বেটাইন দেখবা কুস্তা জানেনা, অক্করে সাধু। বিতরে বিতরে শালারা এক।

একজন আরেক জনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। সন্দেহের অবিশ্বাসের কালো মেঘে কাল বৈশাখীর মত কালো হয়ে আসে সবার মুখ। কে কাকে কাটবে কে জানে। কাটার কারণই বা কি বুঝে উঠে না কেউ। ভাবতে গিয়ে শরীর অবশ হয়ে আসে। ঝিনঝিনি বাতগ্রস্ত রোগীর মতো। পরিবেশটা থমথমে যখন -- দুম করে সুরেন দাস জিজ্ঞেস করে, মন্টুর বাপ অনেক কথা তো কইল্যা, একটা কথা জিগায়, তুমি যে কইলা চম্পকনগর শুইন্যা আইছ। আমিও তো কাইল রাইত দশটা পর্য্যন্ত চম্পকনগর বইয়্যা আইছি। আমরার কানে দেখি ইত্যান কথা কেউ কইল না।

দেবেন্দ্র গলায় ঝাঁজ ফুটিয়ে বলে -- তুমি শুনবা কই। নিজে অমর মহাজনে দেইখ্যা আইছে।

সুরেন বাধা দিয়ে বলে -- অমর মাহাজনের কথা ছাড় ! নিজে দেখছনি কও ? নিজে তো দেখছ না ! অমুকরে জিজ্ঞাইলে কইরা হমুকে কইছে, হমুকরে জিজ্ঞাইলে কইব হমুক নিজে দেখইন্যা কেউ নাই । ইতান মিছা কথা কইয়্যা কী লাভ ।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে উদ্যত ভঙ্গীতে দেবেন্দ্র দাঁড়ায় -- বাঙালী বাঙালীর রক্ত চাস্ । দাঁতে দাঁত চেপে কটমট তাকায় । পারলে যেন চিবিয়ে ফেলবে । সবার প্রতি উদ্দেশ্য করে সুরেনকে দেখিয়ে বলে -- ইটি রাজাকার ! আগে ইটিরে কাটন লাগব । আগে ঘরেরটি পরিষ্কার কইরা পরে পাহাড়্যা কাটন লাগব । ইটি না কাটলে শান্তি আইত না দেশে । পাহাড়্যার দালাল ! বেশী কথা কইলে ইখানই টুম দিয়া লাইমু । ওর চোখ মুখে নেকড়ের মুখ । চোখ দুটি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে ধূর্তামির শাণিত চাউনি । শকুনের চেয়েও ধার লাগে সুরেনের কাছে । সুরেন্দ্র এতটা বিব্রত হবে আশা করেনি ।

হঠাৎ নীরবতার বরফ ভাঙ্গে পাঞ্জাবী ওভারসীয়ারের বাঁশীর শিসে । মন চলে না, হাত পা চলে না তবু টাঙ্গি কোদাল, ঝুড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে মজুররা এগোয় পাহাড় কাটার কাজে ।

দেবেন্দ্র মেটের শুনানো গল্পে, সবার মনে বিলম্বিত এক প্রতিধ্বনি । সুরেন বিশ্বাস করেনা ওনে । উড়িয়েও দিতে পারে না ওর কথা । তবু জানে দেবেন্দ্র তার মতই মজুর ছিল । আগে একবার মজুরী নিয়ে মজুররা হরতাল করে । তখন পাহাড়ী বাঙালীর দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবেন্দ্র হরতালটাকে বানচাল করেছিল । সেই থেকেই মজুর থেকে মেট বা সর্দার পদে উন্নীত । তাই সুরেন বাঙালী এ মজুরিনীর ঝুড়িতে মাটি ভরতে ভরতে বলে -- শুনলানিগো । দেবেন্দ্র মেটের হাতী মারন্যা গপ্ । নিজের চোখে যেমন দেইখ্যা আইছে এই রকম গুজব মাইর‍্যা কামলারার মনে ভয় ঢুকায়্যা দিছে । ইতান গপ শুইন্যা কেউ কারে বিশ্বাস করব ? তিলরে তাল কইর‍্যা গণ্ডগোল বান্ধায়্যা লাভ কি ! বাঙালী মজুরিনীর মনে আতঙ্ক সঞ্চারিত, সে হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি । দেবেন্দ্র মেটের কানে এসব কথা পৌঁছলে ছাঁটাই করে দেবে । আবার ঘটনাগুলো পুরো অবিশ্বাসও করতে পারে না ।

দেবেন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে কথাটা শুনে । হটাৎ চীৎকার করে বলে, পাহাড়্যার দালালটা কি কয় রে ।

কেউ উত্তর দেয় না । কোন কথা বলেনি ভাবটা এমন । সবার মনে উৎকণ্ঠা কখন ঘরে ফিরবে ।

পরের দিন কেউ কাজে যায়নি । ভয়ে আতঙ্কে সবাই সবার ঘরে । শব্দের চেয়েও তীব্র বেগে ছুটছে গুজব । হাজারো বছরের মানুষ মানুষের বিশ্বাস চূর্ণবিচূর্ণ করে । ললিত চম্পকনগরে নুন কিনতে আসে অমর মহাজনের ঘরে । আধা কেজি লবনের দাম এক টাকা রাখে মহাজন । ললিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে -- কি মা-জন বাকি পয়সা ফিরত দিত নানি । অমর মহাজন কালো বিশাল মুখের অতিকায় চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বেলে বলে -- দাম আর কইর‍্য না, পাহড়্যা বেটার কাছে লবণ বেচছি যে তোমার কপালটা বালা । যাও, এইখানতে যাও । সময় বালা না ।

ললিতের বুকটা খামচে উঠে । নিশ্চল চোখের তারা । কিছু বুঝে না এই অবজ্ঞায়, বঞ্চনার কারণ কী ! পার্বত্য মুখে থমথমে আতঙ্কের গাম্ভীর্য্য । কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে

কিছুক্ষণ। বুকে অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলে -- মা-জন বিচারের মানু অয়া তুমি এমন কেমনে কয়। পাহাড়্যা মানু তোমার দোকান মাঝে মাগনা জিনিস খায়নি। অমর মহাজনের গদীর কোণে দেবেন্দ্র মেট। চোখের, ইশারায় কী বলল কি জানে। অমর মহাজন লাফ দিয়ে গদী থেকে নেমে লবণের পুটলি কেড়ে ধমকায়। -- যা বেটা যা, পয়সাও পাইতে না লবনও পাইতে না যা পারস্ কর গিয়া। দেবেন্দ্র মেট বলে, আমরা বালা দেইখ্যা এখনও খাতির করি তোরারে। কোনদিন রাম দা লইয়া কচু কাটুম ঠাকুরই জানে। দেবেন্দ্রের মুখে চোখে ধূর্ত হাসি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে ললিত। প্রতিবাদের ভাষা পায় না। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলে বার বার। থমথমে পার্বত্য মুখটা লজ্জায়, অপমানে ঘৃণায় রাঙিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু। বিচার, প্রতিকার, শব্দগুলো যেন তার নিজের জগৎ থেকে মুছে যাচ্ছে নিমেষে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরোয়। জোড়া জোড়া সন্দিহান দৃষ্টি-তীর তার দিকে নিক্ষিপ্ত। চারদিকে একবার তাকায় এক সন্ধানী দৃষ্টি ছুড়ে। না, বাজারটাতে পাহাড়ীর সংখ্যা খুব কম। বাঙালীদের মধ্যেও খুঁজে ঘনিষ্ট কাউকে। তার পক্ষে দাঁড়িয়ে এই অন্যায়ের মুখোমুখি প্রতিবাদ করার মতো। কাউকে দেখে না। যাদেরকে দেখছে অপরিচিতই বেশী। অনেকের সাথে পরিচয় আছে তবে ঘনিষ্ঠতা নেই। যারা ঘনিষ্ঠ তারা আবার অসহায় ভীরু ধরনের লোক। রিক্ত হাতে, জগদ্দল পাথরের মতো একবুক অপমান, বঞ্চনা নিয়ে ঘরে ফেরে। দু 'তিন দিন বাজারে যায়নি মংকুরুই টীলার লোকগুলো। ভয়ে কাজে যায় না। গত রাতে সুরেন একটা কাঁঠাল আনে। সেটা খেয়ে দুবাড়ীর লোকগুলো একরকম রাত কাটায়। আর উপোস করা যাচ্ছে না। আতঙ্কের কালো ধোঁয়া ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশঃ রাখাল বৈরাগী বৌ বাচ্চা নিয়ে বোঁচকা বেঁধে ঘর ছেড়ে পরশুদিন চলে গেছে রাণীরবাজার। ধনপদ জমাতিয়া বোঁচকা নিয়ে পাহাড়ের গভীরে বৌ ছেলেমেয়ে রেখে এসেছে। ঘর একেবারে ছাড়েনি। একা রাতভর জেগে ঘরে বসে থাকে। শিবচরণের কিছু নেই, একা বুড়া মানুষ। সেও তার অন্ধ মেয়েটাকে পাহাড়ে নিয়ে রাখতে গেছে। এখনো ফিরে নি। মহাজনরাও লরী করে জিনিষপত্র সহ মেয়েছেলেদের শহরে পৌঁছে দিয়েছে। সন্ধ্যে হলেই সারা চম্পকনগর ছমছমিয়ে উঠে! বড়মুড়ার পাহাড়ে লুকানো শতাব্দীর সমস্ত রাত্রির অন্ধকার চম্পকনগরের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জমে।

ক্ষুধার জ্বালা আর মানা যায় না। ভোর বেলা দু'বাড়ীর লোক ছুটল বর্ডার রোডের কাজে। যাদের ঘরে কিছু আছে তারা কেউ যায়নি। যাদের উপোস যন্ত্রণা সহ্য হয়নি তারাই কেবল কাজে গেছে। অন্যদিন দেড়শো দুশো জন কাজে যেতো সেদিন ষাট সত্তরের বেশী হয়নি।

সবাই যখন কাজে, বুড়ী তখন বাঁশীকে নিয়ে ঘর পাহারায়। ক্ষিদের জ্বালায় বসন কাঁদে। থামাতে পারে না বুড়ী। ঘর তন্ন তন্ন করে কিছু খাওয়ানোর মতো খুঁজে পায় না। অনেক কষ্টে দশ বারোটা কাঁঠালের বীচি যোগাড় করে পুড়ে খাওয়ালো। পেটটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হলো। বেশীক্ষণ কান্না থামিয়ে রাখা যায়নি। ভাতের ক্ষুধা কাঁঠাল বীচি দিয়ে কত মিটাবে! সুরেন ললিত ওরা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হবে। দুটো বাড়ীতে এই দুটো মনুষ্য প্রাণী ছাড়া অন্য কোন মানুষ নেই। ঝির্ ঝির্ বাতাস বইছে অন্য দিনের মতোই। তবু মনে হচ্ছে বুড়ীর কোন সর্বনাশা কাল বৈশাখীর পূর্বাভাষ। কাজে যারা গেছে ওরা ফিরে আসবে কিনা কে জানে! বুকের ভেতরটা আজানা

আশঙ্কায় তীক্ষ্ণ নখে কোন জন্তু খাঁমচে খাঁমচে ধরছে । উৎকীর্ণ কান পাখীর ডাকেও চমকে উঠে ? উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ ।

সন্ধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দিলো কি দিলো না । হঠাৎ শুনলো এক আকাশ চিরানো আর্তনাদ । বুড়ী বাঁশীকে বুকে চেপে বেরোয় । পূব পশ্চিম দু'দিকে আগুন জ্বলছে । দুম্ দুম্ গুলির শব্দ না বাঁশ ফাটা শব্দ কে জানে । আতঙ্কে বসন আরো জোরে বুড়ীর গলা জড়িয়ে জাপটে ধরে । কোন দিকে পালাবে বুড়ি ভেবে পায় না । হাত পা কাঁপে ঠক্ ঠক্ । ঘোলাটে চোখ জোড়া ঝাপসা হয়ে আসে । থরথরিয়ে চোখের পাতি কাঁপিয়ে বিস্ফোরিত চোখে তাকায় । তবু দেখে না । শুধু আগুন চীৎকার কান্না শুনছে । নজর চড়াতে গিয়ে ঠোঁট হাঁ হচ্ছে । ঠাহর করতে পারে না । গরু বাছুর ছাগলের বিকট চীৎকার কানে তীক্ষ্ণ শলাকার মতো বিঁধে । বোঝা গেলো আগুনে ঝলসে দড়ি ছিঁড়তে না পেরে আর্তনাদ করছে । নিজের অজান্তেই চীৎকার করে । নিজেই আবার আতঙ্কিত হয় চীৎকারে । একবার ছুটে ললিতের উঠোনে একবার নিজের উঠোনে । ধরার মত কোন অস্ত্র খুঁজে পায় না । আগুনের হল্‌কা আকাশে উড়ে তীব্র বেগে । নীল আকাশটা মশারীর মত পুড়ে পুড়ে খান খান । পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্ত দিগন্ত লাল হয়ে আসে । চোখে জ্বলুনি ধরে । চারদিক জুড়ে আগুনের ব্যূহ । বিশাল দানবের মতো আগুন হাঁ করে জিব লক্‌লকিয়ে তাদের দিকেই ছুটে আসছে । ঝড়ো বাতাসের মাতাল ঘূর্ণী চারদিকে পাক খায় । আগুনের ঢেউ চারদিকে আঠারমুড়ার চেয়ে উঁচুতে উত্থিত । আগুনের ঢেউ বাঁশ ঝাড়ের দিকে কম । সেদিকে উদভ্রান্তের মতো ধায় । সর্বনাশা ধ্বংস নাচে । উন্মত্ত আগুন সে দিকেও ছুটে । বুড়ী হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে । আবার ছুটে হাওড়া নদীর পানে । মানুষ, পশুর আর্তনাদ ছাপিয়ে আগুনের গর্জন । এই ভীম গর্জন বজ্রপাতের চেয়ে বিলম্বিত ভয়ঙ্কর । সমস্ত ক্রোধের জেহাদ যেন দুটি মনুষ্য প্রাণীর বিরুদ্ধে । ভীত চকিত হরিণী যেন ছুটে জ্বলন্ত জুমের ভিতর । বাঁশ ঝাড়ে সহস্র পাখীর কলরব । কলরব নয় ধ্বংসের মুখোমুখি আর্তনাদ ? বাঁশের অজস্র কঞ্চি সূঁচালো কাঁটার মতো উদ্যত । সেদিক ছাড়া পথ নেই । সেই পথে বেরোয় বুড়ী । সারাটা দেহ কঞ্চির তীক্ষ্ণ নখরে ফালা ফালা । কোন রকম নুইয়ে নুইয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে । হঠাৎ খুব কাছে বিকট চীৎকার সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন থর্ থর্ কেঁপে উঠে নিমেষে । পাশে একটা কুশবন । নিজেকে আড়াল করে সেখানে ঢুকে । একটা অর্দ্ধদগ্ধ বাছুর যন্ত্রণায় লেজ উঁচিয়ে প্রাণপণে দিশেহারা ছুটে । শিউরে উঠে বুড়ী । সারাটা দেহ অবশ । পা দুটি ভারী লাগছে, কে যেন জোর করে বাঁকিয়ে দিচ্ছে হাঁটুর জোড়া । থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ । সম্বিত ফিরে আসে । কোন দিকে এগোবে কুল কিনারা পায় না । বাঁশীর কোমল ঠোঁট থেকে নিঃসৃত উষ্ণ লালা বুড়ীর কাঁধ গলা ভিজায় । বাতাসে তীব্র শিস্ দিয়ে এক ঝাঁক তীর পূব থেকে পশ্চিমে যায় । আরেক ঝাঁক তীর পশ্চিম থেকে পূবে মিলায় । গলা উঁচিয়ে কপালে বলি রেখা ফুটিয়ে আতঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে চোখ আবার বুজে ।

শহরের পানে ছুটে । ছুটতে ছুটতে কিছুদূর গিয়ে মনে পড়ে কোলের শিশুটা ভিন জাতের । ওর বোঁচা নাক দেখে কেউ ছাড়বে না । ক্রুদ্ধ উন্মত্ত নরখাদকের চোখে পড়লে পায়ে ধরে ছুড়ে মারবে জ্বলন্ত আগুনে । বুড়ী বাঁশীর বোঁচা নাকটা চিমটি দিয়ে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে টানে । যন্ত্রণায় একবার চীৎকার করে বুড়ীর বুকে আবার লেপটে মিশে যায় । উন্মাদিনীর মতো বুড়ী

উল্টো দিকে পাহাড়ের দিকে ধায় । যেতে যেতে খচ্ খচ্ করে বুকটা । ওইখানে তার নিজের মৃত্যু নিশ্চিত । টাক্কালের মুখে কাঁধের উপর গলা থাকবে না । একূল ওকূল দুই কূলেই ভয় । হঠাৎ ভাবে যা হবার হবে । বাঁশীকে ফেলে যাবেই । নিজেকে নিজে নিষ্ঠুর পরামর্শে শক্ত করে বাঁধে । কোলটা একটু শিথিল হতেই বাঁশী খসে যাওয়ার ভয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুড়ীর গলা চেপে ধরে । ছোট হাতে যেমন এক দানবীয় শক্তি । বুড়ীর বুকের পাঁজরে যেন এক নিরাপদ খাঁচা । সেখানেই সে পায় বাঁচার রক্ষার দৃঢ় অথচ উষ্ণ আশ্বাস । এই কূল ওই কূল কোন কূলেই যাওয়া নিরাপদ নয় যাদের, তারা কোন্ পানে ধায় । বুড়ী ষাট বছরে অভিজ্ঞ মন তন্ন তন্ন করে সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না । হঠাৎ বুড়ী চমকে উঠে দুদিকের তীব্র টর্চের আলোতে । টর্চের আলো বলা ভুল, দুই দিকে দুই হিংস্র নেকড়ে বাহিনীর লোলুপ চাউনি । বুড়ী কুশবনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে ।

তিন দিন পরে পুলিশ কুশবনে খালের ধারে আবিষ্কার করলো দুটো মৃতদেহ । বুড়ীর বুক আলিঙ্গন আবদ্ধ পাহাড়ী শিশুটা । একটা বর্শায় একসাথে গেঁথে রয়েছে দুটি মানুষ ।

রাইমা উপত্যকার উপকথা

দুদিকে সমান্তরাল সবুজ পাহাড়ের সারি, মাঝে সরু আঁকা বাঁকা ছোট্ট একটি ছড়া, পাথরের নুড়ি, বাঁশের পাতা, ধারাল টুকরা ইত্যাদির উপর দিয়ে ঝির ঝির করে চলছে। অনেক বছর ধরে। পশ্চিমের পাহাড়ের উপত্যকায় দূরে দূরে কয়েকটি টংঘর, খুব জোরে ডাক দিয়ে এ বাড়ির মানুষ ও বাড়ির মানুষের সাথে কথা বলে। এই ছড়ার নাম গণ্ডাছড়া। ফিতের মত একটা সরু পথ এঁকে বেঁকে ছড়ার পাশ দিয়ে অনেক দূরে মিলে গেছে — রাইমা সরমা উপত্যকায়, শাল চামলের বনে।

ছড়ার উপর বাঁধ দিয়ে, পাথুরে গর্তে হাত ঢুকিয়ে ছোট চিংড়ি, পুটি, মাগুর, উপল মাছ, শামুক ধরে ধরে কোঁচাটা ভর্তি করে নিয়েছে বুদ্ধিরাম। সাথে গাঁয়ের অনেক ছেলে-মেয়ে, বুড়ি-বুড়ো। এক আঁটি বড় মৃত্তিঙ্গা বাঁশ কাঁধ থেকে নামিয়ে শিরীস গাছের নীচে একটুখানি জিরিয়ে নিতে বসল বুড়ো তক্কী রায়। বসে গড় গড় করে বাঁশের হুকোটা টেনে রাশ রাশ ধোঁয়া ছাড়ল। মাঝে মাঝে সে উপর থেকে খবরদারী করছে যারা মাছ ধরছে তাদের উপর। বুদ্ধিরাম হঠাৎ কাঁদা ছিটিয়ে পাশের মেয়েটাকে শুধু শুধু বিরক্ত করল। মেয়েটাও এক নাগাড়ে ককবরক ভাষায় অশ্লীল কতকগুলো গালি দিল, সাথে সাথে ঝিরঝিরে ছড়াটার বুকে ফেটে পড়ে সরল হাসির কলরোল। মেয়েটাও সাথে সাথে খিলখিল করে হেসে উঠল। মাঘের রোদ তখন শিরীস গাছের মাথায়। সকলে একে একে মাছ ধরা সেরে উঠে পড়ল নদীমাতা তুইমা দেবীকে প্রণাম জানিয়ে। কেউ কেউ দুটো মাছ দিয়ে তক্কী রায় বুড়োর কোঁচাটা ভরে দিল। আর কেনই বা দেবে না ? তক্কী রায়কে এই গাঁয়ের সবাই ভালবাসে। তক্কী রায় এই গাঁয়ের ছোট-বড়নারী-পুরুষ সবার আপনজন। জুমকাটার মরশুমে প্রখর রোদে আগুনে পোড়া পাহাড়ের ঢালুতে বসে জুমকাটার গল্প বুখুগনই বলে চলে। গভীর বনে চোখা চোখা বাঁশ দিয়ে হরিণ বাঘ মারার ফাঁদ তৈরী করতে তক্কী রায়ের নাম কারো কাছে অজানা নয়। শূকর শিকার করে বাজারে বিক্রি করার আগে গাঁয়ের সবাই একটু একটু করে ওর কাছ থেকে বিনে পয়সায় নিয়ে যায়। তক্কী রায় এই গাঁয়ের শক্তিমান পুরোনো বীর। আগে ওর বাড়ী ছিল খোয়াই মহকুমার পদ্মবিলে, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে পদ্মবিলের মানুষ তখন রাজার ঘরে বিনে পয়সায় মজুর খাটত। সেই কুৎসিত প্রথাকে 'তিতুন' প্রথা বলা হোত। এর বিরুদ্ধে গাঁয়ের মানুষদের জড়ো করে তীর ধনুক, চোখা বাঁশ, গাদা বন্দুক দিয়ে সে সামনাসামনি রাজার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। হাঁটুর নীচে এখনও বুলেটে ছেঁদার চিহ্ন আছে। বড় মৃত্তিঙ্গা বাঁশ টাক্কালের এক আঘাতে কাটার মত কবজির জোর একটুও কমেনি।

কয়েকদিন হোল গণ্ডাছড়ার রাস্তা পুল তৈরী করার জন্য ঠিকেদার বাবু এখানে ক্যাম্প করেছে। দশ পনের জন লোক জীপগাড়ী নিয়ে এখানে থাকে। ওরা আসার দু'দিন

পরেই পৌঁছে গেল ওদের কাঠের বড় বড় গুড়ি টানার জন্য একটা হাতী। এখানকার আদিবাসীরা প্রায়ই বুনো হাতীর দলের উৎপাতের সাথে পরিচিত। পালা হাতীও যে একেবারে দেখেনি তা নয়। এইত মাত্র বছর কয়েক আগে পাশের পাহাড়ে করিমগঞ্জের দুজন মহাজন চারটা পালা হাতী নিয়ে এখানে বুনোহাতী ধরার জন্য হাতীর খেদা করেছিল। এই গাঁয়ে লোক দিয়েই বনে আগুন ধরিয়ে বুনোহাতী তাড়া করে খোয়াড়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বাচ্চা বাচ্চা পাঁচটা বুনোহাতীকে পালাহাতী দিয়ে নিয়ে গেল। বুনো হাতীর মা গুলোর চীৎকারে বনটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু মহাজনরা লাভের লোভে গুলি করে দু-দটো বুনোহাতী মেরে দিতে ভ্রুক্ষেপই করেনি। এই গায়ের মানুষ হাতীর উৎপাত দেখেছে। আবার বুকফাটা কান্নাও শুনেছে। তবু হাতী দেখলে ভীড় করে। হাতী যতবারই দেখা যায় ততবারই নতুন মনে হয়।

তাই মাছ ধরে ফেরার পথে হাতীর পাশে ভীড় করে দাঁড়াল। এমন সময় ঠিকেদারের এজন বাবু বুদ্ধিরামকে ডেকে হঠাৎ ধমকে উঠল -- অ্যাই, তুই এখানে কাল সন্ধ্যে বেলা কেন এসেছিলি ? বুদ্ধিরাম ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল -- হাতী দেখতে ! বাবু হাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে বলল -- শুয়রের বাচ্চা, হাতী দেখতে না চাল চুরি করতে এসেছিলি ? বুদ্ধিরামের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বাইশ বছরের যুবক বুদ্ধিরাম নিরুপায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে দেখছে ! চালের কথা ও জানবে কি করে ? গরীব জুমচাষী হলেও কোনোদিন চুরি করার অপরাধ বোধ ওর মনে জন্মেনি। প্রচণ্ড খরা দুর্ভিক্ষের দিনেও বাঁশের করুল, বন-আলু সিদ্ধ খেয়ে, উপবাসে কিংবা আধা উপবাসে মা ছেলেতে মিলে গাঁয়ের আর দশ জনের মত দিন কাটিয়েছে। তাই বলেও কোনোদিন চুরি করতে বা ভিক্ষা করতে রাস্তায় বেরোয়নি। কুসুম বুদ্ধিরামকে ভাল করে চেনে। সে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে এগিয়ে এল। ঠিকেদার বলল -- শোন, এক ঘন্টার মধ্যে চাল যদি ফেরৎ না দাও তবে গোটা গ্রামের বিরুদ্ধে গণ্ডাছড়া বাজারে ফাঁড়ি থানায় কেস করব। কুসুম বুঝতে পারল এদের সাথে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। এদের আসলে চাল চুরি গেছে কিনা কেই-বা জানে ? তবুও ওরা চুরি হয়েছে বলছে, কেননা এটাই যথেষ্ট এই গাঁয়ের মানুষকে থানায় নিয়ে যেতে। এদের আর একবার অভিজ্ঞতা হয়েছে আরেক ঠিকেদারকে ঘরে তৈরী লাঙ্গি বা চালের মদ বিনে পয়সায় দিতে অরাজী হওয়ায় এই গাঁয়েরই পূর্ণমোহনকে ফরেষ্টার দিয়ে কেস করে শুধু শুধু ধরে নিয়ে গিয়ে খুব চাবুক মেরেছিল। তাই কুসুম ভয়ে বলল -- বাবু আপনাদের কত কেজি চাল চুরি গেছে বলুন। আমরা গাঁয়ের লোক সবাই মিলে চাঁদা করে এনে দেব। এই বোকা ছোকরাটাকে ছেড়ে দিন ! বাবু রাজী হয়ে বলল -- ঠিক আছে আমার চার কজি চাল এক্ষুণি নিয়ে এসো। আর চাল এখানে পৌঁছলে ওকে ছেড়ে দেব।

কুসুম ওখানে বসেই কয়েকটা ছোকরাকে চাল আনতে পাঠিয়ে দিল একটা বাঁশের পিঠে ঝোলানো ঝুড়ি 'বেম' দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঘরে কাড়া আকাড়া চাল চাঁদা তুলে

ছেলেগুলো ফিরে এল, আর বুদ্ধিরামও ছাড়া পেল।

এমন সময় তক্‌কী রায় ছড়াতে পায়খানা সেরে বাঁশের আটি নিয়ে আসছে। এসে সব ঘটনা শুনে রাগে তার চোখ মুখ লাল হোল। কুসুমকে সে যা ইচ্ছে তাই বলে ধমকাল আর ঠিকেদারকে শাসিয়ে দিয়ে বলল-- বাবু, তোমরা বোকা সরল পাহাড়ী পেয়ে যা ইচেছ তাই করছ। তবে মনে রেখো চার কেজি চালের জন্য চার মণ চালের ক্ষতি করে ছাড়ব। ঠিকেদারও মুখ ভেঙচিয়ে বলল -- যা, যা ইচ্ছা কর গিয়ে।

মাঘ মাসের সন্ধ্যা। কনকনে শীত, একটু একটু হাওয়া। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, আর এই ঠাণ্ডাতেই তক্‌কী রায়ের টং ঘরে বসল গাঁয়ের মোড়ল, যুবক, সবাই।

মাটির কলস থেকে বাঁশের চোঙা করে সবাইকে একটু একটু করে লাঙ্গি মদ ঢেলে দিতে দিতে তক্‌কী রায় বলল -- আজকে আমি সবাইকে ডেকেছি কেন জান? অবশ্য কুসুম ব্যাপারটার আঁচ করতে পেরেছে। টংঘরের মাচার ওপর এক বিঘা উঁচু মাটির প্রশস্ত স্তরের উপরের চাল থেকে কালি ঝুলিতে ভরা বেতের ঝুড়ি, ফাঁক ফাঁক ঝুড়িতে শূয়োরের মাংস। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। চারপাশে সবাই জড়োসড়ো হয়ে বসে। কারও গায়ে নিজের হাতে বোনা ধূসর, ময়লা রঙের কার্পাস সূতার মোটা চাদর। এদের মধ্যে গাঁয়ের মহিলাও কয়েকজন আছে।

কুসুম একটা কাঠের মুড়া আগুনে ঠেলে দিয়ে জবাব দিল -- দেখ খুড়ো জানি তুমি আজকে আমায় বকুনি দেবে। কিন্তু কি করব, আস্তা গাঁয়ের ওপর একটা জুলুম হবে।

থাম থাম আর বলতে হবেনা -- তক্‌কী রায় বলতে শুরু করতে ওর বৌ মোহিনী পিঠের বাচ্চাটার মুখে বুকের স্তন বদলে বলল -- আগে সবাই মিলে জিজ্ঞেস কর বুদ্ধিরাম চুরি করছে কিনা। তারপর কুসুমকে কি বলতে হয় বল। কুসুম সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলছি। ওদিকে বুদ্ধিরাম চোঙ্গের লাঙ্গি কয়েক চুমুক সেরে ফেলল। সে এই কথা শুনে হুকোর গড়গড়ানি হঠাৎ থামিয়ে বলল -- তোমরা বল, আমি কি দিয়ে দিব্যি করব ? ওরা বলছে আমি চুরি করেছি। কিন্তু সন্ধ্যার সময় শুয়োরগুলো টং এর নীচে ঢুকিয়েই আমি ও বাড়ীর রূপিনীর ছোট ভাই কামবন্ধুর জন্য এক জোড়া মুলি বাঁশের খড়ম তৈরী করছিলাম। রূপিনীর মাও সেখানে আগুনের পাশে। সেও ঢুকে গেল কথার মধ্যে, আমি ওকে সারা সন্ধ্যা আমাদের ঘরে বসিয়ে পান তামাক খাইয়েছি। তখন ও ক্যাম্পে গিয়ে কি করে চুরি করবে ?

এই গাঁয়েরই আরেকটা বুড়ী কোমরে, পিঠে আগুনের চড়চড়ে তাপ লাগানো চামড়ায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল -- তুই তো বলবি। তোর মেয়ের পিরিতে পড়েছে তো ছোকরাটা। ওকে তুই দোষ দিবি না। আস্তা গাঁয়ের মানুষের অপমানটা তুমি চিন্তা করেছ ? বাবুরা ভাল বা খারাপ যাই হোক অন্তত ওরা বলবে পাহাড়ী লোকেরা চোর।

আরেকজন মধ্য বয়সী বুড়ো পোড়া তামাকের কলকেতে ফুঁ দিয়ে ছাই ওড়াতে ওড়াতে বলে -- তক্কী খুড়ো, কাল সন্ধ্যেবেলা বাবুদের একজন লোক আমার কাছে চাল বিক্রি করবে বলেছে । কিন্তু আমি রাজি হইনি, কারণ সে চাল খাসা চাল । বাবুরা খাবে, আমরা আর ঐ চাল দিয়ে কি করব ? তক্কী রায় বলে উঠল -- এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি । তার কথায় জোর পেয়ে বুদ্ধিরাম প্রায় লাফিয়ে উঠল -- আমি পাহাড় দেবতা সংগ্রমার দিব্যি করে বলতে পারি আমি চুরি করিনি । আর যদি চুরি করে থাকি তবে ভোরে মোরগ ডাকার আগেই যেন সংগ্রমা আমায় মেরে ফেলে ।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে গম্ভীর কণ্ঠে তক্কী রায় বলতে শুরু করল -- দেখ কুসুম তোমাকে দোষ দিয়েও লাভ নেই । সত্যকে মিথ্যা বানাতে এ বাবুদের জুড়ি নেই । ওরা আমাদের পাহাড়ীদের ঠকিয়ে বাবু বনেছে । জুমকাটা আইন করে বন্ধ করেছে । পাহাড়ের শুকনো লাকড়ি আনতে গেলে ওদেরকে মাশুল দিতে হয়। যখন খুশি লাঙ্গি তৈরী করতেও আমরা পারি না । তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ চাম্পাহাওরের লোকেরা গত বছর জুমদেবতা বুড়াছার পূজায় মাত্র কয়েক কলস লাঙ্গি তৈরী করেছিল । সেই নিয়ে কত জলুম, কেইস, ধরপাকড় করে গ্রামটাকে ঘর ছাড়া করেছে । এই দিকে পুল, রাস্তা তৈরী করতে আসছ, হয়তো কোনদিন দেখবে আমাদের গণ্ডাছড়ার রাইমা সরমার পাহাড়ীদের তাড়িয়ে দেবে । কার্পাস তুলা, ফিরীন পাট নামমাত্র পয়সা দিয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে । এমন দিন আসবে নিজের ফসলের কার্পাস দিয়ে নিজের শীতের চাদর, জামা তৈরী করতে দেবে না । আমাদের নেংটা হয়ে তাদের দরজায় ঘুরতে হবে -- এইটে তারা চায় । পদ্মবিলের রাজা যা চেয়েছিল, আজকে বাবুরাও তাই এখানে করতে চাইছে । গোলাঘাটির পাহাড়ীদের ধান ওরা পুলিশ দিয়ে লুঠ করে নিয়েছে । তবু ঐসব জায়গায় পাহাড়ীরা বুক ফুলিয়ে চলছে কেন জান ? ওদের একতা আছে, ওরা কখনও রাজার কাছে মাথা নত করেনি । আর বাবুদের কাছেও করবে না ।

লাঙ্গির চোঙে ও এক চুমুক টেনে ঢেঁকুর দিয়ে বলতে লাগল -- তোমরা যদি মাথা নত না করে ধারালো টাক্কল দিয়ে গলা কাটলেও ওদের কাছে মাথা নত করবে না বলে প্রতিজ্ঞা কর তাহলে এরা ভয় করবে তোমাদের ।

কুসুম বলছে ওরা নাকি আমাদের থানায় নিয়ে যেত । যাক্‌না নিয়ে, -- বুড়া বুড়ি কাচ্চাবাচ্চা, মোরগ, শূয়োর, নিয়ে আমরা সবাই থানাতে যাব । দেখা যাক্ কতদিন গ্রেপ্তার করে রাখে । আমাদের মধ্যে যত ঝগড়াই থাক তবু বিপদ আপদের সময় আমরা এক হয়ে চলব ।

দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের আলোয় পাহাড়ী মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল টিকে থাকার আশায় । রাত্রি প্রায় অনেক হোল । পাশের বনে হরিণের ডাক শোনা যায় । সকলের

হাতে এক এক মুঠো লাকড়ির আগুন নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নিঝুম বনের দিকে, নিজ নিজ টংঘরে ।

কয়েকটা বছর দেখতে দেখতে চলে গেল ।

এখন এ গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে জীপ গাড়ী যাওয়া আসা করে । মাইল দু-এক দূরের বাজারে নতুন মহাজনরা এসে গদি পেতেছে । আগের মত আর যেখানে সেখানে গরু মোষ চরানো যায় না । রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় চৌহদ্দি বেড়ে গাঁয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কাঁটা তারের বেড়া । ফরেষ্ট এলাকায় আবার সরকারী খোয়াড় । এই খোয়াড়ে গরু, মোষ পড়লেই এক একটার জন্য জরিমানা পাঁচ টাকা, অন্য খোয়াড়ে পড়লে আড়াই টাকা । এখন এই গাঁয়ের লোকেরা এক সাথে গাঁয়ের সব গরু, মোষ জড়ো করে রাখালি করে । গত বাজারবারে ছিল বুদ্ধিরামের পালা । গরু চরাতে গিয়ে কখন যে শিরীস গাছের ছায়ায় ঝিমিয়ে পড়েছে জানে না, সেই ফাঁকে গরু দুটো গার্ডের হাতে ধরা পড়ে, গরু দুটো আবার কুসুমের ছিল । কুসুমেরও ঠিক নয় । বাজারের রসিক মহাজন মাসিক দু টাকা দরে কুসুমের কাছে রাখালি দিয়েছে । কুসুম খবর পেয়েই মহাজনকে জানিয়েছে । মহাজন দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলল -- এই টাকা কিন্তু আগামী পৌষ মাসে একমণ ধান দিয়ে শোধ করবি, আর না হলে তহশীলদারকে দিয়ে ক্রোকের নোটিশ পাঠাব । কুসুমের করার কিছুই ছিল না । গরুর রাখালির জন্য আনার সময় সে একটা সাদা কাগজে দস্তখত করেছে । সেইটা নিয়ে কি বিপদে ফেলবে কে জানে ।

তাই ভাবতে ভাবতে খোঁয়াড়ে এল গরু ছাড়িয়ে নিতে । গরু খোঁয়াড়ে থাকবে সে ব্যথা ও সহ্য করতে পারেনি । গরু অন্যের হলে কি হবে, ওদের ওপর যে কুসুমের একটা গভীর ভালবাসা জন্মে গেছে । ও দুটোকে খোঁয়াড়ের কাঁটা তারের ভিতর রেখে কুসুম কি করে ঘুমোবে, ঘুম যে আসবে না । তাই এত চড়া সুদেও গরু দুটোকে খোয়াড় থেকে ছাড়িয়ে নিল ।

পরদিন ভোরে তক্কী রায় শিরীস গাছে নীচে বসে কচি বাঁশের বেত তৈরী করছে । কুসুম একটা পিঠে ঝোলানো বেতের ঝুড়ি বেম নিয়ে বাঁশের করুল আনতে যাওয়ার পথে তক্কী রায়ের সঙ্গে দেখা । তক্কী রায় আগেই সব জেনে গিয়েছে । রাত্রিবেলা ওর বৌ চরকি দিয়ে কার্পাস তুলোর বীজ ছাড়াতে ছাড়াতে সব বলেছে । তক্কী রায়কে দেখেই কুসুম হিমসিম খেয়ে গেল । মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল -- খুড়ো, রাগ করেছো ?

তক্কী রায় বেতের দিকেই চোখ রেখে বলল -- দূর বেজন্মা দূর হ এখান থেকে । যা তোর রসিক মহাজনের কাছে গিয়ে বৌকে বন্ধক দিয়ে আয় ।

-- খুড়ো, আমি ঋণ করে গরু ছাড়িয়ে না আনলে যে খোয়াড়ে থেকে আমায় অভিশাপ দেবে ।

কুসুমের এই কথায় তক্কী রায়ের রাগ কিছুটা কমে গেল । ও বলল - দেখ্, আমি বুঝি তোর গরু দুটোকে ভালবাসি না । কিন্তু গরু তুই না আনলে এমনি মহাজন নিয়ে আসত । তুই ঋণ করতে গেলি কেন ? সেটাই তো তোর দোষ ।

কুসুম বুঝতে পারে, গরু দুটোকে সে যতই ভালবাসুক না কেন ওদের আসল মালিক রসিক মহাজন । সে এই ভেবে চুপ করে রইল ।

বেত তৈরী করতে করতে তক্কী রায় বলল -- বাজারের পাশে কাল কি দেখলি ? তোর বাবারা এসে গেছে । ওরা ভালোর জন্য আসেনি, আমাদের উৎখাত করতে এসেছে ।

কুসুম আস্তে আস্তে বসে পড়ল -- কই খুড়ো, আমি তো কিছুই দেখিনি -- দেখবে কি করে, ওদের দিকে তুমি যাওয়ার সময় পেলেত যেতে । তোমার রসিক মহাজনের ধমক শোনার জন্য গিয়েছ । ওরা সি আর পি এনেছে । মনে আছে কয়েক বছর আগে অমরপুরে করবুকের শালবাগানে পাহাড়ী পিটাতে যাদেরকে আনা হয়েছিল, ওদেরকেই আবার এখানে নিয়ে এসেছে । তোর সম্বন্ধি চরণ ওদের ভাল করে চেনে । চরণের পিঠে এখনও এদের লাঠির দাগ কালো হয়ে আছে । জানিস ওরা কেন ওকে মেরেছে ? এখানকার মতই ফরেষ্ট এলাকার চৌহদ্দি ওখানে বাড়িয়ে দিয়েছিল । পাহাড়ীদের ওরা বলেছিল, তোমরা দুদিনের মধ্যে এখান থেকে হটে যাও । ওরা রাজী হয়নি তাই ওদের গ্রামের বাড়ীঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল । চরণের মা নব্বুই বছরের বুড়ী । সেই বুড়ির মেরুদণ্ড লাঠি দিয়ে ভেঙ্গেছিল । কয়েক মাস বাদেই বুড়ীটা মারা যায় । ওই গাঁয়ের লোকেরাও কম সাহসী নয় । এত অত্যাচারের পরও ওরা গাঁ ছেড়ে চলে যায়নি, উপরন্তু ওরা দল বেঁধে ফরেষ্টারদের বড় কর্তাকে দু'দিন আটকে রেখেছিল ।

তারপর কি হলো খুড়ো -- কুসুম সুধায় ।

-- দাঁড়া বলছি । বাঁশটা কেটে নিই । লম্বা একটা কচি বাঁশ মাঝখান দিয়ে দুভাগ করে টুকরো করল ।

তারপর ওই ফরেষ্টাররা বাধ্য হয়ে আগের জায়গায় তারকাঁটার বেড়াটা সরিয়ে নিল । সে কি জবরদস্ত লড়াই । দুজন পুলিশ একেবারে জখম হয়েছিল । হাসপাতালের গাড়ী না আসলে ওরা মরে যেত ।

এমন সময় বুদ্ধিরামকে দেখা গেল বাজারের একটা বাঙালী বাবুকে নিয়ে উঁচু টিলা থেকে নামছে ; কুসুম ঐদিকে দেখিয়ে বলল -- খুঁড়ো, ওই বাবুটা আবার এদিকে আসছে কেন ?

বাবু বুদ্ধিরামকে নিয়ে কাছে এল ।

বাবুকে দেখে তক্কী রায় মুখটা কাচুমাচু করে বলল -- কি বাবু, শহরের মানুষ কি

মনে করে এই পাহাড়ী জন্তুদের কাছে এলেন ?

পড়াশোনা না জানলেও এটা বোঝা গেল বাবু একটা নামের তালিকা পড়লেন । এই তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের সবাইকে আগামী সাতদিনের মধ্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে । কারণ এদের ঘরবাড়ী নাকি সরকারী খাস এলাকার মধ্যে পড়েছে । এই সরকারী এলাকায় বাবুদের আপিস হবে । সেই বিদ্যুৎ অপিসের বাবুদের থাকার জন্যই এই এলাকার মানুষকে সাতদিনের মধ্যে চলে যেতে হবে ।

যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল । কুসুম বেতের বেমটা পিঠে ঝুলিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলো -- খুড়ো, তুমি এতক্ষণ যা বললে তাই কি হতে চলেছে ?

তক্কী রায় হাতে টাক্কল-দাটা নিয়ে কোমড় ধরে দাঁড়াল । গাঁয়ের কতকগুলো দশ বারো বছরের ছেলে নেংটা হয়ে দৌঁড়াদৌড়ি করে আসছিল । রাস্তার ধূলোর উপর গাড়ীর টায়ারের দাগগুলো মুছতে মুছতে ধূলো উড়িয়ে এখানে এসে থম্‌কে গেল । শহরের বাবু এসেছেন দেখার বড় কৌতূহল, তিনি কি বলেন কে জানে ।

তক্কী রায়ের ঠোঁট কাঁপছে । হাঁটু দুটোও রাগে থর থর করে কাঁপছে । তার গলাটা শুকিয়ে গেল, কয়েকবার ঢোঁক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করল । তারপর খুব নম্রভাবে বলতে শুরু করল -- বাবু সবকিছু আমরা ছেড়ে দিয়ে চলছি । বনে লাকড়ি আনা তোমরা বন্ধ করে দিয়েছ । জুমকাটাও শেষ করেছ । এতেও কি তোমরা সন্তুষ্ট নও ? এই বোকা পাহাড়ীদের ঘরছাড়া না করলেই কি চলে না ?

বাবু একটা ঘাসের শিষ ছিড়ে দাঁত খোচাতে খোচাতে বলল -- আমি কি করব ? উপরঅলার হুকুম । আমি তো আর নিজের ইচ্ছায় নোটিশ দিতে আসিনি ।

তক্কী রায় একবার ঠোঁটটা কামড়ে বলল -- যাও, তোমার উপরঅলাকে বল আমরা আমাদের চোদ্দ পুরষের ভিটে ছাড়ব না । আরও বলে দিও যে তোমাদের ওই নোটিশ আমার মানি না ।

বাবুটা বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে বলল -- বাজে কথা কেন বলছ, সরকারী আদেশ অমান্য করলে কি ফল হবে জান ? পুলিশ দিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করব ।

তক্কী রায় ছোঁ মেরে বাবুর কাগজটা ছিনিয়ে নিল, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে থুথু দিয়ে ফেলে দিল । বাবুটা রাগে কটমট করে বলতে বলতে চলে গেল -- জংলী জানোয়ার তোমাদের পোষ মানাতে এক কোম্পানীর বেশী সি আর পি লাগবে না ।

তক্কী রাম বুদ্ধিরামকে বলল -- যাও, এক্ষুণি গাঁয়ের সবাইকে কুসুমের ঘরে ডেকে নিয়ে এসো । দেখলে তো কি ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে ।

বুদ্ধিরাম চলে গেল ।

অনেকদূরে বুদ্ধিরামের হাঁকডাক পাহাড়ের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়ে তক্‌কী রায়ের কানে এলো । সবাই চলে গেলে তক্‌কী রায় ছোট্ট ঝির ঝিরে ছড়াটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল । তার মনে হলো যেন সারা পাহাড়ী মানুষগুলোর চোখের জল কত নীরবে এই ছড়ার মৃদু স্রোতের সাথে চলেছে । এই গাছ কত পুরুষ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, একেও বুঝি ছাড়তে হবে । মানুষগুলো কোথায় যাবে এই বনভূমির বুক থেকে । এই বানর পাখী, গাছের পাতা, এই ছড়ার নুড়ি পাথর সবই রাইমা উপত্যকার উপকথা মানুষগুলোর বুকের স্পন্দনের সাথে স্পন্দিত হয়ে ওঠে । চোখে জল আসছে -- কি জানি কে কোথায় হারিয়ে যাবে । তক্‌কী রায় চোখ মুছল বুকের গোপন কষ্টটাকে থামিয়ে খুব দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ভাবল -- না যেমন করেই হোক এই ভাঙ্গন সে রুখবেই । মানুষগুলোকে জড়ো করে টিকে থাকার জন্য একটা প্রচণ্ড লড়াই সে করবেই করবে ।

এই রাইমা সরমা উপত্যকার কিছু দূরে একটা জলপ্রপাত আছে । প্রতি বছর সংক্রান্তির পুণ্য দিনে পাহাড়ীরা দলে দলে নেমে আসে এই পুণ্যতীর্থে স্নান করতে । এই স্নিগ্ধ উপত্যকায় মেলা বসত । আবার পুণ্য দিনের বিদায়ে এই উপত্যকায় মানুষ ফিরে যেত সবুজ বনের ময়না টিয়া কূজনে, স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে । আজ কয়েক বছর ধরে এখানে বাবুরা আসছেন । বড় বড় গাড়ী আসছে । লোহা, লক্কড় ইট দিয়ে তৈরী হচ্ছে বড় বড় নতুন নমুনার বাড়ী । শাল, শিরীসের চেয়েও উচ্চ লম্বা লম্বা লোহার থাম তার কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছে । এখানে জমি কেনার জন্য দেশবিদেশের মহাজন, দোকানদারদের ভিড় । মাঘের শিশিরে ভেজা সবুজ বনে রাত্রিবেলায় জ্যোৎস্না যেখানে মুক্তো ছড়াত, সেখানে আজ কৃত্রিম আলোর রোশনাই । সরল পাহাড়ী মানুষগুলো তাড়া খেয়ে উপত্যকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে । আর তার পরিবর্তে আসছে কৃত্রিম আলোর রোশনাইয়ের মতই নকল মানুষ ।

তক্‌কী বাড়ীতে নেই । সেই দিনের বাবু আসার পরই পাহাড়ে উপত্যকায়, গ্রামে দু-জন যুবককে সাথে নিয়ে চলে গেছে । উৎখাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরে চলছে । কলোনীর ভূমিহীন বাঙালীরাও বলেছে বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াবে । ওই কলোনীতে ঘোরার সময় দু-জন লেখাপড়া জানা ছাত্র খুব সাহায্য করেছে, লোকজন ডেকে দিয়েছে । তাদের এই উৎসাহ দেখে বীরমান তক্‌কী রায়কে জিজ্ঞেস করল -- খুড়ো এই বাবু দুজন বাঙালী হলেও আমার খুব ভাল লেগেছে । তক্‌কী রায় হাসতে হাসতে বলল -- ওরে বোকা, মানুষকে যারা ভালবাসে তারা বাঙালী, পাহাড়ী ভেদাভেদ করে নাকি ?

এই দুজন বাঙালী নিজেরাই অন্য বাঙালী গ্রামে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ীদের উৎখাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য না খেয়ে না ঘুমিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে । বীরমান, চন্দ্রমণি দুজনে নতুন বাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে বলাবলি করছে -- ওরা আমাদের কোনো মতেই উৎখাত করতে পারবে না, কি বলিস চন্দ্রমণি ? চন্দ্রমণি একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দিল --

দেখলি, সব গাঁয়ের লোকেই এক কথা বলছে, একতা হয়ে লড়াই করলে কেউ আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারবে না । পেছনে পেছনে কথাগুলো শুনতে শুনতে তক্কী রায়ের বুক উচ্ছ্বাসে উদ্দীপনায় ফুটে উঠছে । নতুন জোর, নতুন আশায় বিছিয়ে দিচ্ছে সামনের উজ্জ্বল পথটা ।

তক্কী রায় ঘরে ফেরেনি সেদিন । মাঘের চঞ্চল সূর্য লুকোচুরি খেলার মত রক্তিম আলো ছড়িয়ে লুকিয়ে গেল পশ্চিমের চামল গাছের বনে । গাছে গাছে নীড়ে ফেরা পাখীদের কাকলী । বনের শুকনো পাতার মর্মরে শেয়ালের আনাগোনা শুরু হয়েছে । পাহাড়ী গেরস্থরা শূয়র, মোরগ, ঢুকিয়ে দিল টংঘরের মাচার নীচে ।

পাহাড়ী মেয়েরা মিট্‌মিটে বাতি জ্বেলে দিল টং-এ টং-এ । বুদ্ধিরাম রূপিনী ঘরে বসে তামাক টানছে । এমন সময় হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল কুসুমের বাড়ীর দিক থেকে । বুদ্ধিরাম ঝটিতি বেরিয়ে পড়ল । "বাঁচাও বাঁচাও" একটা চীৎকার সে স্পষ্ট শুনতে পেল । বাইরে আসতেই দেখে টং-এর চারপাশ সি আর পি দিয়ে ঘেরাও । বেরুবার মত কোনো পথ নেই, সব বাড়ীতেই চাপা চীৎকার । রাত্রের অন্ধকারে চারিদিকে অসংখ্য টর্চের আলো, গোটা উপত্যকাটা সি আর পি-র অসংখ্য বুটের ভারে কাঁপছে । দূরের রাস্তা দিয়ে এক এক করে আসছে অনেকগুলো সি আর পির গাড়ীর লাইন ।

রূপিনী, রূপিনীর মা, কামবন্ধু, ওর বুড়ো বাপ সবাইকে ওরা টেনে হিঁচড়ে বাইরে আনছে -- উপত্যকার নীচে । বুদ্ধিরামকে ওরা গলা ধাক্কা দিয়ে লাথি মেরে বের করে দিচ্ছে । এই সব নিষিদ্ধ বাড়ী-ঘরে থাকা চলবে না, এখনই ছাড়তে হবে । কুসুমের বৌ মাত্র কয়েকদিন হলো একটা সন্তান পেয়েছে । এই সন্তানের নাভি এখনও শুকোয়নি । প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে কুসুমের বৌকেও বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো । সমস্ত গাঁয়ের মানুষ আস্তে আস্তে শিরীস গাছের নীচে জমা হতে শুরু করল । গায়ের বাড়ীগুলোতে সি আর পিরা দিল আগুন ধরিয়ে । মোরগ, শুকরগুলো এখনও টং-এর নীচে । আগুন ঝলসে ঝলসে শূকর মোরগগুলোর একসাথে বনকাঁপানো চীৎকার আর মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ । আগুনের ঝলকানিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঘরগুলি মড় মড় করে পড়ছে । চালের ওপর সবুজ লাউগুলো মড়ার মত ঝিমিয়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে । পাশের সবুজ কলাপাতাগুলো আর সতেজ হয়ে থাকতে পারছে না । গরু, মহিষগুলো দড়ি ছিঁড়ে পালাবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছে । ওদের সকলের এত গভীর কষ্ট কেউ কখনো অনুমান করতেও পারেনি ।

চন্দ্রমুনির বৌ-এর ভারী পেট সামনের ফাগুন মাসে খালাস হওয়ার কথা । সি আর পি-র বুটের লাথিতে তার প্রচণ্ড বেদনা হচ্ছে । চন্দ্রমুনির মা কোনমতে ওকে জড়িয়ে ধরে শিরীস গাছের নীচে নিয়ে আসছে । গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যারা এতদিন বাঁদর তাড়িয়ে খেলত, আজকে তারা দেখছে সি আর পিদের মানুষ তাড়ানোর খেলা । খোলা

আকাশের নীচে সকলে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। জামাকাপড় তারা কেউ সাথে করে আনতে পারেনি। তাড়াহুড়োর মধ্যে কেউ একটা বেতের ঝুড়ি, কেউ একটা টাক্কল আবার কেউবা এক টুকরো ছেঁড়া কার্পাসের কাপড় নিয়ে আসছে। বুদ্ধিরাম মুখটা কাঁচুমাচু করে জলন্ত গ্রামটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কাঁদছে। এমন সময় ও দেখতে পেল কুসুমের একটা লেজ পোড়া, পিঠের চামড়া ঝলসে যাওয়া গরু ডাকতে ডাকতে এইদিকে আসছে। কুসুম ভাই, ও কুসুম ভাই, তোমার একটা গরু এসেছে -- চীৎকার করে জানিয়ে দিল বুদ্ধিরাম। কুসুম ছুটে এসে দেখল সেই গরুটা, যেটা মূলতঃ রসিক মহাজনের -- মাত্র ছদিন আগে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল।

সকলে বলাবলি করছে -- তক্‌কী রায়, বীরমান, চন্দ্রমুণি আজকে ফিরবে। দূরের পাহাড়ের দিক অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে গাঁয়ের মানুষ। আগুনের আলোতে পাহাড়ী রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। ঐ দিক থেকেই আসবে গাঁয়ের সেই আপন মানুষটা যে এই সব দিশেহারা ছিন্নমূল মানুষের পথ বাতলে দেবে।

চন্দ্রমুনি, বীরমান, তক্‌কী রায়, খুব জোরে পা ফেলে হাঁটছে। রাত শেষ হলেই উৎপাত শুরু হবে। যে কোন মূল্যেই আজ রাতের মধ্যে তাদের পৌঁছতে হবে। হাঁটার পথে পা ফেলে আসছে রাতজাগা পাখীর ডাক, হরিণ শিশুর বন কাঁপানো চীৎকার, উৎরাই চড়াই। আকাশে গভীর তারাদের নিষ্পলক দৃষ্টি। এসবের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের ভয় আর তার চেয়েও বড় ভয় কখন সূর্য ওঠে।

ওরা যখন গাঁয়ের কাছে এল তখন রাত প্রায় ভোর হয় হয়। গোটা উপত্যকা জুড়ে টং-এর শক্ত কয়েকটা কাঠের খুঁটি মাঝে মাঝে জ্বলছে। তার নীচে জ্বলন্ত বাঁশ, কয়লা, আর তার পাশে মানুষ খেকো সি আর পিরা মাতাল হয়ে আগুন পোহাচ্ছে। সম্বিত হারিয়ে চন্দ্রমুনি বসে পড়ল, বীরমান কাঁদতে লাগল চীৎকার করে আর তক্‌কী রায় কোমর ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। সে ভেঙ্গে পড়ল না, বরং প্রতিশোধের উত্তাপে তার দেহের ধমনীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল। শেষ পর্যন্ত এই হলো, বলেই সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল আর বলল -- চল, গাঁয়ের মানুষদের তো খুঁজে বের করতে হবে।

শিরীস গাছের নীচে ওরা আসতেই ঝিরঝিরে ছড়াটার পাশে উঠল কান্নার রোল। সবাই তক্‌কী রায়কে আঁকড়ে ধরে কাঁদছে -- কার কথা কে আগে তক্‌কী রায়কে শোনাবে। তক্‌কী রায় বলল -- দেখ, এখন সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চল অমরপুরের শহরের দিকে। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। পুলিশরা আমাদের রাস্তায় বাধা দিতে পারে, পেটাতে পারে এমন কি গুলি করেও আমাদের যাওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। তবু আমাদের ছুটে যেতেই হবে। আমরা শহরের আফিস, আদালত অবরোধ করে এর প্রতিবাদ জানাবো। আবার আমরা একদিন এই গাঁয়ে ফিরব, জ্বলে যাক সব কিছু, তবু আমরা নতুন করে বাঁচবো, আবার টংঘর নতুন করে বাঁধবো, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে

আমরা মাথা তুলে দাঁড়াবোই ।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা অনেক ঝক্‌ঝকে তারার মত পাহাড়ী মানুষগুলোর অনেক জোড়া চোখ উজ্জ্বল হয়ে এল । সবাই উঠে দাঁড়ায় । কেউ বেতের ঝুড়ি পিঠে বাচ্চা ঝোলায় । কামবন্ধু খেলার সাথী রণপা খেলার খড়ম জোড়া নিতে ভোলেনি । রূপিনীর হাতে মাছ ধরার ঝুড়ির সাথে একটা কাপড় বোনার যন্ত্র । যে যার আসবাবপত্র হাতে তুলে নেয় । ঝলসে যাওয়া দু-একটা গরু, মোষ শূয়র, মোরগও চলল বিধ্বস্ত অর্দ্ধদগ্ধ গ্রামের মানুষের সাথে ।

শিরীস গাছের নীচে গর্ভিনী বৌ সি আর পি-র লাথি খেয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল । তক্‌কী রায়ের কথা শুনে যেন তার সমস্ত বেদনার উপশম হয়েছে । যে শিশু এখনও অভূমিষ্ঠ তারই কথা চিন্তা করে গোঙাতে গোঙাতে বলে -- তক্‌কী খুড়ো একটু দাঁড়াও, আমিও যাব । কাপড়টা ঠিক করেনি ; ধনুকের মতো বাঁকানো একটা বুড়ি, বুকের ঢেউ খেলানো পাজরটা কুচকানো চামড়ায় ঢাকা । বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁপানো গলায় সে বলে -- তক্‌কী, সবাই যখন যায়, আমাকে এখানে একা ফেলে যেও না । আমিও হাঁটিতে পারব । আমাকে যেতে দাও । তক্‌কী রায়ের বুকটা উচ্ছ্বাসে ফুলে ওঠে, চোখে ছলছল অনন্দাশ্রু ।

বীরমান শক্ত মুঠিতে ঝকঝকে একটা টাক্কালদা চেপে ধরে চীৎকার করে ওঠে -- জয়, খুড়ো তক্‌কী রায়ের জয়, জয় রাইমা উপত্যকার মানুষের জয় । উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ শিশুরা একসাথে চীৎকার করে ওঠে । পাহাড়ী উপত্যকায়, উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়, জয় তক্‌কী খুড়োর জয়, জয় রাইমা উপত্যকার মানুষের জয় ।

ভোরের আকাশে নবজাতকের লাল রং । চামল বনে ঝাঁক ঝাঁক পাখী উড়ছে, চলন্ত গ্রামটা পাহাড়ী পথে বাঁকে মিলিয়ে গেল ।

দগ্ধ জনহীন গাঁয়ের পাশে রইল শিশির ধোঁয়া, আকাশ ছোঁয়া স্তব্ধ শিরীস গাছটা, আর নুড়ি পাথর বাঁশ কাঠের ওপর দিয়ে অনেক বছর ধরে বয়ে চলা গণ্ডাছড়ার কুলকুলে সুরেলা স্রোত । এ সবই থাকবে তেমনি নিখুঁত, অক্ষত । ছিন্নমূল মানুষগুলো আবার টং বাঁধবে । উপত্যকায় আবার বুখুগণই গল্পের গুঞ্জন উঠবে । টং-এ টং-এ আবার টিয়া ময়নার গানের সাথে পাহাড়ী মানুষের স্নিগ্ধ জীবনের কল্লোল উঠবেই । সবাই রইল তারই অধীর অপেক্ষায় ।

মনাইহাম

জৈনহাম রোজকার মতো ভোরবেলা বেরোয় । মাথায় গামছার পাগড়ি, হাতে টাক্কাল, গায়ের কুতাই কাঁধে । কুতাই হলো হাতে কাটা সূতোর জামা । আজকে হাতে আবার একটা পিঞ্জুরাও আছে । পরণের গামছা হাঁটুর উপর উঠানো । সঙ্গে সব সময়ের সাথী চার কিশোর বালক । রণই, তারণজয়, থাইথাহা আর রোগা ছিপছিপে দুর্বাজয় । ব্যস্ত চলা দেখে মনে হবে রাজ্যের কত কাজ ওদের মাথায় । গ্রামের টিলা থেকে বাঁদিকে সোজা নামে কুকীছড়ায় । পশ্চিম থেকে ঝকঝকে নীল জলের রেখা এঁকে বেঁকে পূবের দিকে ধায় । ছড়ার বুক জুড়ে ঠাসাঠাসি চাপাচাপি দ্বীপের মতো বিরাট বিরাট পাথর । চঞ্চলা কোন পাহাড়ী বালিকার গলায় যেন পাথুরে মালা । পাথরে পাথরে ঝনক ঝনক নূপুর বাজে এমন করে হাজার বছর ধরে ।

জৈনহাম জোর কদমে এগোয় ছড়ার উজান দিকে । ছড়ার দু'পাড় ধরে সারি সারি উঁচু পাহাড় । কোথাও পারুয়া-বাঁশের বন ভোরের বাতাসে চামর দোলায় । তারই ফাঁকে সূর্য-হাসি ঝিলমিলিয়ে গায়ে পড়ে জৈনহামের । পাথর থেকে পাথরে লাফায় । বলিষ্ঠ দেহের ভাঁজে ভাঁজে উদ্দাম তরঙ্গ । কুকীছড়ার মাথা তখনো অনেক দূরে । মুলিবাঁশের টিলা, রূপই বাঁশের ঢালুর বিস্তৃতি, আর মিরতিঙ্গা বাঁশের ঘন বন পার হয়ে খমুলুং । আওয়াল, শিমুল, চামল, চালতা, কুমা, রাতা আরো নাম না জানা গাছের গহন বনে গলাগলি । রিয়াংদের ভাষায় গহন বনের আরেক নাম খমুলুং । বিশ্বের যত সুর-তত সুরের গায়ক পাখীরা থাকে ওই খমুলুঙে । কোথাও ধনেশ, টিয়া, বটকল, বৌ কথা কও । বিচিত্র তাদের রূপ, বিচিত্র তাদের রং । আরো বিস্ময়ের, তাদের মিষ্টি গানের ছোট ছোট কলি । তাদের সাথে কুকীছড়ার মাথায় সেই পাহাড়ী ঝরণা । কোন বনবালার গোপন ব্যথা নিয়ে উদাস হয়ে হামেশা গান গায় । দিকহারা এলোমেলো দিগন্ত রেখা যেখানে-সেখানেই জৈনহামের অচিন স্বপ্নের আঙিনা ।

ঝরণার পাশে খমুলুঙে বিরাট উঁচু টিলার চূড়ায় এক শিমূল গাছ । কত বছরের বুড়ি ওই শিমূল ঠাকুমা, জৈনহাম জানে না । অন্যরাও জানে না । প্রতিদিন গাছের মগডালে একজোড়া ময়না গান গায় । ক্লং কিঁ ওই ! ক্লং কিঁ ওই । ক্লং কিঁ ওই পাখীর সেই সুর জৈনহামকে ঘরছাড়া করে । আসতে যেতে শিমূলতলায় দাঁড়িয়ে অপার বিস্ময়ে উপরে তাকিয়ে পাখীর ডাক শোনে । পুচ্ছ নাচানো অনুরাগ, ভালোবাসা নিয়ে ডালের উঁচু থেকে উঁচুতে পাখী দুটো লাফায় । কখনো আধমেলা পাখায় ঠোঁট খুঁচিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আদর করে । পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আকাশের নীচে আরো কোন বড় দেশ -- সেখানেই ওরা উড়তে ভালোবাসে । পাখী জোড়ার ডানায় চড়ে জৈনহামের মনটা কেমন উদাসী হয়ে যায় । প্রতিদিন পলকহারা চোখে ওই পাখী দুটোর গতিবিধি দেখে । কাছে যেতে চায় । চাইলেই যাওয়া যায় না । বেশ ক'টা মিরতিঙ্গা জোড়া লাগিয়েও নাগাল পাওয়া দায় । শিমূল গাছের গায়ে আবার কাঁটা বিছানো বাকলা । ময়নার কাছে যাওয়ার সব পথ রুদ্ধ ।

তবু আশা ছাড়েনি জৈনহাম । ঘুমের মধ্যেও ক্লং কিঁ ওই ! ক্লং কিঁ ওই ডাকে সে দিশেহারা হয় ।

বৈশাখের মাঝামাঝি দু'এক পশলা বৃষ্টির সাথে জুমিয়ারা পহাড় জুড়ে জুমের বীজ বুনতে নামে । তখুনি উঁচু কোটরে ময়নার ডিম ফুটেছে । ফাল্গুনে আশা, চৈত্রে বাসা, বৈশাখে ডিম, জ্যৈষ্ঠে চাও/জ্যৈষ্ঠ গেলে তাদের পাও কি না পাও ।' এই প্রবাদ জৈনহামের জানা । কুকীছড়ার মাথায় দল বেঁধে অনেকেই আসে । কেউ বীজ বুনতে, কেউ বা জুম পাহারার গাইরিং ঘর বানাতে । সাদা বোনা ফসলের ফাঁকে ফাঁকে দিন কাটে অন্যদের ! জৈনহামও ঘুরে জুমে জুমে । মন ভোলানো ক্লং কিঁ ওই । ক্লং কিঁ ওই ডাকা পাখীর খোঁজে । আকাশে উড়া ময়না দু'টো জুমিয়ারা দেখেছে ।কিন্তু কোথায় থাকে খোঁজার সময় নেই বা সময় থাকলেও দেখার সখ নেই ।

তৈরল বা শিমূলের উঁচু উঁচু ডালে ময়না থাকে এটা সবারই জানা । অত উঁচুতে গিয়ে ময়না দেখার সাহস কই !

দেখতে দেখতে জুমের ফসলও বাড়ে । জ্যৈষ্ঠ মাসের জুম বাছানি কাজ শুরু হয় । জুমের ধান ক্ষেত হাওয়ার আনন্দে নাচে । বন চড়ুই এর ঝাঁক নামে বনভোজনে । শোঁ শোঁ শব্দে এক সাথে নামে । ফসল পাহারা দেওয়ার টংঘর থেকে কেউ যখন বাঁশে বাঁশ ঠুকে আওয়াজ করে । -- উড়ে যায় আকাশ ছেয়ে শ'য়ে শ'য়ে । কোথাও আবার দুম্ দুমা দুম মাদল বাজে । যুবক যুবতীরা মিলে জুম বাছাই করে মাদল বোলের তালে তালে । জুম ক্ষেত্রে মাদল বাদককে বলা হয় 'দাওযা' । কাজের গতি শিথিল হলে দাওয়া আবার চিৎকার করে । কখনো গায় । সবুজ পাহাড় জুড়ে সেই মুখরিত কাকলির নাম বনকাকলি কিনা কে জানে ।

জৈনহাম আপন মনে ঘুরে । বনকাকলি তাকে ধরে রাখতে পারে না । বন ময়নার জন্য সে উৎকর্ণ । দূর থেকে দূরে সীমাহীন আকাশে চোখের দৃষ্টি । ক্লং কিঁ ওই ! ক্লং কিঁ ওই ! ডাক দেওয়া পাখী উড়তে উড়তে জাঁপিয়ে পড়ে সবুজ জুম ক্ষেতে । পাখী দুটি কচি ধানের ডগায় বসে ঠোঁট ঝাঁকুনি দেয় । ঠোঁটে একটা নরম সবুজ ঘাস ফড়িং নিয়ে আবার আকাশের নীল সীমানায় হারিয়ে যায় । ওই ডাক শুনলে বুক হাহাকার করে উঠে । অজানা অচেনা মোহ আচ্ছন্ন করে সারাটা দেহ । ছোট ছোট নরম সবুজ ঘাস-ফড়িং ময়নার ছানারা খায় । ময়না ছানার আহারকে বলে 'কুক' । কুক ধরা ময়নার উড়া দেখে আপন মনেই প্রশ্ন জাগে -- কোন পাহাড়ের পাখী কোথায় উড়ে ? দেখতে দেখতে জৈনহাম বুঝতে পারে, বড় ময়না যখন কুক ধরে ছানারা তখন ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়তে শেখে । বিচিত্র ওই দুর্লভ পাখীরা তাকে যতো আনন্দ দেয় তার চেয়েও দুখানো ব্যথার কষ্টে মন কাঁদায় । কত নরম মমতা । ঘাস ফড়িং-এর চেয়েও কোমল সবুজ কিনা কে জানে ! মনের আশা ওই ছোট্ট পাখী দু'টো ধরবে । মনের যত না বলা আশা নিরাশার কথা সেই পাখীদের দিয়ে বলাবে । কিন্তু পাবে কেমন করে ? ভয়ংকর দৈত্যের মতো উঁচু বিশাল শিমূল গাছের কাছে সে যে এক ছোট্ট শিশু । প্রকাণ্ড ওই শিমূল গাছ নিয়ে কতো রূপকথা চারিদিকে ছড়ানো । সে কি শুধু রূপকথা ! আরো বিকট কত কাহিনী ।

জৈনহামের দাদু পিঞ্জুর বানাতে পারে । লোকে বলে এক সময় ময়না ধরা ছিল বুড়োর নেশা । এখন বুড়ো প্রায় অচল । ঘোলাটে চোখ দুটোতে ছানি পড়া । বুড়োর শরীর টিপে, কখনো বুড়োর ঘামাচি চুলকে জৈনহাম আব্দার করে বলে -- দাদু, একটা পিঞ্জুরা বানিয়ে দাও না । বুড়ো রাজী হয় । রাজী হয়েও বানাতে সপ্তাহ খানেক লাগে । একদিন বিকেলে পিঞ্জুরা বানাতে বানাতে

বুড়ো শুনিয়েছিল তার নাতিকে ময়নার অদ্ভুত কাহিনী । বুড়ো মাঝে মাঝে খক খক কাশি দিয়ে বলে যাচ্ছিল ।

আগে চিনতে হবে কোনটা পুরুষ ময়না আর কোনটা তার স্ত্রী । অবশ্য ছোটবেলায় স্ত্রী পুরুষ আলাদা করা কঠিন । বয়স যত বাড়ে পুরুষের কানে দুটো হলুদ ঝুমকা বোরোয় । এদিক ওদিক মাথা যখন নাড়ে ঝুমকা দুটো অপূর্ব সুন্দর হয়ে দোলে । ময়না-বৌ বড় অলস। একেবারে রাজদুলালী । গর্ভবতী হলে তো কথাই নেই । এত আরাম - আয়েস ভালবাসে, বাসা ছেড়ে দূর যেতে চায় না । বিকেলে মিষ্টি পড়ন্ত রোদে একটু আধটু বেরোয় । পুরুষ ময়না তখন বৌকে সাধ ভক্ষণ করাতে ব্যস্ত । নিঃসঙ্গ হয়ে আকাশে উড়ে । দৃষ্টি থাকে অনেক নীচে জুম ক্ষেতের দিকে । জুমে নামে পাকা মরিচ নিতে । গর্ভবতী ময়না- বৌ মরিচ খেতে খুব ভালবাসে। কখনো বন ডুমুরের টক স্বাদ ভালোবেসে মুখে নিয়ে যায়। মানুষের মধ্যেও মেয়েরা গর্ভবতী হলে ঝাল-টক ভালোবাসে । ডিমে যখন তা দিতে শুরু করে বৈশাখ মাসে, ঝড় হোক, গাছ ভেঙ্গে যাক তবু ডিম ছেড়ে সহজে কোথাও যায়না ময়না বৌ ।

বিলাসিনী ময়না বৌ-এর অসুখটাও আবার অদ্ভুত ধরণের । খরায় পাহাড়, মাঠ, ছড়া শুকিয়ে কাঠ । তখন ময়না-বৌ-এর মেয়েলি অসুখ হয় । গরম সহ্যই করতে পারে না। গুহ্যদ্বারের কাছে ফুলে উঠে । পুরুষ ময়না সহ অনেক কষ্টে আরো গহনতর বনে ঢোকে । গহন বন হলেই চলে না । কাছে পিঠে ঠান্ডা কোন ঝরণা চায়। যেখানে দিবানিশি স্নিগ্ধ শীতল বাতাস বয় । দুঃসহ যন্ত্রণায় কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে । নড়তে চড়তে পারে না । গায়ের তেল তেলে ময়ুর রঙে কেমন একটা ময়লা ময়লা ভাব । তখন কাছে গেলে উড়বার চেষ্টাও করে না । হতাশায় দুঃখে বাঁচার ইচ্ছেটাও থাকে না । চিকচিকে কালো চোখের পাশের ধূসর পর্দাটা যেন আরো ঘোলাটে লাগে । কিছুদিন এমন করে থাকার পর ফোলা জায়গাটায় পুরুষ ময়না কোমল কোমল ঠোকরে পুঁজ রক্ত বের করে দেয় ।

অদ্ভুত এই পাখী তাড়াতাড়ি পোষ মানে । পিঞ্জুরা একবার খুলে দিলে খুব সহজেই বন্য হয়ে যায় । তাইতো বাংলা পল্লীগানে আছে "সোনার ময়না পাখীরে কোনবা দেশে উইড়া গেলেরে আমার দিয়া ফাঁকিরে । মন দিলাম দেহ দিলাম আর দিবার নাই বাকি ।" যারা ময়না পালে, তারা ময়নাকে নিকট কোন আত্মীয় ভাবে। অনেকে ময়না মারা গেলে শ্রাদ্ধও করে । আবার কেউ কেউ সাদা কাপড়ে জড়িয়ে ছোট বাঁশের ভেলায় ছড়ায় ভাসিয়ে দেয় । সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে কয়েকটা পয়সাও ।

আবার ময়নার জন্য প্রাণও কাঁদে । অনেকে বলে, — ময়না আগে মানুষ ছিল। কোন এককালে সৎমা নিষ্ঠুরভাবে মন্ত্রপড়া তাবিজ গলায় বেঁধে দিয়ে কোন এক মনুষ্যকে ময়না করে দিয়েছে। ময়না তাই কথা বলতে পারে । বাইরের কোন অতিথি এলে আদর আপ্যায়ণ করে বসতে বলে ময়না ।

সাহিত্যের মতো জৈনহাম দাদুর গল্প শোনে । ঘুম পাড়ানি গানের মতো বুড়োর গল্প তাকে বিবশ করে তুলেছিল । উঁচু তৈরল গাছ বা শিমূল গাছের চূড়ায় নিরাপদ স্থানে ময়না বাসা বাঁধে। যেখানে সহজে বন বিড়াল বা বিষধর সাপ যেতে না পারে । তবুও ওদের রেহাই নেই । জৈনহামকে

তার দাদু আরও বলেছিল — দিন রাত খালি ময়না ময়না করিস না । জানিস না তুই । ওই শিমূল গাছেই পানক থাকে । ময়নার কোটরেই বাসা বাঁধে । ময়না যখন উড়তে শিখে ময়নারা কুক ধরতে যায়। কুক ধরা দেখেই আমরা বুঝি ওদের ছানা ওড়ার সময় হয়েছে। কুক ধরতে গেলে পানক বা বিষধর সাপ এসে ছানাদের গিলে ফেলে । পেট ঠান্ডা করে কুন্ডলী পাকিয়ে কোটরেই অলস মুখে থাকে । ময়না এসে ছানা পায় না । সাপ যখন ফোঁস করে বড় ময়নাকে গিলতে চায়, ময়নারা তখন ঠোঁটের ঘাস ফড়িং কোটরে ফেলে উড়ে যায়। সাপের ছোবল দেখে ময়নার চমকানো ডানা ঝাপটানির কায়দাটাই আলাদা । ডানার ঝাপটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি কোটরে সাপ আছে কিনা। লোকে বলে ময়নারা কুক ধরে সাপকেও খাওয়ায়। কথাটি ঠিক ওই রকম না । আসল কথা ময়নারা অভ্যাসের জোরে চলে । ছানা নেই জানে । জানলেও আবার ওই কুক ধরেই কোটরে যায়। এই স্বভাব প্রায় আষাঢ় মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত চলে । এরপর অবশ্য অন্য কোটরে বাসা বাঁধতে যায় ।

জৈনহাম তন্ময় হয়ে দাদুর গল্প শুনছিল । চোখ দুটি দপদপিয়ে উঠে। যতটা ভয় ছিল তার চেয়েও বেশী ছিল রহস্যময় এক কৌতূহল। দাদু যখন নাতির পিঞ্জুরা বানিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলে, কাছেই ছিল এক বুড়ি । ফোকলা দাঁতে বুড়ি বাঁশের হুকোতে তামাক টানতে টানতে বলেছিল আরো ভয়ঙ্কর কাহিনী ।

এই খমুলুঙের শিমূল গাছেই এক জোড়া ওয়াং পাখী ছিল। আজকাল অবশ্য আগের মতো দেখা যায় না। দেখা না গেলেও কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই থাকে । শ্মশানে গেলে রাত্রিতে ওদের দেখতে পাবে । আধ পোড়া মানুষের হাড়গোড় চিবিয়ে খেতে ভালবাসে । কখনো কখনো ছড়ার নির্জন পারে কাঁকড়া ধরে খায় । ওয়াং পাখীর ডাক শুনলে কার না ভয় হয় । ধূমাছড়ার পতিরায় পাড়ার লোক এক রাতেই মরে শেষ হলো । আগের দিন নাকি ওয়াং পাখী পাড়ার উপর ডেকেছিল ! আমার মেজো মেয়ের বড় ছেলেটি মারা গেছে ওই ওয়াং পাখীর ডাক শুনেই । ওয়াং পাখীরা চেনাজানা স্বর নকল করে অবিকল মানুষের নাম ধরে ডাকে । যারা ডাক শুনে জবাব দেয় ওরাই মরে । জবাব না দিয়েও উপায় কি । এত করুণ মন ভোলানো চেনা চেনা সুর!

জৈনহাম বুড়ীর কথা উড়িয়ে দেয়নি । মুগ্ধ বিস্ময় আর ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠে । ওয়াং পাখীর ডাক মানে রিয়াং সমাজে অমঙ্গলের সংকেত। এটা তার আগেই জানা। ওয়াং পাখীর গল্প বলেই মায়েরা এখনো শিশুদের ঘুম পাড়ায় । শ্মশানচারী ভয়ঙ্কর সেই পাখীর গল্পে গা ছমছম । সবই ঠিক । তবু ওই শিমূল গাছ যেন চেনাজানা এক কোমল স্বরে তারই নাম ধরে ডাকে । সেই ডাক শিমূল গাছের, না ওয়াং পাখীর না ওই ময়না জোড়ার — আলাদা করা যায় না । এই ডাকে বুকের ভিতর আরেকটা ছোট পাখী হাহাকার করে ডানা ঝাপটায়। পাখীটার আকুলি বিকুলি কি আর মন মানে ?

মানে না। তাই বন্ধুদের নিয়ে ছোটে শিমূলতলার দিকে গহন জঙ্গলে। লোকে বলে দিনের বেলায় সেই গাছের নীচে কেউ একা যেতে পারে না। দিকহারা পথভোলা কোন জুমিয়া গেলেও যেতে পারে । তবে ফিরে এসে কেউ বাঁচে না। সব জেনে শুনেই সেই উঁচু টিলার শিমূলতলায় পৌঁছে জৈনহাম । সঙ্গে তার বাধ্য সাথীরা । বড় একটা ডলু বাঁশের টুকরো নিয়ে বেত চিরতে

বসে জৈনহাম আর রোগা ছিপছিপে দুর্বাজয়। বেত চিরতে চিরতে জৈনহাম বলে — তোরা তিনজন যা । ভাল পোক্ত সাত আটটা লম্বা মিরতিঙ্গা বাঁশ নিয়ে আয়। ভয়ের ছায়া রণসাই তারণজয়ের মুখে। একজন আরেকজনের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে । থাইথাহার গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনরকম ঢোক গিলে বলে — তুইও চল ভাই । আমাদের বড় ভয় করে । অন্য জঙ্গল হলে আমাদের কিছু বলতে হতো না ।

জৈনহাম বেত থেকে চোখ তুলে তাকায় কটমট করে । সেই চাউনির ভাষা বন্ধুরা জানে। জানে বলেই তারা অনিচ্ছায় হোক জঙ্গলের দিকে মিরতিঙ্গা বাঁশের বনে এগোয়। নিজেদের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ বাড়তে থাকে। এত ভয়। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই । এখান থেকে ওরা পালিয়ে কোথায় যাবে। ওয়াং পাখী ভয়ঙ্কর। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ওই জৈনহামের মেজাজ। সে রিয়াং ছেলেদের সর্দার । যে ওই কথা শুনবে না তার বিপদ নিশ্চিত । মুখে কথা কম বলে। কিন্তু যাকে ধরবে সূঁচালো বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কান ছেদা করে মেয়ে বানিয়ে দেবে । ওর মতে যারা পুরুষ তাদের আবার ভয় কিসের। লজ্জা, ভয় মেয়েদের শোভা পায়। পুরুষ হয়ে যদি কেউ ভয় পায় তাহলে কান ছেদা করে গয়না পরা উচিত । উদ্ভট যত সব চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খায় । ওর উদ্ভট চিন্তার ফল হচ্ছে থাইথাহার এক কানের ছেঁদাটা । বিরাট মিরতিঙ্গা বাঁশে চোঙ ভরে মরিচ গোলা লবণ জল খেতে দিয়ে ছিল থাইথাহাকে। থাইথাহা ইতস্তত করে । করবে না কেন । সে কি সাধারণ মরিচ। জুমের ছোট ছোট মরিচ । এত ঝাল । কয়েকটা খেলে চোখে মুখে ধান্দা লাগে। তাই কেউ কেউ ধান্দা মরিচ বলেই জানে । কাল মরিচের ঝোল খাওয়ায় কেমন ধরণের বীরত্ব আর ঝালকে ঝাল বলাতে কোন ধরণের ভীরুতা জৈনহামই জানে । থাইথাহা এক চুমুক দিয়েই হুস্ হাস্ করেছিল। আর যায় কোথায় । ধরে ওকে কানে বাঁশের কঞ্চির সূচ বসিয়ে দেয় । ভয়ে আরেকটা কান ছেদা করার আগেই গিলে ফেলেছিল আস্ত চোঙের ঝাল ঝোল। তার ওপর বলেছিল— যদি বাড়ী গিয়ে এসব কথা বলিস বাকী কানটাও ছেঁদা করে দেবো ।

ভয়ে বীর সাজলেও দারুণ কষ্ট হয়েছিল থাইথাহার। নীরবে সব ব্যথা হজম করে যায়। কিন্তু পরদিনই বীরত্বের পরিণতি দেখা গেল। প্রচন্ড দাস্ত । তার উপর কানটা আবার লাল ডুমুর হয়ে ফুলে উঠে সদ্য কান ছেদা কিশোরীর মত । তবু মা বাপকে কিছু জানায়নি পাছে লোকে বোকা বলে । বা জৈনহামের সঙ্গে ঝগড়া এড়াতে গিয়ে । তাছাড়া বাকী কানটার মায়াও ছিল । শুধু কি থাইথাহা ! রণসাইও বাদ যায়নি । এক কোপে একটা রূপই বাঁশ কাটতে পারেনি । এই ছিল অপরাধ । ব্যস ! রণসাই এর কান ছেঁদা । তার উপর বলেছিলো কান ছেঁদা করার সময় যদি উঃ বা ইঃ করে তা হলে অন্য কানটাও ছেঁদা হবে । রণসাই যন্ত্রণায় চোখে জল ছাড়ে, মুখ লাল হয়ে আসে, তবু ইঃ বা উঃ করেনি ।

সমবয়সী সবাইকে জৈনহাম প্রায়ই মারপিট করে । তবুও ওর দুঃসাহসিক চলা-ফেরায় সঙ্গী হতে সবার ভালো লাগে । মনটাও অনেক উদার । গ্রামের সব ছেলেদের লাটিম, বাঁশের খড়ম, রণপা সবই জৈনহামের হাতে তৈরী । ভাদ্র মাসে পাকা ধানে জুম ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে তোতা যখন পড়ে, জৈনহামই তখনো একমাত্র ভরসা । বটের আঠা, খাইমোনা গাছেব আঠা, চামলের আঠা সংগ্রহ করে লাসা বানিয়ে দেয় । নিজের খেয়ে পরের জুমের তোতার ফাঁদ

বানায় । এমন কি শিকারী তোতাটাও সে-ই যোগাড় করে দেয় । কখনো পাহাড়ে গিয়ে মধু খুঁজবে । মৌমাছির কামড় খেয়েও চাক ভাঙবে । নিজের থাক বা না থাক চাক ভাঙা মধু বিলোবে গ্রামের ছেলেদেরকে । সব মিলিয়ে বিচিত্র একটা কিশোর ।

এই বিচিত্র কিশোরটাই অনেকের ভরসা । বিপদের সাথী হয়ে আস্থা অর্জন করেছে অনেক বার । উদ্ভট খেয়ালগুলো মাথায় চাপলেই বিপদ । চোখ রাঙানি তারই সাজে যে সোহাগ করতে পারে । সোহাগ মাখা আদেশ নিয়ে রণসাই, থাইথাহা আর তারণজয় বাঁশ আনলো কয়েকটা । জৈনহাম টাক্কলের পিঠ দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাঁশগুলো পরীক্ষা করে । ভিতরে পোকা বা পিঁপড়া খাওয়া কিনা । পোকায় খাওয়া হলে মচ করে ভেঙে যাবে । দুর্বাজয় দুর্বল ছেলে, বেশি পরিশ্রম করতে পারে না । বসে বসে শিমূল গাছে উঠার সিঁড়িতে বাঁধার বাঁশের চটি বানায় । সিঁড়িকে বলে 'আরা' । অনেক লম্বা হবে সিঁড়িটা । গাছটাই উঁচু হবে একশো হাতের কাছাকাছি । গাছের ধাপে তিনটে করে ডাল । মূল কাণ্ড থেকে বেরোয় । জৈনহাম গুণে দেখে কমপক্ষে বারোটা ধার উঁচুতে উঠতে হবে । মাটি থেকে প্রথম তিনটে ডালের গোড়ায় পৌঁছতে গেলে দশ হাতি বাঁশ লাগে । শক্তপোক্ত মিরতিঙ্গা বাঁশ শিমূল গাছের গাঁয়ে বাঁধে । বাঁশের বেতে জোড়া দিয়ে গাছের বেড় পাওয়া যায় । গাছের সাথে বাঁশ বাঁধে । আবার সেই বাঁশে ছোট ছোট চটি বাঁধে ক্রস চিহ্নের মতো । সেটাই হলো সিঁড়ির পাদানি ।

জৈনহাম আরা (সিঁড়ি) বানিয়ে বানিয়ে উপরে ওঠে । কোমরে তার বেতের মুঠা গোঁজা । সঙ্গে টাককাল । কোন কারণে পিছলে ফসকে গেলে বুক কোমর ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে । এত উঁচুতে কেউ একটু সাহায্য করার জন্য আসতে পারবে না । নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ অসহায় লাগে । নীচের বন্ধুদের অনুশোচনা ছাড়া করার কিছু থাকবে না যদি কোন অঘটন ঘটে । নীচের দিকে তাকানো যায় না । তাকালে মাথাটা কে যেন জোরে নীচে টেনে নেয় । পায়ে ঠক ঠকা ঠক কাঁপন ধরে । পায়ের কাঁপুনি ডালেও লাগে । কখনো মনে হয় ডালটা বুঝি মচাং করে ভেঙে যাবে । হঠাৎ আবার নাভির নীচে সমস্ত নাড়ি-ভুড়ি উঠে আসতে চায় । ভয়ে পায়ের লোম কাঁটার মত দাঁড়ায় । তবু ময়না শিকারী দমে না । বিশাল উদ্ধত উচ্চতার কাছে মানুষ কত দুর্বল অসহায় । মাটিতে পড়লে বোধ হয় ছোট্ট একটা ঢিলের মতো টুপ করে পড়বে ।

শিমূলের গায়ে আবার ধারালো কাঁটা । ঘাম ঝরে সারা দেহে । কোমরে বাঁশের চটিও শেষ । প্রথম ধাপে পৌঁছার পর একটা ডালের সাথে বাঁশের ডগা বাঁকিয়ে বেত দিয়ে বাঁধলো । বাঁশটা পিছলে বা ফসকে যাওয়ার আর ভয় নেই । বারটা ধাপের উপরে একটা ভাঙা ডাল । বৃষ্টিতে পচে খোঁড়ল হয়েছে । সাত সাগর তের নদী পার হয়ে সেই উঁচু মিনারেই যেন ময়না ছানার বাস । ওই কোটরেই জৈনহামের স্বপ্নে দেখা কল্পলোক । সেই কল্পলোকের রং বদলায় মাসে মাসে । ফাগুনের শেষে লাল শিমূল ফুলের হাসি চারিদিকে ছড়ায় । দিক দিগন্তে রূপের বাহার খোলে । ফাগুন হাওয়ায় সে ফুলের রঙে কেমন পাগলা পাগলা দোলা লাগে । পৃথিবীর বিচিত্র পাখী আর কীট পতঙ্গেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সে রূপ সাগরে ঝাঁপ দিতে আসে । চৈতালী হাওয়ায় সবুজ কলার মতো শিমূল ফলে কেমন যেন অলস ভাব । সন্তান বহনের এক ক্লান্ত ভঙ্গিমার সাথে দীর্ঘশ্বাস । বৈশাখের ঝড়ো বাতাসে শিমূল তুলা ফাটে । তুলা ধুনকরের ধনুক থেকে ছুটে যাওয়ার

মতো উড়তে উড়তে চারদিকে ভাসে । জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল নেই ফল নেই । শুধু নতুন গজানো পাতার ঝোপে ঝোপে সবুজের এক খেলা । আড়ালে আড়ালে মমতায় বিরল সেই ময়না । ক্লু কিঁ ওই ! ক্লুং কিঁ ওই -- গানে বন মুখর । সেই কল্পলোকের চিক্‌চিক্ কালো চোখের ময়না ছানা তখনো অনেক দূর । ছয় ধাপের ডালের গোড়ায় পৌঁছে যখন মত্ত হাওয়া শিমূল ডালে আছড়ে পড়ে । দিক্ বিদিক জুড়ে ভূমিকম্পের মতো দোলদোলে ভাব । ঝোপের আড়ালে জৈনহামকে দেখা যায় না । সাহসে ভরা উঁচু মাথায় বাঁধা গামছাটা বাতাসে কাঁপে থরো থরো । আরো বাঁশের দরকার । নীচ থেকে আরো দু তিনটি বাঁশ চেয়ে কূয়া থেকে জল তোলার নমুনায় উপরে নিয়ে যায় । আবার ডাল থেকে সিঁড়ি বাঁধে । চোখের দৃষ্টি নীল আকাশের মুক্ত আঙিনায় । মনে মনে ভাবে ওই নীলের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার মতো ময়নার পাখা গজিয়েছে কিনা কে জানে ! মগ ডালের কাছে যাওয়ার আগেই উল্লাসে ধ্বনি করে । সেই ধ্বনিতে পাহাড়টা তখন মুখরিত । অনেক পাখী ঝোপ থেকে, ডাল থেকে উড়ে গেল আকাশে ময়না শিকারীর শিমূল শীর্ষ বিজয়ের সগর্ব বার্তা ঘোষণা করে ।

আবেগ প্রকাশের ভাষা সেই উল্লাস ধ্বনি জুমিয়াদের কাছে অনেক দিনের পুরানো । পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রেমের সংকেত হোক, খুশীর সংকেত হোক, বহন করে ওই ধ্বনি । আদিম সেই ধ্বনি শুনতে অনেকটা হ্রেষা ধ্বনির মতো । আবেগ চেপে গুমড়ে থাকার রীতি ওদের নেই । সবকিছুই খোলামেলা ।

জৈনহামের উল্লাস মুখর হ্রেষা ধ্বনি গাছ থেকে গাছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটে । ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে জুমক্ষেতে জুমিয়াদের চমকে দেয় । জৈনহাম যখন শিমূল চূড়ায় ওঠে জুমে তখন দাওয়ার মত্ত মাদল বাজে । মাদল বোলের তালে তালে যুবক যুবতী জুমিয়ারা জুম ক্ষেতে ঘাস আগাছা বাছাই করে । কেউ ঠোঁট টিপে হাসে । কেউ বা খলো খলো হাসি তামসার ফাঁকে ফাঁকে ফসলের গোড়ায় গোড়ায় খচ খচ খন্তা টাক্‌কাল চালায় । তারা আত্মহারা আপন মনের দোলায় । কেউ আবার লম্বা সুরে গান তুলেছে । সুরে সুরে ছড়িয়ে পড়ে জুম জুড়ে মিঠে সুখের আবেশ । শিমূল চূড়ায় হ্রেষাধ্বনি তাদের দৃষ্টি কাড়ে, আরো কাড়ে মন । দাওয়ার মাদল আচমকা থমকে দাঁড়ায় । জুমিয়াদের টাক্‌কালও থামে । নারী পুরুষ ছুটতে থাকে শিমূলতলায় ময়না শিকারীর রঙ দেখতে । দূর থেকে দেখা যায় জৈনহামের কোমরে টাক্কাল সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠে । গাছের নীচে জৈনহামের সঙ্গীরা মুখে কারো কথা নেই । উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় মুখ তাদের থমথম । ঘাড় ব্যথা টনটনায় উপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে । অবিশ্বাস্য চোখে গ্রামবাসীরা দেখে দূরন্ত কিশোরের সেই দুঃসাহসিক অভিযান ।

জৈনহামের বন্ধু রণসাই এর মা এসেছিল জুমে বনআলু খুঁজতে । গাছের নীচে এসে বুকের দরদ কেমন উপচায় ছোট ময়না শিকারীর জন্যে । স্নেহ জড়ানো কণ্ঠে চীৎকার দিয়ে ডাকে -- আয় ! বাবা নেমে আয় ! জৈনহাম জবাব দেয়নি এবং বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরো উপরে ওঠে । বুড়ী তখন অসহায় উদ্বেগে বলার কিছু খুঁজে পায় না । বুকটা কেবল উথাল পাথাল করে । বুড়ো মুক্তাহাম এসেছিলো ফসল দেখতে । বাঁশের হুকো ইটর ইটর ইটর টানে প্রচণ্ড বিচলিত উৎকণ্ঠিত । -- নাম বলছি । তোর বাপদাদারা কেউ এই গাছে উঠেনি । জৈনহাম সবই

শুনে কিন্তু জবাব দেয় না । নিচের দিকে তাকালে পৃথিবীটা বড় দূর লাগে । মাথাটা লাটিমের মতো ভন ভন ঘুরলেও লোকজনের সমাগমে দুঃসাহসিকতা আরো বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে । গাছের নীচে নির্জন বনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভরা এক কলরব ।

কেউ বলে ছোকরাটা মরতে চাইছে । কেউ বলে উঁচুতে পৌঁছালে মাথা ঘুরে পড়বে অমনি । কে একজন বললো -- মরতে চায় তো মরুক । নীচে গোলমাল করে ভয় দেখিও না । আরেক জন বলল -- ভগবান ভুল করে লেজটা দেয়নি । নইলে কী আর এমন গাছে উঠার সাহস করে কেউ । বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে বলল একজন এই বয়সে একটু আধটু পাগলা পাগলা হওয়াটাই সুন্দর । এখন এসব করবে না তো করবে কখন । হাজার লোকের হাজার কথা । অবকাশও নেই শুনবার মতো । ময়না শিকারী আপন কাজে বিভোর । হাতের কাছেই ঝড়ে ভাঙা ডালের গোড়া ।

গোড়াতেই এক কোটর । মুখটা আড়াল করা সদ্য পল্লবিত কচি ডালে পাতা । ময়না শাবক দুটির পেটে বোধ হয় ক্ষুধা । মা বাপের পথ চেয়ে আগুন রাঙা ঠোঁট দুটি কোটর থেকে বাড়ানো । সেই আগুন রাঙা সোনালী ঠোঁটে বুঝি প্রায় পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি সঙ্গীত । নীল আকাশে চেয়ে থাকা চোখ দুটি যেমন নিষ্পাপ তেমনি বিস্ময়ে ভরা । গায়ে কৃষ্ণনীল ঝলমলে পালকগুলো পূর্ণতা লাভ করেনি । কোটরে হাত বাড়ায় জৈনহাম । ছানা দুটি আচমকা চিঁ চিঁ ডাক ছাড়ে । হাতে তুলে নিয়ে 'কুতাই'-এর পকেটে ভরে হাতে অনুভব করে মৃদু উত্তাপের সাথে ছোট্ট বুকের টুক টুকে স্পন্দন । গায়ে কেমন একটা সুখকর শিহরণ জাগে ।

বড় ময়না দুটি উড়ে এসে মগডালে বসে । আচমকা গলা ফাটিয়ে হুংকার ছাড়ে চিঁ চিঁ চিঁ ! হুংকার না বলে আর্তনাদও বলা যায় । শিমূল গাছে ঝোপে ঝাড়ে আতঙ্কে চমক লাগে । আর্ত চিৎকারের সময় পালকগুলো কাঁপে ঝিরি ঝিরি । ছল ছল চোখে তাদের সন্তানহারা ব্যাকুলতা । জনপদ থেকে অনেক দূরেই ছিল নিরাপদ আপন সুখের নীড় । কেন আজ সেই নিবিড় নীড়ে ছাই ওড়ে জানে না । স্বপ্ন, আশা, ভালবাসা সব শেষ ।

শেষ বলেই ছোট্ট বুকে সব হারিয়ে সাহস আসে । উড়ে উড়ে জৈনহামের মাথার কাছে ঘোরে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন বুঝে উঠতে পারেনা । জৈনহামের মাথায় ঠোকরাতে চায় । পারে না । আবার ওড়ে মাথার উপর ঘুরে ঘুরে । ব্যথা ভরা ডানা জোড়া ক্লান্ত, ডানার ঝাপটানিতে কিসের এক রিক্ত হাহাকার । যত নীচে নামে জৈনহাম, পাখী দুটিও ধীরে ধীরে সারা গাছ পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে নামে । তাদের দীর্ঘশ্বাস জ্যৈষ্ঠ মাসের বাতাসে মিলায় । পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে যেন বলতে চায় -- যাবার কালে কচি মুখ দুটি একবার দেখাও । গলায় তখন ক্লুং কিঁ ওই মিষ্টি মুর্চ্ছনা হারিয়ে গেছে । কৃষ্ণনীল বুক থেকে ঠেলে আসা দুঃখ আবেগে তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ । বোবা পাখী অসহায় আবেদন জানাতে জানে না । জানালেও কেউ শুনে না । ঘাস-ফড়িং না হলে অভিমানে যারা কিছু খায় না, কচি পালকের গোড়ায় সোনালী ঠোঁটে খুঁচিয়ে সোহাগ না করলে যাদের ঘুম আসে না । কী জানি কেমন করে কাটবে ওদের দিন । এমন তরো কতো প্রশ্ন বুক ব্যথা হয়ে বুকের গহীনে নিঃশব্দে ডুকরে ডুকরে কাঁদে । সেই কাঁদন ভরা গান কোন পাখী গায় । জৈনহাম কিছুটা বুঝে কিছুটা বুঝে না ! অভিযান সফল । তবু যেন জৈনহামের চোখের

কোণে না জানা এক বিষাদের ছায়া ঘন ঘন উঁকিঝুঁকি দেয় ।

জৈনহাম নীচে নামতেই থাইথাহা কাছে আসে । কুতাই এর পকেট থেকে পক্ষী ছানা দুটো পিঞ্জুরায় ভরে । বুড়ো মুক্তাহামকে প্রণাম জানায় জৈনহাম । মুক্তাহাম গাছের কোণে বাঁশের হুঁকো রেখে বিড় বিড় মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ জানায় । মন্ত্র শেষে মুক্তাহাম বলে — আজ থেকে বাবা তোর নাম হবে মনাইহাম । মনাই মানে ময়না । হাম হচ্ছে কান্তি, কুমার, চন্দ্র ইত্যাদির মতো একটা শব্দ । পিঞ্জুরার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায় গ্রামবাসীরা । থাইথাহা, তারণজয়, রণসাই, দুর্বাজয় ওরা দুর্বার অভিযানের গল্প বলে গ্রামবাসীদের শুনায় । রঙে রঙে রাঙানো কাহিনী দিয়ে জাহির করে তাদের বাহাদুরি ।

জৈনহামের মুখ বিজয়ী ছটায় লাল। চোখে আবার ব্যথার কাজল ছোঁয়া । গামছা ঘুরিয়ে বাতাস করে নিজেকে । ক্লান্তিতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস । উপরে মুখ তোলে তাকায়। বড় ময়না দুটো তখনো ভীড়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়ে। করুণ চোখ পিঞ্জুরার দিকে । জৈনহাম নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ।

এমন সময় জৈনহামের চোখে পড়ে আরেকটি ব্যথা ভরা মুখ । চোখ জোড়া যার বিস্ময়ে ভরা। চোখের কালো তারায় মরমী কোন গোপন কথা ঝিলিক্ মিলিক্ চমকায়। অপার রহস্যময় ময়না কিশোরীর বুকের ভেতর মোচড় দেয়। মাথায় একটা খোঁপা । তাতে আবার অশোক ফুলের ঝিলমিলে লাল বাহার । কাচের চুড়ি ভরা নরম কর্মঠ হাতে ধরা পিঠের ঝাকার দড়ি । সংক্ষিপ্ত কাপড় জড়ানো বুক । তার গহীনে কোন রহস্য ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ ছলকায় কে জানে । গলা ভরা রামকলার বীচির মালা। পলকহারা নজর কখনো শিমূল কখনো পাখী কখনো ভীড়ে ঘোরে । শেষে গিয়ে ঠেকে আবার জৈনহামের দিকেই। চোখাচোখি হতেই আবার ঠোঁটের কোণায় লাগে লাজুক লতার দোলা। দোলা দিয়েই মুখ ফিরায় । সঙ্কোচ জড়ানো গলায় বলে — আতা (দাদা) মনাইহাম । পাখী যখন দুটো, একটা পেলে মনের সুখে খুব আদর করে পালব । তুমি তো জানই। আমার ভাইটাই কেউ নেই। তুমি না দিলে কে-ই আমায় দেবে ?

ওই মেয়েটার গলায় এত মিষ্টি, আগে কোনদিন ভাবেনি। মেয়েটা তার চেনা জানা । রোজকার দেখা। তবে কথাবার্তা বড় একটা হয়নি । রঙ তার কালো তাই লোকে তাকে ডাকে কসমতী । যেচে নিজে কথা বলবে, জৈনহাম এমন আশা করেনি। সে কি শুধু কথা । নতুন মনাইহাম সম্বোধনে ডাকা। নিজের গুরুত্ব আর মর্যাদা এত তাড়াতাড়ি ময়না ধরবার পর বাড়বে জানা ছিল না। বিব্রত বোধ করে জৈনহাম । তার উপর মেয়েটার ভাইটাই নেই। ওসব মেয়েলী আবদার কেউ কোনদিন রাখেনি তার কাছে । আবার গলে যাওয়া মনটা শক্ত করে বাঁধে। একটা মেয়ের নরম কথায় এত সহজে গলবে! তাও কেমন করে হয়। লোকে জানে সে একজন কঠিন কঠোর ছেলে । ওই মেয়েটার নরম কথায় সায় দিলে লোকে বলবে কী ! সেই আশঙ্কাও আছে । দোমনা চিন্তায় তোলপাড়ে নিশ্চুপ থাকে জৈনহাম। সাড়া দিলে হয়ত বা মেয়েটার উজ্জ্বল কচি প্রাণটা ব্যথা পাবে। আরো সাধাসাধি করুক । তখন না হয় দেখা যাবে। বার বার ওই পলাতকা চাউনির দিকে চেয়ে থাকতেও ভাল লাগে । মেয়েটা গরীব। মা তার অসহায় বিধবা । পেট ভরে খেতে পেলে কষ্টের বিপদছায়া মুখে থাকতো না । অনেক ভাবনা ঘিরে ধরে জৈনহামকে। এমন

সময় হঠাৎ পেছন থেকে সজোরে হাত ধরে টান। মুখ ফেরাতেই দেখে আরেকটি মেয়ে। বয়েসে জৈনহামের বড়। হাসি খুশীতে ডগমগ । যখন হাসে সারা দেহে ঢেউ ঝাঁপিয়ে ওঠে । ছড়ানো ভরানো যৌবনে যেন চমকে উঠে জৈনহাম । হাসতে হাসতেই বলে — ভাই ! যে যাই বলুক। তোর কাছে অনেক আশা করে এসেছি। আমাকে যে কোন একটা দিতেই হবে। তোর পাখীর টাকা যদি লাগে তাও দেবো ।

দাবীটা বড় জোরদার । উত্তর খুঁজে পায় না জৈনহাম। ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসিতে বিশ্বভুবন সুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নিবিড় আব্দারটা প্রত্যাখ্যান করার মতো শক্তি সাহস দেহ থেকে হারিয়ে যায়। মেয়েটার ফর্সা গায়ে রোদের ঝলক । নাম তার ফাইফিরুং । চোখে হাসির ঝিলিক । সঙ্গে ঝলমল করে বুকে ছড়ানো সিকি আধুলির রূপোর মালা । পারিবারিক স্বচ্ছলতার ছাপ চোখে মুখে ।

দুহি সখীতে ঠোঁট টিপে হাসে কিনা কে জানে। একদিকে অসহায় কষ্টের ছাপ মাখা কসমতী অন্যদিকে ঝলমলরূপে হাসিখুশী ফাইফিরুং । কোন দিকে সায় দেবে জৈনহাম । দ্বন্দ্ব লাগে মনের কোণে । কোথাকার এক সঙ্কোচ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ।

দেখতে দেখতে কাছে এগিয়ে আসে মধ্য বয়সী টাক মাথায় এক বুড়ো। মুখে গাল পুরে পান । গম্ভীর গলায় বলে বাবা জৈনহাম! বড় মেয়েটার বড় শখ একটা ময়না পালবে । টাকা পয়সা যা লাগে বাড়ী গিয়ে দেবো। তোর মতো ছেলে বলেই সাহস করে এমন অসাধ্য সাধন করেছিস্ অত । পরিশ্রমের একটা পুরস্কার তো দরকার ।

জৈনহাম সঙ্কোচের সাথে সমীহ করে বলে—আয়ুৎ (জেঠা) অন্য কোন ময়না পেলে না হয় দেবো। আজকে জেঠার অনুরোধ রাখতে পারব কি? এই মেয়ে দুটোও কেমন নাছোড়বান্দা । কাকে দেব আর কাকে দেব না। যাক্ কেউই পাবে না। দুটোই আমি নিজে পালব ।

বুড়ো কথা না রাখায় লজ্জা পায় । কৃত্রিম হাসিতে লজ্জা এড়ানোর চেষ্টা। নিজেকে কেমন যেন অপমানিত লাগে । বুড়ো বললো— না দিলে তো আর জোর করা যাবে না। যাক বাবা তুমিই খুশি থেকো। এতেই আমার সুখ । তবে তুমি এত শক্ত আগে জানতাম না। বুড়ো চলে যায় হতাশ হয়ে। ফাইফিরুং এবার শুরু করে নানা কথার ছলাকলা । চোখের চাউনিতে তার ফাঁদ পাতা । নাকের পাটা থরো থরো কাঁপিয়ে বলে— তুই এত পাষাণ ! একটা পাখী দিবি তাতেই এত ভাবনা? নাকি তুই কসমতীকে চুপি চুপি দিতে চেয়েছিলি! আমি আসাতে সেটা বুঝি হয়নি।

পাখী নিয়ে এত বিড়ম্বনা হবে জৈনহাম আগে জানতো না। ফাইফিরুঙের বাঁকা বাঁকা কথা, বাঁকা ছুরির মতোই বুকটা যেন ফালা ফালা করে । এত কথার মর্ম বুঝে উত্তর দিতে জানে না। বিব্রত হয়ে চুপ করেই থাকে। ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের ভুরু নাচিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে ফাইফিরুং — সত্যি দেবে না? দেবে না ? না?

জৈনহাম চোখ মুখ শক্ত করে বলে— তোকেও দেবো না । তাকেও দেবো না। আমি নিজেই পালব বলে অনেক কষ্টে উঁচু থেকে এনেছি । অন্য পাখী ধরলে তোদের ঘরে গিয়ে দিয়ে আসব। ফাইফিরুং অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। রেগে ঠোঁট বাঁকিয়ে সরে যায়। কসমতীও ফাইফিরুঙের পেছনে যায়। যেতে যেতে ব্যাথায় না অভিমানে জানি বলে গেল— দাও না !

ফাইফিরং কেই দাও! আমার মতো দুঃখী মেয়েরা কি আর পাবে ? নিজেই খেতে পাই না। পাখীকে খাওয়াব কি ? শেষ কথাটা জৈনহামের বুকটা খামচে মোচড়ে ধরে। দুর্বোধ্য এক যন্ত্রণা মনে তোলপাড় তোলে। দেখতে দেখতে দুটি মেয়েই পিঠের ঝাঁকা নিয়ে টীলা থেকে বনের আড়ালে হারিয়ে যায়। নিজেকে বড় নীচ লাগে জৈনহামের। নিজের অজান্তেই নিজেকে ধিক্কার জানায়। অবলা বালিকা তারা গাছে ওঠা জানেনা বলে আব্দার করে একটা ছোট্ট দাবী রেখেছিল। পাখী দুটো দিলেই বা কি হতো। প্রকাশ করতে পারে না জৈনহাম। ব্যথার ভারে থমকে থাকে অনেকক্ষণ। আবার ভাবে বন্ধুদের কথা। ওদেরও ইচ্ছা নিশ্চয় আছে। ওই পাখী দুটিকেই বা কয়ভাগ করে দেবে। যদিও কথা আগেই পাকাপোক্ত করা। ময়না পাবে জৈনহাম আর টিয়ার মরসুমে সব টিয়া ওরা নিয়ে যাবে। তবু কোথায় ছোট্ট একটা কিন্তু বারবার খুঁচিয়ে তোলে। এত চিন্তার পরে কসমতীর ব্যথা ভরা মুখটা মনের পটে জলছবির মতো ভেসে রয়।

জৈনহামের মাথায় সংসারের নতুন বোঝা। ভোরে তার ঘুম ভাঙে ময়নাদের কথাবার্তা শুনে। ভোর থেকেই শুধু কথা কয় ওরা। জৈনহাম লম্বা বাঁশের কঞ্চিতে ছোট দড়ির ফাঁস বেঁধে গিরগিটি শিকারে বেরোয়। বড়শির মতো গিরগিটি ধরার ছিপের নাম খুইবাক দিয়ে গিরগিটি ধরে কেটে রোজ ময়না ছানাদের খাওয়ায়। মাঝে মধ্যে ভাত ছিটিয়ে খাওয়ানোর অভ্যাসও করে। বাঁশের চোঙে জল ভরে রাখে পিঞ্জুরায়। ময়নারা সে জল কখনো খায়। কখনো আবার ঠোঁটে নিয়ে গায়ে ছিটায়। জৈনহামও সকাল দুপুর বিকাল জল ছিঁটিয়ে ময়না স্নান করায়। কখনো হুঁকোর জল ছিটায় যাতে গায়ের উকুন মরে। দূর থেকে দূরে পাহাড়ে গিয়ে ঘাস ফড়িং খুঁজে আনে। জৈনহামের দিকে মাথা উঁচিয়ে ঠোঁট মেলে ডানা ঝাপটিয়ে অপেক্ষা করে। কে জানি বলেছে — পাকা মরিচ যত খাবে ঠোঁটের রঙ তত লাল হয়। রোজ জৈনহাম পাকা মরিচও খাওয়ায় তাই। দিন বাড়ে। গোটা বাড়ীটা ময়না নিয়ে বিভোর। আধো আধো কথা ফোটা শিশু দুটি যেন স্নেহ ভরা মায়াময় সংসারটা আলো করে থাকে। যখন জৈনহাম দিনরাত ময়না ময়না করে, তখন গ্রাম জুড়ে নিদান মাস। গ্রাম পাহাড়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া পাখা বিস্তার করে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসকে কেউ বলে "আসারিতা"। মানে দুর্ভিক্ষের মাস। জৈনামফা রোজ বসে বসে চাটাই বুনে। জৈনহামের বাপকে লোকে ডাকে জৈনমফা। ডলু বাঁশের বেত চিরে দিনে দুটো চাটাই বুনতে পারে। পেটে শূল বেদনা তাই ভারী কাজ করতে পারে না। চাটাই বুনে নেপালটীলা বাজারে প্রতি হাটবারে মানে শুক্রবারে যায়। নেপালটীলার বাজারে খদ্দের কম। দাম বাড়ে না। দূরের বাজার মাছলী বা ধূমাছড়ায় যেতে পারতো আগে। সেখানে দাম ভাল পেতো। এখন নেপালটীলা যেতেই পথে দু'-তিনবার বসে বসে জিরিয়ে নিতে লাগে। পেটের ব্যাথা তখন ক্যান ক্যান করে। জৈনমফার ছেলে মেয়ে পাঁচজন, স্বামী স্ত্রী, তার উপর বুড়ো বাপ। রোজগার করার কেউ নেই। জৈনহাম বয়েসে চৌদ্দ পনের হবে কিন্তু পাখীর মত ঘুরে ফিরে দিন কাটে। সংসারের দায়দায়িত্ব কিছুই বোঝে না। জৈনামফা কোন হাটবারে যদি অসুখ বিসুখে বা বৃষ্টির জন্য যেতে না পারে সে সপ্তাহে চুলা প্রায় জ্বলেই না। এমনি এক উপোস করা দিনে জৈনহাম বিকেলে আসে পাহাড় ঘুরে ময়নার ঘাস ফড়িং নিয়ে। এসেই দেখে পিঞ্জুরায় জল নেই। পিপাসায় ময়না দুটো ছটফট করে। শুকনো জিভ থিরথির কাঁপে মেলানো ঠোঁটের ফাঁকে, ঘন ঘন জলের শূন্য চোঙে ঠোকরায়।

জৈনহাম রেগে লাল হয়ে বলে— মা, ময়নারা অত ছটফট করছে কেন? সারাদিন এক ফোঁটা জল দেবার মানুষ কি কেউ নেই। বা এক মুঠ ভাত কি দিতে পার না। নিজেদের পেট ঠান্ডা হলে ডানে বায়ে তোমরা কেউ লক্ষ্য করো না। কোটরাগত চোখের মণি জ্বল- জ্বল করে জৈনামের মায়ের । ছেলেকে বোঝায় তবু -- সারাদিন বাড়ীর কেউ ভাত পায়নি। রাতেও চুলা জ্বলে নি। একটা বন আলু তন্নতন্ন করে খুঁজে পায়নি সারা পাহাড়ে। আর তুই বলছিস ময়নার খাবার । ময়না তো আমাদের বাচ্চাদের মতোই। আমরা কি আর বুঝিনা। থাকলেই তো খাওয়াতে পারি। জৈনামফা তামাক টেনে কাশতে কাশতে বলে আর বক বক করো না। মা বাপ যে উপোসে রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য আছে? ছোট ছোট ভাইবোনেরা গতরাত থেকে উপোস। ঠোঁটে মাছি ধরলেও তাড়াতে পারছে না এমন দুর্বল, দেখেও দেখিসনা, বুঝেও বুঝিস না । এমনি আমার কপাল মন্দ। ময়নার জন্য রাগ করছিস । আমরা মরে গেলেই ভালো। ময়না নিয়ে থাকিস। তোর বয়েসী ছেলেরা এখন মা বাপ পালে। আর তুই পাখীর মতো ঘুরছিস। লজ্জা শরম কিছু নেই। বাবারে খা ভাল করে খা। আমি মরে গেলি বুঝবি! জৈনহাম রাগে প্রত্যুত্তর দেয়। তুমি মরো না। মরলে আমারও হাত পা আছে ভগবান একটা কিছু করে খাওয়াবে। কাজ কি আমি করি না। চাটাই বোনার সব বাঁশ পাহাড় থেকে তো আমিই আনি। তবু যখন কাজের দাম নেই। বাড়ীতে বসে কিছু বেত চিরে চাটাই বুনবে সেটাই বড়। আর আমি মশা জোঁকের কাছে রক্ত দিয়ে বাঁশ আনি। কই একটা জামাও তো গায়ে দিতে পারি না। তবুও ঘরে ঢুকে শান্তি নেই।

বুড়ী তখন মিটমাটের স্বরে বলে— ঝগড়াঝাটি করে কী লাভ । কেউ কাজ না করে ঘুমিয়ে থাকে না। তুইও যেমন কষ্ট করে বাঁশ কাটছিস তেমনি বুড়োও শূল বেদনায় উঠতে না পেরে দিনরাত চাটাই বোনে । ঝগড়া করে পাড়ার লোক হাসানোর কী দরকার । কি করে এক মুঠো ভাত পাওয়া যায় তার চিন্তা কর । কিছুক্ষণ নীরব থাকে জৈনহাম। ঘরে উপোসী করুণ মুখগুলি জ্বলজ্বল চোখে তাকে যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। জৈনহাম বুঝতে পেরে বলে, ঠিক আছে। কাল থেকে চৌধুরীর জুম বাছাই এর কাজে যাব। আর পেড়পেড়ি ভালো লাগে না। এখুনি যাচ্ছি চৌধুরীর বাড়ী থেকে দু কেজি চাল আগাম ধার চেয়ে আনছি। মা আনাজ তরকারি যোগাড় কর ।

বলেই হন হন করে হাঁটতে থাকে। কোটরাগত চোখে মুচকি হেসে বুড়ি তখন বলে আপন মনে— বাবারে আগে যদি খেয়াল করতে। এত কষ্ট হতো না।

রোজ সকালে কলাপাতার মোড়ক বেঁধে ভাত নিয়ে ছোটে চন্দ্রহাম চৌধুরীর জুম ক্ষেত বাছাই এর কাজে। নিজের খেয়ে মজুরী পায় সাত টাকা। বিকেলে কাজ থেকে ছুটি পেয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যেও ঘনায়। অন্যের জুম ক্ষেতে যখন নিড়ানী চলে তখন নিজের জুম ক্ষেতে বীজ খুচিয়ে রোপণ চলে । বিরাট জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে জমি তৈরীর কাজ শেষ। বীজ ধানের অভাবে অর্ধেক ধান খুচানোর পর সব কাজ বন্ধ। বীজ দূরের কথা খোরাক পর্যন্ত নেই। যতটুকু বীজ বোনা হয়েছে সেটাও আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে ফেলেছে। নিড়ানীর সুযোগ নেই। কি খেয়ে কাজ করবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের আরেক নাম নিদান মাস।

নিদান মাসে পাহাড়ী চোখ কোটরে বসে । বনআলু তন্নতন্ন করে খুঁজে পায় না কেউ।

বনআলু কারো রোপণ করা না, ক্ষেত ভরে থাকে না। বনআলু মানে এক বুনো লতার শিকড়। খিদে পেলে সেদ্ধ করে খায়। নিদান মাসে বন আলু ধরে না। শুধু গাছের লতাপাতা বাড়ে। দু'একটা পেলেও এই মাসে বন আলু সেদ্ধ হয় না। কেউ বাঁশ করুল খেয়ে বাঁচে। নিষ্ঠুর সময়ে করুল মাত্র অঙ্কুরিত হয়। মহাজনের ঋণ ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। ঋণ মানে মাঠের ফসল অল্পদামে আগাম বিক্রি করা। ঋণ না আনলে এতগুলো পেট চলবে কেমন করে। নিদাম মাসে জৈনামফা গেল ধূমাছড়া বাজারে। মদন মহাজনের গদীতে। এই অঞ্চলে পাট, কার্পাস, তিল,ধানের সর্বচেয়ে বড় মহাজন। পাহাড়ী জুমিয়াদের জন্য বৃষ্টির মতো টাকা ছাড়ে। ফসলের মরসুমে সুদে আসলে পাহাড় থেকে ঢল নামে লাভের। জৈনামফার দুশো টাকা দরকার। ত্রিশ কেজি বীজধান হলে খালি জুমটা ভরতে পারে, অন্য দিকে নিদান দিনগুলোও কোন রকম কাটাতে পারলেই বাঁচে।

মদন মহাজনের গদীতে বড় মিরতিঙ্গা বাঁশের দুটো হুঁকো। কোন পাহাড়ী গদীতে এলে তামাক ভরে টানতে দেয়। ওর দোকানেই পাহাড়ীদের নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রাখে। বন্ধকী ব্যবসাও তার রমরমা! পাহাড়ী মেয়েদের রূপোর মালা, হাতের বালা, সব কিছুই বন্ধক রেখে টাকা দেয়। দোকানের পাশেই লম্বা একটা হলঘর। গুড়ের টিনের গুদাম। শুকনা মাছের মটকাও থাকে। ঘরের ভেতর বিরাট মাচা। অনেক দূরের পাহাড়ীরা যারা বাড়ী ফিরতে পারে না তারা ঐ মাচায় নারী পুরুষ দল বেঁধে ঘুমায়। মদন মহাজনের কাছে জৈনামফা ঋণের কথা বলে। কালো বিরাট পুরুষ মদন মহাজন। জৈনামফার কথা শুনে বলে— ঋণ দেব। তবে আসলের অর্ধেক সুদ দিতে হবে ফসলে। অগামী মঙ্গলবার তোমাদের পাড়ায় গিয়ে খোঁজ নেব। জুম আসলে কতটুকু করেছ। কি লাগবে না লাগবে না দেখে ঋণ দিই না কাউকে।

ঠিক দুপুরে মদন ছাতা মাথায় দিয়ে হাজির হলো জৈনমফার ঘরে। সঙ্গে তার কর্মচারী। ছিপছিপে রোগা। বগলে একটা লাল কাপড় জড়ানো হিসেবের খাতা। কোন পাড়ায় কত ঋণ সব লেখা। সারা পাহাড়ের মানুষ ওই খাতায় বন্দী। মহাজনের কাছে ঋণ নেই এমন কেউ এই পাহাড়ে থাকে না। জৈনহাম তখন ছিলনা। গিয়েছিল চন্দ্রহাম চৌধুরীর জুম ক্ষেতে মজুরী খাটতে। মহাজন টংঘরের বারান্দা 'সাংসিতে' বসে। সামনেই ময়নার পিঞ্জুরাটা চালা থেকে ঝোলে। মহাজন জৈনমফার সাথে জুমের খবর নেয়। কার ফসল কেমন। কে কত অভাবে চলছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। কোঁ! কোঁ! পিক পিক! পিউ পিউ! হাজার কথার ঢং। তবু তাদের কথা শেষ হয় না। মদন মহাজন সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার হিসেব-পত্রের কথা বলে। সব শেষ করে দশ টাকার নোট বের করে জৈনমফার কাছে এগিয়ে বলে — গোণ ভাল করে, গোণ। এই একশো টাকা আজকে দিলাম, বাকী একশো টাকা দেবো সামনের বাজার বারে। ফসল যখন তুলবে তখন দুশো টাকার সুদ আসল মিলিয়ে তিনশো টাকা শোধ করতে হবে ফসল দিয়ে। দেখ ভাল করে পোষায় কিনা। আগে তিতা পরে মিঠা ভালো। তবে আরেকটা কথা, ওই ময়না জোড়া যাবার সময় নিয়ে যাব। কি বল? জৈনমফা বলে— যা বলেছেন তাতো সবই ঠিক। দশ জনে যেমন নেয় তেমনি আমিও ঋণ নেব। শোধ করার সময় কম দেই বেশী দেই সে সব জন মহাজন ঠিক থাকলেই হয়। তবে ময়না জোড়ার মালিক আমার বড় ছেলে। ওকে জিজ্ঞেস না করে

দিই কি করে ? কাজ থেকে ফিরে এসে ময়না ছানা না দেখলে ঘরে আগুন জ্বালাবে। মদন মহাজন একটু বিরক্ত হয়ে বলে আমি এত টাকা বিনা কাগজে বিনা জামিনে দিতে পারি। আর তুমি দুটো বনের পাখী দিতো ছেলেকে দেখাচ্ছো? তা কেমন কথা? যাক তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে বোলো মহাজন পছন্দ করে নিয়ে গেছে। বড় কাতরভাবে জৈনমফা বলে — বাবু তা হয়না। ওই পাখী দুটিই আমার ছেলের প্রাণ। ও এলে আপনি যদি পারেন তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যান, আমরা আপত্তি করবো না। মহাজন দ্যাখে সিধে অঙ্গুলে ঘি উঠবে না। ক্রুর একটা হাসি ফোটে চোখে। মুখে। বলে— শোন জৈনামফা ওই পাখীরা আমার বাড়ী গেলে রোজ ব্রিটানিয়া বিস্কুট দুধে মিশিয়ে খাওয়াব। সপ্তাহে সপ্তাহে পশু হাসপাতালের পশু ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করার। পাকা চাপা কলা খাইয়ে দেহ কেমন পুষ্ট হবে দেখবে । এখানে ওরা খেতে পায় না। কি খাওয়াব না খাওয়াব সেটা পরের কথা । আসল কথায় আসি। ফরেষ্টার বাবুরা এখনো খবর পায়নি। যদি পায় ময়না দুটোর মাশুল লাগবে কম করেও দেড়শো টাকা। দিতে না পারলে, ধরে নিয়ে তোমার ছেলেকে জেলে দেবে। মামলা চলবে। এই নিদান মাসে এত টাকা যোগাড় করতে পারবে ? জৈনামফা, ওপর দিকে চোখ তোলে ময়না দুটোর দিকে। ফরেষ্টার, মাশুল, জেল শব্দগুলো শুনতেই একটা ভয় ভয় শিহরণ জাগে সহসা। দেহের সমস্ত ভিতর জুড়ে ভয় আর বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসে। জৈনহামের মা দরজার আড়ালেই ছিল। চোখ বিস্ফারিত ভয় ভরা উদ্বেল। করুণ কাতরতা জড়ানো গলায় বলে— মহাজন ভালমন্দ সব তুমিই জান। পাখী দুটো আমার নিজের সন্তানের চেয়েও আদরের। তুমি কি পারবে! নিজের সন্তান দিয়ে দিতে অভাবের জ্বালায়?

মহাজন বুঝতে পারে ওরা নাছোড়বান্দা। ছলনায় খুব একটা কাবু করা যাবে না। কৌশল পাল্টায়। রুক্ষ নির্মম গলায় বলে — দেখ জৈনামফা। ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পাখী দুটি যদি না পাই ঋণ ফিন দিতে পারবো না। এখন বলো কি করবে? কথার ভঙ্গীতে উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য ফোটে প্রকট হয়ে।

স্বামী স্ত্রী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে । উত্তর দেয়ার মতো কোন ভাষা খুঁজে পায় না। দু'জনেই বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একসাথে, মহাজন নিজেই উঠে পিঞ্জুরার দড়ি খুলে হাতে ঝুলায়। আপন মনে বলে, না দিয়ে যাবি কোথায়! ক্রুর হাসিতে মিট মিট করা চোখ দুটোতে ধূর্ত শিয়ালের মতো চাউনি। জৈনহামের মা বাপ অসহায় চোখে ফ্যাল ফ্যাল তাকায়। বাধা দেওয়ার সমস্ত শক্তি অবশ হাতের মুঠিতে ঘামে ভেজা দশ টাকার খস খসে নোটগুলো। কে যেন নোটগুলো গলার ভিতর খুঁচিয়ে পুরে দিচ্ছে। ইচ্ছা করলেও রুদ্ধ গলায় কিছুতেই আওয়াজ বোরোয় না। ময়নারা অচিন লোমশ কালো হাতটা দেখে ছটফট ডানা ঝাপটায় পিঞ্জুরার ভিতর।

সূর্য তখন পশ্চিম পাহাড় চূড়ায় মিরতিঙ্গা বাঁশের বনে ডুবু ডুবু । আকাশ জুড়ে পাখীরা নীড়ে ফিরে রোদের গন্ধ মুছে। জৈনহাম কাজ থেকে ফেরে। জামার পকেটে কয়েকটা ঘাস ফড়িং। কুকীছড়াতে নামতেই সন্ধ্যায় জল তুলতে যাওয়া মেয়েদের মুখে সব ঘটনা শুনতে পায়। তবু নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করতে পারে না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় হন হন করে ছুটে বাড়ীর দিকে। বারান্দায় উঠতেই দেখে পিঞ্জুরা নেই। বুকে সহসা ছুরিবিদ্ধ মানুষের মতো কপালে দু'হাতে প্রচন্ড জোরে আঘাত করে বসে। পৃথিবী কাঁপানো চীৎকার দেয়। মা তোরা আমার সব শেষ করে দিলি।

আমার চোখ দুটো খুলে কেন বেচতে পারলি না। বিলাপে প্রলাপে উন্মাদ জৈনহাম । বিলম্বিত কান্নার সুর বাতাসে মিলায়। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার মাও কাঁদে। জৈনামফা গামছার খুটে চোখ মুছে সব কথা বলে। জৈনহাম আঁখি মুছে দাঁড়ায়। শক্ত হয়ে উঠে মুখ—অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় চোখ মুখ আরো রক্তিম হয়ে উঠে ।দাঁতে দাঁতে কিড়মিড়। মা এখুনি মহাজনের কাছ থেকে পাখী দুটো ছিনিয়ে আনবো। দেখি মাশুল, জেল,কতদূর হয়। কারো কোন উত্তরের অপেক্ষা করে না। বলিষ্ঠ আশায় চোখ জ্বল জ্বল। হনহন ছুটতে লাগলো দৃঢ় পদক্ষেপে ছমছমে নির্জন পাহাড়ের পথে বাজারের দিকে। বুকের ভিতর এক শূন্য হাহাকার তোলপার করে। অনেক দূরে পাহাড়ের সীমায় আকাশের কোণে দুটো পাখী উড়ে যায়। দূর থেকে দূরে মিলায় ক্লুং ! কিঁ ওই! ক্লুং! 'কিঁ ওই! বেদনায় ভরা ডাক ।

কাঁসার বাটি

প্রতাপদের বাড়ীর সামনে বিরাট পুকুর, চার পাড়ে কচিসহ বাঁশ পোঁতা তাতেই ঝুলে ঝুলে রয়েছে সিম গাছের লতাপাতা। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ঘাটের পাশে ছাইতুষ দিয়ে এই খাড়া দুপুরে কাঁসার বাসনগুলো মাজতে মাজতে থমকে গেল হীরা, কাঁসার বাটি খুব ভালো করে এঁটে। লেবুর সাথে ছাইতুষ দিয়ে আলাদা যত্ন নিয়ে মাজতে, সেটা তার খুব পরিচিত। এই কাঁসার বাটি যত বেশী পরিষ্কার হয় তত বেশী তার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রতাপদের বাড়ী, এই গাঁয়ের মধ্যে মোটামুটি স্বচ্ছল, এই বাড়ীর মেয়েরা, বৌরা বাসন মাজতে পারে না বা জানে না তা নয়, তবু একটু অলস, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর শীতল পাটি পেতে বারান্দায় পান সুপারী খাবে, একটু মৌজ করবে। একে আরেকের মাথার উকুন ধরবে, অলস হাই তুলে একটু আধটু গল্প করবে, এমন সময় কি আর রোদ দুপুরে ঘাটে বসে বাসন মাজতে ভালো লাগে?

তাই রোজ হীরা এই বাড়ীতে দুপুর বেলা আসে বাসন টাসন মাজতে, এই বাড়ীর গিন্নীরা ওকে কোন দিন এক কৌটা চাল দিয়ে বিদায় করে, কোন দিন এক সন্ধ্যায় ভাত তরকারী রেখে দেয়, এতেই হীরা সন্তুষ্ট। কম বেশীর জন্যেও কোন দিন অভিযোগ করে না— হীরা সকাল হলে ঘুম থেকে উঠেই চলে যেত গাঁয়ের এ বাড়ী ও বাড়ী ধান ভানতে। ঢেকির পাশেই একটা ন্যাকড়ার তালি দেওয়া কাথাতে বাচ্চাটাকে রেখে, ঢেকিতে ধান ভানা প্রতিদিনকার ঘটনা! এমন করে চলছে ওর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে আজ অবধি। ধানের তুষের ডালার পাশেই আস্তে আস্তে বাচ্চাটা বাড়ছে। প্রত্যেক বাড়ীর ঢেকিগুলো কি কাঠের তৈরী, কোন্ বাড়ীর ঢেকি ভাড়ী না পাতলা, হীরামতি বলতে পারে।

বাচ্চাটা যখন হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল হীরামতি বাচ্চাটাকে নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। প্রতাপদের বাড়ীর কালো কুকুরটা ঢেকির পাশেই তুষের ডালায় শুয়ে থাকে, বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিয়ে কখনও কুকুরের লেজ কান কামড়ায়। কুকুরের মুখের লালা লক লক জিহ্বাটা হাত দিয়ে ধরতে একটুও ভয় করে না। এই গাঁয়ের দক্ষিণ মাথায় ছন বাঁশের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটায় হীরামতি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে থাকে। ওর ঘরের পাশের বেড়াটা ভেঙ্গে গেছে কয়েক রাত আগে। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে শেয়াল ঢুকে ওর কালি ঝুলি মাখা ভাতের হাঁড়িটা নিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে গেছে।

বাচ্চাটা এবার ছয় বছর বয়সে দাঁড়াল। পরের বাড়ীর ধান ভেনে, কারও বাড়ীতে লেপা পোছা করেই কোন রকমে ছেলেটাকে গাঁয়ের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিল। হীরামতি গরীব, অকালে বিধবা, শরীরের ঠাট-বাট যুবতী মেয়ের মতই রয়েছে, একটুও ভাঙ্গেনি, রোদ-বৃষ্টিতে পরিশ্রমে গায়ের চামড়াটা শুধু কিছুটা ময়লা হয়েছে।

এই গাঁয়ের মোড়ল অবিনাশ, বেশ পয়সাকড়ির মালিক, বয়স পঞ্চাশ হবে, সে কতবার মোহনের মাকে পাঠিয়েছে হীরামতির কাছে নুতন করে সংসার পাতার প্রস্তাব নিয়ে। হীরামতির একমাত্র চোখের মণির কথা চিন্তা করেই ঘর সংসার করেনি।

গাঁয়ের ষন্ডামার্কা যুবকটা যাকে কালো মনা বলে গাঁয়ের সবাই চেনে। সেই কালো মনাও হীরামতির কাছে হার মেনেছে। একদিন রাত দুপুরে হীরামতির ভাঙ্গা বাঁশের দরজা টানাটানি করতে গিয়ে, হীরামতি ওকে ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়েছে।

হীরামতি গাঁয়ের মোড়লদের খুব শ্রদ্ধা করে। পুকুর পাড়ে কোন মোড়ল থাকলে, ঘাটে জল নিতে নামে না, হঠাৎ রাস্তাঘাটে কোন মোড়লকে দেখলে ঘোঁমটা টেনে রাস্তার পাশে থেমে পড়ে। তাই পাড়ার মোড়লরাও ওকে কোনদিন খারাপ চোখে দেখেনি। গাঁয়ের কোন ঘরে প্রসূতি হলে ঐ বাড়ীতে গিয়ে হীমামতি রান্না বান্না, কাজকর্ম চালিয়ে দিত। গাঁয়ের কোন গিন্নীর অসুখ, বিসুখ হলে গেরস্তের বাড়ীতে ধান সিদ্ধ করা, ধান রোয়া, মাড়া, ঝাড়ায় সাহায্য করা হীরামতির মজ্জাগত।

নিজের মণিকে যেমন আদর করত তেমনি অন্যের ছেলেমেয়েকেও । মায়েরা মারপিট করে দুষ্টুমির শাসন করুক এটাও হীরামতির ভালো লাগত না।

রোজ মণি স্কুল থেকে এসে ছুটাছুটি করে, সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফেরে, ওকে হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে পড়ায় বসিয়ে দেয়। রাত একটু গভীর হলেই মায়ের গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পরে। মায়ের গল্প শুনতে ভাল লাগে, হীরামতি ছড়ার দেশের গল্প বলে। এত বড় হয়েছে তবু মায়ের বুকের স্তন চুষতে ওর লজ্জা হয় না। এই নিয়ে পাড়ায় লোকেরা ওকে টিটকারী দেয়, এতে ওর কিছু আসে যায় না বরং পাড়ার লোকেদের জিহ্বা বের করে ভেংচি কেটে পালিয়ে আসে।

শ্রাবণ মাসের সপ্তাহ, বৃষ্টি পড়ছে, সেই শনিবার থেকে আজ অবধি থামছে না। রাস্তার উপর গরু মহিষ চলাচল করে কাদায় ভরে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটু পর্যন্ত ডুবে যায়। চারদিকে উঠান খাল বিল জলে থই থই করছে। গাঁয়ের কেউ ধান শুকোতে পারেনি, আর গাঁয়ের অনেকের ঘরেইতো ধানচাল শেষ হয়ে গেছে। বেশী বৃষ্টিতে দু'তিনবার বন্যা আসায় অনেকেরই ধানবীজ নষ্ট হয়ে গেছে, কেউ দুবার তিনবার হালির চারার জন্য বীজ ফেলেছে। সারা গাঁয়ে অভাব। ঘরে বাতি জ্বলছেনা কেরোসিনের অভাবে, গত দু'দিন পাশের বাড়ী থেকে এক কুপি কেরোসিন এনে চলছিল। আজকে কোথাও কেরোসিন নেই, শুধু কি কেরোসিন, দু'বেলা হল হাড়িই চড়ছেনা। এই বাদলা দিনে কে ধান ভানবে। আর যাদের ধান আছে রোদের অভাবে শুকাতে না পারায় বাজারে মেসিনে চাল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসে।

হীরামতির হাতে একটা কানা কড়িও নেই, মণিটা ক্ষুধার জ্বালায় ঘানর ঘানর করে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরে আবার হয়ত জাগবে আবার কাঁদবে। বাদল ঝড়া দিন, বিকেল বেলাতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। ঘরের চাল থেকে বৃষ্টির জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, অনেক বুদ বুদ সেদিকে চেয়ে দাওয়ায় বসে হীরামতি, গায়ে পুরানো ছেঁড়া কম্বল। ভাবছে আজকেও বৃষ্টি থামবে না, কি দিয়ে ছেলেটার মুখে এক মুঠো ভাত তুলে দেওয়া যায়।

বাঁশের মাচাটার পাশে যেখানে চাল দিয়ে ঘরের ভিতর জল পড়ে সেখানে একটা পুরানো কাঁসার বাটি পাতা ছিল। বাটিটা জলে ভরে যাওয়ায় মেঝের উপরে উপচে উপচে পড়ছে। নজর পড়ল সেই বাটিটার দিকে। জলটা বাইরে ফেলে বাটিটা হাতে নিয়ে ভাবছে ঘরে কিছু না থাকুক অন্নতঃ এই বাটিটাত আছে। প্রতাপ বাবুদের বাড়ীতে এটা বন্ধক দিয়ে কয়েক টাকা পাওয়া যাবে।

তাই দিয়ে বাজার থেকে দু'সন্ধ্যা চলবে। নুন কেরোসিন এনে বাদলা দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারে। এই বাটিটাইবা কি করে বিক্রি করবে, স্বামী থাকতে কেনা বাটি, দুধ ভাত খাওয়ানোর জন্য সখ করে কিনেছিলো। আজ দুধ ভাত না থাক বাপের কেনা বাটিতে ফেন ভাত খাচ্ছে। আর এই বাটিতে স্বামী-স্ত্রীর স্মৃতি জড়িত আছে। ভালবাসার স্মৃতিই উন্নীত হয়েছে স্নেহে। বাপের উপচানো স্নেহ এই চকচকে কাঁসার বাটিতে উজ্জ্বল। তালি দেওয়া কাথার মুড়ি দিয়ে মণি শুয়ে আছে। পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার আওয়াজের মধ্যে ঘুমন্ত মণির লম্বা শ্বাস প্রশ্বাস হীরামতি শুনতে পেল। একবার মণির কথা, মণির বাপের কথা ভাবছে, আবার মণির পেটের ক্ষুধার জ্বালায় হীরামতির বুকটা ধিক ধিক করে ছাই হয়ে, শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে প্রতাপবাবুদের বাড়ীতে বন্ধক দিয়ে নিয়ে এল সাত টাকা। তাই দিয়ে বাদল ঝরা দিনগুলো মোটামুটি কাটিয়ে দিল। দু'তিন দিন পরে পান্তা ভাত খেয়ে গিয়ে মনির আপত্তি কাঁসার বাটি ছাড়া খাবে না। কাঁদতে শুরু করে। হীরামতি ওকে কোলে নিয়ে বুকের স্তন চুষিয়ে বলল— কেঁদোনা আমার লক্ষ্মী ছেলে, ডোবায় বাটিটা ধুতে গিয়ে পড়ে গেছে, ডোবায় এখন অনেক জল, জল কমলে খুঁজে দেখব। মনিও মায়ের দেওয়া বুঝটা মেনে নিল।

বাড়ীর উঠানের পাশেই একটা ডোবার মত গর্ত। প্রতিদিন মনি একটা বাঁশ দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে ডোবায় দেখে, কি জানি বাটি পাওয়া যায় কিনা। বর্ষা গেল আস্তে আস্তে শীত এল, খাল, বিল শুকিয়ে গেছে, ডোবাটায় এখন প্রায় এক কোমর জল, গাঁয়ের কয়েকজন বড় ছেলেকে মনি ডেকে আনলো। টিনের থাল হেওয়াত বা জল সেচের বাঁশ লাগানো টিনের টুকরা নিয়ে জল সেচতে আরম্ভ করল। মনির বিশ্বাস এখানেই তাদের বাটি পাওয়া যাবে। তার মা তাকে কোন দিন নিজে কথা বলবে না। হীরামতি বাইরে ধান ভানতে গিয়েছিল, এসে দেখে এই কাণ্ড। বার বার ইচ্ছে হল বলতে, বাটি সে বন্ধক দিয়েছে, এই গর্তের জল শুধু শুধু কষ্ট করে সেচে লাভ হবে না। এই কথা বলা মানেই ছোট নিষ্পাপ শিশুটার মনে দারুণ আঘাত দেওয়া ছাড়া কিছু না। জল সেচে, লাটি, মাগুর, পুঁটি মাছ ধরতে লাগল গাঁয়ের ছেলেরা। কিন্তু মনি কাদা মাটির প্রত্যেক ইঞ্চি কাদা মাটি হাতড়িয়ে দেখছে। বাপের হারানো স্নেহ স্মৃতি কাদা মাটির বুক থেকে বের করার ব্যর্থ প্রয়াসে। হীরামতিকে ক্ষত বিক্ষত করলো। তবুও সে বলল না বাটি বন্ধক দিয়েছে। কচি শিশুর নির্মল বিশ্বাসের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করার অধিকার তার নেই। মায়ের প্রতি ছেলের অগাধ ভালবাসা, আস্থা, বিশ্বাসের উপর সন্দেহের কলুষ বিন্দু স্পর্শ করতে দেবেনা, তাই সে চুপ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনি ক্লান্ত হয়ে কাদা মাখা দেহে উঠে মায়ের কোলে মাথা রেখে শরীরটা বারান্দার মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে বলল— মা, বাটি বোধ হয় জাল মেরে চুরি করে কেউ নিয়ে গেছে। মায়ের নীরবতাই তখন ভাষা, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে মূল কথাটা এড়িয়ে গেল, বলল "শরীরের কাদা শুকিয়ে গেলে চামড়া টান টান হবে, চল চান করে আসি"।

প্রতাপবাবুদের বাড়ীর বাসন মাজতে গিয়ে বারবার বাটিটা ওর হাতে আসে। কোনদিন, ইলিশ মাছের তেলে বাটিটা চট্ চট্ করে, ছাই তুষ দিয়ে পরিষ্কার করে, এই বাটি যত উজ্বল হয়, ততই স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর সোহাগ, আরও বেশী সজীব হয়ে ওঠে হীরামতির মনে। প্রতিদিন প্রতাপবাবুদের বারান্দায় যখন বাসনগুলো রেখে আসে মনে হয়, স্বামীর সোহাগ ভালবাসা স্মৃতি

সব রেখে আসছে।

ঘরের বাঁশের পালাতে গর্ত কেটে অনেকবার চেষ্টা করল, বাটিটা বন্ধক থেকে ছুটিয়ে আনার মত টাকা যোগাড় করতে, সুদে আসলে টাকার পরিমাণ প্রায় বিশ টাকা হয়েছে— এই অভাব অনটনের মধ্যে কোনদিন সেই টাকা একত্রিত হলো না, দশ বারো টাকা হলেই এমন অভাব পড়ে, যে টাকা না ভাঙলে আর চলে না, হয়ত মনির অসুখ, হয়ত বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে আর গা ঢাকা যাচ্ছে না, নুন কেরোসিন ভাত আরও কত কি!

আজকে প্রতাপবাবুদের বাড়ীর পরব; বাড়ীর গিন্নীরা সবাই ব্যস্ত, নানা ব্যঞ্জন পায়েস দিয়ে রান্না ঘন ঘন বাসন মাজা ও ধোয়া হীরামতির কাজ। কখনও বাটিতে পায়েস, কখনও মাংসের পচা ঝোল, কখনও বা বুটের ডাল, মোট সাত আট বার মাজতে এল। আজকে ভাবল বাটিটা সে নিয়ে যাবে। প্রথম দু'তিনবার বাটিটা বাসনের সাথে রেখে দিল। চতুর্থবার দেখল চারিধারে কোন লোক আছে কিনা, তারপর আস্তে আস্তে, আঁচলে লুকিয়ে রাখল, আবার ভাবল একটা বাটির জন্য বদনাম পাবে, গাঁয়ের লোকেরা চোর বলবে, সারা জীবনের জন্য একটা দাগ থাকবে, অনেক চিন্তা করে। আবার বাটিটা শুধু মাজতে মাজতে ভাবল কোনদিন এই বাটি আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সপ্তমবার বাসন মাজা শেষ করে বাসন ঘাটে রেখে উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ দেখতে পাচ্ছে কিনা। না কেউ দেখেনি। তার বুকটা দুর দুর করে কাঁপছে। হাতটা বাড়িয়ে দিল কাঁসার বাটির দিকে।

হাতের কাঁপুনিতে কাঁসার বাটি বাকি বাসনগুলোর সাথে ঝন ঝন করে উঠল। মনে হল গোটা বাড়ীর মানুষ এই শব্দে ওর দিকে তাকাচ্ছে। আবার উঠে দাঁড়াল, না কেউ দেখেনি, শুধু মনের ভুল।

আর একটু সাহসের সাথে বাটিটা নাভিদেশে লুকিয়ে আঁচল দিয়ে ঢাকল। আস্তে আস্তে বাসনগুলো বারান্দায় রেখে দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল। এমন সময় ঘাটের পাশে সিম তুলে প্রতাপবাবুর মা খিট খিটে বুড়ীটা ফেরার পথে 'কিলো বাসনপত্র রেখে এলি, এত শিগ্‌গির চলে গেলে বাকী কাজ কে করবে।'

আমতা আমতা করে ঠোঁট কাঁপিয়ে, পা কাঁপিয়ে হীরামতি জবাব দিল না, 'মনিটা এখন স্কুল থেকে আসবে, ওকে খাইয়ে এখুনি চলে আসছি।' তা তোর কোচরে ওটা কি ফুলে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে উঠানে বাড়ীর গিন্নীরা জড়ো হয়েছে, কারও হাতে ঝাড়ু, কারও হাতে লাকড়ি, মাঝখানে হীরামতি দাঁড়িয়ে কাপড়ের আঁচলটা দাঁতে চিবোচ্ছে, চোখ বেয়ে জল, মাটির দিকে চেয়ে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুড়ছে।

গাঁয়ের পাঠশালা তখনও ছুটি হয়নি। মাষ্টারবাবু কালো বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন র—থ রথ ইত্যাদি। পেছনে বেঞ্চে বসে মনি আনমনা হয়ে ডাগর চোখ দুটো জানালার দিকে আকাশে উড়ন্ত মেঘে। ভাবছে মায়ের কথা, মা বোধ হয় বারান্দায় বসে একাকী মাথার উকুন ধরে ধরে ছেলের আসার অপেক্ষায়। ঘরের ভেতর বাঁশের ঝুঁড়িতে ঢাকা একটু ভাত, একটু জল। ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা বাজল, পড়ন্ত রোদের আলো বকের পাখায় চড়ে গেল পশ্চিমের দিগন্তে। ঘরের ফেরার শিশুরা চলল, মায়ের উষ্ণ বুকে, মায়েদের হাসি, শিশুদের ক্লান্তি ঝরিয়ে দেবে। আব্দারের সুরে

"মা" বলে ডাকবে।

মনিও ছুটে চলল সোজা বাড়ীর দিকে। হাতে শ্লেট ও চট চট করা 'পড়বো লিখবো" বই এর মলাট। বারান্দায় ওর মাকে দেখতে পেল না, ভাবল মা বোধ হয় ঘরের ভেতরে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলছে।

বাঁশের ভাঙ্গা দরজা শিশুর আবেগ ভরা ধাক্কায় মড় মড় করে উঠল। মনির বুকে প্রচন্ড একটা আঘাত লাগল, "মা" বলে গলা ফাটিয়ে একটা চীৎকার! কড়ি কাঠ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে চেয়েছে তার মা, কিন্তু পারল না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। গাঁয়ের কুড়ে ঘরগুলোতে মিট মিটে বাতি জ্বলতে লাগল। মনিদের কুটিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতে কেউ এল না, তার মা যে সোহাগ স্মৃতিটুকু আনতে গিয়ে এক বোঝা লাঞ্ছনা ও অপমানকে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল সমাজের পরাজিত মানুষের গলিতে। মনির একটা চীৎকারে ফিরে এল বুকের কাছে। জড়িয়ে নিল মনিকে। নতুন করে বাঁচার মোমবাতিটা ধরিয়ে দিল মনি।

জাবেদ আলির আজান

জেলের দেয়াল উট্‌কে ভোর আসে অনেক দেরীতে। ঘটঘটাং শব্দে সুবোধ পুলিশ হাজতী খানার তালা খোলে। চাবি ছড়ার ঝুমুর ঝামুর শব্দে সারা জেলখানায় মুক্তির চঞ্চলতা। রাতের বাসি গন্ধমাখা কম্বলগুলো ভাজ করে সারি সারি বেঁধে বেরিয়ে আসে হাজতী বন্দীরা। দরজা খোলা খাঁচার মুরগীর মতো ঠাসাঠাসি চাপাচাপি। কার আগে কে বেরুবে। আরমান খাঁ, নাজীর আলী, যেমন গরু চুরির আসামী তেমনি পুতুল নাথ, বুন্দি দেববর্মা সংরক্ষিত বনের কাঠ কাটা আসামী। জাবেদ আলী বাংলাদেশ যুদ্ধের আসামী। কেউ তিন মাস কেউ দশমাস, কেউবা বছর দেড়েক হাজতী হয়ে জেলে পঁচছে। বিচার কখন হবে বা কার জামিন হবে জানা নেই। তারিখে তারিখে কোর্টে নেয় আবার বন্দী শালায় ফিরিয়ে আনে। বিচার দূরের কথা, কারো কারো অভিযোগ এখনও তৈরী করে পুলিশ জমা দেয়নি। হাজতে বসে বসে কারো গিটে গিটে ব্যথা। কারো বা বুকে কোমড়ে জ্বালা। তবু চাবি ছড়ার ঝনঝনানিতে কেমন যেন বন্দীদের বুকে মোচড় দেয়।

হাজতী খানার সামনে ফুলবাগান। মৌসুমে মৌসুমে দেশী বিদেশী ফুল ফোটে। জাবেদ আলী রোজ সকালে কলাবতীর পাতা তুলে ঠোঙা বানায়। গোলাপ, রজনী গন্ধা, শেফালী ডালিয়া সূর্য্যমুখী নানা ফুলে শিল্পীর মতো ফুলের তোড়া বাঁধে। জেল জমাদার সেই তোড়া জেইলারের ঘরে পৌঁছে দেয়।

জাবেদ আলী পুরোনো কয়েদীদের মুখে শুনেছে জেইলার বৌ নাকি ফুল খুব ভালোবাসে। ফুল দেখে টেখে জেইলার বৌ যদি খুশী হয়। জেইলার সাহেবকে কিছু বলে কয়ে জাবেদ আলীর খালাস বা জামিনের কাজটা এগিয়ে দেয় মন্দ কি। তাছাড়া সকালের ফুলের শিশির ঝরে যখন, মনে হয় ঘরের বিবিজান হানিফার চোখের জল। তার উপর ফুলের পাপড়ীগুলোর নরম পরশে অনুভব করে ছোট্ট মেয়ে মর্জিনার গালের কোমলতা।

আকাশটাও তখন শিশুর গালের মতো রাঙা। বাঁধন হারা পাখা মেলে ঝাঁক ঝাঁক পাখী উড়ে। জেলের ভেতর জেল, তার ভেতর সেল। ছেলের খুনে হাত রাঙানো অমর মিস্ত্রীর পাগলী বৌ জেলে থাকে। ছেলের কথা মনে এলে কখনো কখনো কাঁদে। কখনো বা বাচ্চা আদরের ঢঙে সুর তুলে ছড়া আওড়ায়।

সবাই যখন বেরিয়ে আসে আপন মনে হাজতী খানায় ব্যস্ত থাকে বিদুর বাবু। কম্বল থেকে ছারপোকা ধরে দেয়ালে টিপ দিয়ে মারে। দেয়ালটায় কতশত ছারপোকার লাশ শুকানো না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ।

রান্না ঘরের পাশে টিউবওয়েলে সারি বেঁধে কাঠ কয়লায় মুখধোয়ার তাড়াহুড়া। পকেটমার মামলার আসামী সুধীর আর ওভারলোড মোকদ্দমার আসামী কৃষ্ণ ড্রাইভারের ঐসব লাইন টাইন ভালো লাগে না। দু'জনে বসে বিড়ি টানে বারান্দায়। জাবেদ আলী তখন ঝাঁঝরি নিয়ে ফুলের চারায় জল দেয়। নাজিম আলী কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে "অ জাবেদ ভাই, নুয়া আসামীয়ে বিড়ি কণ্ডু দিছইন্?" জাবেদ আলী পাল্টা জবাব দেয় "বিড়ি তো দিছে বা, কিন্তু রুটী কটা দেওয়া

লাগবো হক্টানি-জান।'' এমন সময় গিরিশ জমাদার বেতের লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে আসে। ধমকে ওঠে, 'হালার পুত গপ্ করিস না কাম কর।' কথায় তার কুমিল্লার সুর।

বিদুর বাবু বয়সে বুড়ো। গায়ে বাত বেদনা। কনুইয়ের উপর একটা তামার রিং। কয়েকশ ছারপোকা মেরে ফুল বাগানের পাশ দিয়ে হাটে সে। মাথাভরা পাটের মতো সাদা চুল। মুখের কাচা পাকা দাড়ি বুঝিয়ে দেয় দাড়ির বয়স চুলের চেয়ে কম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন জাবেদ আলীর একেবারে কাছে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, 'কি জাবেদ ভাই, ফুল বাগানটা কি তোমার হাতে লাগানো?' 'অই আজ্ঞা বাবু, কাইলকু বিড়ি যে দিছ্ইন, রুটী কগু দেওয়ন লাগব।' বিদুর বাবু ঝক ঝকে দাঁতের হাসি ফুটিয়ে বলেন, রুটী বা বিড়ি কিছুই লাগবে না ।

জেলের নির্ধারিত রুটিতে পেট ভরে না কারো। তুব যাদের ধূমপানের নেশা প্রবল তারা ভাগের রুটী দিয়ে বিড়ি কেনে। আধা উপোস থাকলেও বিড়ি না থাকলে চলে না। সেখানে বিনে পয়সায় বিড়ি দুর্লভ ঘটনা। সামান্য বিড়ির পরিবর্তে রুটী চাওয়াটা বিদুর বাবুর কাছে অপমান কিনা কে জানে। না কি সহৃদয়তা বুঝতে কষ্ট হয় জাবেদ আলীর। বিস্ময় ভরা কৃতজ্ঞতায় জাবেদ চেয়ে রয় বুড়োর দিকে । শত্রুতা অবিশ্বাস নিষ্ঠুরতার এক অন্তহীন ধারাবাহিক জীবন মানেই জেল। সেখানে বুড়োর উদারতা সবাইকে চমকে দেয়।

রুসুই ঘরে ধুমধাম আওয়াজ। অশ্লীল গালি গালাজের সাথে থাল বাসনের ঝন ঝনানি। বিদুর বাবু, কয়েক পা এগোয় সেদিকে। রসুই ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। উনুনের ভিতরে এক গোলাকার ছাই লাগা বস্তু নিয়ে পুতুল নাথ আর চন্দ্র মোহন কাড়াকাড়ি করছে। দু'জনের চোখে লক্ লক্ করছে জলন্ত হিংসা আর ঘৃণা। পৃথিবীর আদিম কোন লড়াই যেন।

জাবেদ আলী ডাকে, 'বাবু ইতা দেখিয়া লাভ নাই । আটার গোল্লা লয়া ঝগড়া লাগ্ছইন।' বিদুব বাবু অবাক হলো। ডলা আটার গোল্লা চুরি করে পুড়ে খেতে গিয়ে ঝগড়া। ঝগড়ায় মত্ত হয়ে একজন অরেক জনের চুলের মুঠি ধরে ঘাড় কাত করে টানে।

জানালার পাশে বিদুর বাবুকে দেখে একজন আরেক জনকে ছেড়ে দেয়। নত মুখ তাদের লাজে ভরা। চোখ তুলে কেউ তাকায় না। পুতুল নাথ নিজের চোখটা নিজে রগড়ায়। যেন ধোঁয়ার জন্য চোখে অসুবিধা হয়েছে।

বিদুর বাবু বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। সুবোধ পুলিশ আসে হকচকিয়ে। বিদুর বাবু সরে দাঁড়ায়। জাবেদ আলী বিজ্ঞের মতো বিড় বিড় করে । 'কিতা কইবা বাবু, পুলিশ যে আইছইন্ । কোন বিচার-উচার করতা নায়। হেষ কালে তেল আর লবন লইয়া চুপচাপ যাইবাগি।'

কৌতূহল থাকলেও প্রথম বিদুর বাবু বিশ্বাস করেন নি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সুবোধ পুলিশ রসুই ঘর থেকে খালি বালতি জেল গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিদুর বাবু বলল, জাবেদ আলীকে 'এগুলো জেইলারের কাছে যেন রিপোর্ট করো না।' জাবেদ আলী ঘন ঘন হাসে। সে হাসি অবজ্ঞার না তাচ্ছিল্যের বুঝা গেল না। হাসতে হাসতেই জাবেদ আলী বলে 'রিপট! রিপট কিতা বাবু ? নিজর আতে তেল চুরি ধরছি । হেষকালে জেইলার আয়া দুই ঠ্যাঙ্গ ডান্ডা বেড়ি লাগাইছইন।'

কিছুক্ষণ থেকে জাবেদ আলী বিদুর বাবুকে জিজ্ঞেস করে। 'বাবু, একটা কথা জিগাই। গোসা করবা নি? বাবু আমরারে আনছইন পাকিস্তানর দালাল কইয়্যা। বাবুয়ে কিয়র লাগি হাজতঅ আইলা!'

শরণার্থী শিবিরে মানুষ খাবার পায়না। আর একটা লাউ দশবার করে ওজন করে টাকা পয়সা লোপাট করছে। হাকিম, দারোগা, ব্যবসায়ী সবাই জড়িত। আমরা এসব বারণ করেছিলাম। তোমরা নিশ্চয় জানো, শরণার্থী শিবিরে লোক না খেয়ে মরছে। নোংরা জল খেয়ে আমাশায়, কলেরায় ভুগছে অনেক মানুষ। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। রাষ্ট্রবিরোধী কেইস দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে।

জাবেদ আলী বলে 'বাবু কইতাম কিতা, দেশঅ গণ্ডগোল একখানা অয়লে আমরারে আগে বান্দে। চীন যুদ্ধর সময় বিছরাত আল বাওয়াত আচলাল। হৌ যে বিছারাতন দরিয়া আনলো আর ছাড়এইন না। আট মাস জেল খাটছি। যুদ্ধ কিয়র কে জানে, আমার বাপেও জানে না। আরও তিনমাস খাটলাম। কিতা কইমু, বাবু কিয়ানর কাশ্মীর কিয়ানর চীন নামও হুনছি না। মানুষ কালা না দলা কইতাম পারতাম নায়। লাম্পা না বাট্টি আল্লায় জানে। আর আমি বুলে পাকিস্তানের দালাল। দেশঅ বিচার নায়, বিচার পাইতা কিয়ানো? আউশর খেত হারছি, খালি হাই ঘর, ধান হবে কালা অয়া থুর বারঅর। অমন্না সমইত লয়া আইল আমারে। কিতা কইমু বাবু ছাওয়ালটার জ্বর। দাওয়াই আনবার লাগি বাজারো আইছিলাম। বাজার তেখি লয়া আইলো যে ঘরে খবর পর্যন্ত দিতাম পারছি না। অউদিন অ যার। আল্লাই কোনদিন দোয়া করব কে জানে!'

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে জাবেদ আলী। অনেক দূরে সুবোধ পুলিশের গলা খাকারি শুনা যায়। বিদুর বাবু বলে সাদা পাটের মতো চুলে আঙুলের বিলি কেটে। 'এসব অত্যাচার সংখ্যালঘুদের উপর করছে ওরা। তোমরা যদি এ দেশ ছেড়ে চলে যাও তোমাদের জায়গা জমি সব দখল করে মহাজনরা মালিক হবে। ওরাই তো এসব করাচ্ছে।' 'ঠিক কথা বাবু। গত কাশ্মীর যুদ্ধে জেলতন বার অয়া দেখি গ্রেরামর আজমত উল্লী, গনু মিয়া নায় পাকিস্তান গেছেগি। ওনার বাড়ী-ঘর জমিন হকলতা দখল করি বইছইন বাজারর মহাজন হকলে।

সুবোধ পুলিশ কাছে এলো। বুটের আগায় একটা তেলা গুড়ো করে ধমকে ওঠে 'শুকরের বাচ্ছা, কাম কর! আলাপ করিছ না। এদেশে থাইক্যা পাকিস্তানর স্বপ্ন দেখ্ছ, দেখাই দিমু। বেইমান, যার নুন খাস তার গুণ গাস না কেরে?'

জাবেদ আলী ভয়ে জরোসরো। বিদুর বাবু সেই অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারে নি। খুব ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে বলে 'আপনি ওরকম গালি গালাজ করছেন কেন? হাজতী দিয়ে কাজ করাতো বে-আইনী, তার উপরে এ রকম গালিগালাজ!' সুবোধ পুলিশ রেগে গর্জে উঠে 'যান যান, আর আইন দেখঅন লাগতো না। কারে কি কাজ দিমু ইটা কি আপনারে জিগায়া দেওয়ান লাগবো! রাজার আমল থাইক্যা চাকরী কইর‍্যা আইলাম। আরো কত কথা হুনছি, আর হুনুম।' আঙুলের আগায় চাবির ছড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেইটের দিকে চলে গেল। যাওয়ার ভঙ্গীতে বুড়োকে অপমান করে গর্ববোধ করে।

বুদ্ধিমঙ্গল এই জেলের আট মাসের হাজতী, দাঁতের গোড়ায় পুঁজ জমে ফুলে গেছে।

ঔষুধ, ডাক্তারের জন্য বার বার পুলিশের কাছে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। গালটা টন টন করে ফুলে ঝুলছে। গালে হাত দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে এল বিদুরবাবুর কাছে। নালিশ শোনে বিদুর বাবু। অসহায় মানুষটাকে সান্ত্বনা দেয়। নিজের হাতে আঙুল দিয়ে চেপে পুঁজ বের করে গরম জলের শেক দেয়। বুড়োর ধূসর শান্ত চোখের দরদ মাখা সহানুভূতিতেই বুদ্ধি মঙ্গলের ব্যথা উপশম হয় যেন।

পুতুলের বাবা জেল গেইটে গত মঙ্গলবার এক পেকেট বিড়ি দিয়েছে। গোটা পেকেটটাই আত্মসাৎ করেছে গিরিন্দ্র পুলিশ। রান্না ঘরে আরাখান খাঁ পাচকের কাজ করে। ওকে ধমক দিয়ে সুরেশ জমাদার আসামীদের তেল, নুন নিয়ে গেছে এই অভিযোগও বিদুর বাবুর কাছে। বিদুর বাবু সাদা চুলের উস্কো খুস্কো মাথায় এত অভিযোগ কি করে লিখে রাখে। অবাক হতে হয়। তারপর এইসব অভিযোগ নিয়ে জেলখানার জেইলার সাহেবের সঙ্গে রোজ বিতর্ক করে।

যতক্ষণ তার একমাত্র গামছাটা শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ বুদ্ধিমঙ্গল রোজ দশটার সময় স্নান করে রোদে দাঁড়িয়ে থাকত। তাই দেখে বিদুর বাবু নিজের কাঁধের গামছাটা খুলে বুদ্ধিমঙ্গলকে দিয়েছিল।

জাবেদ আলী বিড়ি টেনে ধোয়া ছেড়ে নাজিম আলীকে বলে, 'ঠাকু-বাই, বিদুর বাবুর দিলটা বড় বালা, ঠিক যেন খোদার দরবেশ।' জাবেদ আলী দিন দিন বিদুর বাবুর কাছে ঋণী ভাবত। কতদিন বিদুর বাবুর এটো থাল ধুয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু বিদুর বাবু কোন অবস্থাতেই নিজের থাল অন্যকে ধুতে দেয় না। বিকেলে শেষ বেলায় কোর্ট থেকে ফিরে আসে হাজতীরা। প্রতিদিন। জামীন না পাওয়ার বিষাদ নিয়ে কেউ কেউ ; কেউ আবার আত্মীয়স্বজনদের পাঠানো আকূল খবর নিয়ে জেলে ঢোকে।

আকাশে তখনও পাখীদের খড় কুটা নিয়ে আনাগোনা, বাইরে মুক্ত মানুষের কর্মচঞ্চল বিকেলের আমেজ। কয়েদী হাজতীর গুণতি শেষ হলে ঘটাং ঘটাং করে জমাদার গিরিশবাবুর বন্ধ তালা পরীক্ষা শেষ হয়। ওয়ার্ডের বারান্দায় জ্বলে কেরোসিনের লণ্ঠন। শুরু হয় জেলের ভিতর নামাজ পড়া। আরমান আলী, জাবেদ আলী, নাজিম আলী নামাজ শেষে মুক্তির জন্য আল্লার কাছে মোনাজাৎ করে।

পুতুল থাল বাজিয়ে রূপবানের গান গায়। ওদিকে অমর মিস্ত্রীর পাগলী বৌ-এর এলোমেলো গান ফিমেল ওয়ার্ডের দেয়াল পার হয়ে চারদিকে ভাসে। এই এলোমেলো গান তবুও যেন এক আহত ব্যাকুলতা। জাবেদ আলী দরজার সিকের ভিতর দিয়ে গামছার আঁচল ছুড়ে মারে। নাগালের বাইরের লণ্ঠনটা আঁচলে টেনে নেয়, বিড়ি ধরায়। সেন্ট্রিটা ভারী বুটের আওয়াজ দিয়ে পাহাড়ায় আছে বলে জাহির করে। জাবেদ আলীর মুখে বসন্তের দাগ, যুবক মানুষ লণ্ঠনের আবছা আলোয় পায়খানার বালতির স্থির কালো জলে মুখ দেখে। আরমান আলীর গায়ে ব্যথা, পুতুলকে দিয়ে হাত-পা টেপায়। বিদুর বাবু লোহার দরজায় ঠেস দিয়ে মুক্ত তারা উঠা আকাশের দিকে চেয়ে নতুন দেশের স্বপ্ন দেখেন, যে দেশের বসন্তে ফুলের যৌবন শুকিয়ে যায় না, সে বসন্ত আসে বঞ্চনার ভীড় ঠেলে মৃত্যুর উপত্যকা পার হয়ে অসংখ্য বন্দী জাবেদ, নাজিমের উৎসবের কুচকাওয়াজের সাথে। ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা বাজলে সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে। পুতুলের

জামীন নিয়ে কোর্ট দারোগার ঘুষ চাওয়ার কথা, পদ্ম রাংখলের শুয়োর শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী। জাবেদ আলীর নতুন সাদি করে ফেলে আসা বিবি হানিফার কথা। ছোট্ট কোমল হাতে গলা জড়িয়ে ধরতো তার ছোট্ট মেয়ে মর্জিনা। এখন, না জানি কতবড় হয়েছে; কাছে থাকলে আধো আধো কথা ফোটা মুখে আব্বা ডাক শুনতো। ভাবতে গিয়ে জাবেদ আলীর বুকটা কেমন যেন বিকল হয়ে ওঠে। কখনও মনের পটে জলছবির মতো ভাসে জমিনের সেই নাগরী শাইল ক্ষেতের ধান। কখনও বা ভাবে পয়লা বিয়ানের গাইটা কেমন আছে, কে জানে। জাবেদ আলী তার প্রতিবেশী আমির উদ্দিনের গল্প বলে, যে তিন মন ধান এক সাথে না জিরিয়ে মোহনপুর থেকে গঙ্গানগর পর্যন্ত নিতে পারতো। রোজ তার জন্য আফশোষ করে জাবেদ আলী। শুনেছে, সীমান্ত রক্ষীর গুলিতে সে মারা যাওয়ার কথা। বেঁচে থাকলে জেলে থেকেও আশ্বস্ত হতে পারত। প্রায়ই বলে, 'আল্লা তাল্লাই বালা মানসেরে বাঁচতে দেয় না!'

চারদিক যখন নিঝুম। বিদুর বাবুর গল্প বলার আসর জমে রূপকথার মতো। দেশ বিদেশের চেনা অচেনা দুঃখ ব্যথার রোমাঞ্চকর কাহিনী। সব গল্পের আসল বক্তব্য হলো ঘুম থেকে মানুষ উঠাও। গল্প শুনে কেউ হাই তুলতো। কেউ বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে নাক ডাকত। শুধু জাবেদ আলী সম্মোহিতের মতো জিজ্ঞেস করতো, 'তারপর!' বুড়ো বলতো, 'তারপর' সমসের গাজি চাষী নিয়ে সৈন্যদল গঠন করে । তীর ধনুক বর্শা ছিল সেদিনের অস্ত্র। রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উদয়পুর থেকে রাজধানী আগরতলায় নিয়ে এল। সেই রাজা তখন কুকীদের টাকা পয়সা দিয়ে সমসের এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে। কিন্তু সমসের ছিল গরীব কুকি পাহাড়ী মুসলমান— সবার প্রিয়। কেউ সমসের-এর বিরুদ্ধে গেল না। রাজার অনুচর জমিদার নাসির রাজার সৈন্য নিয়ে গরীব মানুষের মাথা কেটে বর্শার আগায় গেঁথে রাস্তায় নাকি পুঁতে রাখত। তখন গল্প শুনে সবাই ই-স করে উঠত। জাবেদ আলীর বুক গর্বে উঠতো বীর সমসের ইতিহাস শুনে। সমসেরকে শেষ জীবনে মুর্শিদাবাদের কারাগারে বন্দী করা হয়। সব শুনে জাবেদ আলী 'হায় আল্লা' বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

বেটে মানুষটার নাম পদ্ম রাংখল। পাহাড়ী যুবক নাক থেবড়া, ছোট ছোট চোখ পিট পিট করে জ্বলত। একটা ভাষাহীন আগুন। তার মনে দাগ কাটে রাজার বিরুদ্ধে রতনমণির প্রজা বিদ্রোহের সেই কাহিনী। সব গল্পই বাসি; তবু শুনতে ভাললাগে। ডাইনী বা রাক্ষসের নয়। মানুষের জয় পরাজয়, উত্থান পতনের ইতিহাস বলেই অমন হতো কিনা, কে জানে!

গল্প শেষ হলে বিদুর বিড়ি ধরাতো। সব গল্প ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত টানতো আদালত, থানা, কাছারী, সমস্ত পাহাড় প্রমাণ আইন কি করে বদলানো যায়। সে সব সিদ্ধান্ত সবাই না বুঝলেও সায় দিত। যতই দুর্বোধ্য হোক, দুরূহ হোক, তবু এমন একটা অগোছাল স্বপ্নের মুগ্ধ আবেশে ঝিমিয়ে পরতো সবাই।

জাবেদের চোখে এত সকাল ঘুম আসে না। মনে ছোট্ট মর্জিনার কথা। রোজ এই সময় বাইরে হিসি করিয়ে ঘুম পাড়ায়, মর্জিনা আব্বাজানকে কাছে না পেলে খেতে বসতো না। বিবিজান হানিফাকে শুধু কতদিন গাল দিয়ে অবিচার করেছে। কতদিন হলো হানিফাকে বুকে নিয়ে ঘুমায় না। প্রতি বাজার-বারে হানিফার জন্য এক প্যাকেট বিড়ি নিয়ে যেতো, মর্জিনার জন্য মিঠাই।

বিড়ি মিঠাই তো দূরের কথা, দু'বেলা খেতে পায় কিনা। হানিফা কত আব্দার করে বলেছিল, এইবার ফসল তুললে শাড়ী কিন্যা দেওয়ন লাগব। গত বছর ওকে নায়র যেতে দেয়নি। ভাবতে ভাবতে বুকটা গভীর রাত্রির মতো এক পাহাড় বেদনা জমে ওঠে। ঢং ঢং ঘন্টা বাজলো। সেন্ট্রি বদল হল, রবি পুলিশের ডিউটি শুরু হল।

বেলা দুপুর ঘটাং ঘটাং করে জেল গেইটের তালা খুলে গেল । জাবেদ আলীর মুক্তি আজ। এক বছর আগে যে ডোরা লুঙ্গি আর নীল তালিমারা জামাটা নিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে তাই নিয়ে বেরিয়ে এল। আরমানের বাড়ীতে খবর পৌছে দেবে। পুতুলের জন্য গিরিজা উকিলের মুহুরী বাবুর কাছেও দেখা করবে। নাজিমের চাচা খুরশেদ আলীকে নাজিমের জন্য একটা গামছা পাঠাতে খবর বলবে। বিদুর বাবুর তারিখ সামনের বুধবার, সেদিন কোর্টে আসতে হবে। যেতে যেতে ঠাট্টা করে গিরিশ জমাদারকে বলে "বাবু থাল কম্বল ঠিক করি রাখইন যেন আবার কোন দিন লইয়া অইব কে জানে?"

এই দুপুর বেলা চলেছে বাড়ীর দিকে, মনটা আগে আগে ছুটে চলেছে, ছোট মেয়ে মর্জিনা নাক ভরা সিকনী নিয়ে উঠানের কোলে ছোট ছোট মোরগা বাচ্চাদের নিয়ে হয়তো খেলছে । কোমরের তাগায় ঘুঙুর। ঝন ঝন করে বাজিয়ে ছুটে আসবে। কত দিন না শোনা সেই আব্বা ডাক আবার শুনবে। হানিফা দরজায় ঠেস দিয়ে বসে বসে কাঁদছে, জাবেদ আলীর কাছে ঘর বেধে এত দুঃখ বেচারীর জীবনে, শান্তি কোন দিন এল না। ভাবতে ভাবতে চলেছে জাবেদ আলী। কমলপুর সাব জেল থেকে উত্তর দিকে মাইল দেড়েক হেঁটে পথে এল পরিচিত সেই কাঠের পুল। কাঠের আলকাতরা ফেটে গেছে রোদে । তবুও তাকে এই দুপুরে যেন স্বাগত জানালো। যেতে যেতে পুল পার হয়ে কাশীম আলীর লাউ পাতা দেখা যায়।

গাঁয়ের নাম মোহনপুর। মনমোহনী রূপ নাই বা আছে। তবু গাঁয়ের পাশে মসজিদের পাড়ে আসতেই জাবেদ আলীর কানে বাজে এক চেনা জানা মোহনবাঁশী । মসজিদের পুকুরে শামুক সন্ধানী হাঁসের ঠোঁটে বা আমজান কামরাঙ্গা গাছের ডালে বাতাসে দোলায়। নিঝুম দুপুরে পতঙ্গের নিরন্তর গানের কলিতে। গ্রাম নয়, ঘোমটা পড়া গ্রাম্য সোহাগী আঁচলের কোমল দোলা। পুকুরের পুর্ব পাড়ে গাছের ফাঁকে নানী, চাচা, আরো কত নিকট আত্মীয়ের গোরস্থান। মাটীতে তারা মিশে গেছে সব। তবু সবুজ দুর্বাঘাসের ডগায় ডগায় পায় এক মধুময় জেয়ারত নামাজের মাঙ্গলিক গুঞ্জন!

জাবেদ আলী থমকে দাঁড়ায়। বুকে মোচড় দেয় যখন চোখে পড়ে টিনের চালা উপড়ানো মসজিদ। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এক নারকীয় অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন হয়েছে এই ছোট্ট গ্রাম। রাস্তার পাশে কবরের মতো বাংকারের অনেক চিহ্ন। এক ঘন্টার নোটিশে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়ে। গরু, বাছুর, ছাগল, মুর্গী কেউ সামালাবার সময় পায়নি। গোয়ালের দড়িতে বদ্ধ অবস্থায় অনেক গরু ছাগল মারা গেছে। শুধু গরু বাছুর কেন ! গুপ্তচর সন্দেহে চালান দেয়া হয়েছে অনেক গ্রামবাসীকে। এই পুকুর পাড়েই জাবেদকে ধরার আগের দিন আমন্দী মিঞা গরু চড়াতে বসেছিল কামরাঙ্গা গাছের নীচে। সম্পর্কে সে জাবেদ আলীর নানা। তাকে ধরে নিয়ে মারপিট করে সৈন্যরা। কারণ কারো জানা নেই। জিজ্ঞেস করার অধিকার ছিল না। থাকলেও কার এমন বুকের পাটা যে কাউকে

গিয়ে জিজ্ঞেস করবে! বুটের লাথিতে, বন্দুকে বাঁটের আঘাতে আমান্দী মিঞা মারা যায়। কবরে নেয়ার জন্য বাজারে গিয়ে সাদা কাপড়ের কাফন আনার লোক ছিলনা। পাশের হিন্দু পাড়া থেকে হারাধনকে বাজারে পাঠিয়ে কোন রকম কাফন আনে গ্রামবাসীরা।

মাইল খানেক দূরে ওপার বাংলা। মাঝখানে ধলাই নদী। ওপারে থাকে জাবেদ আলীর আরেক চাচা নৌসা মিঞা। সীমান্তে কড়া পাহারা। আমান্দী মরার সময় আসতে পারেনি। গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়িয়ে শুধু কেঁদেছিল। হায়দর এই গ্রামের ইমাম। রমজান মাসের রাত্রি শেষে ফজর ওয়াক্ত নামাজের আজান দিত হায়দর আলী। আজানের প্রভাতী সুর ধলাই গাঙের পানি পার হয়ে নৌসা মিঞার ঘুম ভাঙাতো। মোরগের ডাকে দুই দেশেই নেমে আসত শিশির মাখা রূপালী সকাল। গাঙের পারে মাছরাঙাদের ডানায় রোদের গন্ধ মুছে যেতো। হায়দর ইমাম শুরু করতো আশরওয়াক্ত নামাজের আজান। মন্নাফ মিঞার লাজুক বৌ তখন পুকুর পাড়ে। কামরাঙ্গা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁস তুলতো তৈ তৈ তৈ তৈ..... তৈ ডাক দিয়ে। জাবেদ আলী তখনো বিয়ে করেনি। আসতে যেতে পথের পাশে কামরাঙ্গা ফলে ঢিল ছুড়ে হানিফার খলো ঝলো হাসি শোনাতো। হানিফার নানী মেহেদী মাখতো নাতনীর হাতে। ভাবী নাতিন জামাইকে দেখে বুড়ি ঠাট্টা করে বলতেন 'দারঅ দামান থয়া দুরই দিতাম কেনে'। হানিফা সরম পেয়ে বুড়ীর বুকে মুখ লুকিয়ে খিল খিল হাসতো। জাবেদ তখন লুকিয়ে থাকতো ঘর ফেরা রাখালদের গরুর পালের ভীড়ে।

আরো কিছু দূর এগিয়ে দেখে আমিরুদ্দিনের বৌ ঢেকি নাচিয়ে ধান ভানে। ঢেকি ছেড়ে ছুটে আসে জাবেদকে দেখে। চাপা আবেশে বুক ফাটে। বিলাপ করে 'কারে বাইজান কয়া ডাকবায়'। জড়িয়ে ধরে জাবেদকে! ছেলেবেলা আমিরুদ্দিনের কাছেই লাঠি খেলা শিখেছিলো। চাষের সময় নাস্তা যেতো মাঠে। আমিরুদ্দিন একা কোনদিন খায় নি। জাবেদকে পাশের জমি থেকে ডেকে বসতো দুজনে। আলে বসে কোন জমিনে কি ধান রোয়াবে পরামর্শ চলতো।

সেই আমিরুদ্দিন এখন আর নেই। জাবেদ যখন জেলে, আমিরুদ্দিনকে টেলিফোনের তার দিয়ে বেঁধে একেবারে সীমান্তে নিয়ে যায় সৈন্যরা। সেখানে চোখ বেঁধে তাকে গুলি করে। গ্রামের হাস, মুর্গী, বকরী সীমান্তের সৈন্যরা জোর করে নিয়ে যেতো। আমিরুদ্দিন প্রতিবাদ করেছিল। সেই অপরাধে তাকে মরতে হয়।

ছাই হয়ে গেছে মুকবইল মিঞার বাড়ী। কে কোথায় চলে গেছে এখনো ঠিকানা মিলেনি। গ্রামের শেষ মাথায় আব্দুল নূরের বৌ থুর থুরে বুড়ীটা নেই। গোলাগুলির শব্দ শুনে মূর্চ্ছা গিয়ে মারা যায়। মতলিফ মিঞা গুলিতে এক পা হারিয়ে পঙ্গু। কি করে ক্ষেত গিরস্থি করবে। সবার দুশ্চিন্তা। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীরা ভীড় জমায়। মন্নাফ মিঞা নিরাপত্তা আইনে ধরা পড়ে। আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে এখনো হাজতী। মন্নাফের মেয়ে আয়েসা ছুটে এলো জাবেদের কাছে বাপের খবর নিতে। জিজ্ঞেস করে গভীর উৎকণ্ঠায়, 'চাচা আব্বার কোন খবর পাইছনি।' জাবেদ আলী জবাব দিতে পারে না। অসহায় সহানুভূতিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কোন রকম সামাল দিয়ে বলে বাংলা অখন স্বাধীন অইছে হক্ কলে ছাড়া পাইব'।

অনেক দূরে জাবেদের ছোট্ট মেয়ে মর্জিনা দৌড়তে দৌড়তে আসে উলঙ্গ হয়ে। কোমরে

তাগায় বাধা ঘুঙুর টুং-টাং বাজে। আব্বা-আ! আ! একটা চীৎকারে জাপটে ধরে জাবেদকে। জাবেদের বুকের দোয়ার খুলে পাজরের একেবারে ভিতরে যেতে চায় মর্জিনা। কোমল ছোট্ট হাতে বাপের কর্কশ মুখটা ধরে কোমল চুমু দেয়। মমতায় ভরা মিলন মধুর আবেশে জাবেদ মোমের মত গলে।

হানিফা বারান্দার খুঁটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে। শাড়ীর আঁচল চিবোয় দাঁতে। চোখের তারা দুটি ছল ছল। আনন্দের এক মধুময় বেদনা। নাকের পাটায় রোদে ঝিকি মিকি চমকায় নাকছাবিটা। ভিজে যায়। বোদেলা দুপুরে স্নেহ, সোহাগের পুকুরে সবাই ডুবে।

জেল ফেরত জাবেদ আলী এখন আলাদা মানুষ। বিদুর বাবু কি মন্ত্রে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ছিন্নমূল নড়বড়ে গ্রামটাকে সাজিয়ে নতুন রঙ দিতে চায়। মন্নাফ মিঞার মুক্তির জন্য চাঁদা করে আগরতলায় লোক পাঠায়। গ্রামের ছেলেদের জড়ো করে আমিরুদ্দিনের বৌ বাচ্চাদের জন্য সারা গ্রাম ঘুরে খোরাকী জোগাড় করে। নিজের এক টুকরা জমি নিয়ে চান্দু মিঞার মামলা চলছিল অনেক বছর। জমির একটা অংশ ছেড়ে শেষ করে মামলা। আমীর হোসেনের সাথে হরিদাসের ঝগড়া গাঙ পাড়ের চর নিয়ে। গ্রামের সকলকে ডেকে মিটিয়ে দিল ঝগড়া। মনসুর আলী রোজ বৌ পেটায়। সমস্ত মা বোনদের জমিয়ে একদিন জাবেদ আলী মনসুরের বারান্দায় ওঠে। মনসুর সেদিন থেকে বৌকে আর মারধোর করে না।

জাবেদ আলী এখন দশের গণ্যমান্য একজন। ওর কথার ওজন বাড়ে দিন দিন। হাফিজ মিঞা কারো গরু ছাগল ক্ষেতে পড়লেই খোয়াড়ে নেয়। ইনতাজ আলীর গরু কালই ক্ষেতে পড়েছে তবু জাবেদ আলীর কথায় খোয়াড়ে গেলনা। ইনতাজ আলীও গরু ছাগল আগের মতো উদাম ছাড়েনা।

চেরাগ মিঞার যক্ষা রোগ। থু-থুর সাথে দলাদলা রক্ত বেরোয়। জাবেদ আলী তাকে নিয়ে ভাল ডাক্তারের কাছে যায়।

নিজে লেখাপড়া জানে না। অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার কামিনী বাবুকে ধরে অসময়ে পড়াশোনার তাগিদ দেখে বিশ্বাস করতেই পারেনি। জাবেদের আগ্রহটা বুঝা গেল শেষে। লাউ কুমড়া দিয়ে কখনো, ঘরের চালা মেরামত করে বা গাই দোহিয়ে দিয়ে মাস্টারকে খুশী করার কত চেষ্টা। অনেক কিছুর বিনিময়ে নাম দস্তখত শিখে। এখন অবশ্য বর্ণবোধও পড়তে পারে। গ্রামের দশজনকে পড়ার কথা বলে। কেউ শোনে। কেউ শোনে না। মন্নাফ মিঞার বিবি ঘোমটা থেকে মুখ বার করে বলেছিল 'পুয়ারে এক মুট ভাত দিতাম পারিনা, বই কিনতাম কিয়ান তনে'। তোরাব আলী গামছায় পিঠ চুলকাতে চুলকাতে বলেছিলো 'জাবেদ কথা বালা কইছ, পুয়ারে মানষর বাড়ী কামঅ দিতাম না পড়াইতাম'।

আশার চেয়ে হতাশা ছিল বেশী। মানুষকে বুঝাতে না পারায় এক বোঝা ব্যথা বুকে তীক্ষ্ণ নখে খামচে ধরে। মানুষকে বুঝানোর বলিষ্ঠ যুক্তি না পেয়ে অন্ধকারে হাতরায় তবু হাল ছাড়েনি। নিজকে বুঝায় সবাই না এলেও কয়েকজন নিশ্চয়ই আসবে।

মসজিদের পুকুরের আর এক নাম ইলোফকিরের পুকুর। ইলোফকিরের পুকুর পাড়েই শুরু হয় নতুন পাঠশালা। প্রথম পাঠক্রম শুরু হয় গ্রামের রাস্তা মেরামতির কাজে। শুক্রবার

নামাজের আগে সবাই কোদাল নিয়ে আসে। ভাঙ্গা জীর্ণ পরিত্যক্ত ইস্কুল ঘরটাও মেরামত হলো।

শুক্লপক্ষের আশমানে হানিফার রূপোর নলুকের মতো চাঁদ বেরোলে ইলোফকিরের পুকুর পাড়ে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে বসে। লাঠি খেলা, কুস্তী খেলা শিখায়। বিদুর বাবুর মুখে বলা দেশ বিদেশের নানা গল্প শোনায়। সবকিছু গুছিয়ে বলতেও জানে না। তবু নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মতো যতটুকু সম্ভব বুঝিয়ে বলে। বিদুর বাবু তার কাছে আদর্শ দরবেশ। এই গ্রামে কেউ কোনদিন বিদুর বাবুকে দেখেনি। তবু গল্প শুনে অনেকেরই মনে বিদুর বাবুর ছবি আঁকা।

গ্রামে এখন নিজেদের একতা চিন্তা, আর শক্তির উপর এক বিশ্বাস বোধ জন্মে। অসংগঠিত মানুষকে সংগঠিত রূপ দিতে কত কাঠ পুড়াতে হচ্ছে একমাত্র জাবেদ আলীই জানে।

জানে বলেই প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে ঘোরে। কার বাড়ী ঘর নেই। অন্যের ঢেকির ঘরে বা ছাগলের ঘরে মাথা গুজে কে আছে। তার তালিকা বানাতে শুরু করে। পরের ঘরে আশ্রিত মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। থাকেও বড় পরাধীন হয়ে। মনি ধরের বাড়ীর গোয়াল ঘরে কোন রকম বৌ বাচ্চা নিতে থাকত হরিগোপাল। হরিগোপালের বৌ পুকুর পারে বাসন মাজার অপরাধে কত কথা শোনে। পরের বাড়ী বলে কিছু বলতেও পারে না।

জুম্মা মিঞা থাকে আজিদের ঘরে বারান্দার সাথে এক চালা দিয়ে। একটা শিঙে গাছ লাগাবার সুযোগ নেই। নিজের এক জোড়া ছোট ছোট গরু আছে। সুবিধা হলে অন্যের জমি চাষ করবে। কিন্তু আজিদ মিঞা জুম্মাকে এক টুকরী গোবর নিতেও দেয় না।

হারাধনের বড় ছেলেটার বিয়ে হলো। ছোট্ট চালা ঘরে নিজেও থাকে অবিবাহিত ছেলে মেয়ে নিয়ে। তার উপর ছেলে আর ছেলের বৌ। একেবারে জন্তু জানোয়ারের মত থাকা। তাদের নামও উঠল জাবেদ আলীর গৃহহীনের তালিকায়। দেখতে দেখতে উনত্রিশ পরিবার পর্যন্ত পৌছে। তারা সবাই এক গ্রামের নয়। বিভিন্ন গ্রামের গৃহহীন।

সেই উনত্রিশ পরিবারের পুরুষদের নিয়ে ছুটল পশ্চিমে বিলাস ছড়ার পাহাড়ে। নিজের গ্রাম থেকে মাইল চারেক দূরে। বিলাস ছড়ার বহমান স্রোতের পাশেই জায়গা বাছাই করে। যাতে জলের কোন অসুবিধা না হয়। দুর্গম জঙ্গল। বাঁশবন, বুনো চালতা, জগুয়া গাছের ঘন ঝোপ ঝাড়। লোকে বলে গহন জঙ্গলে সাপও বুঝি জিভ বের করতে পারবে না।

মাস খানেক ধরে চলে জাবেদের কাজ। সবাই সবদিন যেতে পারে না। ঘরে খোরাক না থাকলে জঙ্গল আবাদ করতে যাবে কে। বড় একটা লুঙ্গাও আবিষ্কার হলো। জারুল গাছের শিকড়, চামলের গুড়ি উপড়ালো, পরে মনে হলো এমন সোনার থালা জঙ্গলে কে লুকিয়ে রেখেছে।

বন দপ্তরের বাবুরা গেল বনকাটার মাসুল আদায় করতে। গৃহহীন নিঃস্ব মানুষেরা খেতেই পায়না, মাসুলের পয়সা কোথায় পাবে। বনবাবুরা বন্দুক দেখিয়ে দা, কুড়াল কেড়ে আনে।

জাবেদ আলী সমস্ত গৃহহীনদের নিয়ে ফরেষ্ট অফিসে দলে দলে জড়ো করে। সবার মুখে একটাই কথা, দা কুড়াল ছাড়া আমরা বাঁচব কেমন করে। ফরেষ্টের বড় কর্তা অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায়। দা কুড়াল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিল। তবে সংরক্ষিত বন যাতে না কাটে তার নির্দেশও দেয়।

জঙ্গল কাটতে গিয়ে আমাশা, ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেকেই ভুগে। আলতু দুদিন কাজের পরে জ্বরে ভুগে আর কাজেই গেল না। সুজন মালীর আমাশা। তিনদিন গেলে ছ'দিন যায়না। গৃহহীনের সংখ্যা কোনদিন বাড়ে কোন দিন কমে।

জঙ্গল কেটে বসতি শুরু হলো। পাহাড়ের ঢালুতে, লুঙ্গার কোনায় দাঁড়ালো বিশ বাইশটা ছোট ছোট ঘর। নিজের মাটিতে মাথা গুজার মতো আস্তানা। দিন তারিখ ঠিক হলো। সবাই সামনের মাসে গরু, ছাগল পরিবার পরিজন নিয়ে উঠবে।

রবিবাবু, বড় একজন ঠিকেদার। লরী করে রোজ আসতো জঙ্গলে আবাদের সময়। তার ইটভাটা আছে অনেকগুলো। জঙ্গলের লাকড়ী বোঝাই করে নিয়ে যেতো ইটভাটায়। গৃহহীন লোকেরা লাকড়ী বিক্রী করে তার কাছেই। নূতন আবাদ করা সোনার থালার মতো লুঙ্গা দেখে লোভ লাগে। জাবেদ আলীকে বলেও ছিল, লুঙ্গার জন্য কিছু টাকা দেবে। রাজী হয়নি।

হঠাৎ একদিন জরীপ বিভাগের আমীন, তহশীলদার, নায়েবদের নিয়ে আসে রবিবাবু। লুঙ্গা, পাহাড়, সমস্ত আবাদী অঞ্চল জরীপ করে। এমনকি ছোট ছোট নূতন ঘরগুলোও জরীপের আওতায় ঢোকে। তখন জাবেদ আলী নিজের গ্রামে।

গৃহহীনরা সবাই বিস্মিত। ইনতাজ আলী জিজ্ঞেস করে অনেক সাহসে। 'বাবু, আবাদ করলাম আমরা আর আপনে দেখি জরীপ করইন, বিষয় কোনতা বুঝলাম না'।

রবিবাবু ধূর্তামির সাথে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য—'কার জমি কারে কে আবাদ করতে কইছে, বুঝি না। এই জমি কি খাসের । যে আয়া বইলেই মালিক হইবা'।

জাবেদ আলী গ্রাম আর মানুষ নিয়ে যত ব্যস্ত হানিফা তত বেশী বিড়ম্বিত। জেলে থাকার সময় বন্ধক দেওয়া ঝুমকা জোড়া আজও ছুটিয়ে আনতে পারেনি। ঝুমকার কথা উঠলেই না জানার ভান করে আনমনা থাকে। ভাবটা এমন যেন কিছুই জানে না।

হালের একটা বলদের কাঁধে দগদগে ঘা। কিলবিল করে মাছির ডিম। কতদিন বললো হানিফা গরুটা হাসপাতালে দেখাতে। কিছুতেই সময় করতে পারে না। হানিফা মনে করে বৌ-এর কথা বলেই বুঝি ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ গরুটা মারা গেলে আরেকটা গরু কিনার ক্ষমতা নেই।

সামনেই বৈশাখ । ঝড় আসবে। ছনহীন চালাটা ফালাফালা করে উড়ে যাবে। সময়ে মেরামত না করলে অসময়ে ছন পাবে কোথায়। যদিও পায় দাম দ্বিগুণ। জাবেদ আলী শুধু বলে, 'করুম'। ওই শেষ । ঘর ছানি আদৌ হবে কিনা কে জানে।

দিবানিশি কিসের এত ছুটাছুটি । জাবেদ এখন অন্য দুনিয়ার মানুষ। অন্য ভাবনাতেই থাকে। সুখ দুঃখ নিরিবিলি একটু আলাপ করবে । ফুরসৎ কোথায় । কপোত কপোতীর মতো কুজনে ডুবে থাকার দিন বুঝি চলে গেছে হানিফার । সবটুকু দরদ ভালোবাসা একা পেতে চায় হানিফা। জাবেদ অন্যদিকে স্নেহ, দরদ, ভালবাসার সব নির্যাস বাতাসার মতো গ্রামে বিলিয়ে দিতে চায়। এই সংঘাতের রহস্যময় জ্বালা ক্ষত বিক্ষত করে হানিফাকে।

কথা ছিল দু'জন নায়র যাবে মামার বাড়ী। নায়র তো দূরের কথা। মামা এলো। সপ্তাহ খানেক থেকেও শান্তিতে একদিন ভাগ্নি জামাই নিয়ে বসে খেতে পারেনি। ভাবতে গিয়ে ঠোঁপ কাঁপে থরথরিয়ে, চোখের তারা ঝাপসা হয়ে আসে হানিফার ।

মরিচ ক্ষেত আঁচরে খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করছে কুব্বাত মিঞার মোরগাগুলো। সহ্য করতে পারেনি হানিফা। রেগে মাটির ঢেলা ছুড়ে একটা মুরগীর ঠ্যাং ভেঙে দেয়। কুব্বাত বৌ ঠ্যাং ভাঙা মুরগী এনে জাবেদের সামনে বিচার চায়। রাগে দুদিন কথা বন্ধ করে থাকে হানিফার সাথে। হানিফা ডুকরে ডুঁকরে কাঁদে। প্রথম ভেবেছিল অভিমান। পরে বুঝি রাগ। মনের মানুষটা অমন করে বদলে যাচ্ছে অনুমান করতে পারে না। মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে আপ্রাণ। তবু কোথায় যেন একটা খটকা লাগে।

দূরের কোন গ্রামে রাত বেশী হলে ঘরে ফিরে না জাবেদ। হানিফা নিঃসঙ্গ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে রাত ভর কাঁদে! তখন যদি জাবেদকে কেউ খোঁজে, গম্ভীর গলায় উত্তর আসে 'জানিনা'।

জাবেদ আলী বৌ এর আচরণ জেনে দুঃখও পায়। রাগ করতেও পারে না। মাথাটা বন বন করে ঘোরে গৃহহীন বসতির নতুন সমস্যায়। তার উপর বৌ নিয়ে জ্বালা। কোন দিক সামাল দেবে । কুল কিনারা মিলে না। বৌটা আবার ছয় মাসের পোয়াতি। এ সময় মেয়েরা ভাল খাবার চায়। ভাল খাবার দুরের কথা। দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া জুটে না। মর্জিনার বুকের পাজর ভাসছে । এক ফোটা দুধ বাপ হয়ে যোগাড় করতে না পারা বড় বেদনাদায়ক। নিজের এত যন্ত্রণা কাউকে বুঝতে দেয় না। আপন দুঃখ সব সময়ের হাসি দিয়ে আড়ালে রাখে।

সব ব্যথা বুকের কোণায় গিঁট বেঁধে বসলো ইলোফকিরের পুকুর পারে। সন্ধ্যে বেলা চারদিকের লোকজন জমে। চোখে মুখে অনেকেরই ভয় আর উৎকণ্ঠা। কেউ আবার নির্বিকার। জাবেদ আলী জানায় "কাইল গঙ্গানগর গিয়া হুনছি খাজনার লাগি সামনের হপ্তা তনে গেরামে গেরামে ক্রোক আরম্ভ অইব"। সেরু মিঞা চিন্তিত স্বরে বলে — 'যুদ্ধে এবার ক্ষেত গিরস্থি অইছে না, কেউ ধানের গোছাত কাচি নি ছোয়াই তো পারছে । খাজনা দিমু কিয়ান তনো। গরু বাছুর টানলে এবার ছাড়াছাড়ি নাই।'

কাছেই বসেছিলো ইনতাজ আলী। বিড়িতে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে— নোয়া গিরহীন বসতি বুলে বা রবিবাবু নামে রেকড করাইছইন। নায়েব বাবু নোটিশ দিছইন পনের দিনের মাঝে উচ্ছেদ করবা কয়া ।

সবাই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানতে চায়। একে একে ইমতাজ আলী সব ঘটনা খুলে বলে। মানুষ বড় বিচিত্র। এর মধ্যে সামসুলের বাপ ধলাই গাঙে বড়শিতে বড় শৌল মাছ আটকানোর গল্প বলে। জাবেদ আলী তাকে প্রায় ধমক দিয়ে উঠে। আবার বলতে শুরু করে । খাজনার নোটিশ কেউ রাখবায় চাইত্ত। গিরহীনের মানুষ যদি উচ্ছেদ করে হককলে বার অইতায় অইব। কিতা কও। সবাই সায় দেয়। চাপা উত্তেজনার গুনগুনানি শুরু হল চারদিকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাম্য সরল জোড়া জোড়া চোখে দীপ্ত হয় কঠোর অঙ্গীকার। ইনতাজ আলী বিড় বিড় করে বলে— মরলে আমরা কবর দিবার সাড়ে তিনহাত জমি আল্লাই দিছইন না। কদিন বাদে কাছারীর তহশীলদার, নায়েব পিয়ন এলো খাজনা আদায়ের নোটিশ নিয়ে। ঢোল বাজানোর বাদ্যকর ঢোল বাজায়। তহশীল খাজনা আদায়ের ফরমান জারী করে। খুরসেদ আলী তহশীলদারের নোটিশ হাতে নিয়ে ছিড়েফেলে থু থু দেয়। মন্নাফের বিবি উঠোনে ঝাড়ু ধরে দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয় 'আয় বালা মতন খাজনা দিতাম'। আমিরুদ্দিনের বুড়ী মা লাঠি ভর করে বেরিয়ে মুখ খেকিয়ে বলে—

কিয়র খাজনা, আমার পোয়ারে গুল্লি করে বেটাইন মারছিলায় মনে নাইনি! আইয়! খাজনা দিমু।

জাবেদ আলী ঘামতে ঘামতে ছুটে আসে। চোখে মুখে তার আগুন। গলার গম্বুজ ফুলিয়ে চীৎকার দেয় "কেউ খাজনা দিতাম নায়। নোটিশ বুটিশ রাখবার চাইয়। আগের মতো পুলিশ দেখলে দৌড়িও না, মরলে অন দাঁড়াইয়া হককলে মরমু।"

অবস্থা বেগতিক। তহশীলদার, নায়েব পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে চুপচাপ প্রস্থান করে।

সারা এলাকা থম থম। ঝড়ের কোন পূর্বাভাষের মতো। উঠোনে উঠোনে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক। হাকিম, পুলিশ, মহাজন, ঠিকেদার তারাও ভীষণ উদ্বিগ্ন। দপ্তরে দপ্তরে গভীর রাত অবধি চলে শলাপরামর্শ। ভিতরে ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলে গৃহহীনের বুক জুড়ে আগুন, খাজনার ভারে মেরুদন্ড বাঁকানো। কৃষকের মাথার রক্ত পায়ে পড়ে। ক্ষেতমজুরের গায়ে লাগে অজানা উত্তাপ। সংখ্যালঘুর কাছে নিরাপত্তার উষ্ণ আশার অঙ্গীকার। টগবগিয়ে উঠে ধমনীর রক্ত ধারা।

রবিবাবু থানায় কেইস করেছে জাবেদ আলীর বিরুদ্ধে। বে-আইনী বল পূর্বক জমি দখলের মামলা। পুলিশ তাকে খুঁজে হয়রান। গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে তার খোঁজ মেলে না। গ্রামে গ্রামে উত্তেজনা চাপা দাবানলের মতো ছড়ায়। রবিবাবু দু'জন বেকার ছেলেকে চাকরির লোভ দেখিয়ে জাবেদের পিছনে লাগায়। ফল হলো উল্টো। বিলাসছড়ায় গৃহহীনরা ওদের ধরে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দেয়।

রাত ভর বৃষ্টি। শরতের মাঝামাঝি। মাঠে তখন আমন ধানে সবুজ পাতায় কৃষ্ণনীল রঙ ধরে। অলস চাষীরা তখনো মাঠে মাঠে কিছু ধান রোয়ানোর কাজে। ভোরের তারা আকাশে ফিকে হয়ে আসে। জাবেদ তখনো ঘুমে। ইনতাজ আলী ছুটেএসে খবর জানায়। "সর্বনাশ ভাই! রবিবাবু পুলিশ লয়া গিয়া আস্তা গিরহীনে আগুন জ্বালাইছইন।"

"যাও তুমি দৌড়! আমি হককলরে লয়া আরাম" বলেই জাবেদ ছোটে নদীর পারে। খুব সকালে রফিক মিঞা, মনীন্দ্র নাথ, ক্ষিতীশ কলই ক্ষেতে বীজ বোনে। ওদের ডেকে আবার উত্তরে। হাকাহাকি ডাকাডাকি। নিজের উঠোনে এল একটা লাঠি নিতে। সামনেই মুখোমুখি মহেশ দারোগা। পুলিশরা বাঁশী বাজিয়ে চারদিক ঘিরে ফেলে। মহেশ দারোগা খুব মোটা সোটা। বিরাট দেহ। জাবেদের ঘাড়ে পাছায় এক সজোরে লাথি মারে। হানিফা পেটের ভারে কষ্টে চলে। দারোগার পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদে— বাবু, অমলা মারিও না। পুলিশ জাবেদের হাতে হাত কড়া পরায়। মর্জিনা বাপের লুঙ্গির কোণা ধরে হাউ মাউ করে কাঁদে। জাবেদ মর্জিনাকে বোঝায়, হানিফাকে সান্ত্বনা দেয়! কেউ বোঝে না। শুধু বুক ফাটা আর্তনাদ। টেনে হিচড়ে জাবেদকে নিয়ে চললো থানার দিকে। যাওয়ার সময় গর্ভবতী হানিফাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয় মহেশ দারোগা। মর্জিনা তবু বাপের পেছনে চীৎকার করে ছোটে।

জাবেদের খবর শুনে সবাই ছোটে রাস্তার দিকে, কেউ ছোটে গিরহীনের দিকে। ভোর তখন হয় হয়। আলমাছের মা তখন ধান কোটে ঢেঁকিতে। আলমাছের নানীর চোখে ছানি। এতলোক ছোটাছুটির কারণ বোঝে না। জিজ্ঞেস করে ছেলের বৌকে "এত সকাল আজান পড়ছে না কিতা হককলে দৌড়ইন।" ধান কুটতে কুটতে আলমাছের মা জবাব দেয়। "আজান নাগো বেটী, জাবেদ আলীর আজান"।

বিপথের পথিক

খেপেঙরায়ের পায়ের পাতায়, আঙুলের ফাঁকে অসংখ্য ঠুসা। ফেটে জল বেরোয়, কোনটা আবার জল জমে টইটম্বুর। পাহাড়ের নুড়িতে যখন পা পড়ে মাথার খুলি পর্যন্ত চিন্ চিন্ করে প্রচন্ড ব্যথায়। ঠুসা যখন ফাটে জ্বালা পোড়াও বাড়ে। উরুতে উরুতে ঘসে জংঘার চামড়া উঠা। পা দুটো ফাঁক করে হাঁটতে হয়। বয়েস তার সতেরো কি আঠারো। গহন অরণ্য পর্বতে জীবনটা বেড়ে উঠলেও একনাগাড়ে কোন সময় পাঁচ দিন পাঁচ রাত বিশ্রামহীন ভাবে হাঁটেনি।

দ্রুত না হেঁটে উপায়ও নেই। ওর সঙ্গীরা লংতরাই পাহাড়ে একটা বাস লুঠ করে ফিরছে। কেউ গুনে দেখেনি স্টেনগানের গুলি বৃষ্টিতে কয়জন নারী, শিশু মারা গেছে। ঘটনার পরেই সি, আর, পি, পুলিশ সারা জঙ্গল ঘিরে ফেলে। কোন রকম খাড়া পাহাড়ে লতা ধরে বেয়ে সি, আর, পি-র দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। গেলে কি হবে। আবার মুখোমুখি হয় আরেকদল সীমান্তরক্ষীর সাথে। ওই দলে প্রায় তেত্রিশ জন। সবাই একবারে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত। মালসুমা স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন। দারুণ বুদ্ধি রাখে। চোখের পলকে সবাইকে উর্দি ছাড়িয়ে লেংটি পড়িয়ে বাঁশ কাটতে নামায়। পোষাক, জিনিষপত্র, লুটের মাল, বন্দুক সবকিছু বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। সীমান্ত রক্ষীরা কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। তবু বিপদ কাটেনি। সারা পাহাড় জুড়ে জোর তল্লাস চলছে।

বুক ডিপ্ ডিপ্ করে ভয়ে। গলায় কাঠ ফাটা তৃষ্ণা, খিদের আগুন পাকস্থলীর কোণায় কানায় দাউ দাউ জ্বলে। তার উপর মায়ানী রিজার্ভের যত কাছে আসে পাহাড়গুলো তত দুর্গম আর একেবারে খাড়া। ত্রিপুরার লঙতরাই, আঠারোমুড়া কোনটাই এত দুর্গম নয়। কষ্টে যন্ত্রণায় খেপেঙরায়ের পা দুটো ভালুকের মতো ফুলে অবশ হয়ে আসে। কদম উঠতে চায় না। তবু জিরিয়ে নেবার সুযোগ নেই। ক্যাপ্টেন মালসুমার কড়া আদেশ। রাস্তায় কেউ কোথাও বিশ্রাম নিতে পারবে না। তাছাড়া একবার বিশ্রাম নিতে পারলে পায়ের গতি শিথিল হবে। আর হাঁটা যাবে না।

মুখে কারো কথা নেই। সীমান্তের শেষ গ্রাম অক্রুফা পাড়া সকাল ন'টার মধ্যে পার হতে হবে। আর দুপুরের মধ্যে সাজাক পাহাড়ের টেকটিকেল ক্যাম্পে পৌঁছুতে না পারলে চূড়ান্ত শাস্তি। মালসুমার কাঁধে একটা স্টেনগান। বাকী সবার কাঁধে একটা করে থ্রি নট- থ্রি -রাইফেল। আড়াইশো রাউন্ড করে গুলি। পিঠে সবার হ্যাভার-স্যাক ব্যাগ।

খেপেঙরায় এই দলে নূতন। মাত্র পাঁচ দিন ধরে বাস লুট করে ফিরে আসা দলের সাথে যোগ দেয়। এখনো তাকে বন্দুক দেয়া হয়নি। টেকটিকেল ক্যাম্পে রিপোর্ট করার পর তিন মাস ট্রেনিং। এর পর বন্দুক, হ্যাভার-স্যাক সবকিছুই হবে। এখন হাতে একটা টাক্কাল, গামছায় পুটলায় বাধা একটা জামা একটা প্যান্ট। আর কিছুই নেই। খেপেঙরায়কে নিয়ে দলে সবসুদ্ধ জনা দশেক লোক।

মালসুমা আগে আগে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফায় কাঠবিড়ালীর মতো। কখনো খাড়া পাহাড়ে লতা ধরে সোজা বেয়ে উঠে মনে হয় একটা বিরাট গুইল সাপ। সামনেই একটা দু'পায়া

পথে পা বাড়ায় মালসুমা। সেই পথ একটা গভীর চামল বনের দিকে রেখার মতো ছুটে গেছে, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় খেপেঙরায় মালসুমার ক্ষিপ্র সতর্ক চলাটা খেয়াল করে।

চামল বনের অরণ্য পার হয়ে এক ছোট নদী, পাহাড়ের উপর কল কল বেগে ছুটছে। মালসুমা নদীর উপর দিয়ে চ্ছলাৎ চ্ছলাৎ হাঁটে। জংলী জুতো জোড়া জলে ভিজা। যেতে যেতে নদীর বাঁকে গিয়ে মনে হয়। আরো আছে । এই অনেকগুলো আরো আছে পার হয়ে পৌঁছায় শ্যাওলা ধরা কাঠের ঘাটে। নদী থেকে সোজা কোদালে কাটা সিঁড়ি। সিঁড়ির কাছে যেতেই শোনা যায় গৃহপালিত মুর্গীর ডাক। কখনো শিশুর চীৎকার। কখনো গাইল-ছিয়ার দুপ্ দাপ আওয়াজ। অস্ফুট কিছু ভাসা ভাসা কথা। মালসুমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে আমরা এখন অক্রফা পাড়ায়। খেপেঙরায় লোকালয়ে পৌঁছার আনন্দে চিক্ চিকে খুশীতে চোখ উজ্জ্বল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চোখে পড়ে বেশ লম্বা একটা পাহাড়ী পাড়া। উঠোনে উঠোনে ঘোৎ ঘোৎ করে এলোমেলো শূয়রের পাল। উদ্দামভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চড়া এলোমেলো মুর্গী। লোকজন খুব একটা নেই। অধিকাংশ বাড়ীর দরজা বন্ধ। জুম ক্ষেতে চলে যাওয়ার মতো শূন্যতা ।

পিঠে বাচ্চা নিয়ে দুটো বছর সাতেকের মেয়ে। মাথায় তাদের কাপড়। বোঝা যায় নোয়াতিয়া লাইতং। খেপেঙরায়দের দেখেই প্রাণপণে ঘরের দিকে ছোটে। কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ড'কে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি অবসাদের মধ্যে কুকুরের এক সাথে ডাকাটা বড় বিরক্তিকর। মালসুম' একটা বড় কাঠের ডাল কুকুরের দিকে নিক্ষেপ করে। কুকুর গুলোর কলরব আরো বাড়ে ক'ানের পর্দা ফাটিয়ে। কাছেই টং ঘরের মাচায় এক বুড়ো। পিঠে বাচ্চা। বেত চিরে চিরে চাটাই বুনে যাচ্ছে আপন মনে। বন্দুকধারী এতজন লোক দেখে ভ্রুক্ষেপও করে না। ডর ভয় কিছু নেই। একেবারে নির্বিকার। চোখ জোড়া মন্থর ভাবে তুলে তাকালো একবার। তারপরেই ডুব দেয় আপন কাজে।

মালসুমার ব্যক্তিত্বে একটু আঘাত লাগে। এখানকার সব পথ ঘাট চেনা জানা। তবু জিজ্ঞেস ক'ে বুড়োকে— হেই বুড়ো, কুকুরগুলোকে একটু সামলাও না। বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকায়। একেবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে দায় সারার মতো চুৎ চুৎ চু -চু আওাজ করে। বুড়োর ইচ্ছাকৃত উদাস ভাবটায় সবাই রাগে। মালসুমা কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করে— হেই বুড়ো থাংনাং গ্রামে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে।

বুড়োও উত্তর দেয় 'ওই দিকে'। ওই দিকটা যে কোন দিক বুঝা বড় কঠিন। মালসুমা আবার জিজ্ঞেস করে। ওই দিকে মানে কোন দিকে। বুড়ো উত্তর দেয় 'আমি জানি না, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো।'

মালসুমা চকিতে এক লাফে মাচায় উঠেই পিঠে বাঁধা বাচ্চার কাপড়টা খুলে ঘাড়ে ধরে প্রচন্ড ধাক্কায় বুড়োকে ফেলে উঠোনে। মুখ থুবড়ে বুড়ো ধূলি মাখা চোখে তাকায়। কিল, চড়, লাথি বুড়োর সর্বাঙ্গে বৃষ্টির মতো পড়ে। গায়ের জামাটা ফালা ফালা হয়ে ছেঁড়ে । বুড়ো কোনরকমে কফ বিজড়িত গলায় চীৎকার করে। কে শোনে কার চীৎকার। বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে গালের উপর মারল একজন। গলগল করে মুখে রক্ত বেরোয় বুড়োর। রক্তের সাথে হলদে দুটি দাঁতও বেরোয়। এত কষ্টের পর বুড়োর ক্ষমা নেই। দুনিয়া নামের জমাতিয়া ছেলেটা মুখ খিচে গলায়

গামছা বেঁধে হিড় হিড় করে উঠোনে মরা কুকুরের মতো টানে বুড়োকে। শালা ভনিতা করছ। এতক্ষণ তো কথাই বলতে চাওনি। আমরা কুকুর বেড়াল এসেছি নাকি।

বুড়ো নতজানু হয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। বাবু, আমার শরীর ভাল না, একমাস যাবৎ বিছানায় রোগে পড়ে আছি। মালসুমা বুড়োর থুতনিতে লাথি মেরে মাটিতে ধপাস করে ফেলে। পাড়ার বিভিন্ন বাড়ী থেকে নারী পুরুষ ছুটে আসে। শুরু হয় একসাথে কান্নার রোল। মালসুমা বন্দুকের নলটা উঁচিয়ে সবার দিকে ঘুরিয়ে বলে, খবরদার। কান্নাকাটি করবে তো এখান থেকে কেউ যেতে পারবে না।

বুক ঝাঁঝরা করে দেব। কান্নার রোল নিমেষে থামে। তবু কান্না চাপানো আবেগ থমকে থমকে উঠে মাঝে মধ্যে। সন্ত্রস্ত চোখে ফোটে ভয়ের করুণ ছায়া। কেউ এসে মালসুমার পায়ে ধরে, কেউ এসে বুড়োর রক্ত মোছে। জমাতিয়া ছোকরাটা এক লাথিতে পায়ে ধরা মেয়েটাকে দূরে নিক্ষেপ করে। সোজা বন্দুকের নলটা বুড়োর বুকে ধরে ট্রিগার আঙুলে রেখে বলে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কোনদিন এমন কাজ করবে না। জাননা। আমরা কারা। দেশের জন্য বাড়ী ঘর সব ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি। সাত দিনে দু'দিন খাওয়া জুটে কি জুটে না। আর তুমি! একটু রাস্তা দেখাতে কষ্ট পাচ্ছ। কত বড় লোক! কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে কর না।

বুড়োর সারা দেহ ধূলো মাখা, মাথায় আগাছা গাল ফুলে চেহারা পাল্টায়। পায়ে ধরে মুখ তোলে অসহায় চোখে প্রতিজ্ঞা করে বুড়ো। আমাকে বাবু ক্ষমা কর। প্রতিজ্ঞা করছি কোনদিন এমন ভুল করব না।

মালসুমা এবার একটু শান্ত হয়ে বলে — হই, দুনিয়া! বন্দুকটা রাখ। ওরা আমাদের আইন কানুন সব জানে না। আস্তে আস্তে সব জানবে। দে আজকের জন্য ওকে ছেড়ে দে। বলে বগলের বাঁশীতে ফুঁ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছনে পিছনে হাঁটে সারি বেঁধে। খেপেঙরায় কোন কিছুতেই অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু কতদিন না করে থাকতে পারবে। মালসুমা স্নেহের সুরে বলে— জানো বাচ্চা খরগোস। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জুম কাটতে গিয়ে পেট্রোল ফরেস্টার বাবাকে জেলে পাঠায়। জেলে থাকে দু'মাস বিনা জামিনে। সংসারের বিরাট ভার আমার কাঁধে নামে। কারণ ভাইদের মধ্যে আমিই বড়। বাধ্য হয়ে পড়াশুনা বন্ধ করলাম। রুজি রোজগার করে ভাত যোগাড় করব না পড়ব। দু'কাণি লুঙ্গা জমি ছিল আমাদের। সব বিক্রি বন্ধক দিয়ে বাবার কেইস চালিয়েছি। ফরেস্টার বাবুর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে পালাতে গিয়ে পাহাড় থেকে পিছলে গিয়ে মেরুদন্ডের হাড় ভাঙে। জেল থেকে খালাস পেয়ে মাস তিনেক কোনরকম বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ভিটে বিক্রি করেও চিকিৎসার ত্রুটি করিনি। মারা গেল।

এর পর যাই কোথায়। রাস্তায় পুল মিস্ত্রির যোগালীর কাজে যোগ দেই। পুলের কাজ সবদিন পাওয়া যায় না। শুরু করলাম মদ বানিয়ে বিক্রি করা। চার বার জেলে গেলাম। দারোগা বাবুর মাসোহারা টাকা সময় মতো দিতে পারিনি। মায়ের তখন যক্ষ্মা রোগ। থু-থুর সাথে দলাদলা কাঁচা রক্ত বেরোয়। বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলো! দাহন করার সময় পর্যন্ত আমি জেলে। ছোট ছোট ছয় ভাই-বোনকে নিয়ে পথে পথে অনেক ঘুরেছি। আমার সঙ্গে থেকে ওরা কোনদিন পেট ভরে খেতে পায়নি। ছোট ভাই এখন পরের বাড়ী মুনির কাজ করে।

কই! ওই দুঃসময়ে আমাদের চোখের জল দেখতে কেউ আসেনি। যে দু'কানি জমি মহাজনের কাছে বন্ধক গেছে, ফেরত আনা কোনদিন হবে না। মহাজনের গরু বাছুর বিনে পয়সায় রাখালি করেছি দু'বছর। সে তবুও জমি ফেরত দেয়নি। জীবনের সব পথ আমাদের জন্য রুদ্ধ। যেদিকে গেছি মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা আমাকে শুধু দূর দূর করেছে। বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভিজে আসে মালসুমার । একসময় কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

যেতে যেতে প্রায় দশটার মতো ছোট ছোট ছড়া পার হলো। চারদিকে নিশ্চুপ বন জঙ্গল। মানুষ্যের সাড়া শব্দ নেই। বাতাসে বাঁশে বাঁশ ঠুকে দু'একটা আওয়াজ । কখনো বা ঝিঁঝির নিঃসঙ্গ বেদনার একটানা গান। বড় একটা কাটা কড়ুই গাছের বাকলের উপর উর্দ্ধমুখী দা এর কোপ। পর পর তিন চারটে গাছ এই ধরণের। মালসুমা অঙুল নির্দিষ্ট করে বাকলের উপর দা-এর কোপ দেখিয়ে বলে— এই দাগ দেখে আমাদের টেকটিকেল ক্যাম্পের পথের সংকেত বুঝি। চলো ওই দিকে।

মাইল খানেক এগিয়ে খেপেঙরায় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অস্পষ্ট স্বরে মনুষ্য কণ্ঠের এক বুকভাঙা আর্তনাদ ভেসে আসে। বিজ্ঞের মতো একটু হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে মালসুমা বলে— চমকে যেয়ো না। যারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায় সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেয়ার জায়গা হচ্ছে ওই টীলার পেট। খেপেঙরায় কয়েক পা এগিয়ে চোখ বড় বড় করে। বিরাট ডালপালা বিস্তার করা পুরনো এক চামল গাছ। ছম ছম করে সারা দেহের রোম কূপ। যখন চোখে পড়ে দড়ি দিয়ে ডাল থেকে ঝুলানো জীবন্ত একটা মানুষ।

কিশোরের বয়েস তারই সমান হবে। পরনে ছোট্ট হাফ পেন্ট। খালি গায়ের লালচে পিঠে কালো কালো কঞ্চির দাগ। কোন কোন দাগ থেকে রক্ত তখনো ঝরে। হাত দুটো পিঠের পিছনে শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা। দু'পা জোড়া করে দড়ি বেঁধে গাছের উঁচু ডাল থেকে ঝুলানো। মাথার চুল মাটির দিকে ছুঁই ছুঁই করছে।

তিন জন যুবক পোষাক পরা। একজন গাছে উঠে গোড়ালীতে পায়ের পাতায় একটা কাঠের মুগুর দিয়ে আঘাত করে। আরেকজন নিজের চোখ বেঁধে হাতের কঞ্চি দিয়ে সপাং সপাং মারে। অন্য জন দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে নির্দেশ দেয়। খেপেঙরায় বুঝতে পারে এদের একজন নেতা।

সপাং সপাং কঞ্চি যখন পড়ে, কিশোরের সারা দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে উঠে ছটফটানিতে। আতঙ্কিত চোখ জোড়া বিস্ফারিত সহানুভূতি ভিক্ষার এক মরমী ব্যাকুলতায়। বাদুড়ের মতো মাথাটা যখন এপাশ ওপাশ ঘুরোয় তখন তাকানো যায় না। থর থর কাঁপন ধরা ঠোঁটে কি যেন বলতে চায়। বলতে পারে না। ঠোঁটের কোণ থেকে চোখের উপর দিয়ে চুল পর্যন্ত লালা গড়ায়। সঙ্গে দু'এক ফোটা তাজা রক্ত। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

নিজের অজান্তেই চোখের পেশী অসহনীয় নিষ্ঠুর দৃশ্যের যন্ত্রণায় সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। চোখের বন্ধ কলাপের ভিতরও সেই নির্মম দৃশ্য অনেকক্ষণ ভেসে থাকে। ইচ্ছে করেও সরতে চায় না। শিরা উপশিরায় প্রবাহিত রক্ত নিমেষে থমকে জমে যেতে চায় ঘুমন্ত বিবেকে সজোরে টানা অদৃশ্য লাগামের টানে। কানের পর্দায় জলন্ত লৌহ শলাকার মতো বিঁধে কঞ্চির সপ সপাং শব্দের

সাথে ওই যুবকের আর্তনাদ।

মালসুমা চোখ টিপে ইশারা করতেই কে যেন একজন খেপেঙরায়ের হাত ধরে টানে। টেকটিক্যাল ক্যাম্পের পথ ধরে হাঁটে। একটা সিগারেট ধরিয়ে খেপেঙরায়ের কাঁধে হাত রাখে মালসুমা । মুখে তার ক্রুর হাসি । নরম সুরে বোঝাতে চায় খেপেঙরায়কে তুমি একটা আস্ত খরগোস । এতা ভয় থাকলে ত্রিপুরা স্বাধীন করবে কি করে। আমাদের পাহাড়ী জাতকে যদি ভালোবাস তবে শত্রু, বেইমান, ওদেরকে খতম করতে হবে। এতে যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে তুমি এই পথে এলে কেন। যাক এসব নিয়ে বেশী ভাবনা চিন্তা করো না। যখন যা আদেশ করি দ্বিধাহীন ভাবে মেনে চললেই সব ঠিক হয়ে যাবে । সাবধান— ভাল মন্দ খারাপ, কেন, কি কোন সময়, কোথায় ওসব প্রশ্ন টশ্ন করতে যেয়ো না। তাহলে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। খেপেঙরায় নিরুত্তর। কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে থাকলেও সাহস কোথায়! মাথায় তখনো বিষাদ ঘুঙুরের মতো ফুটফুটে কিশোরের আর্তনাদ রিমঝিম বাজে। প্রশ্ন করা নিষেধ। তবু মাথার মধ্যে ভীমরুলের মতো অনেক প্রশ্ন হূল ফুটায় । তাকেও কি এমনি নিষ্ঠুর হয়ে নিজেরই কাউকে মারতে হবে।

বাংলাদেশের এই গহন অরণ্যের যেন শেষ সীমা নেই। নাম তার মায়ানী রিজার্ভ। মায়াবী রাক্ষসীর রূপ কথার মতোই রহস্যময় আর ভয়ঙ্কর তার গহন বনের ইতিকথা। গাছ, গাছালির ছম ছম শব্দ। নির্জনে নিঃসঙ্গ ঝিঁঝির ডাকে খেপেঙরায়ের মনে আঁকে না জানা কত নিষ্ঠুর ছবি। কদম কদম এগোয় যত, গহন বন তত রহস্যময় হয়ে উঠে। অক্রুফা পাড়ায় সেই বুড়োর ঘটনার পর হাঁটছে তো হাঁটছেই। শেষ কোথায়। দুর্গম সাজাক পাহাড়ের চূড়ার মাথায় সূর্য উঠে। দুর্ভেদ্য গভীর বনের পাস দিয়ে যেতে যেতে কখনো টিলার পেটে কখনো পাদদেশে জিরিয়ে শেষে পৌছায় তিন পাহাড়ের সঙ্গম স্থলে।

তিন পাহাড়ে ঘেরা বিশাল লুঙ্গা। দক্ষিণ পশ্চিমে নিঃশব্দে নীরবে বইছে এক ছোট নদী। নাম তার মাজরা ছড়া। বাঁশ পাতায় ছানি দেওয়া তিনটে লম্বা ঘর। মাঝখানে কুচকাওয়াজের ছোট মাঠ। সেখানে কেপটেন মালসুমা দাঁড়ায়। খেপেঙরায় মনে মনে ভাবে এবার বুঝি বাঁশী বাজবে। না। কোন বাঁশী বাজায় নি। দুটি বাঁশের টুকরো হাতে নিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে। বাঁশে বাঁশ ঠুকা সংকেত পেয়ে বেরিয়ে আসে সান্ত্রী। বেটে খাটো অথচ বলিষ্ঠ। গায়ের ঘন সবুজ উর্দি দেখে বুঝতে দেরী হয় না মালসুমার দলেরই লোক বলে। এসেই সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে মালসুমাকে।

মাসলুমার ছোট দলটা ধীরে ধীরে বাঁশের শিবিরে গিয়ে ঢোকে। হঠাৎ ধমকে চমকে উঠে খেপেঙরায়। হেণ্ডস্ আপ। মালসুমা তাকে কখন কি করতে হবে বুঝিয়েছিলো আগেই। দু'হাত তুলে দাঁড়ায়। হাত তুলা অবস্থায় তাকে নিয়ে যায় বাঁশের এক লম্বা ঘরে। বন কচুর গুড়ি ভরা মেঝের মাটি। কোথাও আবার কেঁচোর মাটি দল পাকানো। বাড়ীতে সে ভাল বিছানা দেখেনি। তবে কেঁচোর মাটিতে কোনদিন শুতে হয় নি। কিছু না থাকুক অন্ততঃ একটা বাঁশের মাচা ছিল। নিজেকে নিজে আরও কঠিনতর অভ্যাস ও কষ্টের জন্য পরামর্শ দেয়। তিন হাত লম্বা একটা পলিথিনের টুকরা দিলো তাকে শোবার জন্যে। আগন্তুক বলে তাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস

করতে এলো না। একা একা বসে থাকে টেকটিক্যাল ক্যাম্পের শিবিরে। কাছের আরেকটা ঘর থেকে মাঝে মধ্যে রেডিওর হিন্দি গানের কলি ভেসে আসে। অন্ধকার পাহাড়পুরীর বুকে যেন অমরা পুরীর কোন অলৌকিক মুর্চ্ছনা। কার ঘরে রেডিও বাজে জানার কৌতুহল থাকলেও সাহস ছিল না জিজ্ঞাসার । সন্ধ্যে বেলা ফল-ইন হওয়ার পর খাওয়া। এর আগে কোন বন্দোবস্ত নেই। ক্লান্তিতে অবসাদে নড়তে চড়তে পারে না। পলিথিনের উপর গা এলিয়ে ঘুম আসে দু'চোখ ভরে।

বিকাল চারটা! একজন রিয়াং সান্ত্রী এসে খেপেঙরায়ের ঘুম ভাঙায়। কাঁচা ঘুম ভাঙায় অস্বস্তি লাগে খেপেঙরায়ের। অনেক লোক। রিয়াং, ত্রিপুরী হালাম, জমাতিয়া, কলই সব সম্প্রদায়ের চল্লিশ পঞ্চাশ জন হবে। সবাই জুম থেকে ফিরছে। এসেই বাঁশের হুঁকোতে তামাক ভরে গোল গোল হয়ে বসে। কয়েকজন আবার বসে আগন্তুককে ঘিরে। বাস লুটের ঘটনা জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুটিয়ে। সবাই এখানে রেডিওতে বাস লুটের ঘটনা শুনছে। কেউ কেউ আবার নির্বিকার। বাস লুট তো দূরের কথা পৃথিবী ভাঙলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

খেপেঙরায় প্রশ্নবানে জর্জরিত। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কারণ সে লুটের সময় ছিল না। পালাবার পথে এসে যোগ দেয়। কারো বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। অধিকাংশ ছেলেই ত্রিশ-এর নীচে। ক্ষুধার্ত চোখের চাউনীতে ফুটে সন্ধ্যেবেলায় খাবার তৈরীর অধীর অপেক্ষা। ক্লান্ত চোখ মুখে অপ্রকাশিত নিরাশা আর বিষাদের ছায়া। কয়েকজন বসে টাক্কাল হাতে খাকুলু কাটতে। এক সাথে পাঁচ সাতটা খাকুলু । পাশেই দু'জন বড় দুটো মুরগী কেটে চামড়া ছাড়ায়। খেপেঙরায় ভাবে এত মানুষ আর খাকুলুর তুলনায় মাংস এত কম । ওই টুকু মাংস কার মুখে দেবে।

হঠাৎ বাঁশী বাজে। কলের পুতুলের মতো সবাই ছুটে মাজরা ছড়ায়। হাত মুখ ধুতে । বেটে খাটো কলই ছেলেটা খেপেঙরায়কে নিয়ে যায় ছড়ায়। লোকটা কেমন কে জানে। এত কষ্টের মধ্যেও গুনগুনিয়ে গান গায়। বিষাদ হতাশা ভরা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আরেক পৃথিবীর জীবের মতো আপন ভোলা। অনেক আগেই জঙ্গলে হারিয়ে গেছে বিকেলের রোদ। আকাশে তখনো রোদের শেষ রক্তিম আভা। কলই ছেলেটা চারদিকে তাকায়। আবার মাথা নীচু করে পাথরে গর্তে হাত ঢুকিয়ে চিংড়ি মাছ খোঁজে। কেউনা দেখে এমন করে পকেটে পুরে চিংড়ি মাছ। খেপেঙরায় বিষ্ময়ে তাকায় মাজরা ছড়ায় চিংড়ি চুরির খেলা। কলই ছেলেটা খেপেঙরায়কে শাসানোর ভঙ্গীতে বলে— সাবধান চিংড়ি ধরার কথা কাউকে বলবি তো পেটের ভুরুল বের করে ফেলব। খেপেঙরায় বোবা হয়ে তাকায়। চিংড়ি ধরা কিসের অপরাধ যুক্তিতে আসেনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই ফল-ইন পেরেড আর গুনতি শেষ।

দল বেঁধে খেতে বসে সবাই শিবিরের উঠোনে। খেপেঙরায়ের পাশে সেই কলই ছেলেটা। টিনের বাটিতে এক বাটি ভাত সবার পাতে। বাটির উপর ভাতের চূড়া নির্মমভাবে বাঁশের টুকরো দিয়ে কেটে দেয়। নিমেষে খাকুলুর সাথে সিদল মেশানো ঝোল শেষ করে। অনেকক্ষণ জিভ দিয়ে আঙুল চেটে বসে থাকে খেপেঙরায়। কলই ছেলেটা টুক করে পেকেট থেকে একটা পোড়া চিংড়ি খেপেঙরায়ের পাতে নিক্ষেপ করে। আশা ছিল মাংস আসবে। আর কিছুই আসেনা। সবাই উঠে

নিজের এঁটো পাতা হাতে নিয়ে। খেপেঙরায়ের অপেক্ষা দেখে কলই ছেলেটা বললো—ওঠ। আর কিছু ভাগ্যে নেই। পেট কারো ভরে না। কোন দিন ভরবেও না। খেপেঙরায় বিশ্বাস করতে পারে না। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে— কেন! মুরগীর মাংস কি এই বেলা রান্না হয়নি? কলই ছেলেটা ঠোঁটের কোণে করুণ হাসি ফুটিয়ে বলে— মুরগী তো রোজই রান্না হয়। তবে আমরা পাই না। কুকুরের মতো আধ পেট খেয়ে সন্তুষ্ট হতে শিখেছি।

দেখলে না? ক্যাম্প থেকে চার মাইল দূরে গিয়ে জুম ক্ষেতে কাজ করে এলাম। কই! এত কষ্টের পর কেউ পেট ভরে নুন ভাত পেয়েছে? আর অন্যদিকে অনেকে দু'বেলা তিন বেলা মাংস ছাড়া ভাত খায় না। স্বাস্থ্যটা কি ছিল আর কি হচ্ছে দিন দিন। আধ পেটা খেয়ে কোন দিন স্বাস্থ্য হয়! দিন দিন রোগা হচ্ছে। ফিরেও যেতে পারি না, থেকেও কি হবে কিছুই বুঝিনা। মনটাকে শক্ত করে বুঝিয়েছি। চিন্তা রোগে শরীরই খারাপ হয়, লাভ কিছুই হবে না। কপালে যা লিখা আছে কেউ খন্ডাতে পারে না। বলতে বলতে আবার সতর্ক হয়ে উঠে কলই ছেলেটা। এসব কথা আবার অন্যের কানে যেন না যায়। কমান্ডারের কানে গেলে জ্যান্ত গুলি করে মারবে। কথার সাথে মুখটা কেমন মেঘলা মেঘলা লাগে সন্দেহ আর অবিশ্বাসে। এই নিষ্ঠুরতার অন্তহীন ধারাবাহিকতার পেছনে কোন্ আদর্শের খেলা বুঝতে কষ্ট হয় খেপেঙরায়ের। দ্বিধা দ্বন্দ্বের জিজ্ঞাসায় তোলপাড় মন। ঘোলাটে ধোঁয়াটে চিন্তা জটলায় ভারী হয়ে আসে মাথা! ছন্ন ছাড়া জীবনের মোড় কোথায় এসে থমকে দাঁড়াবে নিজেই জানে না। ঘুমোবার সংকেত দিয়ে বাজে ক্যাম্পের বাঁশী। শিবিরে সারি সারি পলিথিনের টুকরা। শুতে যায় সবে। খেপেঙরায়ের চোখে ঘুম আসে না। তবু ঘুমোতে হয়।

সকাল তিনটে হলে ঘুম ভাঙে। উঠোন ঘর সাফাই-এর শব্দ। তারপর পিটি বা শরীরের কসরৎ খেলা। প্রচন্ড শৃঙ্খলায় তালে তালে বাঁশীর সাথে হাত পা উঠানো নামানো। কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে চিৎ হয়ে বা উপুড় হয়ে বিচিত্র ভঙ্গী। উদ্দাম উন্মত্ত চাঞ্চল্যে শরীরে মনে সঞ্চারিত হয় এক দুর্বোধ্য বুনো আনন্দ। খেপেঙরায়ের প্রশ্ন জাগে। মানুষগুলো কি মাসের পর মাস বছরের পর বছর এমনি অফুরন্ত উৎসাহে উল্লাস মুখর জীবন কাটাতে পারবে । সারা দেহের কোষে কোষে তখন উন্মাদনার ক্ষিপ্রতার শিহরণ জাগে। বাঁশী বাজে প্রাতঃরাশের । প্রাতঃরাশ বলে কিছু নেই। এক বাটি ভাত আর বেরমান বুতুই। মানে সিদলের ঝোল। সারাদিনের আহারটুকু পেটে যেতে না যেতে আবার বাঁশী বাজায় মিজো ওস্তাদ।

বিচিত্র ধরণের হামাগুড়ি শেখার পালা। কখনো সাপের মতো উপুড় হয়ে বুক মাটিতে ঘসে ঘসে চলা । কখনো বাঘের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঁচু পাহাড় ডিঙানোর অভ্যাস। মাটির ঘসায় কনুই-এর চামড়া উঠে, হাঁটুর চামড়ায় জ্বালা পুড়া করে। খেপেঙরায় দুদিন বাদে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঔষধ পথ্য নেই। গরম জলের সেক দেওয়ার সুবিধাও কম। উপায় নেই। অসুস্থ হলেও প্যারেডের মাঠে যেতেই হবে। কারো আমাশা, কারো ম্যালেরিয়া জ্বর। কারো মাথা বেদনা। বেশী অসুস্থ হলে বন্দুকের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খোলা বা জোড়া দেওয়া। প্রতি রোববারে ঈশ্বরের প্রার্থনা সভা জমে কুচকাওয়াজের মাঠের কোণার গীর্জায়। শুচি শুদ্ধ হয়ে সব খ্রীস্টানরাই আসে গীর্জার গম্ভীর ঘন্টার মাঙ্গলিক সুরে। মিজোরামের আত্মগোপনকারীরাও বাদ যায় না। তাদের মধ্যে

রাভো লুসাই অন্যতম। খেপেঙরায় খ্রীস্টান না হলেও বাইবেলের শ্লোক শুনতে ভালবাসে। নতজানু হয়ে দেবদূতের মতো রাভো লুসাই-এর প্রার্থনা বিস্ময় জাগায়। বাইবেল ভালবাসলেও হত্যা বিদ্যার আসল গুরু রাভো লুসাই। তারা বলে মিজো ওস্তাদ। বয়েস প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। সুঠাম দেহে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। বহু সামরিক কনভয় এমবুশে খান খান করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবন। রসিয়ে রসিয়ে বীরত্বের কাহিনী শোনায়। মানুষ নৃশংস কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু জানে কিনা কেউ জানে না।

একদিন লোকটা জীবন্ত বানর ফাঁদে ধরে নিয়ে আসে। হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে গাছে ঝুলায় দূর থেকে গুলি করে নিশানা অব্যর্থ করতে শেখায়। বানরটা চেঁচিয়ে উঠে প্রথম গুলিতে একটা উরু ছিদ্র হয়ে গেলে বানরের আর্তনাদে সারা মায়ানী বনভূমি থর থর কাঁপে। রক্ত ঝরে অবিরত। বুক আর মাথা ছাড়া সারাটা দেহ ঝাঁঝরা।

প্রাণ থাকা অবস্থায় নামিয়ে আনে। এবার খেপেঙরায়ের পালা। একটা চোখ ধীরে ধীরে উপড়াতে হবে। হাত কাঁপে, বুক কাঁপে, মাথাটা কেমন করে উঠে মিজো ওস্তাদের হুকুম শোনে। খেপেঙরায়কে বিবশ করে তুলে বানরের নিষ্পাপ চোখের ভয়ার্ত চাউনি। এক হাতে বানরের মাথার পিছনের দিকটা ধরে। মাথার শিরার স্পন্দন হাতেও সঞ্চারিত হয় এক প্রাণের প্রতি আরেক প্রাণের দরদে। বাকী হাত ছুরি থেকে খসে যেতে চায়। দেরী দেখে মিজো ওস্তাদ খেপেঙরায়কে সরিয়ে দেয় লাথি মেরে। একটা বানরের চোখ উপড়াতে যদি কষ্ট লাগে, তুমি পারবে মানুষ মারতে!

থর থর কাঁপা চোখের মণিটা হাতে রেখে মিজো ওস্তাদ বলতে থাকে। ঠান্ডা মাথায় সিগারেট টেনে, হাত পা বাঁধা মানুষের গলার নালী পুছ পুছ দিয়ে কাটতে শিখেছি। আর একটা অর্ধমৃত বানরের চোখ উপড়াতে তোমার হাত কাঁপছে। ওস্তাদের মুখে ভরা ক্রুর হাসি। ভয়ঙ্কর সেই হাসির আড়ালে লুকোচুরি খেলে এক জঘন্য শয়তানের রূপ। খেপেঙরায় ভাবতেই পারে না এই লোকটা কেমন করে গীর্জার প্রার্থনা সভায় বাইবেলের শ্লোক আওড়ায়। এই রকম নিষ্ঠুর মানুষ শিকারীকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেন ক্ষমা করে। জীবন্ত মানুষের গলার নালী কাটার বীভৎস দৃশ্য খেপেঙরায়ের দেখা।

মনে পড়ে আজ থেকে বছর দু'এক আগের ঘটনা। এখান থেকে অনেক দূরের ত্রিপুরা রাজ্যের লঙতরাই পাহাড়। পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে ছোট একটা গ্রাম নাম মেচুরিয়া। জাংথুমছড়া তর তর করে ছুটে মেচুরিয়া গ্রামের বুক চিরে। নদীর পূর্ব পাড়ে ত্রিপুরী উপজাতিদের পোনের বিশটা বাড়ী। পশ্চিম পাড়ে উদ্বাস্তু বাঙালীদের ভূমিহীন কলোনী। ওই উপজাতি পাড়াটাই খেপেঙরায়ের জন্মভূমি। ছেলেবেলাতেই মা বাপ হারিয়ে ঠাকুরমার কোলে পিঠে বেড়ে উঠে। জমিজমা ছিল না। অন্যের গরু রাখালি করে পেট পালতো। সকাল বিকেল গরুর পাল নিয়ে ছুটতো জাংথুমছড়ার উজানে। গরু ছেড়ে জারুল গাছের ছায়ায় বসতো বাঁশী বাজিয়ে। কাছেই আবার ভাটিয়ালী গান গেয়ে গরু চরাতো ভূমিহীন কলোনীর সুধীর দাস। ওর সংসারেও বিধবা মা ছাড়া কেউ ছিল না। দুই নির্ধনের ধন মিলে সবার অজান্তে। গরু চরিয়ে দু'জনে ফিরে এক সাথে। একজন নদীর এই পারে, অন্যজন নদীর ওই পারে। সন্ধ্যে বেলা দু'জনে মিলে গ্রামে

পাড়ায় চষে বেড়াত। কখনো বাঙালী পাড়ায় মদন কচু চুরি। কখনো পাহাড়ী পাড়ায় আখ চুরি।

মানিক জোড় যে দিকে যেতো একটা অঘটন ঘটত। পাহাড়ী পাড়ায় গড়িয়া পুজো হতো বছর বছর। পূজার মাদল গভীর রাতে সুধীরকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। নদী পার হয়ে রাত্রি বেলা সুধীর খেপেঙরায়ের টংঘরে। কুক্ কুক্ উড়ি বাজালে খপেঙরায়ও বেরিয়ে আসতো। দু'জনে চলে যেতো গড়িয়া পুজোর উঠোনে। সুধীরের পাড়ায় কোন বাড়ীতে কীর্তন হবে রাত ভর। খেপেঙরায় আর সুধীর না হলে জমতোই না। তিননাথের আসর হোক দু'জনের থাকা চাইই। সুধীরের মা সংক্রান্তির পিঠে বানিয়ে লুকিয়ে রাখতো খেপেঙরায়কে দিতে। খেপেঙরায়ের ঠাকুমাও মুরগী কাটলে খেতে পারতো না সুধীরকে না দিয়ে।

হাটে, মাঠে, ঘাটে কোথাও মানিক জোড়ের জোড়া ভাঙে না। তাতেই বোধ হয় সর্বনাশের শুরু।

তখন শরৎকাল। জাংথুমে কাশফুলে ফোটে। সমুদ্রের ফেনায় মতো দিকদিগন্ত ছেয়ে। গরু ছেড়ে দু'জনে বসে কাশ ফুলের ঝোপের আড়ালে। কখনো গানে কখনো গল্পে তন্ময়। শরতের মেঘের মতো গরুগুলো চরতে চরতে আশেপাশে ঘুরে। সন্ধ্যেবেলা গরুর পাল জড়ো করে দেখে সুধীরের একটা ডেকি বাছুর নেই। খুঁজতে খুঁজতে রাত হলো।

পরদিন দু'জন মিলে ছুটলো লঙতরাই পাহাড়ের উঁচুতে মেজেনছড়ার কিনারে। মেজেনছড়া গ্রাম থেকে অনেক দূর। গ্রাম মাইল পাঁচেক। বিকেল হয়ে আসে উৎকণ্ঠায়। নির্জন পাহাড়ে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। টিলা নামে তরতর। চারদিকে বিস্তৃত মুলি বাঁশের বন। হঠাৎ বাঁশবনের ফাঁক থেকে ছয়জন লোক বেরিয়ে চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। পড়নে জলপাই রঙের পোষাক। দেখতে বেটে খাটো হলেও সৈনিকের মতো রুষ্ট চেহারা। হাতে বন্দুক স্টেনগান। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভয়ঙ্কর ভাবে একসাথে গর্জে উঠে বুনো জানোয়ারের মতো। ওই গর্জনে পিলা চমকায়। বাক শক্তি হারিয়ে ফেলে দু'জনেই! চোখের পলকে পিছমোড়া করে বাঁধে। চোখেও আবার শক্ত করে গামছার পট্টি বেঁধে দেয়। চোখ বেঁধেই নিয়ে চলে আরো গহন জঙ্গলে।

খেপেঙরায়ের চোখের বাঁধন খুলে সুধীরের দুটো পা বেত দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বাঁধে। প্রাণপণে ঝাকুনি দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করে খেপেঙরায়। আকাশ বাতাস কাঁপে চীৎকারে। কিন্তু তাকে সজোরে মাটিতে শুইয়ে বুটের তলায় মাথা বুক চেপে রাখে। বন্দুকের বাট দিয়ে ঠোঁট থেতলিয়ে, পায়ের আঙ্গুল ফাটিয়ে চীৎকার বন্ধ করতে বলে। অন্যরা সুধীরকে চেপে ধরে মাটিতে। একজন ঠোঁট কামড়ে ধারালো টাক্কল দিয়ে গলার নালী কাটে। সুধীরের অর্ধছিন্ন গলাটা থরো থরো কেঁপে লুটিয়ে পড়ে অস্ফুট চীৎকার তুলে। হাত পা গুলি ছটফট করে শেষ আস্ফালনে। ঠোঁট কামড়ানো কসাই এর চোখ দুটো রক্তের পিপাসায় নেকড়ের মতো জ্বল জ্বল করছিল। খেপেঙরায় উন্মাদের মতো বুটের গোড়ালীর নীচে রাখা মুখ দিয়ে চীৎকার করে— বাবু আমাকে মেরে ফেলো, তবু ওকে ছেড়ে দাও। কার আবেদন কে শোনে। এতক্ষণে সুধীরের বিস্ফারিত কাতর চোখ দুটি স্থির। খেপেঙরায়কে তারা ছেড়ে দেয়নি। সাত দিন হাত বেঁধে পাহাড়ে সঙ্গে রাখে। শেষে লঙতরাই পাহাড়ের একটি হালাম বস্তীর পাশে নিয়ে ছাড়ে।

সাত দিনের প্রতিটি মিনিট ছিল দিনের চেয়েও লম্বা। বিলম্বিত সেই সাতদিনে গোটা

পৃথিবীটা বদলে গেছে ভয়ানক ভাবে। মুক্তির পর কোথায় যাবে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনা। কখনো থাংসি পাড়ায় রাত কাটায়। কখনো কুকীছড়ায় পাথরের উপরে একা হাঁটে নিঃসঙ্গ বনদেবতার মতো। বুক জুড়ে হাহাকার তোলে ভয়ঙ্কর এক রিক্ততা। অনেক ভেবে ছুটে এলো বিকেলে জাংথুম ছড়ার পারে। যেখানে ছড়ার পারে বসে সুধীরের মা গলা চেঁচিয়ে বুক ফাটিয়ে সুধীরের নাম ধরে ডাকে। সেই ডাকশুধু নদীর পাড়ে, বাঁশ বনে প্রতিধ্বনি তোলে বিষাদ ভরা ব্যাথায়। কাছে গেলো না। কি জবাব দেবে সুধীরের মাকে। মৃত্যু নিয়ে পাহাড়ী বাঙালী গ্রামে গুজব ছড়ে উত্তেজনার আগুন ছিটিয়ে। কেউ বলে সুধীরকে ডেকে নিয়ে খেপেঙরায় হত্যা করে পালিয়েছে, আবার কেউ ভাবে সুধীরের সাথে খেপেঙরায়ও মারা গেছে। পুলিশ এসে প্রায় রাতেই খেপেঙরায়ের বাড়ী তল্লাসী করে। বুড়ী ঠাকুরমাকে থানায় তিনদিন জেরাও করা হয়। সুধীরের মৃত্যু চোখে দেখেনি কেউ। সব গুজব সত্য বলে ধরে নেয় লোকে।

সুধীরের পাড়ার লোক না এলেও শহর থেকে কিছু ছেলে এসে খেপেঙরায়ের বাড়ীতে আগুন দিতে চেয়েছিল। তবে সুধীরের মা সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধা দেয়। আগুন জ্বালাতে পারে নি। অন্যদিকে উপজাতি পাড়ার মোড়ল শ্যামাকান্ত নতুন খ্রীস্টান। সে পাড়ার ছেলেদের জড়ো করে বন্দুক তৈরীর পরামর্শ দেয়। নইলে নাকি বাঙালীর হাত থেকে বাঁচা যাবে না। হিন্দু খ্রীস্টান কেউ ওর কথায় সায় দেয়নি। শ্যামাকান্তের বাড়ী এসে বন্দুকধারীরা রাত কাটায় মাঝে মাঝে। পাড়ায় বলে বেড়ায় কাঁকড়া তারাও। কাঁকড়ার মতো বাঙালীদের অনেক হাত ব্যবসা, জমি, অফিসে। শ্যামাকান্তই একদিন খেপেঙরায়কে ডেকে ওদের সাথে মিলিয়ে দিলো। একূল ওকূল দুকুল হারিয়ে খেপেঙরায় কোন পথে এগোবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজে গ্রামে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ। ফিরে আসতে পারে তবে জীবনের বিনিময়ে। আর ওই বন্দুকধারীদের দলেই বা যাবে কোন ভরসায়। না গিয়েও উপায় নেই। কোথাও কোন বাড়ীতে গেলে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। এক বেলা কোন রকম খাইয়ে বলে -- বাবা পুলিশ জানতে পারলে তুমিও গ্রেপ্তার হবে, আমরাও বাঁচব না। আশ্রয়হীন ভবঘুরের মতো একমুঠ ভাতের সন্ধানে বন বন ঘোরে। আর শামাকান্ত ভয়ের ধার ধারেই না। আপনজনের মত একটা চাদরও দিয়েছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হলে কি হবে। খেপেঙরায়কে বন্দুকধারীদের দলে ভেড়ার পরামর্শ ছাড়া বাঁচার কোন পথ দেখায় না। এমনি করেই মাসের পর মাস কাটে। তবু দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। সে যে বিশ্বাসঘাতক নয় সে কথা বিশ্বাস করানোর মানুষও খুঁজে পায় না। অনেক সাহসে নিশীথ রাতে চুপি চুপি একা গিয়ে পৌঁছে সুধীরের বাড়ী। প্রচন্ড ইচ্ছা সুধীরের মাকে সব খুলে বলবে। এতে যদি তাকে মারে মারুক, পুলিশের হাতে দেয় দিক।

দরজার কড়া নাড়তেই বুড়ী ঘরের ভেতর বাতি জ্বালে। ভয়ে ভয়ে চুপি দিয়ে দেখে বাইরের আগন্তুককে। অন্ধকারে চিনতেও পারে না। বুড়ী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ডাকাত! ডাকাত! হৈ চৈ সোরগোল উঠে। লোকজন বেরোয় চারদিকে। কারো হাতেটর্চ, কারো তীর, ধনুক, লাঠি। খেপেঙরায় অবস্থা বেগতিক দেখে প্রাণপণে ছুটে পালায় ; আজও পালিয়েই চলছে। চলতে চলতে শেষ ঠিকানা বাংলাদেশের মায়ানী রিজার্ভের নৃশংস মানুষের আস্তানায়।

টেকটিকেল ক্যাম্পের ট্রেনিং শেষ। খেপেঙরায় এখন আত্মগোপনকারীদের রাজধানীতে।

কাঁধে বন্দুক, পিঠে হেভারস্যাক বেগ। সঙ্গে আবার সেই বেটেখাটো ছেলেটা শুয়োরের মত হেলে দুলে চলে। সবাই ডাকে ওয়াক। অর্থ হলো শূয়োর। সাজাক পাহাড়ের চূড়ায় পাঙ্খ উপজাতিদের বসতি। গ্রামের নাম থাংনাং। থাংনাং থেকে দু'পায়া পথের রেখা কমলা বাগানের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে উত্তর পূর্বে। সুন্দী, শিমূল গাছ গাছালিতে আড়াল করা টিলায় শিবির সিংলুং। চারপাশে মূলিবাঁশের বন। মাঝখানে পাঁচটা বাঁশের পাতায় ছাওয়া ঘর। পিছনে নাবাক ছড়ার নির্বাক ধারা। খেপেঙরায় আর ওয়াক তখন কমাণ্ডারের সেন্ট্রি ডিউটিতে।

একটা ছিমছাম ঘরে রঙীন টেলিভিশনের পাশে কমাণ্ডার। টাইপমেশিন, কেমেরা বেড়াতে ঝুলানো। ঘরে প্রতিটা পালায় আবার বিভিন্ন জীব-জন্তুর মাথা। কোনটা বন মহিষের, কোনটা বানরের, কোনটা আবার মানুষের। টেবিলের উপর পা তুলে টেলিভিশনের ইংলিশ গানের তালে তালে নিজেও একটু একটু দোলে। প্রাতঃরাশ করে আস্ত একটা সেদ্ধ মুরগী চিবিয়ে চিবিয়ে। তাছাড়া টেবিলের উপর রুটি মাখন জেলী।

এমন সময় ত্রিপুরার ময়নামা বাজার লুট করে ফিরে আসে ছয়জন। সঙ্গে কাপড়ের বিরাট বোচকা। কমাণ্ডারের সামনে সকাল বেলা বোচকা নিয়ে ঢোকে কেপটেন মালসুমা। চোখে মুখে ক্লান্তি আর ক্ষুধা। দৃষ্টিটা কমাণ্ডারের মুখের মুরগীর ঠ্যাং এর দিকে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে মুরগীর মাংসের গন্ধে। বোচকা খুলে টেরিকটের কাপড়ের থান মেলে ধরে মালসুমা। কমাণ্ডার, পিঠ চাপড়িয়ে সাবাস্ বলে অদ্ভুত খুশীতে। মালসুমার পেন্ট ফাটা, ছেঁড়া। একদিকে দু'দিন গেলে ওই পেন্টে লজ্জা নিবারণ করা যাবে না। মালসুমা বিনীতভাবে বলে স্যার, একটা পেন্টের পিস্ যদি বলেন তো নিয়ে যাই। কমাণ্ডারের মুখটা নিমেষে বদলায়। গম্ভীর হয়ে বলে— সামনের মাসে ঢাকা শহরে কনফারেন্সে যেতে হবে। অনেক টাকা দরকার। বড় বড় হোটেলে খরচ এমনিতেই বেশী। ওই টেরিকটের থান কয়েকটা বেচে কী টাকাই পাব। তার উপর তুমি কোন মুখে পেন্টের কাপড় চাইছ বুঝি না। মালসুমা বিস্ময়ে বিষাদ মুখে বেরোয় ঘর থেকে। কমাণ্ডারের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে খেপেঙরায় হতবাক। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে জীবনের কত ঝুঁকি নেয় ওই মালসুমা। অনাহারে অর্ধাহারে বন্য জানোয়ারের মতো বন থেকে বনান্তরে ছুটে। নৃশংসতা এখন তার চরিত্রের মূল উপাদান। অথচ লোকটা এখানে কত অসহায়। নিজের হাতে লুট করে আনা একটা পেন্টের মালিক হতে পারে না। মালসুমাকে ঘর থেকে বেরুনোর পথে দু'জন সান্ত্রী কমাণ্ডারের ইশারায় সারা দেহ তল্লাস করে। অপমানে, লজ্জায় মালসুমার চোখ দুটি ছলছলে। পা দুটি ঠক্ ঠক্ কাঁপে।

একমাস বাদে রেডিওতে সন্ধ্যে বেলা খবর রটে আত্মগোপনকারী মালসুমা নয় জনের একটি দল নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সমেত আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে। সারাটা ক্যাম্পে সঙ্গে সঙ্গে জাগে চাপা চাঞ্চল্যের এক শিহরণ। আশা নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত শিবিরবাসীরা থমকে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের মনেই অনেক কিছু বলার আছে। তবু কেউ কিছু বলে না। পাছে কমাণ্ডার যদি শুনে ফেলে। তাছাড়া কে কাকে বিশ্বাস করবে। সন্দেহে, অবিশ্বাসে, ভয়ে এক একজন বোবা চেতনাহীন পাথরের মতো শক্ত। তবু চোখে ভাসে স্তিমিত আশা।

যক্ষ্মারোগে দীর্ঘদিন ভুগছে দুনিয়া জমাতিয়া। শরীরটা পাটকাঠির মতো লিকলিকে।

থু-থুর সাথে দলা দলা রক্ত বেরোয়। ভয়ে কাছে কেউ ভীড়ে না। রোজ রাত্রে সকালে জ্বর হয়। শীত শীত করে। গায়ে জড়ানোর একটা কম্বল পায়না। ঔষধ। এখানে দুঃস্বপ্নের চেয়েও অলীক। মিজো ডাক্তার খোয়ালতে কখন আসবে তারই অধীর অপেক্ষায় থাকে। ডাক্তার খোয়ালতে এলো না। কমাণ্ডারও ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেনি। গভীর রাতে একদিন কাশতে কাশতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল। শিয়রে ছিল না-মঞ্জুর দরখাস্ত। ভোর বেলা নাবাক ছড়ার পাশে গর্তখুড়ে কবর হলো। কমাণ্ডার একবার দেখতেও যায়নি।

নিরাশার অন্ধকার জমাট বাঁধে চির অমাবশ্যার মতো সারা শিবির ছেয়ে। দুঃখী দুঃখী মুখগুলো বড় নিরুৎসাহে পেরেডে ভীড় জমায়। সবসময় খিট খিটে থাকে মেজাজগুলো। তবু কিসের একটা ভয়ে প্রকাশ ঘটেনা। তুষের আগুনের মতো নিঃশব্দে ধিকি ধিকি জ্বলে।

একদিন কমাণ্ডার ডেকে পাঠায় খেপেঙরায়কে। চোখে মুখে ক্রোধের আগুন। ঘন ঘন পায়চারি করে গর্জে উঠে বলে— শুনেছ ! মালসুমা গোপনে গোপনে আরো অনেককে আত্মসমর্পণ করাবে। আস্তে আস্তে সবার মনোবল দুর্বল হচ্ছে। দলকে চাঙ্গা করতে গেলে আত্মসমর্পণের খেলা বন্ধ করতেই হবে। মালসুমাকে আগামী দশদিনের মধ্যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিলে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। সেই দায়িত্ব তোমাকেই দিচ্ছি। যাও গিয়ে তোমাদের গ্রামের শ্যামাকান্তের সাথে দেখা করো। ও আমাদের খুব বিশ্বস্ত। সব ব্যবস্থা করে দেবে।

খেপেঙরায় সহ ত্রিপুরায় পাঁচ জন আসে। দেখা করে শ্যামাকান্তের সাথে। শ্যামাকান্ত মালসুমার গতিবিধি জানিয়ে দেয়।

কুকীছড়ার পাশে মালসুমার বাড়ী। কাছে পিঠে বাড়ী নেই। উৎলা জমির মাঝখানে দ্বীপের মতো একটা ছোট টিলায় বাঁশের কুড়ে ঘর। আত্মগোপন থাকার সময় মেয়েটার সাথে ভাব জমে; তাকে নিয়েই সংসার পাতে। একটা ছেলে। বয়স প্রায় বছর দেড়েক। বোধহয় হতাশ জীবনের আশার আলো। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে। মাসলুমা ঘরের ভিতরে। কোলে বসে ছেলেটা কোমল কোমল হাত পা নাড়ে। মালসুমা সস্নেহে আখের টুকরার খোসা ছাড়িয়ে নিজেও খায়,বাচ্চাটার মুখেও দেয়। বাঁশের জানালার ফাঁকে পিস্তল উচিয়ে ধরে খেপেঙরায়। নৃশংস মালসুমার ভিতরের মানুষটা এত নরম খেপেঙরায় আগে জানতো না। কোমল মমতা মুখর ছবিটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরা হাতটাকে অবশ করে তুলে। বার বার তিন বার চেষ্টা করে আঙ্গুলটা ট্রিগারে টিপতে। কিছুতেই পারে না। নিজের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে এক অদ্ভূত মরমী আবেগে। স্থান ত্যাগের সংকেত জানায় চোখের ইশারায়। টিলা থেকে নিচু মাথায় উতলার দিকে তরতর নামে। পিছনে সঙ্গীরা। কিছুক্ষণ এগুতেই দড়াম্ দড়াম্ পিস্তলের নিষ্ঠুর গর্জন। মুখ থুবড়িয়ে কাদামাটিতে লুটিয়ে পড়ে খেপেঙরায়। গোঙাতে গোঙাতে শুনতে পেলো— পৃথিবীতে বেইমানের স্থান এইখানে। সেও মাথাটা তুলে বললো— জানতাম কপালে এই হবে । তবু তোমরা ভুল পথ ছাড়। বন্দুকধারীদের কানে সে কথা পৌঁছল কিনা কে জানে। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারের দিকে বন্দুকধারীরা পা বাড়ায়। পেছনে পেছনে খেপেঙরায়ের অস্ফুট কথাটা ছায়ার মতো ঘোরে।

করাচি থেকে লংতরাই

বেলা দুপুরের কড়া রোদ তখন হালকা। দেশী বিদেশী যাত্রীদের পায়চারিতে, আনাগোনার ব্যস্ততায় করাচি বিমান বন্দর কলরব মুখর। মেম, সাহেব, আমলা, আমীর, বেগম রঙ বেরঙের অভিজাত পোষাকে, কারো রঙ আপেলের মতো টকটকে লাল। কেউ রূপের আগুনের আঁচে সারা লাউঞ্জের যাত্রীদের চোখে জ্বালা ধরায়। চোখে মুখে গায়ের রঙে ঐশ্বর্যের বিলাসের ভোগের কিরণ বিচ্ছুরিত। মুখে বিদায়ের করুণ হাসি মেখে করমর্দন করে কেউ। কেউ আবার বিদায় বেলায় আবেগ ভরা বিলম্বিত আলিঙ্গনের ইতি টানে। কারো হৃদয় উজাড় করা চুম্বনে গালের উপর সিক্ত পরশ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কেউ আবার ফিরে ফিরে হাত নাড়িয়ে বিমানে উঠতে যায়। ছলছল জোড়া চোখের চাউনিতে যেতে দেবনা তবু যেতে দিতে হয় ভাব।

রানওয়ে থেকে ছেচল্লিশজন যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়ল একটি ভাইকাউন্ট বিমান। পাইলট আর কো পাইলট হলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাক এবং রহমান। টেক অফ করার সময়েও যাত্রী বা বৈমানিক কারো মনে অশুভ আশঙ্কার মেঘ উঁকি দেয়নি। ধীরে ধীরে বিমানের পায়ে এবং ডানায় লেখা VP -- AEG আকাশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট্ট বিন্দুর মতো। চার ইঞ্জিনের জাহাজ। বিকট আওয়াজের রেশটুকু শুধু রেখে গেল বন্দরে বিদায় জানাতে আসা প্রিয়জনদের কানে। সবকিছু থেকেও নেই ধাঁচের এক মধুময় বিষাদের শূন্যতায় প্রিয়জনদের মন ভারী হয়ে আসে।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসের দিন। কাল বৈশাখীর দামাল ঘূর্ণি ঝড় মৃত্যুর ফাঁদ হাতে নিয়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে ছুটছিল কেউ জানে না। শীত শেষ। বসন্তেরও শেষ। গাছে গাছে নতুন কচিপাতার ভার নিয়ে নীচের পাহাড় কচি সবুজ রঙে সাজানো। আকাশে বিস্তৃত নীল আর নীল। আকাশের মধ্যে উঠলেই যাত্রীদের উদাসী মনও মুক্ত বিহঙ্গের মতো দিক দিগন্তে ধেয়ে যেতে চায়। বিমানখানা যাবে ঢাকায়। আরোহণের উচ্চতা নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা কুড়ি হাজার ফিটের সংখ্যার দিকে ছুঁই ছুঁই করে। কুড়ি হাজার ফুটের উঁচুতে যাওয়া মানেই একেবারে স্বর্গের কাছাকাছি। ধূসর রঙের N. D. B. যন্ত্র ককপিটে ঠিক মতোই নির্দেশ জানিয়ে দেয়। হঠাৎ কোন জায়গার উপরে এল সাংকেতিক অক্ষরে নন ডিরেকসনেবল বেকন যন্ত্রে বেরোয়। নেভিগেশন কাজ রেডিয়ো অপারেটর সংকেত বুঝে দরকার হলে কাছাকাছি বিমান ঘাঁটিতে যোগাযোগ করে। দেখতে দেখতে করাচি থেকে বেনারসের উপরে এলে। মোটামুটি অর্ধেক পথ অতিক্রান্ত। দুজন রূপসী বিমান সেবিকা ততক্ষণে যাত্রীদের হাতে হাতে জলখাবার তুলে দিয়েছে।

যাত্রীদের কেউ কেউ তখন চিরবহমান গঙ্গার লীলাখেলা বৈচিত্র্যরূপ দেখার নেশায় তন্ময়। অনেক নীচে আঁকাবাঁকা রেল লাইন দিয়ে ছোট খেলনার মতো রেলগাড়ী ধীরে ধীরে চলছে। ধূ ধূ করা মাঠের মাঝখানে কখনো বা সদ্য পাকা গমের ক্ষেত। কোথাও গোলাকার ডিম্বাকৃতি জলাশয়ে সূর্যকিরণের প্রতিফলনে আয়নার মতো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বুড়ি গঙ্গা, মেঘনার নৌকাও চোখে ভাসে এক সময়।

নেভিগেটরের চোখ তখনো এন ডি বি যন্ত্রে নিবদ্ধ। দেখতে দেখতে যন্ত্রের মধ্যে VP -- DC সাংকেতিক অক্ষর চারটি বেরোয়। বোঝা গেল ঢাকার কাছে পৌঁছে গেছে। বিমান সেবিকা কোমল কণ্ঠে ঘোষণা দিল কোমরে বেল্ট ঠিক মতো রাখতে এবং সোজা হয়ে বসতে। নামার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই।

হঠাৎ বিমানটির ওপর একটা ঝাঁকুনি লাগে। বিমান খানা মহাশূন্যের মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠানামা করে। পাইলট উইণ্ড কন্ট্রোল সুইচ চালিয়ে দেয়। না। বিমান নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় এলিভেটরটাকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করে। বৈঠার মতো সেই যন্ত্রটা কোথায় যেন শক্ত হয়ে আটকানো ঘূর্ণি ঝড়ের বেগ ঠেলে এলিভেটর নড়তেই পারছে না। প্রকাণ্ড একটা বাসুকীর মতো কালোমেঘের স্তম্ভ ঘুরতে ঘুরতে বিমানটিকে গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ঢাকার সাংকেতিক চিহ্ন VP -- DC অদৃশ্য হয়ে গেল। নতুন করে বেরোল আগরতলার সাংকেতিক চিহ্ন VE -- AT। পাইলটের ইচ্ছায় বিমান যাচ্ছেনা যাচ্ছে বাতাসের ইচ্ছায়। উপর নীচ চারদিক অন্ধকার। আকাশ মাটি অন্ধকারে একাকার।

বেতার যন্ত্রে আগরতলার কণ্ঠ ভেসে আসতে না আসতেই আবার একেবারে নিশ্চুপ। নেভিগেটর হতাশায় ভেঙে পড়েনি। বিরামহীনভাবে রোজো রোজো, আগরতলা ! আগরতলা করেই যাচ্ছে। উত্তর কিন্তু আসেনা।

দমক দমক বিদ্যুৎ চমকানি। নীচের দিকে বিশাল স্তরে স্তরে মেঘের আস্তরণ। ঢাকা, তেজগাও, আগরতলা জুড়ে ঝড় ছুটছে। রাডার, টাওয়ার, রানওয়ের ট্র্যাক সব অদৃশ্য। রেডিয়ো অফিসার প্রাণপণে চেষ্টা চালায় যোগাযোগ করতে। কখনো সংকেত আসে তাও দুর্বোধ্য। কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের কোন উপায় নেই। অবশ্য এন ডি বি যন্ত্র তখন পর্যন্ত বিশ্বস্ত। বিমানখানা টাল সামলাতে সামলাতে একেবারে সিলেট বিমান ঘাঁটির ওপর। সেখানেও একই অবস্থা। কিছুদূর গেলেই সমসের নগর বিমান ঘাঁটি। একেবারে ত্রিপুরার সীমান্তে। ততক্ষণে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। অন্ধকারে গোটা পৃথিবী তোলপাড়। ঝড়ের সাথে বৃষ্টিও পড়ছে। কয়েক চক্কর দিল আকাশে দিশেহারা পাখীর মতো। উড়তে উড়তে এল কৈলাশহর বিমান ঘাঁটির ওপরে। কিন্তু সেখানে রাডার, টাওয়ার, লাইট কিছুই নেই। শুধু এন ডি বিতে ভেসে আসে VEKR মানে কৈলাশহর। সামনের নগর, সিলেট, কৈলাশহর, কমলপুর সবদিক জুড়ে দূরন্ত কোন পাগলা ঘোড়ার মতো ঝড় ছুটছে। আবহাওয়া দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ঝড়ের বেগ ছিল নব্বুই মাইল। আধা শুকনো ডাল পাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরছে। চক্করের পর চক্কর। ঘাঁটির দিশা মেলে না। ত্রিপুরার পাহাড়ের গায়ে গায়ে দু একটা কাটা জুমে আগুন জ্বলে। ঝড়ো বাতাসে দপদপিয়ে ওঠে পাহাড়ের কোন কোন ঢালু। আকাশে কখনো সজোরে নিক্ষিপ্ত করে আগুনের টুকরো ছাই। ঝড়ো আকাশে অন্ধকারে ধূয়ার কুণ্ডলী দিয়ে ঘিরে ঘিরে। অনেক উঁচুতে হাওয়াই জাহাজের লাল, নীল, সাদা তিনটি নেভিগেশন বাতির ম্লান আলো। নীচের পৃথিবীর কারো চোখে পড়ে না। পড়লেও করার কিছু নেই। ক্রুদ্ধ প্রকৃতির কাছে মানুষ নতজানু এক জড়পদার্থ মাত্র। এত অন্ধকারে কৈলাশহর বিমান ঘাঁটির নিশানা ঠিক করা একেবারে অসম্ভব। তবু চেষ্টা করে কৈলাশহরে বিমান

ঘাঁটিতে নামতে । বিমান ঘাঁটির ব্যবস্থাপনা একেবারেই সেকেলে । তবুও দেশ বিদেশের পাইলটদের বিমান পথের মানচিত্রে একটা স্থান ছিল । করাচির বৈমানিক এই ঘাঁটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতো কিনা কে জানে । তবু ডুবন্ত মানুষ একটা তৃণ ধরেও বাঁচতে চায় । ভালো খারাপ যাই হোক শেষ ভরসা এই অখ্যাত বিমান ঘাঁটি । চক্করের পর চক্কর দিতে দিতে রাত প্রায় আটটা বাজে । কোথায় পাবে বেতার যন্ত্রের সংকেত । এই ঘাঁটির কাজকর্ম দুপুর হলেই ফুরিয়ে যায় । ঘাঁটিতে রাখালরা ঢোকে গরু চড়াতে । বিমান ঘাঁটির সাইরেন বাজার পরিবর্তে শোনা যায় মাঠের কোণে রাখালের বাঁশী ।

সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ বাতি দূরের কথা, ছিঁটে ফোটা জোনাকীর আলো ছাড়া কিছু থাকে না । মানুষের সুবিধার জন্য এই বিমান ঘাঁটি তৈরী হয়নি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন যখন গোটা উত্তর পূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই বিমান ঘাঁটিগুলো গড়ে ওঠে । কোন রকম যুদ্ধের বিমান আসতে যেতে পারলেই হয় ।

যুদ্ধ শেষ । ঘাঁটিগুলো তুলে নিয়ে যেতে পারেনি । পারলে তাও নিয়ে যেতো বৃটিশরা । ঘাঁটি জমির মালিক যারা ছিল তাদের অনেকে আজকে জমি অধিগ্রহণের টাকা পায়নি । টাকা পেল বা না পেল সে প্রশ্ন ওঠে না । বড় কথা এখানে বিমান নামে ।

লোকে বলে ১৯৪৪ সালে প্রথম সিঙ্গারবিল ঘাঁটি তৈরী হয় । তারপর সমমেয় নগর, কৈলাশহর, কমলপুর, বিলোনীয়া, খোয়াই এই সব ঘাঁটি গড়ে উঠতে থাকে । সেদিন এই ঘাঁটি গুলোতে যাত্রীবাহী বিমান নামানোর কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ছিল না । সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার তাড়নার তাগিদেই এই সব যুদ্ধ ঘাঁটির জন্ম ।

শহরের গা ঘেঁষে লম্বা এক টুকরো মাঠ । মাঠ না বলে জমি বললেই চলে । দক্ষিণ সীমানায় মনু নদীর বাঁক । উত্তরে কৈলাশহরে ঢোকার বর্তমান রাস্তা । পূর্ব দিক জুড়ে লম্বা হয়ে বাঁশের ঝাড়, আম সুপারী বিদ্যানগর গ্রামের গাছ-গাছালি । পশ্চিমে ছুটে গেছে পাইতুর বান্দার ছনতৈল রাস্তা । কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জমি । আগে বিমানের দৌড়পথ জুড়ে পিচ ঢালা পাকা ছিল না । গোল গোল ছেদাওয়ালা ইস্পাতের লম্বা পাত বিছিয়ে বিমান নামতো ঘট ঘট থেকনা খেয়ে । সবে মাত্র দেশ ভাগ শেষ । রাস্তা বলতে যা ছিল সবই গেছে পাকিস্তানের ভাগে । অগতির গতি একমাত্র বিমান । নিরুপায় হয়েই বিমান দিয়ে যোগাযোগ চলতো ।

বিমান ঘাঁটিতে এখনকার মতো টাওয়ার, রাডার, টেলিফোন আধুনিক কোন সরঞ্জামই ছিল না । ছনবাঁশের ঘরে ঘড় ঘড় করে একটা ওয়ারলেস চলতো । কয়েকজন পিয়ন আর নির্মলানন্দ বর্দ্ধন এরাই তখন বিমান ঘাঁটির কর্মচারী । বেলা দশটায় ওয়ারলেস যন্ত্র চালু হতো । কখনো জলের বুদ বুদ ভাঙার মতো শব্দে নতুবা তেলের কড়াই গরম কিছু ভাজার শব্দে, কখনো ভাঙা বাঁশে বাতাস ঘুরে বেসুরা সুর কাঁপে তেমনি ছিল ওয়ারলেস । এই বিচিত্র যান্ত্রিক ধ্বনির মধ্যেই দৈববাণীর মতো হঠাৎ ভেসে আসতো মানুষ্য কণ্ঠের স্বর । এই বেতার সংকেতে জানান দিত বিমান আসছে । রোজো ! রোজো ! কিছু কথা । ওভার ।

কর্মচারী আর যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উঠতো । নীল উর্দি পড়া একজন চৌকিদার হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাজাতো সাইরেন । সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁটির শেষ প্রান্তে কালো সাদার ডোরাকাটা চোঙের

পতাকা উড়ত বাতাসে। চৌকিদাররা ছুটতো হেই হেই করে গরু মোষ মাঠ থেকে তাড়াতে। উৎকণ্ঠিত যাত্রীরা কপালে হাতের বারান্দা বানিয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো অধীর অপেক্ষায়। কখন বিমান নামবে।

একসময় দেখতে দেখতে চক্কর খেয়ে বিদ্যানগরের বাঁশের আগা, সুপারীর চূড়া ছুঁই ছুঁই করে বিশাল তিমি মাছের মতো রূপালী চকচকে একটা বিমান ডানা বিস্তার করে নামতো। থামতে থামতে প্রপেলারে পাখায় আনতো ঝড়। মাঠের ধুলা শুকনো পাতা যেমন উড়তো তেমনি উড়ত বর্দ্ধনবাবুর গলায় টাই, জামা, পত পত শব্দে।

কেউ বলত কলিঙ্গ কোম্পানীর বিমান, কেউ বলতো ভারত কোম্পানীর। বিমানের কাছে সিঁড়ি লাগাতেই একে একে নামতো পৃথিবীর সবচেয়ে আলাদা বিমান যাত্রীরা। কারো হাতে দড়িবাঁধা টিনের সুটকেস। কেউ বা হাতে একটা শীতল পাটি, অন্য হাতে হাতল ছেঁড়া চামড়ার ব্যাগ। কোন কোন যাত্রীর মাথায় এত তেল, ঘাড় বেয়ে জামার কলার পর্যন্ত ভিজিয়ে দিতো। কারো গায়ে ধবধবে জামা কিন্তু নীলের পরিমাণ বেশী। যাত্রী যদি মেয়েলোক তবে বিড়ম্বনা আরো বেশী। হয়ত ভেতরেই বমি করেছে। কপালের সিঁন্দুর ঘামে লেপটানো। বাহুতে কালো সুতায় বাঁধা মাদুলী। চৌদ্দহাতি শাড়ী পরেও দেহের অনেকখানি উদাস। কারো কব্জি পর্যন্ত জামার হাত। তার উপর ঘড়ি। কারো পকেটের কলম থেকে চোয়ানো কালিতে নীল বুক। প্রসাধনে যতই সেজেগুজে থাকুন, গায়ে তাদের ত্রিপুরার মাটির একটা বিশেষ গন্ধ মাখা। ঠোঁটের কোণে পানের পিক বেরোয়। নামতে নামতেই পিচকারীর মতো ছাড়ে।

বিমানের নাম ডাকোটা। কখনো একুশ জনের আসন থাকে, কখনো আটাশ জনের আসন। এই বিমানের যাত্রীরা শখ করে বিমানে যায় না। নেহাৎ নিরুপায়। যোগাযোগের অন্য কোন পন্থা নেই বলেই বিমানে ওঠে। এরা যে ত্রিপুরাবাসী কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। দমদমের ঝলমলে লাউঞ্জে থাকলেও হাজারো মানুষের ভীড়েও স্বতন্ত্র চিহ্ন নিয়ে এরা থাকে। ওদের নিয়ে যখন বিমান আসে, ঘাঁটির পাশে কৃষক কাস্তে হাতে ধান কাটা থামিয়ে তন্ময় হয়ে রয়। রোজ দেখে তবুও যেন যন্ত্রের এই ব্যঙ্গমা পাখী দেখে কৌতূহল মেটে না। দুর্বোধ্য রহস্যের জালে কেন জানি মগ্ন থাকতে হয়।

যাত্রী নামা শেষ হলেই দুজন বৈমানিক, একজন বেতার যন্ত্র চালক, একজন বা দুইজন বিমান সেবিকা নামে। বিমানের কর্মচারী না বলে স্বর্গলোকের দেবতা বললেও ভুল হতো না।

বিমানের বিশাল ডানার ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। ইংরাজীতে কথা বলে। মাঝে হিন্দিও। ধবধবে সাদা জামা, পরনে নীল প্যান্ট। পায়ে আয়নার মতো চকচকে জুতো। গলায় নীল টাই। জামার কাঁধে পদ-মর্যাদা অনুযায়ী ফিতার প্রতীক। চেহারা ছবিতে ভোগের সুখের ছাপ। বিমানটা অদ্ভুত, এরা যেন তার চেয়েও অদ্ভুত। নীল আকাশপথে বিশাল তিমি মাছটাকে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরী হয় বুঝি এরা। সকালে কোলকাতা, দুপুরে আগরতলা। গোটা পৃথিবীর সীমাহীন দূরত্বকে এরাই বুঝি হাতের বিঘৎ দিয়ে মাপতে পারে। এই অদ্ভুত মানুষরূপী জীবরা আকাশের অনেক উঁচুতে উড়তে উড়তে পাহাড়, নদী, মাঠ, মানুষ, দেশের পর দেশ দেখতে পায় চোখের পলকে।

এদের সঙ্গিনী সেই বিমান সেবিকা। কোন দেশের স্বপ্নলোকের পরী কে জানে। প্রজাপতির

মতো পাখা মেলে উড়তে এই অচিন দেশের মাঠে এসে বুঝি পড়েছে। মাথায় বিরাট খোঁপা। খোঁপা বাধার মধ্যেও তার কতো নিপুণ কলাকৌশল।

যাত্রীদের নামা ওঠা শেষ হলে আবার স্বর্গলোকের দিকে পারি দিত বিমান। আর এই বিমান ঘাঁটিতে বিদেশী কোন বিমান নামতে ঝড়ের রাতে আসবে কেউ কখনো কল্পনা করতেও পারেনি।

তবু আকাশে আগন্তুক বিমানের দিকদিশাহীন চলা দেখে এই ঝড়ের রাতে বাইরে এসে তাকায় অনেকেই। কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বিমানটির নেভিগেশন বাতিগুলো দক্ষিণ দিকের আকাশে ধাওয়া করলো। আর দেখা গেলো না লোকে বলে সেই শনিবারে কৈলাশহরে একটা জুয়ার মেলা বসেছিল। জুয়ার মেলায় কেউ ফকির কেউ বা বনে বাদশা। সেদিন জুয়ার মেলা। ঝড়ে ভেঙে গেল অসময়ে। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে কোন কুবেরের ধন কোন নির্ধনীয়া হাতে আসার সংকেত বার্তা বয়ে এনেছিল কে জানে।

বিদ্যুৎ চমকানোর মতো চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ধ্বনি বৈমানিক সহ যাত্রীদের মনে চমকে চমকে ওঠে। ধন দৌলত, সুখ, ভোগ সবকিছুই তখন অর্থহীন। এতগুলো প্রাণ পোঁটলায় বেঁধে যন্ত্রদানব এগিয়ে যায় মহাশূন্যের দিকে একেবারে মৃত্যু উপত্যকার মুখোমুখি। মাঠ, নদী, পাহাড় সবই অচেনা। চেনা হলেও নামার উপায় নেই।

বিমানের ট্যাঙ্কে চার ঘন্টার জ্বালানী ছিল করাচি থেকে টেক অফ করার সময়। জ্বালানীও প্রায় শেষের পথে! ফুয়েল মিটারের কাঁটা শূন্য অঙ্কের কাছে প্রায়। উপর থেকে এক সাথে চীৎকার করলেও পৃথিবীর মানুষ কেউ শুনবে না। চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুহূর্তে শুধু N. D. B. যন্ত্রটা বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো কৈলাশহর এলাকায় আছে বলে জানিয়ে যাচ্ছে। এলিভেটর বিকল। ডানে গেলে বাঁয়ে যায় না। বাঁয়ে গেলে ডান দিকে নড়েনা। দূর আকাশে নেভিগেটরের তিনটি লাল, নীল, সাদা বিন্দু ম্লান হয়ে হতাশায় ভরা ব্যথা নিয়ে শেষ রক্ষার আবেদন জানাতে জানাতে মনুনদীর উপর দিয়ে ধূমাছড়ার উৎস মুখের দিকে হারিয়ে যায়।

দক্ষিণ পশ্চিমে উঁচু দেয়ালের মতো লংতরাই পাহাড়ের শিখর। জ্যা মুক্ত তীরের মতো প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারে পাহাড়ের চূড়ায় উঁচু দুটো গর্জন গাছের সঙ্গে। পলকে AP-AEG লেখা দুটো ডানা ভেঙে চুরমার খান খান। গাছ দুটো মাঝখানে এমনভাবে টুকরো করে যেন দক্ষ-করাতীর শব্দ। গাছ ভূপতিত হওয়ার আগেই মাথাটি গিয়ে দড়াম শব্দে আঘাত করে পাথরের দেয়ালে। প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই খুলে খসে পড়ে। বিমানটি গিয়ে লুঙ্গার মধ্যে দক্ষিণমুখী হয়ে মুখ থুবড়ে পড়তেই বড় পাথরের চাঁইটি মাথার উপর চেপে বসে। সমগ্র পাহাড় বন বিরাট একটা ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে।

ছিন্নভিন্ন ডানা। পাখা, দরজা, লেজ, চাকা, বিক্ষিপ্ত হয়ে দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত। লোহা লক্কড়েরই এমন অবস্থা। মাখনের মতো নরম-মানুষের কত শোচনীয় হতে পারে সহজেই অনুমেয়। মাথা দেহ থেঁতলে পুড়ে শত ছিন্ন — দেহ থেকে দেড়শো দুশো হাত দূরে। এক টিলায় হাত অন্য লুঙ্গায় কাটা উরু। ককপিটের বৈমানিক এদের অবস্থা পাথরের নীচে চেপ্টা পিঠের মতো। এখনো সেই পাথর সরিয়ে ওদের হাড়গোড় কেউ বের করতে যায়নি। বাক্স, পেঁটরা মূল্যবান সব জিনিষপত্র

এলোমেলো । কোনটা ঝলসানো । কোনটা ভাঙা ঠেটো । কাছে পিঠে কোন লোকালয় নেই । দুর্ঘটনার সেই পৃথিবী কাঁপানো শব্দ বারসামুনি পাড়া, থাংসিপাড়া সিঙ্কুক শাক, জাংথুম, সিদুর পাড়ার পাহাড়ীরা শুনতে পেয়েছিল ।

তখন ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে । ব্যবসা বাণিজ্য সবই চলতো নদী পথে । নৌকায় বা বাঁশের ভেলায় । জুমের তিল, কার্পাস, পাট, সরিষা, তূলা, খাকুলু, কুমড়া যখন পাহাড় থেকে নামতো সবই যেত ব্যবসা কেন্দ্রে নদীপথে । তেমনি আবার নুন, কোরোসিন, সূতা, সাবান, শুটকী আসতো পাহাড়ে নদী পথ ধরে । মনু নদীর উপর তেমনি অনেক নৌকা ঘাটে ঘাটে ভিড়ত । কখনো সাউমনু, ছৈলেংটা, ধূমাছড়া, ফটিকরায়, কৈলাশহর সবখানেই প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নৌকা ।

মহাজনদের নৌকার এক মাঝি, নাম ককতারিয়া । আসল নাম কার্তিক ত্রিপুরা । অন্য দশ পাঁচজন জুমিয়ার মতো জুম চাষ করতো না । নৌকা চালিয়ে পেট পালতো । পাহাড়ে গ্রামে খুব একটা থাকতো না । শহরে, হাটে বাজারে দোকানপাটে তার সব সময় আনাগোণা । মহাজন, ব্যবসায়ী, কর্মচারী তাদের সাথেই তার বেশী চলাচল । প্রবাদ আছে পণ্ডিতের বাড়ীর বিড়ালও দুই অক্ষর সংস্কৃত জানে । পিছিয়ে পড়া জুমিয়ার ছেলে হলেও প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের সাথে চলতে চলতে ব্যবসা একটু আধটু শিখেছিল । চাল চলনে অন্য আদিবাসীদের চেয়ে খানিকটা আলাদা । গুড় কিনতো ধূমাছড়া, সাউমনু বাজারে সোয়া চার আনা দরে । ছয় আনা সের দরে সেই গুড় বেচতো লংতরাই পাহাড় ডিঙিয়ে হালাহালি বাজারে । হালাহালি বাজার আগেও বসতো বা এখনো বসে রোববারে । মাঝির কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে রবিবারের গুড় ব্যবসা ছাড়তো না ।

শনিবার বিমান দুর্ঘটনা ঘটে । পরদিন রবিবার । কার্তিক ভোর হতে না হতেই একটিন গুড় পিঠে বেতের ঝুড়িতে করে ঘর থেকে বেরোয় । হাতে একটা টাক্কল । ঝুরিতে কলাপাতা দিয়ে মোড়া এক গোলা ভাত । নুন, সিদল, মরিচ মেশানো মছডেং । এই পথ দিয়ে সচরাচর মানুষ চলে না । সংক্ষেপে পথ ধরে যারা হালাহালি যেতে চায় তাদের সংখ্যাও খুবই কম । অনেক পাতা ঝরা গাছে তখনো নতুন পাতা আসেনি । তবু গাছে গাছে কচি সবুজের সমাহার । কোন কোন গাছ, বিশেষ করে শিমূলের শাখা প্রশাখা হরিণ শিং-এর মতো নগ্ন । পাহাড়ের ঢালুতে কোথাও সদ্য কাটা জুম । রোদে খা খা । চেনা অচেনা পাখীর কলরব । দূরের টিলায় টিলায় দু একটা গলাভাঙা কোকিলের ডাক । এমনি করে পাহাড়ের উঁচু থেকে উঁচুর দিকে এগোয় কার্তিক ।

দুই তিন মাইল গিয়েই ধূমাছড়ার উৎস । উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়ে লংতরাই পাহাড় । পাহাড়ে চূড়া থেকে পূর্বদিকের ঢালুর দিকে দুর্বার বেগে কলকলিয়ে নামছে ধূমাছড়া । জল খুব একটা নেই । গতরাতের বৃষ্টিতে জলের রঙ খানিকটা ঘোলা । এই ছড়া আরো পূর্বে মাইল দশেক গিয়ে ধূমাছড়া বাজারের পাশ দিয়ে মনু নদীতে মিলেছে । ডানে বাঁয়ে বেশ কয়েকটা পাহাড়ী জনপদ ।

এই তরতরিয়ে ধূমাছড়া অবতরণের পাশ দিয়ে খাড়া পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব । টাক্কল দিয়ে কেটে কেটে সিঁড়ির মতো একটা ঘোরালো পথ ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে । হামাগুড়ি দেয়া ছাড়া এই পথে কেউ উঠতে পারে না । একটু অসাবধান হলে কত নীচে গড়িয়ে পড়বে বলা

দৃষ্কর ।

ছড়ার উৎস মুখের উপর দাঁড়ালে পাহাড়ে ওপারে পশ্চিমে আর একটা ঝরনা । তিনটা বড় ধাপ হয়ে ঝরনা থেকে পাংথুম ছড়া নাম নিয়ে কমলপুরের ধলাই নদীতে মিশে গেছে । এই ঝরনার কাছেই একটা বাঁক পার হলে রামলাল থাং পাড়া : হালামদের পুরনো বাসভূমি । আশেপাশেই তারা জুম চাষ করে ।

ধূমাছড়ার উৎসমুখের নাম হালাম ভাষার তুইসেনতিয়েন বাংলা অর্থ দাঁড়ায় লাল ছড়া । ছড়ায় লোহার ভাগ বেশী । সবসময় লালচে মতো মাটির থিক থিকে কাদা পাড়ে । কার্তিক এই লালচে থিক থিক কাদার কাছে এসেই হামাগুড়ি দিয়ে উপরে জায়গাটার পাশে একটু জিরানোর জন্য বসে । জঙ্গলটা কেমন যেন একটু খালি খালি সেদিন । বিরাট কোন হাতীর পাল এসে ঝরিয়ে গেছে রকম অবস্থা । কিন্তু গাছ পাতা পোড়া পোড়া । অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটি হঠাৎ গিয়ে থমকে দাঁড়ালো বাঁশ ঝাড়ের চূড়ার দিকে । অদ্ভুত দৃশ্য । নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারে না । বাঁশ ঝাড়ের চূড়ায় উজ্জ্বল নীল রঙের কাপড় । কিছুটা মানুষের মতো লাগে । ভয়ে সারা দেহ শিউরে ওঠে । এ নিশ্চয়ই কোন বনদেবী । নাহলে এই নির্জন গভীর অরণ্যে, তাও আবার বাঁশ ঝাড়ের আগায় এমনভাবে থাকবে কেন । ভয়ে থাকতে থাকতেই নিজের অজান্তেই বিকট একটা চীৎকার দিয়ে ফেলে । চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে নিজেই আবার শঙ্কিত । কয়েক কদম এগিয়েই দেখে একটা বিরাট বিমানের ধ্বংসাবশেষ । ঝলমলে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাংশ দূরে ছড়ানো ছিটানো ।

ঝলমলে যন্ত্রাংশের দু -এক টুকরো তুলে ধরে । কোনটা ভীষণ ভারী একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় । কিছুদূর এগিয়েই বুকটা দুরু দুরু কেঁপে ওঠে । আগুনে ঝলসানো মানুষের টুকরো চারদিকে ছড়ানো । কটা মানুষ এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে । ভয়ে শরীর হিম হয়ে আসে । কাছে গিয়ে দেখে বিকৃত চোখ মুখ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন ঠিকানা নেই । তাজা তাজা রক্তের দাগ সর্বত্র । ওই বাঁশ ঝাড়ে কোন রকমে ওঠে । নীল কাপড়ে জড়ানো মহিলা কোন রকম বাঁশের কঞ্চির জটলায় আটকানো । গায়ে তার উজ্জ্বল আগুনে রঙ । দেহটা ক্ষত বিক্ষত । ধোপার কাপড় কাচার মতো আছাড় দিয়ে বড় কোন গাছের ডালে পাহাড়ের চূড়ায় । সেখানে গড়িয়ে বাঁশঝাড়ে আটকে গেছে । ক্ষীণ প্রাণের স্পন্দন বুঝতে পারে গায়ের উষ্ণতায় হাত দিয়েই । কোন রকমে নীচে নামিয়ে আনে । চোখে মুখে জল ছিটায় । যন্ত্রণায় নিশ্বাসে গোঙানির মতো শব্দ । চেনাজানা হাড়ভাঙা গাছের পাতা ছেচে রস মাখলো । পাশেই বাঁশে বাঁশ ঘষে আগুন জ্বালে । বাঁশের ঢোঙায় জল গরম করে মাথার ক্ষতে গায়ের ক্ষতে ধুয়ে ধুয়ে সেবা দেয় । চোখ তুলে মন্থরভাবে দু একবার তাকালো । কিছুটা জ্ঞান ফেরে । চোখের ভাষায় কোথাকার মানুষ কোথায় এলাম ধরণের প্রশ্ন ফোটে । কিছু কিছু অস্ফুট কথা বলে । কার্তিকের কোলেই ঢলে পড়ে অজানা অচেনা কোন ধনীর দুলালী মানুষের কাছে মানুষের অধিকার জানিয়ে । করাচির আহত মুমূর্ষু মানুষটির কাছে লংতরাই পাহাড়ের জুমিয়া তখন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদে সহানুভূতিশীল আশ্রয় । গভীর দুর্গম অরণ্যের মাঝখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে । অভিজাত কন্যা, কাছে তখন দুফোঁটা চোখের জল ফেলার আপনজন কেউ ছিল না । সংসারে এমন নিঃস্ব নিষ্ঠুর মৃত্যু খুব কমই ঘটে ।

মহিলার মৃত্যুর পর কার্তিক বা কেউ তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়নি । মহিলাকে জীবিতভাবে

পাওয়ার ঘটনাই বেমালুম অস্বীকার করে । না হলে কোন মামলায় ঝুলতে হতে পারে সেই ভয়ে ।

তখন মৃত ওই মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার সময় কোথায় । চারদিকে অফুরন্ত সম্পদ । কোথাও তোড়া তোড়া নোট । কোথাও আগুনে জ্বালা গলিত কাঁচাটাকার পিণ্ড । কোনটা মূল্যবান, কোনটা না বুঝতে পারে না । আপাত দৃষ্টিতে ঝলমলে বিমানের টুকরোগুলিই আকর্ষণীয় । না । উদভ্রান্তের মতো চললে হবে না । ধীরে ধীরে সব কিছুই নিতে হবে । যেতে যেতে দেখে মখমলের মতো সুন্দর কাপড়ের থলি । একটা নয় অনেকগুলি । তুলতে গিয়ে তুলতে পারে না । এতভারী জিনিষ । কোন রকম একটা খুলে দেখে চারকোনা পাথরের কত সব জিনিষে ভরা । কার্বন কাগজের উল্টাদিকে যে ছাই রঙ সেই রকম রঙ ওই সব পাথরের । প্রশ্ন জাগে খুব দামী কিছু না হলে এত যত্ন করে রাখবে কেন । সারাদিন ধরে বাড়ীতে ওই সমস্ত জিনিষ বহন করে । এক জায়গাতেই ওই ছাই রঙের পাথর ছিল না । বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল । কারো মতে সেই সোনা পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের । কারো ধারণা বিমানে আন্তর্জাতিক সোনার চোরা চালান চক্র ছিল । কোন বাদশা পরিবার সোনা দানা নিয়ে দেশান্তরী হচ্ছিল ।

বাড়ীর পাশে বিভিন্ন জায়গায় অন্ধকারে গর্ত করে এই সব জিনিষ পুঁতে পুঁতে রাখে । ওই জিনিষটা কি জিজ্ঞেস করার মতো লোক পায় না । পেলেও গুপ্ত ধনের রহস্য বের হবার ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে না । তবু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পাথরে ঘষে ঘষে দেখে রঙটা সোনার মতোই । তবু নিশ্চিত হতে পারে নি । নিশ্চিত না হলেও বন থেকে কুড়িয়ে আনার কাজ কিন্তু বাদ দেয়নি ।

লোক জনের অনুমান কার্তিকদের কাছে মহিলা সোনার পরিমাণ জানিয়েছে । কেউ বলে দুমণ । কেউ আরো একটু নিশ্চিত করার জন্য বলে এক মণ পঁয়ত্রিশ সের । সব কিছুই অতিরঞ্জিত তবে মুঠো মুঠো সোনার টাকা, কড়কড়ে তাজা নোটের তোড়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

একদিন যেতে না যেতেই সারা পাহাড় জুড়ে কলরব । লংতরাই পাহাড়ে প্রচুর সম্পদ, টাকা, সোনা আরো কত কিছু বিমান থেকে পড়েছে । গুজব শুনে দলের পর দল সেই উপত্যকার দিকে ছোটে ।

বিমান দুর্ঘটনার দুদিন পর কৈলাশহর পুলিশ অফিসে খবর আসে । তিনদিন পর শান্তি বর্দ্ধন, পুলিশ অফিসার, এক বাহিনী পুলিশ নিয়ে দুর্ঘটনার স্থান খুঁজতে যায় । লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানে কোন রকম পৌঁছে । নিহত যাত্রীদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন । কোন রকম জড়ো করে এক জায়গায় । পচে গলে পোকা বিড় বিড় করে । কার দেহ কোনটা চিহ্নিত করা সম্ভব না । তখন আগরতলা থেকে এসিস্ট্যান্ট এরোড্রাম অফিসার নাম ছিল পি নাথ, জাতিতে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, ছুটে গেল সেখানে । সঙ্গে আগরতলার অরুন্ধুতিনগরের মিশন থেকে খ্রীষ্টান পাদ্রী । কৈলাশহর থেকে গেল এক মৌলবী, আর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত । এদের সামনেই দেওয়া হল এক গণ কবর । বাইবেল, কোরান, গীতার কিছু কিছু অংশ পড়া হলো সেখানে । নাম গোত্রহীন মানুষের জন্য লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র । আসার পথে পি নাথ একটা বড় থার্মোফ্লাস্ক জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল ।

সাতদিনের দিন আগরতলার এরোড্রাম অফিসার অমরেন্দ্র মুখার্জী গেলেন এক পাঁচ

আসন বিশিষ্ট অটার নামক বিনাসে বিমানে । ব্রিটিশ বিমান অফিসারকে নিয়ে । দূরবীন নিয়ে একটা ভাঙা ডানা দোমড়ানো অবস্থায় দেখলো গাছের ফাঁকে পাহাড়ের উপত্যকায় । এলুমিনিয়ামের মসৃণ চাদরে সূর্যালোক লেগে চোখ ধাঁধায় । ইনসিওরেন্স দপ্তরের কর্মীরা ফিরে এলো দুর্ঘটনার নিশ্চয়তা নিয়ে ।

তার পরেই হঠাৎ এলো আগরতলা বিমান বন্দরে এক করুণ চিঠি । পংক্তিতে পংক্তিতে আহত কপোতীর মত প্রাণঢালা আবেদন । সোনা, রূপা, ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী নয় । তার প্রিয়তম স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে চায় কবরের এক মুঠো মাটি ।

কাঠের বাক্সে করে সে মাটি পাঠানো হয়েও ছিল । তবু বিশ্বাস করতে পারেনি নিজের চোখে না দেখে কি নাম ছিল তার । অনেকের মনে আসলেও মুখে আসে না । কেউ বলে জাতিতে সে ইটালীয়ান কেউ বলে ফরাসী নৌকা টানার কাজ ছাড়ে । ভোর হলেই নির্জন অরণ্যে ঢোকে প্রতিদিন ধন সম্পদ সন্ধানে । পাহাড় এলাকায় চেপে থাকলেও খবরটা একদিন প্রকাশ হলো । বাইরে ধূমাছড়াতে হরিমোহন সাহা, রাসবিহারী সাহার দোকানে । দোকানে গিয়ে প্রায়ই কাচের বয়াম কিনতো । মাটিতে সোনা নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে । এত বয়ামের টাকা কোথায় পায় । এই বয়ামগুলিই বা কি কাজে লাগে । মহাজনদের সন্দেহ সৃষ্টি হয় ।

কার্তিকও একেবারে বোকা নয় । বেশ চালাক চতুর লোক । ধূমাছড়া বাজারে না গিয়ে সে গেল সাউমনু বাজারে নলিনি সাহার কাছে । নলিনি সাহা তখনো বানিয়ার কাজ করতো । রিয়াং, নোয়াতিয়া, চাকমাদের অলঙ্কার বানাতো । এক চাকা সোনা নিয়ে কার্তিক সেখানে পরীক্ষা করতে গেল । কষ্টি পাথরে ঘষতেই ঝলমলে আগুনে উজ্জ্বল রঙ বেরোয় । কিন্তু বানিয়া পিতল বলে চালাতে চায় । পিতলই যদি হয় তাহলে ফিরিয়ে নিই বলতেই বানিয়ার চোখ ছানাবড়া । ওজনে দেখে ওই একচাকা সোনাতেই বায়ান্ন তোলা ওজন । দশ পাঁচ টাকা তুলা দরে সেই সোনা সেখানেই বেচে । ঝড়ের বেগে সে খবর পাহাড়ে কন্দরে বাজারে রটে ।

স্বর্ণ ভাণ্ডারের মালিক কার্তিক ত্রিপুরা । যাকে গ্রামে ডাকতো ককতারিয়া বলে । তখন থেকেই তার নাম সোনা কার্তিক । কার্তিক তখন লংতরাই পাহাড় শুধু নয়, গোটা উত্তর ত্রিপুরায় তার নাম রূপকথা ছড়ায় । কেউ বলে সোনা পাওয়ার আগের রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে বিরাট একটা ভরা নদী সাঁতরিয়ে পার হয়েছে বলে । যা ত্রিপুরী বা রিয়াংদের মতে দুর্লভ ধন পাওয়ার লক্ষণ । কেউ বলে পূর্বজন্মের পূণ্য ফল । পূণ্যবান কার্তিকের ঘরে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে মহাজনদের আনাগোনা । সবসময় তাকে ঘিরে রাখে । ধূমছড়া বাজারে আসলেই মহাজনেরা প্রতিযোগিতা শুরু করে কার আগে কে নিয়ে নিজের গদীতে টেনে বসাবে । জল চাইলেই কেটলী ভরে মদ এনে হাজির করে । চুপি চুপি সবাই কথা বলতে চায় । কিন্তু ফুরসৎ কোথায় । সব সময়ই ওর পাশে লোক । কার্তিক একাই যে সোনা আর টাকা পেয়েছে তা কিন্তু নয় । খবরটা রটার সঙ্গে সঙ্গেই শত শত ত্রিপুরী, হালাম, দার্লং, রিয়াং উপজাতির লোকরা দলে দলে বিমান দুর্ঘটনার স্থানে ভীড় জমায় ।

বিমান দুর্ঘটনার দুদিন পরে আকাশে আকাশে ওড়ে দুটো ডাকোটা বিমান । আকাশেই ঘুরতে থাকে কেবল । জঙ্গলের নীচে কোথায় যে বিমানটা নিখোঁজ হলো তা কিন্তু আবিষ্কার করতে

পারেনি । অথচ নীচেই পাহাড়ের উপত্যকা লুঙ্গায় চলছে স্বর্ণ সন্ধানী পাহাড়ীদের কলরব । সিদুং পাড়া, সাতক রায় পাড়া, পাং তুম, থাংসি, সাইকার বাড়ী থেকে যেমন লংতরাই ডিঙিয়ে অপর পারে ছোটে । তেমনি জামির ছড়া করাতি ছড়া, রাজকান্দি, ডেমডুম, নেপালটিলা, কুকীছড়া, ময়নামা থেকে মানুষ ভীড় জমায় গহণ অরণ্যে । চুরমার বিমানের আশেপাশে হন্যে হয়ে ঘোরে ।

দুর্ঘটনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনেক দামী দামী কাপড় চোপড় । কোথাও নতুন কাপড় । কোথাও রক্তের দাগ লাগা । কোন কিছুই বাদ যায়নি । কেউ মৃত দেহে খোঁজে আংটি, ঘড়ি, জুতা, মোজা, গলার হার । শুধু সোনা, টাকা, কাপড়ই নয় । বিমানের ভাঙাচোরা যন্ত্রাংশের আকর্ষণও কোন অংশে কমছিলনা । পুলিস পৌঁছানোর দুদিন আগেই দা, কুড়াল, কোদাল নিয়ে দল বেঁধে নামে । কেউ মাটি খুঁড়ে যন্ত্রাংশের আয়নার মতো চকচকিয়ে ওঠা । প্রপেলারের পাখা কেটে নিয়ে যায় । কুড়ালে কেটে কেটে নেয় বিমানের আচ্ছাদনের টুকরো । কখনো বিমানের চুম্বকে হিড় হিড় করে টাক্কল আকর্ষণ করে । প্রথম প্রথম কেউ চমকে গেলেও বুঝতে পারে এটা চুম্বক । শুয়োরের খাবার দেবার থালা বানায় কেউ । কেউ আগুনে গলিয়ে হাতা থালা কড়াই বানায় । সাইবার বাড়ীর কয়েকজন দালং রীতিমতো থালা বাসন বানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরী করতো । তামা, পিতলের তার, যন্ত্রাংশ নিয়ে কেউ ধূমাছড়া, ছাউমনু, হালাহালি বাজারে নিয়ে আংটি, বালা, মাদুলি, কানের ঝুমকা, চুড়ি বানিয়ে নেয় । কেউ শুধু ছোট ছোট লোহার নল কেটে দেশী বন্দুক, পিস্তল বানায় । বিরাট ভারী ইঞ্জিনটা কিন্তু এখনো পাথরের চাপা কম ছিল না । অনেক চেষ্টা করেও বড় পাথরটাকে সরানো যায়নি । কয়েকমাস ধরে চলছিল বিরাট মেলা । সমতল থেকে অবশ্য সেখানে যেতে কেউ সাহস করেনি । একদিকে মাইল দশেক গভীর জঙ্গল । পথঘাট নেই । অন্যদিকে বাঘ, ভাল্লুক, হাতীর ভয় । বিশেষ করে বিরাট লংতরাই পাহাড় ছিল কয়েকদল বুনো হাতীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ।

সোনা কার্তিকের নাম ডাক চারদিকে যখন ছড়ায় তখনি বিপদ ঘনিয়ে আসে । কয়েকবার তার বাড়ীতে ডাকাতি হলো । টাকা পয়সা সোনা লুঠ করেই ক্ষান্ত হয়নি । গুপ্তধনের ঠিকানার জন্য ওর বৌকে হাত পা বেঁধে রাখে ডাকাতরা । প্রচণ্ডভাবে কার্তিককে ধরে মারধোর করে । প্রাণে কিন্তু মারেনি । মরে গেলে গুপ্তধনের খোঁজ যে মিলবে না সেই ভয়ে । সোনা কার্তিকও কম চতুর না, সামান্য মারধোর করলেই একেবারে মরে যাওয়ার ভান করতো । মূর্চ্ছা যাওয়ার নমুনা দেখলেই ডাকাতরা জল ঢেলে যত্ন নিতো । চোখে মুখে জল ছিটানোর পর চেতনা আসলেই আবার জিজ্ঞেস করতো, বল সোনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ । অতিরিক্ত নির্যাতন হলে কিছুটা দিয়ে দিতে সে সামান্য কয়েকভরী কোথায় তার আসল স্বর্ণ ভাণ্ডারে মাটিতে পুঁতে রেখেছে বউকেও জানতে দিতো না । জানতে না দিলে কি হবে বাজারে এসে মহাজনদের কাছে নানাভাবে প্রতারিত হতো ।

এই সমস্ত সোনা কার্তিকের বাড়ীর ডাকাতির মামলার বিভিন্ন অভিযোগে রসিক ত্রিপুরাকেও কয়েকবার গ্রেপ্তার হতে হয় । রসিক ত্রিপুরার ছেলে এখন ওই এলাকায় বিশিষ্ট নেতা । রসিক ত্রিপুরার অবস্থা এলাকার মধ্যে এখনো বেশ রমরমা । রসিক ত্রিপুরা ছাড়াও তখন অনেকে গ্রেপ্তার হয় । মনুতে তখন থানা ছিল না । ফটিকরায় থানার অধীনে এই সমস্ত পাহাড় অঞ্চল । কোন ফৌজদারী ঘটনা ঘটলে থানার দারোগা আসতো পায়ে হেঁটে । তখন ফটিকরায় থানায় মুক্তার

মিএগ্রা ও সি । ছোট দারোগা সেকেরকোটের রমেশ দাস । মুক্তার মিএগ্রা এখন নেই । রমেশ দাস ইদানিং সার্কেল ইন্সপেক্টার । শীঘ্রই অবসর নেবে হয়তো । অতুল গৌতম জাঁদরেল পুলিশ অফিসার তখন কৈলাশহর কোর্টের ইন্সপেক্টার । এত ডাকাতি হলেও পুলিশ মহল তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো না ।

ডাকাতরা পিটতে পিটতে পঙ্গু করে রাখে। থানায় এজাহার দিয়েছে কয়েকবার। কিন্তু মামলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু আইনগত অসুবিধার অজুহাত ছিল। কারণ বিমান দুর্ঘটনার পরে পাকিস্তান থেকে সংবাদ আসে বিমানটিকে খুঁজে দেখার। ভারত সরকার দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে কিন্তু সোনার ভান্ডার বেমালুম অস্বীকার করে। সুযোগ ছিল অস্বীকারের। যখন করাচী থেকে দিল্লীতে নামে বিমানটি তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সোনা বা টাকার কথা ঘোষণা করেনি।

বার বার সোনাদানার ক্ষতিপূরণের তাগিদ আসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে। হাইকমিশনার পর্যায়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ চালাচালির পরেও পাকিস্তানের সরকার বিশ্বাস করতে পারেনি। ত্রিপুরার তখন একজন মাত্র এস পি । গৌরী প্রসাদ ঘোষ পশ্চিমবাংলার পুলিশ সার্ভিসের কেডার। কৈলাশহরে তখন সার্কেল ইন্সপেক্টার অনাথ বন্ধু চৌধুরী। সরেজমিনে তদন্তে এলেন পূর্ব পাকিস্তানের ডি সি। নাম তার এইচ আই নামানি। বিহারী মুসলিম। বড় বিচক্ষণ। ভারতীয় পুলিশ অফিসারদের নিয়ে সোজা ঘটনাস্থলে এলেন। ভাঙা বিমানের মাটি অর্ধেক ডুবন্ত ইঞ্জিনটাই গভীর অরণ্যের মাঝখানে দেখে গেলেন। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ দিলনা ভারতীয় অফিসাররা। সবই বুঝতে পারলেও চাক্ষুস কোন প্রমাণ হাতে নেই। আর ডাকাতির কেইস গ্রহণ করলে সোনাদানা সীজ করলে পাকিস্তানের যুক্তিকেই সমর্থন করা হবে । এই কূটনৈতিক চাল চালতে গিয়ে সোনা কার্তিক বিচার পায়না। ফাকে ফশকে ডর ভয় দেখিয়ে মাঝপথে পুলিশ অফিসারদের অনেকের ভাগ্যে চাকা চাকা সোনা জোটে। নামানি ত্রিপুরায় আসার আগেই নাম না জানা মহিলা আসে। বিমানে নিহত কোন যাত্রীর বিরহিনী বৌ। গায়ে তার খ্রীষ্টান মঠের সন্ন্যাসীনির পোষাক। বয়স প্রায় ত্রিশ, বত্রিশ। দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছেন । বিশ্বাস করতে পারেননি তার স্বামী যে মারা গেছে। প্রিয়জনের অশুভ শুনতে ভাল না লাগা বা বিশ্বাস না করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ষড়যন্ত্র করে সোনা লুট করার কাহিনী মনে করতো দুর্ঘটনার সংবাদটাকে। পাকিস্তানের সরকারের সাথে ভারতীয় সরকারের বিদ্বেষ বিদ্বেষ একটা ভাব দুই সরকারই সযত্নে পালন করতো। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার উদ্দাম ধারাকে রাজনৈতিক সীমানার বেড়া দিয়ে আটকে রাখতো। পাকিস্তানের মানুষের কাছে ভারতবর্ষ এক নিষিদ্ধ দেশ। ভারতীয় মানুষের কাছে পাকিস্তানকে চিরশত্রু বলে চিহ্নিত করে রাখে দু'দেশের শাসকরা।

পাকিস্তান সরকার মৃত মানুষদের সংবাদ সংগ্রহের কাজে যত তৎপর ছিল তার চেয়ে বেশী সচেতন ছিল গোটা ঘটনাকে নাশকতা মূলক ষড়যন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। ভারতবর্ষের সরকার মানবতার দৃষ্টি দিতে যায়নি। বরং অবাঞ্ছিত ঝামেলা মনে করে পরিকল্পিতভাবেই ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। দায়িত্ববোধের ঘাটতি যেখানে। সেখানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা স্বাভাবিক। ওই মহিলা এমনি পরিবেশে কখনো পাকিস্তান সরকারের কাছে কখনো ভারতীয় দূতাবাসে ছলছল চোখে আবেদন নিবেদন জানিয়ে মাসের পর মাস বসে থাকে। কূটনৈতিক জট

তবু খোলে না। শেষ পর্যন্ত অনেক অশ্রুর বিনিময়ে কূটনৈতিক আমলাদের মন গলে। ঘটনাস্থল দেখে আসার আবেদন মঞ্জুর হলো। পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে ছুটে এলো দিল্লীতে। দিল্লী থেকে কোলকাতা হয়ে আগরতলা। আগরতলা থেকে মনু। মনুতে পৌঁছানো খুবই কঠিন। কয়দিন লাগবে কেউ অগ্রিম হিসেব করে বলতে পারতো না। ১৯৫৩ সালে রাস্তা ঘাট ছিল না বললেই চলে। দুর্গম পাহাড় ধরে মাত্র পথ তৈরীর কাজ শুরু। গাড়ী বলতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নীলামে কেনা কয়েকটা জীপ ডিব্রুগড় বা ইম্ফল থেকে কিনে আনতো ব্যবসায়ীরা। আর চলতো কয়েকটা ওয়েপন কেরিয়ার তাও যুদ্ধের পর বাতিল করা গাড়ী। শেষ পর্যন্ত এই ওয়েপন কেরিয়ারগুলোই ত্রিপুরার পথে প্রথম যাত্রী হয়ে যাতায়াত করে। মানুষ; পণ্য বহনের স্থল পথের যানবাহন। কয়েকটি জি এম সি লরীও চলতো পাথর গাছ বহনের কাজে।

রাস্তায় বিপর্যয় লেগেই থাকতো। আসাম পূর্তবিভাগ ১৯৪৯-৫০ সালে এই রাস্তা গড়ার কাজ নেয়। আসাম পূর্ত বিভাগের সদর দপ্তর তখন শিলং। বহুরাজ্যের ঠিকেদাররা দলে দলে আসে ত্রি পুরার পথে পাহাড়ে পয়সা কুড়াতে। পয়সা কুড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো জীবনের অনেক ঝুঁকিও। রাস্তার পাশে কিছুদূর গিয়ে গিয়ে পাওয়া যেতো শ্রমিক শিবির। বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, নোয়াখালির শ্রমিক আসতো জীবিকার সন্ধানে। মজুরী তিন চার টাকা মাত্র। ম্যালেরিয়া আমাশয়ে কত শ্রমিক দেশে ফিরে যেতে পারেনি তার হিসেব নেই। কেউ কেউ অসুখ বিসুখের ভয়ে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতো। কেউ ঝগড়া বিবাদ করে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতো। কেউ আবার এখানেই থেকে গেছে। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে ধারার এক অদ্ভুত জীবন প্রবাহ। এই রাজ্য জুড়ে এই প্রবাহ চলছে ইতিহাসের বিস্মৃত কোন যুগ থেকে।

তেলিয়ামুড়ার খোয়াই নদী জুরিন্দা নৌকায় গাড়ী পারাপার করতো। বৃষ্টি বাদল বেশী হলে পারাপার বন্ধ। এই বন্ধ যে কতদিন থাকে তার ঠিক নেই। নদী পার হলেও পথে পথে ধ্বস নামে। এক একটা ধ্বস পরিষ্কার করে চলাচল শুরু করতে কত মানুষের শ্রম গেছে কেউ হিসেব রাখেনি। কোমর ধরার রোগ ধরে জীবন পঙ্গু করেছে অনেকে।

রাস্তায় কোথাও উল্টে থাকত গাড়ী। হাসপাতাল-ঔষধ অলীক স্বপ্নের মতো দুর্লভ। রাস্তায় গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিকল হলে আরো বিপদ। কয়দিনে চালু হবে ঠিক নেই। কাদায় ডুবলে ধাক্কা মারো। বাবু, শ্রমিক, অফিসার কারো রেহাই নেই। কোথাও রাস্তায় এত কাদা আর এত পিচ্ছিল। গাছের ডালাপালা বিছিয়ে গাড়ী পার হতো। একটু আধটু জায়গা নয় ফার্লঙের পর ফার্লং। মাটির ঢেলায় মৈ চড়ার মতো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলতো দেশ বিদেশের পথিকরা। বর্ষার অনাবরত ধারার ঢল যখন নামে পাহাড়ী ছড়াগুলো সাপিনীর মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠত। ক্রুদ্ধ আস্ফালনে পুল চুরমার করে নিয়ে যেতো। কখনো বুনো হাতীর দল পথ আগলে দাঁড়ায়। গাড়ীর হেন্ডিম্যান টিন বাজাতো। একসাথে যাত্রীদের হৈ হৈ আওয়াজ। রাত হলে আরো বিপদ। ন্যাকড়ায় পেট্রোল ভিজিয়ে জ্বেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাতী তাড়িয়ে পথ বের করে এগোতে হয়। যে কোন গাড়ীতে থাকতো। কোদাল, বেলচা, বালতি, দা, খুন্তি, বড় বড় দড়ি। অনেক ধরণের সরঞ্জাম। সঙ্গে শুকনো খাবার চিড়া গুড়। দলুবাড়ীতে গেইট ছিল। মনাই মলসুম নামে এক পাহাড়ী সর্দার কোন রকম একটা হোটেল চালু করতো। সিদলচাটনি, ভাত, ডাল ছাড়া কিছুই থাকতো না হোটেলে।

ক্লান্ত পথিকরা অমৃতের কাছে বসতো যেন সেখানে। খিদের পেটে তখন ওই হোটেলে নোংরা কলাইকরা থালার ভাত অমৃতের মতোই লাগতো। কেউ আবার পাহাড়ী মদে বুঁদ হয়ে থাকতো গাড়ী ছাড়ার সময় ভুলে।

পথে ঘাটে হাতী দিয়ে কাঠ টানা, পুলের লোহার মাঙ্কি মুগুর টানা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সেখান থেকে আবার উঁচু লংতরাই। দুর্গম পথে পিছলে কত গাড়ী লুঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে। কোনদিন থামেনি লংতরাই মন্দিরে তখনো মানুষের চলা । তবুও গাছ তলায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে লংতরাই দেবতার নামে পয়সা দিত। যাত্রার শুভ কামনা প্রার্থনা সরে আবার চলতো গাড়ী। কোথাও পথের পাশে বন দপ্তর লিখে রাখতো, বুনো হাতী থেকে সাবধান।

হাতীর পাল কখনো দাঁড়াতো পথ দখল করে। কখনো রাস্তার পাশের গাছ ভেঙে ঠেলে রাস্তা রুখে দিয়ে মজা করতো। কখনো বা ঠিকেদারের রোলার রাস্তায় থাকলে দুষ্ট হাতী কয়জনে গভীর লুঙ্গার মধ্যে দিতো ফেলে। এমন, তরো উপদ্রব।

পথের পাশে গাছপালা মরমর করে উঠলেই যাত্রীরা শিউরে উঠতো অজানা আশঙ্কায়। হকচকিত ভীত জানোয়াররা জঙ্গলে কখনো বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতো।

লংতরাই থেকে নেমে কৈলাশহর কমলপুর সীমানার কাছে খাগরা ছড়া বহমান। ছড়ার উপর পুল। একবার এই পুল জলের তোড়ে উড়ে যায়। গাড়ী পার হতে পারে না। তখনকার মোটর শ্রমিক দমবার পাত্র ছিল না। গাড়ী পার করতে হবেই। ড্রাইভারের বাড়ী ধর্মনগর। নাম অনন্ত ভট্টাচার্য এখনো জীবিত আছে কিনা কে জানে। এই দুর্গম পথের অভিযানের ইতিহাসের সাথে তার ওই দুর্ধর্ষ অভিযানের কথা লুকিয়ে আছে। খাগরা ছড়া পুল উড়লেও ঠিকেদারদের শ্রমিক শিবির ছিল পাশে। লোক লস্করের অভাব ছিল না। গোটা গাড়ীটাকে অনন্ত ড্রাইভার টুকরো টুকরো করে খোলে। খোলা যন্ত্রাংশ একটা একটা করে কোন রকমে ছড়া পার করে রাখে। তার পরে মানুষ পার হয়। আবার যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়েগাড়ী খাড়া করে স্টার্ট দেয়। মানুষের এগিয়ে চলার পথ কোনদিন রুদ্ধ হয়না। এইখানেই অন্যজীবের সাথে মানুষের পার্থক্য বোধহয়।

আসাম আগরতলার পথে চলা মানেই প্রতিমুহূর্তে জীবন প্রাণ বাজি ধরে কদম কদম এগিয়ে যাওয়া। রাস্তা গঠনের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের উত্থান পতনের আশা নিরাশার কাহিনী। কেউ রাস্তার কাজ বাদ দিয়ে ছুটে যেতো ধূমাছড়া এলাকায় স্বর্ণ ভান্ডারের কাহিনী শুনে। হন্যে হয়ে ঘুরত কোন ধান্দা করে জলের দামে কয়েক রতি সোনা পাওয়া যায় কিনা।

গাড়ীতে গাড়ীতে তখন সোনা কার্তিকের কাহিনী লোকমুখে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধু কুমারের কাছে এলে চোখে পড়তো দূরে দূরে উঁচু গাছের মগডালে ছোট ছোট ঘর বাঁধা। লম্বা বাঁশের মৈ মাটি থেকে উঠে উঁচু ঘরের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। এই সমস্ত আয়োজন হাতীর ভয়ে। আর সেই পথেই গাড়ী চলে। চালায়। হাজার বাধা বিঘ্ন থাকলেও চলতে হবে। এই আসাম আগরতলা রাস্তাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধমনী। কোন কারণে পথ বন্ধ হলেই গোটা রাজ্য অচল হয়ে থমকে দাঁড়ায়। চেনা অচেনা বহু মানুষের এক নদী রক্ত ঘাম অশ্রুর বিনিময়ে প্রথম ত্রিপুরার জীবন ধমনী সচল হয়েছিল আজকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে গেলেও তার চিহ্ন কোথাও কোথাও থেকে গেছে।

সিন্ধুকুমার পার হয়ে যেতে যেতে সামনেই মনুনদী। লংতরাই পাহাড়ের বহুমানুষের চোখের জল বুকে ধরে চিরদিন বহমান। মনুর এখানে খরস্রোত। বর্ষায় পাগলা মহাদেবের মতো সংহার মূর্তি ধারণ করে ধেই ধেই করে সর্বনাশা নাচ নাচতে নামে। আর তার উপর দিয়েই জুরিন্দা নৌকায় করে জীপ, ট্রাক পার হয়। নৌকার মাঝিরা সবাই চাকমা আর ত্রিপুরী।

মনুঘাট পার হয়েই টীলার উপর আসাম রাইফেলের ক্যাম্প । ১৯৫০ সালে এখানে ছাউনি পাতে ছয় নম্বর ব্যাটেলিয়ানের এ কোম্পানী । তাদের আর একটা ক্যাম্প ছিল বি কোম্পানীর কাঞ্চনপুর জামসুরী এলাকায় । সদর দপ্তর আগরতলায় । মনু ক্যাম্পের শিবিরে তখন এক তরুণ এংলো ইণ্ডিয়ান দায়িত্বে ছিল । নাম তার ডি. এইচ. ডি ক্রুজ । ১২০ জন সিপাহী, বারোটা খচ্চর গোটা দশেক জীপ, ওয়েপন কেরিয়ার এই ছিল ক্রুজ সাহেবের সংসার । সঙ্গেই এক ক্যান্টীন । শিলং থেকে চাকরী ছেড়ে সুখেন দাস নামে এক বাঙালী যুবক চালাতো এই ক্যান্টীন । হোটেল, চা স্টল, দোকান বলতে কিছুই ছিল না । বাঁশের বেড়া বাঁশের তরজা দিয়ে ছানি দেওয়া সুখেন বাবুর সেই ক্যান্টীনই একমাত্র ভরসা । মনুতে তখন গেইট বসিয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হতো । ধর্মনগরগামী গাড়ীগুলো একসাথে বেলা একটা পোনেরতে গেইট খুলে দিলে যাত্রা করতো । আবার আগরতলাগামী গাড়ীর গেইট খুলতো একটা পঁচিশে । এর আগে যত বিপত্তিই থাক রাস্তার গাড়ীর ড্রাইভাররা আপ্রাণ চেষ্টা করতো এই সময়ের আগে পৌঁছতে । পৌঁছতে না পারলে এই দুর্গম স্থানে আর একদিন বসে থাকতে হবে ।

ক্যান্টীনে চা, বিস্কুট, কুকিস, বিড়ি, নুন, কেরোসিন, চাল যেমন ছিল তেমনি প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জাম, টিংচার ডেটল, তুলা ইত্যাদিও থাকতো । ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, দোকানী সবকিছুই একা সুখেন বাবু । এই পারেই আসতো করিমগঞ্জ, শিলচরের মাড়োয়াড়ী, দেশ বিদেশের আগর ব্যবসায়ী, রাস্তার ঠিকেদার, আর অগণিত ভিন রাজ্যের শ্রমিক । সাউমনু, ছৈলেংটা, ধূমাছড়ায় জুমের ফসলের উঠতো বিপুল সম্ভার । তিল, কার্পাস, তূলা, তিসি, পাটের কারবার করতে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যবসায়ীরা এই পথে আসে । দুর্গম পথে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করতো না । গচ্ছিত রেখে যেতো সুখেন বাবুর কাছেই । মালপত্র কিনে নৌকা দিয়ে পাঠাতো । নিজেরা কিন্তু গাড়ীতে বা পায়ে হেঁটে পৌঁছত সুখেন বাবুর ক্যান্টীনে । বিরাট মাচা । তার উপর লম্বা বালিস । আসো ঘুমাও এমন তরো একটাভাব । পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ এলে দাদন লগ্নী করতে আসতো মহাজনরা । নগদ লেনদেন ছিল না । মহাজনের চিরকুট নিয়ে সুখেনবাবুর ক্যান্টীনে হাজির হলে টাকা মিলতো ।

রাস্তায় দুর্ঘটনা আহত যাত্রীরা এলে সুখেনবাবুই ডাক্তার । গাড়ী খাদে গেছে যাও সুখেন বাবুর কাছে । উনিই ক্রুজ সাহেবকে বলে কয়ে জোয়ান পাঠাবে গাড়ী উদ্ধার করতে । বিচিত্র মানুষের আনাগোনা, কতাবার্তা সব যতনে রাখতো । তখনকার সময় রেডিও, পত্রিকা না থাকলেও সুখেনবাবু সব খবরের ভাণ্ডার । দারোগা, তহশীলদার, মাষ্টার সবারই একবার এই পথে আসতে যেতে এখানে না ঢুকলে চলতো না ।

তেমনি অনেক ভিতরে পাহাড়ী পল্লীর সর্দার, কারবারি, অচাইও আসতো এখানে । সেই কারণেই আকাশ থেকে সোনা ঝরার কাহিনী সুখেনবাবুর কাছে পৌঁছয় । আসাম আগরতলা

রাস্তার পুরনো ঘটনার এই জীবন্ত সাক্ষী সুখেনবাবু এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ । কিসের নেশায় বাড়ী ঘর সংসার ছেড়েএই গভীর অরণ্যে আস্তানা গেড়ে দিন কাটাতো কে জানে । শিক্ষা দীক্ষা ও ছিল । চাকুরীও তখন এতটা দুর্লভ না । তবু নির্জন অরণ্যে নির্বাসিত জীবনে প্রাণের কোথায় যেন মানবিক দরদের কলকলাজি বইতো । অর্থ উপার্জনই শেষ কথা ছিল না । ছিল না বলেই বিপন্ন পথচারীরা তাকে এখনো ভোলে না । ভুলতে পারে না দুর্যোগ রাতে কালের ক্যান্টীনে পাওয়া এক দুর্লভ উষ্ণ আশ্রয় ।

আসাম রাইফেলের উর্দিপরা জোয়ানদের মানুষ ভয় করতো । কাছে যেতে সাহস পেতো না । সুখেনবাবুর মাধ্যমে যোগাযোগ হত সরাসরি ক্রুজ সাহেবের সঙ্গে ।

তেমনি হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলো করাচির বিরহিনী বৌ । চোখে কালো চশমা, গায়ের রঙে মালিন্যের অবসাদের কালো ছায়া । যৌবন উদ্যত তবু বৃষ্টিহীন বালুচরের মতো শুষ্ক কঠিন । অনেক ঝড়ের ধকলে চাউনি মন্থর । অসহায় চোখের জল শুকিয়ে দাগ রয়ে গেছে । একটা জীপ থেকে নেমে সুখেনবাবুকে নিজের পরিচয় জানায় । তার স্বামী নাকি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কোন এক মেজর । দুর্ঘটনায় পতিত সেই বিমানের যাত্রী ছিল । বক্ষে তার তোলপাড় করা ব্যাকুলতা, কোথায়, কখন, কত দূরে বিমানটা আছে ? সত্যি সত্যি সবাই মারা গেছে কিনা, মারা গেলেও স্বচক্ষে দেখা কোন লোক আছে কি ? .... আরো অনেক প্রশ্ন । সুখেন বাবু অল্প কথায় উত্তর দিয়ে বুঝ দিতে চায় । বিচলিত ব্যাকুলতা নিয়ে উঠল ক্রুজ সাহেবের কাছে । ক্রুজ অবিবাহিত । হঠাৎ এক অপরিচিত সদ্য বিধবা যুবতীর অভিযোগ অনুযোগে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে । সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কি আচরণ ভাষা প্রয়োগ করবে ঠাহর করতে পারে না । সময় তখন বিকেল । পাহাড়ে এমনিতেই সকাল সকাল বিকেল হয় । তক্ষুণি ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত । অনেক বলে কয়ে তাকে বোঝানো হলো । সামরিক শিবিরেই আলাদা হয়ে তাকে রাখার বন্দোবস্ত করে ক্রুজ । পরদিন ফটিকরায় থানার দারোগা ছোট বাবু রমেশ দাসকে ডাকা হলো ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য ।

কয়েকটা খচ্চরের চড়ে মনু নদী পার হয়ে ধূমাছড়া বরাবর লংতরাই পথে যাত্রা করে । মেম সাহেবকে দেখে পথে ভীড় জমে । মানুষ যত দেখে চাপা কান্না তত বাড়ে । ছোট বড় অনেকেই পেছনে পেছনে যায় । কৌতূহল সহানুভূতিতে পাহাড়ে পাহাড়ে এবং ঘরে ডাকাডাকি শুরু হয় । এ ওকে দেখিয়ে দেয় । পথ প্রদর্শনের জন্য কার্তিককে ডাকলো দারোগা । ক্রুজ সাহেব ঘটনার পর আসেনি । এতদিন না আসার অপরাধ বোধে মুখটা লাজিয়ে ওঠা । খুব একটা জিজ্ঞাসাবাদ করে না । কার্তিক এলো ঠিক সময়েই । তার আগেই অনেক পথ প্রদর্শক জুটে গেছে । কেউ আবার ভীত । ফিস ফিস করে বলে এবার গ্রামের সবাইকে ধরে সমস্ত সোনা বমি করাবে । পরের ধনে পোদ্দারি করা শিখিয়ে দেবে । কেউ আবার ভয়ে পথ থেকেই কেটে পড়ে । কেউ নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে পেছনে পেছনে যায় । বাচ্চা মেয়েদের পিঠে ছোট ভাই বা বোন তরতরিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলো । পাইলশিয়া দিয়ে ধান ভানে কোন বাড়ীর বৌরা কৌতূহলে ছোটে পথের দিকে । কেউ শূয়োরের খাবার বানায়, কেউ লাঙ্গি টেনে বিভোর । কেউ টং ঘরের বারান্দায় বসে সূতা কাটে । অপরূপ সেই স্বর্গ থেকে খসে আসা বিরহিণীকে দেখতে ছোটে সবাই ।

অভিজাত বাড়ীর সুখের দুলালী । অবসাদে ক্লান্তিতে পা চলে না । তবু ব্যাকুল প্রাণের তাড়না । প্রিয়জনের দেহের কোন চিহ্ন হয়ত মিলবে । গিয়ে পৌঁছয় দুর্ঘটনার স্থানে । কার্তিক চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখায় । হাওয়াই জাহাজের ভাঙা একটা টুকরো রোদে ঝলমলিয়ে ওঠে পথের পাশে । দেখেই বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে । গভীর অরণ্যের মাঝখানে সে কান্না অরণ্যের বাতাসেই গাছ গাছালির শাখা প্রশাখায় হারিয়ে যায় । কবর আগেই হয়ে গেছে তবু খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে কিছু হাড়গোড় জড়ো করে । দুর্গন্ধে ভরা হাড়গুলোকেই চুমু খায় বার বার । সেখানেই নতুন কবর খোঁড়ে লোকজন দিয়ে । সব হাড়গোড় গর্তে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দেয় । গড়িয়ে গড়িয়ে ঘাস মাটি মুঠোতে ভরে বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে । এরপর নতজানু হয়ে ক্রুজ সাহেব আর করাচির বৌ প্রার্থনা করে কবরের সামনে । বাইবেলের কোন গম্ভীর মন্ত্র পড়ে ।

আসলে সেই হাড়গুলো তার স্বামীর কিনা জানার উপায় ছিল না । তবু হতাশায় ভরা ব্যাকুলতা নিয়ে সেখানেই থাকতে চায় । নির্জন বন ছেড়ে যেতে মন মানে না ।

এলোমেলো চুলে পাগলিনীর মতো আঙুল বুলায় । উঠে আসার সময় ঠোঁট বাঁকিয়ে আবেগ বিগলিত কণ্ঠের জড়ানো আওয়াজে বলে এলো, শান্তিতে ঘুমিয়ে থেকো । এরপর প্রতিবছর মহিলা আসতো । পাথর সিমেন্ট দিয়ে কবর বাঁধিয়ে দেয়। লোহার ফলক একটা পুঁতে নাম লিখে ফেলে যায় । লোহার ফলকটা এখন মরচে ধরে রোদ বৃষ্টিতে লেখাটা মুছে গেছে । পাঠোদ্ধার করা খুবই কঠিন ।

করাচির মেম সাহেব সোনাদানা টাকা পয়সার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেনি । বরং নিজেই নগদ টাকা খরচ করে গ্রামবাসীদের খাওয়ায় । কাপড় কিনে দান খয়রাতি করে । শোকে মূহ্যমান তাই হয়তো জিজ্ঞেস করেনি । ভয়ও ছিল । অচেনা অজানা জায়গা তার উপর ভিন রাষ্ট্র । জিজ্ঞেস করলে আমলা অফিসার তারাও নিষেধ দিতে পারে । অথবা উত্তর দেবে কে । কেনই বা উত্তর দেবে । সরকার নিজেই যেখানে তীব্রভাবে অস্বীকারের কথা জানিয়েছে । সে প্রশ্ন করে লাভ নেই । যারা পেয়েছে তারাও আমরা নিয়েছি বা পেয়েছি বলে স্বীকার করতে এগিয়ে আসবে না । যদিও কোন রকম খোঁজ খবর মেলে । সোনার মালিক অন্যরাও তো হতে পারে ।

যাবার সময় কবর থেকে ঝুর ঝুর কয়েক মুঠো মাটি নিয়ে গেল ব্যাগ ভরে । নেওয়ার মধ্যে ওই মাটিটুকুই । ফেরার পথে কে একজন ছুটে এসে এক পাটি সেণ্ডেল দেখাল । সেণ্ডেল দেখতেই বিদ্যুৎ চমকানোর মতো চমকে ওঠে । দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জুতাটাইতো নতুন বৌয়ের পায়ে ছিল । বিমান দুর্ঘটনায় যে এক নব দম্পতির প্রাণ গেছে মহিলার কাছ থেকেই লোকে প্রথম জানতে পারে ।

সন্দেহ অনেকের । অন্য লোকের কাছে খোলামেলা কিছু না বললেও হয়তো ক্রুজ সাহবের কাছে অনেক কিছু জানিয়ে গেছে । মহিলাকে বিদায় দিয়ে ক্রুজ সাহেব জোয়ানদের নিয়ে আবার ঘটনাস্থলে তল্লাসী চালায় । কিছু পেয়েছে কিনা প্রকাশও হয়নি । গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় ক্রুজ সাহেব নিজে অনেক বাড়ীতে হানা দিতো । কার্তিক ত্রিপুরাকে ধরে এনে শিবিরে আটকেও রাখে কয়েকবার । মারপিট লাঞ্ছনা সবই হয়েছে । তবু কার্তিক ছাড়া পায় । লোকে বিশ্বাস করে ক্রুজ সাহেব সোনা আর টাকার লোভনীয় পরিমাণ পেয়ে চুপসে গেছে । সত্যি কি মিথ্যা তা সম্পূর্ণ

বিতর্কের ব্যাপার ।আসাম রাইফেলের কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যাপারটা অনেকখানি মেঘলা । কয়েকবার ক্রুজ সাহেবের বাড়ীতে, শিবিরে গোপনে গোপনে তল্লাসী তদন্ত চলে । দোষী প্রমাণিত হয়েছে কিনা সাধারণ মানুষের কাছে আজকেও অজানা । আবার এও শোনা যায় পরবর্তী জীবনে ক্রুজ সাহেব কর্মজীবনের অনেক উঁচুতে ওঠার সিঁড়ির নাগাল পেয়েছিল । রহস্যময় সেই অধ্যায়ের পাতার রঙ মুছে গেলেও লংতরাই পাহাড়ের পুরনো বাসিন্দাদের মন থেকে মুছে যেতে পারে না ।

ক্রুজ সাহেবের আচমকা আচমকা রাত দুপুরে হানা দেওয়ার পর গুজব ছড়াতে থাকে চারদিকে বেগবান দাবানলের মতো । কেউ বলে কয়েক মণ সোনা পাওয়া গেছে । প্লেনের নীচে এখনো বিরাট সিন্দুক আছে । গুজব যতো রটে ধান্দাবাজদের স্রোত এই লংতরাই পাহাড়ে তত বাড়ে ।এমনিতেই প্রকৃতির দান কাঠ, বাঁশ, পাথর প্রভৃতি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ লংতরাই অন্যদিকে তিল, মরিচ, কার্পাস, তূলা, পাট বিভিন্ন জুমজাত ফসলে ভরপুর সারা উপত্যকা । বাসিন্দারা আদিম যুগের বন্ধ অন্ধকারে থাকলেও আধুনিক দুনিয়ার জটিলতা, লোভ লালসার সীমাহীন অনাচারে প্রবেশ করেনি । সহজ সরল বিশ্বাস, সাধারণ জীবন ধারাই জীবনের মূল পুঁজি । এত সম্পদ, সোনালী ফসল চারদিকে । যারা ফলায় তারা আবার শিশুর মতো সরল । নিজেরা জানে না তাদের ফসলের দাম কতো । এই পাহাড়ের আকাশ থেকেই শিলাবৃষ্টির মতো চাকা চাকা সোনার বৃষ্টি ঝরেছে । দূর দূর থেকে ধান্দাবাজ প্রতারকরা ছুটে আসে নানা রূপে । নানা ঢঙে । শূয়োর যেমন ঘোৎ ঘোৎ শব্দে নোংরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ায় । তেমনি ধান্দাবাজরা সোনার খোঁজে খোঁজে ঘুরে ।

এমনি এক ধান্দাবাজ এসে হাজির । আস্তানা গাড়ে ফটিকরায় বাজারে । আরবের কোন পীর ফকিরের পোষাকের মতো গায়ে দিতো বিরাট একটা আলখাল্লা । আলখাল্লায় সেফটি পিন দিয়ে আটকে রাখতো মেয়েদের খোপার প্লাষ্টিক ফুল, রঙীন কাচের মালা । মেয়েদের আংটি, চুড়ি, বাচ্চাদের খেলনা, বাঁশী আরো কতো হরেক রকম জিনিষ । তার আলাদা কোন দোকান ছিল না । সারা দেহটাই একটা ঝলমলে মনোহারী দোকান ।

রাজস্থানের কোন মরুভূমি থেকে আগত আগন্তুক কেউ বলতে পারে না। নামটাও মনে নেই কারো। কেবল আগরওয়াল পদবীটিই এখনো লোক মুখ বেঁচে আছে। কেউ আবার বলে ওর আসল পদবী ওইটা নয়। বন বাদাড়ে আগর গাছ খুঁজতো বলেই তার আগরওয়াল। আসল উদ্দেশ্য যে কি বলা কঠিন ছিল।

ঘুম থেকে উঠেই আলখাল্লা গায়ে দিয়ে ছুটে যেতো অনেকদূরে। লংতরাই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পাহাড়ী গ্রামে। যেতে যেতে বাঁশী বাজিয়ে বা হাতে ঝুমুর বাজিয়ে খদ্দের ডাকতো । ভীড় জমাতো পাহাড়ী গ্রামের উঠোনে। কার গলায় কোন রঙের মালা মানাবে পছন্দ অপছন্দের ভার থাকতো নিজের উপরেই। চির অভাবের জ্বালায় জর্জরিত জুমিয়াদের কাছে লগ্নী করতো টাকা দেড় গুণ দ্বিগুণ সুদে।

কখনো আবার আলখাল্লাটা কারো টং ঘরে লটকিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঢুকতো আগর গাছের সন্ধানে। করাতি দিয়ে গাছ কেটে সার নিয়ে গোপনে সে নিরুদ্দেশ। কোথায় দেশান্তরী হতো কেউ জানতো না। আবার আবির্ভাব হতো জুমের ফসল কাটার মরশুমে। আলখাল্লা পকেট ভরে নিঙরে

নিঙরে লুটে নিয়ে যেতো জুমিয়াদের ফসলের সমস্ত নির্যাস।

বিমান দুর্ঘটনার পর এলাকা ছাড়ে না। সোনার গন্ধ শুঁকে শুঁকে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। কারো কাছে কোন রকম সন্ধান থাকলে চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে। দু'বোতল মদের দাম দিয়ে নতুবা একটা শূয়োরের দাম দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আত্মসাৎ করতো। কখনো কয়েক জোড়া চুড়ি বা প্লাস্টিকের বাঁশীর বিনিময়ে সোনা নিয়ে যেতো।

পুলিশের নিষেধ চারদিকে। তবু ফাঁকে ফোঁকে পাড়ায় ঢুকে সোনাদানা কখনো যে ভুলিয়ে কার কাছ থেকে নিয়ে যেতো কেউ বুঝত না।

কাউকে গিয়ে ধর্ম বোনের সম্পর্ক পাততো। কাউকে ডাকতো ধর্মের বাপ। কাউকে ধর্ম বন্ধু। ধর্ম আত্মীয়তা তখন আদিবাসীদের কাছে মর্যাদার ব্যাপার ছিল। মুখে মুখে সম্পর্ক হতো না। রীতিমতো শূয়োর কেটে, মুরগী কেটে তামা, তুলসী, ধান, জল ছুঁয়ে অচাই নামক পুরোহিতের সামনে শপথ করে সম্পর্ক স্থাপন হতো। আগরওয়াল এমনি করে সম্পর্ক পাততো বিনিময়ে চুড়ি, মালা, ঝুমকা উপহার দিতো। নতুন আত্মীয়েরা তাকে দিতো সোনা। লংতরাই পাহাড়ে যখন স্বর্ণ ভান্ডার শেষ। ধর্মের ভাই আগরওয়ালও নিরুদ্দেশ হলো। আর কোনদিন ফিরেনি। কপালে সোনার গাছ রোপণ করে কোথায় হারিয়ে গেল কেউ জানে না।

শুকনো মাছ পাহাড় অঞ্চলে প্রিয়। বিশেষ করে পুটি মাছের শুটকী। মাছের তেলে ভিজিয়ে বড় বড় মাটির মটকায় ঠেসে ঠুসে রাখে মটকার মুখ ঢেকে। এই শুটকীর পাহাড়ী নাম বেরমান। পাহাড় অঞ্চলে দারুণ কদর এই খাদ্যের। মাথায় টুকরী নিয়ে যেতো বেরমান অরণ্য সন্তানদের পাড়ায়। বেপারীরা চাল দিলে পয়সা দিলে নিতো না। বলতো এক টুকরো সোনা দিলে এক সের বেরমান পাবে। অনেকে, যাদের ঘরে সোনা আছে তারা দিয়েও দিতো। রূপা, দস্তার অলংকারই তাদের কাছে প্রিয়। সোনাদানার অলংকার নেই বললেই চলে। সোনা যে কত দামী ধারণা করতে কষ্ট পেতো। সেই দুর্বলতার সুযোগেই মহাজনরা যেতো সোনা কুড়াতে।

শিক্ষিত, চাকুরীয়ান মধ্যবিত্ত ছাড়া সোনার প্রচলন অন্যদের মধ্যে ছিল না। আরো ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো কল্পনা করাই কঠিন। সঙ্গতি ছিল না। সেটাই মূল কারণ নয় অবশ্য। অনেকে কোনদিন সোনা চোখে দেখেনি। সোনার সাথে পরিচিত না হলে প্রতারণার ভয় থাকে। এক টুকরো প্লেটিনাম বা ইউরেনিয়াম রাস্তায় পড়ে থাকলে আজকের যুগেও কয়জন চিনতে পারবে। হয়তো রঙ মাখা কোন লোহার টুকরো বলে ধারণা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। মোদ্দা কথায় অজ্ঞতার অভিশাপে হাতের মুঠোয় মুঠো মুঠো সোনা আসার পরও কেউ ধরে রাখতে পারেনি।

ওরা সোনার মূল্য যে অনেক বেশী খুব দেরীতে বুঝে। একসময় এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকেই মূল্যবান হাতীর দাঁত মণ মণ চলে যেতো বাইরে। হাতীর দাঁত মূল্যবান কিছু হতে পারে বিশ্বাসই করতো না। আন্দামানে জারোয়া, অঙ্গী উপজাতিরা আজকেও কাপড় পড়তে শিখেনি। সোনা, রূপা, লোহা একসঙ্গে সামনে ধরে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কোনটা নেবে। তৎক্ষণাৎ উত্তর আসবে লোহা। তীরের ফলক, দা কুড়াল আরো কত কিছু হয়। সোনা দিয়ে কি হয় জানে না। সমাজ বিকাশের পথে আটকে থাকা পশ্চাতপদ মানবগোষ্ঠীর কাছে সোনার মূল্য স্বাভাবিকভাবেই

সেদিন থাকতে পারে না। তাই যতদিন তাদেরকে অন্ধ রাখা যায় ততদিন শোষণের যন্ত্রও চলে অবিরাম।

কমলপুরে হালাহালি বাজার। থাংসি, সাইকার, সিদুং, পাং থুম বিভিন্ন গ্রাম থেকে দার্লং, রিয়াং, হালামরা দল বেঁধে বাজারে আসে। নারী পুরুষ, কিশোর কিশোরী সবার পিঠে খাড়া বোঝাই জুমের ফসল। বাজারে যখন আসে তখন কেমন যেন একটা উৎসবের মেজাজ। বাজার মানেই মিলন মেলা। সপ্তাহে একদিন পাহাড়ের নির্জন থেকে বেরিয়ে জাতি, উপজাতি, বিচিত্র মানুষের কলরবে নিজেকে খানিকক্ষণের জন্য হারিয়ে দেওয়ার আনন্দ কত অদ্ভুত সুখকর। যারা আসে তারাই জানে।

বাজারে নেওয়ার মতো কিছু থাকুক না থাকুক। পথের চড়াই উৎরাই যতো বন্ধুর হোক না কেন বাজারে যাবেই। না হলে জীবনটা বাঁশের চোঙে বন্দী বেরমানের মতো থেকে যায়। বিমান দুর্ঘটনার পরে বাজারে যাওয়া মানেই রোজগার। ঘরে বেচার মতো চালকুমড়া, জুমের মুখী, মরিচ, কার্পাস, তুলা না থাকলেও আপত্তি নেই। বাজারে গেলেই সওদা করা যায়। কোনরকম শুধু বিমানে পাওয়া গলিত কাঁচা রূপা নিলেই হয়। রূপা না থাকলে বিমানের গায়ের এলুমিনিয়ামের টুকরো আগুনে গলিয়ে দলা করে বাজারে নিতে পারলেই টাকার অভাব থাকে না। মহাজনরা হাঁ করে বসে থাকে এই গলিত এলুমিনিয়ামের গোলা কিনতে। ওজনের সময় কিন্তু বড় হুঁশিয়ার। ওজন বাড়াতে গেলে এলুমিনিয়ামের গোলার ভেতরে ছাই রঙের চারকোণা সেই ধাতুর টুকরো দিলে ওজন বাড়বেই। চারকোণা সেই ছাই রঙের ধাতুর ওজন এত বেশী কেন পাহাড় অঞ্চলে কয়জনে জানে। কি কাজেই বা লাগে এই ছাই রঙা ধাতু বুঝতে পারে না। সাইকারের রইদনার বাপ নিজেকে চালাক মনে করতো। পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ায় মহাজনরা এতদিন ওজন করার সময় পাহাড়ীদের ঠকায়। পাট তিন মণ ধরে ওজন করে বাপ ছেলে নিয়ে গেলেও মহাজনের তুলাদন্ডে উঠলে এক মণও হয় না। কি যাদু জানে তারা। এখন থেকে আমরাও ভারী সেই ছাই রঙা ধাতু এলুমিনিয়ামের গোলার ভিতরে দিয়ে ওদের ঠকাব। দেখি মহাজনরা কতটুকু চালাক।

শুধু কথা নয়। সেই ধাতু ঢুকিয়ে দিয়েও ছিল। হালাহালির মহাজনরা সেইসব এলুমিনিয়ামের গোলা জলের দামে কিনে। এলুমিনিয়ামের চাক ভেঙে দেখতে পায় বায়ান্ন তুলার ওজনওয়ালা জ্বলজ্বলে সোনা।

চুপিচুপি মহাজনদের অনেকেই যেতো পাহাড়ী পল্লীতে সেই ছাই রঙা চারকোণা ধাতু খুঁজতে। কয়েক মোঠা লাল নীল সুতার বিনিময়ে।

ধীরু ডাক্তারও যেতো। কামরাঙ্গা, থাংসি, জংথুমে। ম্যালেরিয়া, রক্ত আমাশায়, টাইফয়েডে একসাথে পাড়াকে পাড়া ঝিমিয়ে থাকতো। দু-একটা রোগীর চিকিৎসা করেই দাবি জানাতো সেই ছাই রঙা ধাতুর। স্বপ্নে দেখা যক্ষের ধন পেয়ে যেমন রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠে কেউ। তেমনি অনেক মহাজন, ডাক্তার, নায়েব বিরাট সম্পত্তির মালিক হলো।

কার্তিক বা কার্তিকের মতো কয়েকজন সোনা যে মূল্যবান ধাতু জানতে পারে। পারে বলেই কিছুদিন আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছিল। পরশ পাথরে অনেক কিছু নাকি বদলায়। সোনার পরশ পেতে না পেতে মনু নদীর মাঝি কার্তিক ত্রিপুরাও বদলাতে থাকে দ্রুততম গতিতে।

লোকজন নিমন্ত্রণ করে মুরগী কেটে শূয়োর কেটে রোজই চলতো মহোৎসব। যে প্রণাম করতো তাকেই উপহার নগদ টাকা বা সোনার টুকরো। ধন দৌলত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও বাড়ে। নতুন আপনজনরা তোষামোদ করার জন্য ভীড় জমায়। বিশাল চুলার উপর মস্ত বড় একটা কড়াইয়ে দিন রাত রান্না চলে। হরিণ, পাঠা, শূয়োর, মুরগী বাদ নেই। যে আসে সেই খায়।

হাঁড়ির পর হাঁড়ি ভাত বসছে। বিরাট কলস ভরে লাঙ্গি মদ। রান্নার লোক, লাকড়ি আনার লোক, মাছ মাংস খুঁজে আনার লোক অভাব নেই। কেউ বলে কার্তিক সাক্ষাত দেবতা। কেউ বলে কার্তিক দয়ার সাগর। কেউ বলে কার্তিকের চেহারা নাকি পার্বতী পুত্র কার্তিকের চেয়েও সুন্দর। উপদেশ পরামর্শ, বুদ্ধি কলা কৌশল শেখানোর জন্য দলে দলে লোক বসে থাকে। কেবল নিরিবিলি একা পেলেই হলো।

উপদেশ আসে জমি কিনে লোকজন দিয়ে চাষ করো। মাঠের আলে ছাতি দিয়ে শুধু দেখাশোনা করবে রোদ বৃষ্টিতে কষ্টের প্রয়োজন নেই। জানই তো জমির উপরে কোন ধন নেই। একসময় মা বাপও ছেলেকে খাওয়ায় না। জমি কিন্তু চিরদিন খাওয়াবে। বেইমানি করবে না। কথায় আছে মাটি ও মায়ের ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না।

কেউ আবার বলে এর চেয়ে ভালো হাতীর ব্যবসা। একটা মাহুতের উপর দায়িত্ব দিয়ে হাতী কিনে দিয়ে দাও, সপ্তায় সপ্তায় ঘরে টাকা আসবে। হাতী কিনলেই তুমি যে বড়লোক, সেই নামডাক ছড়াবে। এক বৎসব ঠিকমতো চালাতে পারলে এক হাতীর রোজগার দিয়ে অন্য বছর একটা কিনতে পারবে।

আসাম আগরতলা রাস্তা শীঘ্রই চালু হবে। এখন ব্যবসা বলতে একটাই। কোনরকম একটা নীলামের গাড়ী যদি আনতে পারো তাহলে এই এলাকার টাকা সব তোমার হাতে আসতে বাধ্য। আগরতলা কৈলাশহরে দেখো না কয়দিনে এক একটা গাড়ী নামিয়ে কত টাকা পাচ্ছে। দালান বাড়ী, জমি সবই হবে।

কেউ আবার বলে তিল, কাপাসের ব্যবসা করো। দাদন লগ্নী আরম্ভ করো। এই লংতরাই পাহাড়ের সবাই তোমার কাছে আসবে। দরকার হলে আমরা তোমার কর্মচারী হয়ে থাকবো। তিল কাপাসের ব্যবসার উপর আর কোন ব্যবসা নেই।

না। ওইসব ব্যবসা এখন চলবে না। আসাম আগরতলা রাস্তা তৈরী হচ্ছে দেখেছো, বাঁশ কাঠের কত চাহিদা। আমরা কামলা খুঁজব, পাহাড় থেকে কাঠ চিরানোর করাতীও আনবো, তুমি শুধু বসে বসে লাভ গুণবে। সপ্তাহের বুধবারে শুধু তোমার কাজ। সেদিন বাজারবার। লোকজন আসবে। বসে বসে শুধু টাকা লেনদেন করা।

শুভাকাঙ্খীদের উপদ্রবে কার্তিক একেবারে দিশেহারা। নৌকার মাঝি কার্তিক ধনদৌলত পেয়ে এত বিড়ম্বনায় পড়বে ধারণা করতে পারেনি। ডাকাতি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সোনা, রূপা, টাকা, নিয়ে যদি ছেড়ে দিতো কোন অসুবিধা ছিল না। ডাকাতরা এসে চূড়ান্ত অত্যাচার করলো একবার। বাঁচবে কোন আশা ছিল না। জ্বলন্ত লাকড়ি দিয়ে পিছমোড়া বেঁধে পিঠে সেঁকা দিয়ে গুপ্তধনের ঠিকানা খোঁজে। কোনরকম সহ্য করে। লোহার সূঁচ লাল করে নখের ভিতরে

ঢুকিয়ে যখন দেয়, তখন বাধ্য হয়ে ঘরের কোণে কলা গাছের নীচে এক ছোট্ট মাটির কলস দেখিয়ে সেই যাত্রা বেঁচে যায়।

বাঁচলে কি হবে। অন্য ফাঁদ আগেই পেতে রাখে রতন রোয়াজা। ওর এক ভাইয়ের মেয়ে দেখতে শুনতে ভালো। কার্তিকের আগের সংসারের বৌ জীবিত। ছেলে মেয়েও আছে। থাকলে কি হবে। রতনের ভাইঝি কার্তিককে দেখে কত রঙে গান গায়। চোখের চাউনিতে আয় আয় ধরণের ছলাকলা। ডাকাতদের মারধোরে যখন খুব আহত, যেচে যেচে কত সেবা যত্ন সেবা যত্নের জন্য পয়সা থাকলে লোকের অভাব নেই। তবু রতন ভাইঝির সেবা যত্ন সবার আলাদা কেন জানি। কার্তিকের আগের বৌকে দিদি ডাকতো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা সম্পর্কও আছে। রতন ভাইঝি কুমই বলে ডাকে। কুমই হলো জামাইবাবু।

কুমই এতো বিপদে। রাতা মুরগীর কলিজা, কয়েক বোতল মাইমি চালের মদ, এক কান্দি সপৃকলা নিয়ে উঠল কুমইকে দেখতে। কুমই খুব বেশী। রতন ভাইঝির আরেক নাম খুচাকতি। যার মানে ঠোঁট বুলবুলির লেজের মতো লাল। খুচাকতির যৌবনে তখন পাহাড়ী নদীর মতো ঢল। চলতে ফিরতে চারদিক আলো করে। কুমইকে গা টিপে দেয়। গরম জলে ঘা মুছে দেয়। আরো কত ঢঙে সেবা। তার উপর সবসময় সেজে গুজে থাকে। গলায় ভরা সিকি আধুলির মালা। লাল ঠোঁটে খল খলে হাসতে গিয়ে সারা দেহ দোলে। কার্তিকের তখন চোখে মুখে ঘোর লাগায়। রাশি রাশি সোনা তার হাতে। খুচাকতি তখন সেই সোনার চেয়েও উজ্জ্বল লাগতো।

কার্তিক তাকে জিজ্ঞেস করে কি পেলে খুশী হবে। খুচাকতি উত্তর দিয়েছিল ঘুরিয়ে প্রবাদ বচন টেনে। ঈশ্বর আমার কপালটা দিয়েছে কুকুরের আর জিভটা রাজার। অর্থাৎ কপালে জুটবে আমার কোন গরীব জুমিয়া অথচ ইচ্ছে আমার রাজার রাণী হতে। সোনা রূপার দরকার নেই। তোমাকে পেলেই হলো। প্রেম করার সময় সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর বাছাই করা কথা বলা সব জাতির সব প্রেমিকার ধর্ম। কার্তিক অভিজ্ঞ লোক। তবু ভুলে যায় ছলা কলায়ভরা কথা শোনে। নিজেকে সঁপে দেয় খুচাকতির প্রেমে।

পাড়া পড়শীরা আবার অন্যরকম কথাও বলে। কার্তিকের প্রথম বৌ নাকি প্রায়ই অসুখ বিসুখে ভোগে। দাম্পত্য জীবন সেই কারণে বিষিয়ে উঠেছে। আবার কারো মতে রতন রোয়াজা কার্তিকের সম্পত্তি লুটপাট করার জন্য ডাকাতি করিয়েছে, ভাইঝি খুচাকতিকেও লেলিয়ে দিয়েছে।

প্রথম বৌ নাকি তোলা তোলা সোনা লুকিয়ে লুকিয়ে বাপের বাড়ী চালান দিতো। অসুখ বিসুখের কথা একবারে বানানো। যে কারণেই হোক প্রথম বৌ-এর সাথে খুব একটা বনিবনা ছিল না।

লোকে বলে প্রতিবেশী পাড়ার সর্দার রতন রোয়াজা সেই সুযোগ গ্রহণ করে। খুচাকতিকে সেই পাঠায় কার্তিককে প্রেমের ফাঁদে ধরতে। সেই ফাঁদ পাতার জমিও তৈরী হয় দুঃসাহসিক ডাকাত দল পাঠিয়ে।

আরোগ্য হলেও কার্তিক খুচাকতিকে যেতে দেয় না। অসুখের ভান করে দিনরাত শুয়ে থাকে। হাতে রূপার বালা চুরি ঝমর ঝমর বাজিয়ে গলার সিকি আধুলির মালায় টুং টাং শব্দের ঝঙ্কারে বোতল থেকে কলকলিয়ে মদ ঢাললে কার্তিকের বুকের কোন নরম জায়গায় দুর্বোধ্য এক

মধুময় অনুভূতি খামচে ধরতো। খুচাকতির রূপে যখন এমনিভাবে ডুবে। খুচাকতি বিচলিত বোধ করে দিনরাত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বলে—এইখানে থাকলে আরো বিপদ হবে। চলো যাই আমাদের পাড়ায়।

কার্তিকের দ্বিধা ছিল। তবু গররাজী হওয়ার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলে। কার্তিকের আগের বৌ শুকিয়ে কাঠ। যৌবনের উচ্ছ্বাস নেই। মরা নদীর মতো সবকিছু থমকানো হলেও স্বামীর উপর একচেটিয়া ভালোবাসার অধিকারকে হারাতে চায়। চায় না বলেই দিনরাত প্যান প্যান করতো। কার্তিক মদে বিভোর। খুচাকতি ওই নেশাভরা চোখের সামনে আকাশ থেকে খসে পড়া এক পরী। পরীর কথায় কার্তিক বউ পিটতো। চুলের মুঠী ধরে অসুর মূর্তি ধরে বন বন ঘুরিয়ে নিজের পুরুষত্ব জাহির করতো। অশান্তি দিন দিন বাড়ে।

একদিন কার্তিক খুচাকতিকে নিয়ে একেবারে মা বাপের ভিটে ছেড়ে চলে এলো রতন রোয়াজা পাড়ায়। সেখানে আবার নতুন ধাঁচের বিড়ম্বনা। বাজার থেকে কাছেই রতন রোয়াজা পাড়া। প্রায়ই বাজারে যায়। হরি সাহার দোকানে বসে রোজ। হরি সাহা তাকে জামাই বলে ডাকে। দোকানে বসলেই কেটলী ভরে মদ, থালা ভরে মাংস। বিরাট মিরতিঙ্গা বাঁশের হুঁকোতে সাজানো তামাক। এত আদর আপ্যায়ন কার্তিক প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলো।

কোন সময়েই সুস্থ থাকে না। ঢুলু ঢুলু চোখে, পায়ে বেসামাল পদক্ষেপ। যে যায় তাকেই এক টুক রা সোনা। নতুবা কড়কড়ে নোট। হরি সাহা তাকে চালায়। তোমার সোনাদানা তোমার কাছেই থাক। তবে ওজনের দায়িত্ব আমিই নেব। নেশার ঘোরে রাজীও হয়। রোজ সকালে হরির গদীতে যাওয়ার সময় পকেটে পুরে সোনার চাকা থাকে। হরি সাহা নিক্তিতে রতি পাথরে ওজন করে। এক রতির জায়গায় এক তুলা ওজন করে। বাকী সোনা নিজের পকেটে রাখে। হরি সাহা রাতারাতি বিরাট বড়লোক হয়ে গেল শুধু সোনা ওজন করে।

কার্তিককে হরি হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে, বসে বসে খেলে রাজার ধনও ফুরায়। কাজেই ভূসি মালের ব্যবসায় নামো। আমি তোমার কর্মচারী হবো। হরির কথায় রাজী হয় কার্তিক। ধুমাছড়া বাজারে দোকান খোলে। কার্তিকের টাকায় মাল কিনতে যায় হরি শহরে। সব টাকা মেরে নিজের মাল আনে। কার্তিকের জন্যও আনে। তবে নামমাত্র।

কার্তিক তখন রাজা। বিরাট লম্বা একটা লঙ্গরখানা খোলে ধুমাছড়া বাজারে। দিনরাত মানুষ খাওয়ায়। হরি লুঠের মেলা চলে। শূয়োর, পাঁঠা, মুরগী দিয়ে প্রতিবেলা ভোজ। কেউ এসে বলে পিসতুত ভায়ের শালা বছরটা চলবে কেমন করে এক মুঠি ধান জুমে পায়নি। সব বুনো হাতী খেয়ে ফেলেছে। কার্তিক না বলে না। সোনা একটা কিছু দেবেই। নতুন দোকান হরি সাহার হাতেই চলে যায়। কার্তিক থাকে লঙ্গরখানার জনসেবায়।

কেউ এসে বলে — কার্তিক স্বপ্নে দেখেছি, লংতরাই দেবতা তোমার উপর রুষ্ট। একটা পূজো দিয়ে দোষ কাটাতে হবে। কোন কথা নেই। সব মঞ্জুর। ভিন দেশ থেকে দলে দলে লোক যায় সোনা কিনতে। হেমেন ঠাকুর মাউমনু থেকে এলো। অতি চালাক চতুর লোক। উপরে কয়েকটা দশ টাকার নোট নীচে কয়েকটা দশ টাকার নোট। ব্যস হাজার টাকার বান্ডেল। গিয়েই বলে কয়েক ভরি সোনা চাই। গুণে দেখার সুযোগ নেই। চারদিকে সজাগ অনেক চোখ। পকেট থেকে কয়েক

চাকা সোনা বের করে দেয়। এমনি ধারায় চলছে প্রতিদিন প্রবঞ্চনা।

কুমারঘাটে গিল কোম্পানীর বিরাট ক্যাম্প। আসাম আগরতলা রাস্তার কাজে এসেছে পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে বক্তিয়ার সিং গিল ও তার ছোট ভাই নচওর সিং গিল। দু'ভাই মিলে কোম্পানী চালায়। রোড রোলার থেকে পাথর ওড়ানোর যন্ত্র সবই ছিল। পনের বিশটা গাড়ী। ওদের এক বিশ্বস্ত ত্রিপুরী শ্রমিক একটা ছাই রঙা চার কোণা পাথর নিয়ে তাদের দেখায় আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য দামে সেই পাথর কিনে দু'ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুমাছড়ার পাহাড়ে কাঁচা সোনা সংগ্রহের অভিযানে । কার্তিকের কাছে এসে ধুতি, জামা, বিলাতী মদের উপহার দিয়ে সোনা কেনার আবেদন জানায়। লোকের বিশ্বাস বেশ কয়েক সের সোনা গিল ভায়েরা দেশে নিয়ে গেছে। জলন্ধরে বক্তিয়ার সিং গিলের একমাত্র ছেলে নাকি দুর্ঘটনায় মরে। জনরব ওঠে উপজাতি ঠকানোর পাপের ফলেই এত সর্বনাশ।

কার্তিক তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। বলরাম, জাংথুম, মাতকরায়, জামিরছড়া, ময়নামা সর্বত্র। বন্ধু পাতায়, সই পাতায় সোনাদানা, কাঁচা টাকা দান করে। শেষ বেলায় ছোট বৌ খুচাকতিকে সঙ্গে করে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ তীর্থ করতে যায়। ফিরে এসে বাজারের পাশে একটা ছন বাঁশের মন্দির স্থাপনও করে। বদ্ধ পাগলের মতো গাঁজা খায় দিনরাত। সঙ্গে মদও চলে। ছোট বৌয়ের ঘরে সন্তান হলো না। বৌ তাকে ছেড়ে এখন উত্তর লংতরাই রূপমোহন পাড়াতে উপেন্দ্র ত্রিপুরার বৌ হয়ে নতুন সংসার পাতে।

কার্তিক এখন নিঃস্ব। দেবতার ধন পেয়েছিল তবু ভোগের চূড়ান্ত অধিকার পায়নি। পৃথিবীর বিলাসিতার চূড়ান্ত শিখর দেখতে দেখতেই কখন ধপাস করে সবার অলক্ষে পড়ে গেছে কেউ জানে না। সে এখন কোথায় থাকে সঠিক বলতে পারে না। চুল দাঁড়ি রেখে পাহাড়ে পাহাড়ে ভিক্ষে করে। কয়দিন আগে অরুণ ত্রিপুরা পাড়ায় পৌষ মাসে এসেছিল। চোখের নজর কমে গেছে। হাত পা থরো থরো কাঁপিয়ে এক করুণ দৃষ্টিতে সিলভারের দুমড়ানো লোটায় এক এক মুঠ চাল খোঁজে। নিষ্পাপ অরণ্য সন্তান, সোনার পাহাড় মাথায় এলেও শতাব্দী ধরে যে ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে সে ঘুম ভাঙুক, তারা জেগে উঠুক, অগ্রসরতম মানুষেরা যদি তা না চায়, হাজার কার্তিক যুগে যুগে পথে পথে এমন করেই ঘুরবে।

তখাপাড়ার ইতিকথা

শাখান পাহাড়ের কোন এক হাঁটুর ভাঁজ থেকে কলকলিয়ে ছোট একটা জলের ধারা পূব থেকে পাহাড়, পাথর, গাছ-গাছালির ছায়া ও শিকড়ে চুমু খেয়ে নাচতে নাচতে নেমে গেছে পশ্চিমে। পাহাড়ের হাঁটু থেকে বেরিয়ে এলেও কেউ তার নাম জাহ্নবী রাখেনি।

আঞ্চলিক নাম 'মসাতুইসা'। মানে বাঘাইছড়া। শীতকালে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। হাঁটুর সমান গভীর জল। তবু নীল ঢেউ-এর ঘুঙুর থামে না। কবেকার কোন ধূসর অতীতে বাঘের বাসা ছিল কারো মনে নেই। আরো দশটা বন-বাদাড়ের মতোই এখানেও কালেভদ্রে হরিণ, ভালুকের হাড়গোড় কঙ্কাল মিলে। বর্ষায় এই পাহাড়ী ছড়া উন্মাদিনীর মতো তাণ্ডব নেচে নেচে চলে। তখনকার ঐ ক্ষুব্ধ চেহারা বড় ভয়ঙ্কর।

ছড়ার পাড়ে পাড়ে জারুল, চালতা, বনসুপারীর ঘনবন। লুঙ্গায় আবার জ্যালিবেতের ধারালো কাটায় ভরা ঝোপ-ঝাড়। উপত্যকা জুড়ে গামাইর, শিমূল, গর্জন, চামল, আউল বা রঙ্গি, রাতা। গাছের গলাগলি দেওয়া সবুজ চাদর জড়িয়ে পাহাড়টা উঠে গেছে পুবের দিকে; পিক্ পিক্, পিউ, পিউ চেনা-অচেনা পাখীর কোলাহল। ছড়া থেকে উঠেই উত্তরে দুপায়া পদরেখা। কোথাও চিহ্ন আছে কোথাও লতাপাতার ঝোপ-ঝাড়ে হারানো। পথের মধ্যে কোথাও নুয়ে পড়া বাঁশ-কাটার দাগ। তাতেই পথের দিশা। টিলায় টিলায় রুপই, মুলি, মিরতিঙ্গা, বাঁশের চাদর দোলে। বাঁশবনের নীচে স্যাঁতস্যাঁতে পাতা-পচা মাটি। মাটির কুণ্ডলী পাকিয়ে দাঁড়ানো কেঁচোর বাসা। কোথাও বাঁশ ঝাড়ের কোটরে উইপোকার ঢিবি। মথুরা পাখী এই নির্জনে বাসা বাঁধে; কেঁচো খুঁড়ে-খুঁড়ে খায়। মাঝেমধ্যে উড়ো জাহাজের মতো অদ্ভুত গর্জনে নিস্তব্ধতার পর্দা ছিঁড়ে বন কাঁপায়।

ছানা নিয়ে দল বেঁধে বন মুরগী গলা বাড়িয়ে বন কাঁপিয়ে আড়ালে আড়ালে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে খাবার খোঁজে। কোথাও আবার ঝি-ঝি পোকার গান। ঝি ঝি না না! ঝি ঝি না না! সুর। গাছ পাতার ছাকনিতে ছাকা রোদের ঝিলিমিলি খেলা।

পার হয়ে যেতে যেতে আরও উঁচুতে উঠলেই জনপদের এক মৃদু স্পন্দন। গৃহপালিত কুকুরের ডাক। মুরগীর কাক্রো কক্! কক্! কখনো দুউক দুই উক্ গাইলসিয়ার ধান ভাঙ্গার ধ্বনি কোনো পাহাড়ী বউয়ের বুক ভাঙ্গা ব্যথার মতো বাজে। কখনো আনমনা যুবতীর তুলা ধুনতে ধুনতে গাওয়া কাঁপানো গলার দীর্ঘ গানের কলি। এরই মাঝে লাজুক বউয়ের কোমল কোমল আওয়াজ দিয়ে শূয়োর ডাকার মিষ্টি সুর। মালা আ! আ! আ! বন থেকে বনে ভেসে বেড়ায়। কারো উঠোনে কাঠের গামলা বানানো জুমিয়ার কুঠারের ঠুকঠাক্। পিঠে শিশু বেঁধে বালিকাদের দাপাদাপি। বাঁশের হুকোয় তামাক টানতে টানতে দম আটকানো বুড়োর কাশির খুউক! খুউক! খুউ-উউক।

পাচুয়া মদের গন্ধে নেশা ধরা বাতাস এই উঠোন থেকে সেই উঠোনে টালমাটাল পায়ে ঘোরে। কারো কারো উনুন থেকে রান্নার ধোঁয়ার কুন্ডলী নির্জন আকাশে ধেয়ে চলে। অনেক দূর থেকেই জানিয়ে দেয় এখানে একটি জনপদ বেঁচে আছে। কিন্তু বড় নিঃশব্দে, নীরবে।

যদিও পৃথিবীর মাঠ পাহাড়, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি সব জায়গাতেই জরীপ শেষ। কিন্তু

কোনদিন কোন আমীনবাবুকে দূরবীন, শিকল বা লোকলস্কর নিয়ে এই জনপদে কেউ উঠতে দেখেনি। সারাদেশে কয়েকটা আদমসুমারীও সমাপ্ত। তবুও এই জনপদের বেঁটে-খাঁটো, চোখ ছোট, সহজ সরল ইষৎ পীতবর্ণের মানুষগুলোর হিসেব সরকারী খাতায় বহুদিন স্থান পায়নি। আজকাল অবশ্য রাজস্ব দপ্তরের জমিতে, জরীপ বিভাগের মানচিত্রে বা বনদপ্তরের ভাটিয়াল কাটার খাতায় নতুবা পঞ্চায়েত সচিবের তালিকায় এই জনপদের উল্লেখ থাকলেও থাকতে পারে। বর্তমানে এই গ্রামের নাম তখাপাড়া।

আগে তখাপাড়া নাম ছিল না। গোটা গ্রামটায় দুটো পাড়া। মাঝখানে বাঘাই ছড়া। উত্তরের টিলায় রিয়াং উপজাতিদের বাস। দক্ষিণের টিলায় আসলং উপজাতিদের পাড়া। আসলংরা মূলতঃ ত্রিপুরী উপজাতিদের একটি শাখা।

যে পাড়ায় যখন যে সর্দ্দার থাকে সেই পাড়ার নামও ততদিন সর্দারের নামেই পরিচিত হয়। রিয়াং পাড়ার আগের সর্দারের নাম রধ্যমুনি। লোকে ডাকত, রধিয়া মুনি। তাই পাড়ার নামও রধিয়ামুনি চৌধুরী পাড়া। রধিয়া মুনির পরে সর্দার হলো কর্ণমুনি। তারপরে সপ্তরাম চৌধুরী। এখন সপ্তরাম চৌধুরী পাড়া নামেই পরিচিত। সপ্তরায়কে কেউ সপ্তরাই বলে, কেউ ডাকে সপ্তরাম।

অন্যদিকে আসলংদের পাড়ার পুরনো নাম ছিল অঙ্গদ রোয়াজা পাড়া। রোয়াজা মানে সর্দার। ক্ষুদ্র এই জনপদে রোয়াজা রাজার মতই সম্মানিত। বিচার আচারের মালিক। গ্রামের ভালমন্দ দেখার চূড়ান্ত অধিকারী। কোনদিকে কোন পাহাড়ে জুমচাষ করতে যাবে গ্রামের লোক, রোয়াজার নির্দেশেই ঠিক হয়। রোয়াজার পদ বংশানুক্রমিক নয়। রোয়াজা বৃদ্ধ হলে বা মারা গেলে গ্রামের লোকেরা নতুন রোয়াজা নির্বাচন করে। অঙ্গদ- রোয়াজাকে গ্রামের লোকেরা হারিয়াকা বলেও ডাকতো। বুড়ো বয়সে হারিয়াকা চলে গেল নাতিন মনু। তখন নতুন রোয়াজা নির্বাচিত হলো নীল-ফা। নীলফার বুদ্ধি, শক্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলেও কোন ছেলে সন্তান ছিল না, মাত্র তিনটি কন্যা। নীল-ফা বিচক্ষণ, দূরদর্শী, প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টায় সবসময় ব্যস্ত। বড় মেয়ের নাম নিলিরুং। বিয়ে হয়েছে থালছড়ায়। লোকে ডাকে নিলিফা বা নীলো-ফা। নীলোফার আধিপত্য চারিদিকে বিস্তার হোক, এটা সে চাইতো। কিন্তু পাশের রিয়ার সর্দার কর্ণমুনি কেমন যেন আলাদা আলাদা। নিজের রিয়াং গোষ্ঠিকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে থাকে। বাইরের কাউকে নিজ পাড়ার ব্যাপারে মাথা গলানোর সুযোগ দেয় না। তার উপর অহংকারী। নিজের লোকজন কম। তবু কারো কাছে মাথা নত করতে চায় না। কারো উপর নির্ভরশীল হওয়াও অপমান-জনক মনে করে। সীমানা ক্ষুদ্র হোক, তবু সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রভুত্ব বজায় রেখে চলতে চায়। অহংকারী কর্ণমুনিকে নীল - ফা কোনদিন বশে আনতে পারল না। প্রায়ই জুমের সীমানা বা জীবজন্তু শিকারের বনভূমির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে কলহ বিবাদ লেগেই থাকে।

সুদূর চট্টগ্রামের পাহাড় থেকে এসেছিলো নীলো-ফা শাখান পাহাড়ে। এমনিতেই এক এক পাহাড়ে বেশী বছর থাকে না। পনের-বিশবার জুম করলে অন্য পাহাড়ের সন্ধানে ছুটে চলা বা উর্বরতর উপত্যকায় নতুন বসতি করা রিয়াং-হোক, ত্রিপুরী হোক বা হালাম হোক, মোটামুটি প্রায় সব পাহাড়বাসীদের রীতি।

যে পাহাড়ে যত বেশী পুরনো বাঁশবন, সেই বনে ততবেশী ফসলের সম্ভাবনা। তাছাড়া রোগ, শোক, মহামারী অথবা অপদেবতার দৃষ্টি এগুলোর ভয়েও পাড়া ছাড়ে। কখনো আবার

পাড়া বড় বলে পাড়া ছেড়ে আলাদা একটি দলে কয়েক পরিবার নিয়ে নতুন পাহাড়ে ছোটে। নতুন পাড়ায় নতুন রোয়াজা বা সর্দার নির্বাচন হয়। সঙ্গে থাকে নতুন পুরোহিত বা 'অচাই'। সেই পাড়াকে বলিষ্ঠ করতে বা সমৃদ্ধ করতে অন্য পাড়া থেকে লোক ফুঁসলিয়ে ফাসলিয়ে, ভাঙিয়ে নিয়ে আসা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই নীলোফা পাড়াতেই থাকে নয়ানসিং তয়াং সিং দুই ভাই। যদুরামের ছেলে। দুইভায়ের মধ্যে চেহারায় চরিত্রে আচরণে দারুণ অমিল। নয়ানসিং কৃপণ, স্বার্থপর। নিজের না থাকলে কোন কিছুরই ধার ধারে না। অতিথি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এসে বিড়ম্বনা করুক এটা চায়না। চায় না বলে কারো বাড়ীতেও যায় না। অবশ্য অবস্থা স্বচ্ছল। খোরাক চলার পরেও বছর বছর বাড়তি ফসল বিক্রি করে। টাকা লগ্নী করে গরীবদের মধ্যে চড়া সুদে ধার দেয়। ঘুঘুর মতো খুঁটে খুঁটে খায়। কালে ভদ্রে কোন অতিথি এলে কপাল কুঁচকে থাকে। রান্নার আগে এলে খাবার পায়। রান্না চাপানোর পর যেই আসুক না কেন উপোস থাকতে হয়। কেউ খেতে বসলে একটা ভাত - ও যাতে না পড়ে সে জন্য কম দিতো। যদিও একটা-দুটো ভাত পড়ে তবে মনি-মুক্তার মতো মেঝে থেকে তুলে তুলে শুয়োর মুরগীকে খাওয়াতো। একটা সুতো কেউ কিছুক্ষণের জন্য ধার চাইতে এলে সোজা বলে নেই। গ্রামে পায়খানা ঘর থাকে না। জঙ্গলেই মলত্যাগ করা রীতি। পাড়ায় শুয়োর বিষ্ঠা-আবর্জনা খায়। নয়ান সিং -এর বেলায় অলাদা কথা। নিজের বিষ্ঠা অন্য বাড়ীর শূয়োরকে খেতে দেয় না। নিজের শূয়োর ডেকে খুঁজে নিজের বিষ্ঠা খাওয়ায়। কেউ কর্জ চাইতে এলে মদের বোতল দেওয়া রীতি। মদ গ্রহণ করলে বুঝা যায় ঋণ পাওয়া যাবে। নয়ান সিং কারো মদ গ্রহণ করে না। আসলের দেড়গুন সুদ সাব্যস্ত হলে তবেই মদের বোতল গ্রহণ করে।

অন্যদিকে তয়াং সিং সহজ সরল। সঞ্চয় দূরে থাক। কোনটা পাঁচটাকা, কোনটা দশটাকা ভালো করে চিনে না। বয়স জিজ্ঞেসে করলে কোন ছড়ার মাথায় কতবার জুম করেছে, টীলায় বা উপত্যকায় জুম করেছে, এক একটা স্মরণ করে, গুনে, বয়েস হিসাব করা প্রতিটি পাহাড়ীবাসীর রীতি। তয়াং সিং জীবনে কোনদিনই ধারাবাহিক স্মরণ করতে পারে না। অতি বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়া বা তুফানে ঘরবাড়ী ধ্বংস করার এক দুটা বছর মনে আছে। তয়াং সিং মাঝে মধ্যে অচাই বা বৈদ্যের কাজ করে। দিন-রাত আত্মীয়স্বজন নিয়ে মশগুল থাকে। ঘরের চাল অছে বা না আছে কি জানি। কিন্তু চুলোর উপর বাঁশের শিকে হেজা, শূয়োর, হরিণ এমন কি হাতীর মাংস পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে। মাংস ছাড়া একবেলাও খেতে পারে না। ঝাল, নুন, টক, তেতো স্বাদ-বিস্বাদের ধার ধারে না। খাওয়ার পাতে ভাতের চূড়া উঁচু হলেই হলো। শুধু সঙ্গে চাই আগুনে ঝলসানো যে কোন মাংসের টুকরো। দুই-ভাই দুই চরিত্রের। লোকে ঠাট্টা করে বলে, কতর সিকাম, সেটে ওয়ান জুই। মানে বড়জন লুসাই, ছোট জন বাঙালী।

তয়াং রায়ের তিন ছেলে। মালিচান, মালিরায়, থাকসারায়। একমাত্র মেয়ে বিপশ্রী। বিয়ে দিয়েছে গ্রামেই স্বরকুমারের কাছে। মালিচান, থাকসারায় খুবই কর্মঠ। দিনরাত সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মালিরায় কর্মঠ হলেও আলাদা ধরনের। সংসারের ধার ধারে না। শিকার তার নেশা। গ্রাম, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব এসব নিয়েই দিন কাটে। বাকী দুভাই বাড়ীর সব কাজকর্ম কুলিয়ে নেয় বলেই সে নিশ্চিন্তে দশের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পায়।

ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ শক্তিশালী আর সাহসী। খাড়া পাহাড় দৌড়ে দৌড়ে উঠতে

পারতো। ময়না, তয়ুং পাখীর ছানা পাড়তে দুঃসাহসে উঠে যেতো উঁচু গর্জন গাছের মগডালে। দু-হাতে যদিও গাছের বের পায় না। গোলাকার রিং বানাতো দড়ি দিয়ে । বড় গাছে দড়ির রিং বানাতো সিঁড়ি বানাতে বানাতে উঠে যেতো আকাশ ছোঁয়া গাছে। ওইসব পাখীর বাসায় কখনো কখনো লম্বা লম্বা খাকি রঙের সাপ থাকে। পাখীর ছানা খেয়ে পেট ভরে কুন্ডলী পাকিয়ে ঠোঁট মেলে বসে থাকে ওই সব সাপ। ময়না আর ময়না - বৌ যখন বাইরে থেকে আঁধার এনে কোটরের মুখে আসে। খাকি সাপ তখন হাঁ - করে মুখ এগিয়ে দেয়। ময়না দম্পতি তখন ছানা ভেবে সাপের মুখেই আঁধার গুঁজে দিয়ে আবার উড়ে যায় খাবার খুঁজতে । ওই ধরনের খাকি সাপ ধরে বনবন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজা পেতো মালিরায়। পাহাড়ে বাঁশবনে বুনোবিছা থাকে। কচি বাঁশে বিছার কামড় লাগলে ছিদ্র হয়ে যেতো । সেই ছিদ্র পথে কি করে যে ওই খাকি সাপ ঢুকতো বলা কঠিন। মালিরায় বিছার কামড় খাওয়া ওইসব বাঁশ কেটে সাপ বের করতো। ঘোরাতো লেজ ধরে। কখনো দোক্তা পাতা সুপারীর সাথে চিবিয়ে পানের পিক সাপের হা - করা মুখে পিচকারীর মতো ঢেলে দিতো। সাপ ছট-ফট করে নিমেষে এদিক-ওদিক পেশী পাকিয়ে দলিয়ে মরে যেতো। এতেই তার কত উল্লাস। লম্বা বাঁশের আগায় চিকন দড়ি দিয়ে গিরগিটি ধরার ফাঁদ পাততো। কখনো ওর নিত্য সঙ্গী রিজাবমুনি, মায়ারায়, থাইথাকমুনি ওদের নিয়ে যেতো গহন জঙ্গলে, তরকাকমা পাখীর খোঁজ। গল্পে শুনেছে, তরকাকমা পাখী নাকি ধনকুবের। ওদের বাসায় মনিমুক্তা, সোনার হার, দামী দামী পাথর থাকে। তরকাকমা পাখী ধন-দৌলত ধার দেয়। সুদ নেয়। বন্ধক রাখা ওদের কারবার। শোধ করতে না পারলে সন্তান পর্যন্ত কেড়ে রাখে। বিশেষ করে ঘুঘু হলো সবচেয়ে গরীব পাখী। কিন্তু ওদের প্রেমের তুলনা হয় না। একটা শষ্য দানাও যদি পায়, প্রেমিক ও প্রেমিকা মিলে ভাগ করে খায়। সারা জীবন বিভোর থাকে প্রেমেই । ভবিষ্যত চিন্তা বলে কিছু নেই । ঝাঁক বেঁধে তিল শষ্য যা পায় তাই খায়। ঘুঘুর বাসায় সঞ্চয় বলে একটা দানাও থাকে না। শ্রাবণ-ভাদ্রে দিনরাত বৃষ্টি পড়ে। মাঠ, জুমে ফসলও পাকে না। দিনের পর দিন উপোস থাকে। তখনই ওরা যায় তরকাকমা পাখীর কাছে বাচ্চা বন্ধক দিতে।

ছাইরঙের মথুরার মতো দেখতে। মুখটা পেঁচার মতো। হাতের নখ ধারালো। মাংসভোজী। মাকড়সা, ব্যাঙ, কীট তীক্ষ্ণ নখে খামচে ধরে নিয়ে যায়। বৃষ্টির জল লাগতে পারে না এমন কোঠরে বাসা বাধে । ওদের বাসায় রং বেরঙের পাথর যেমন থাকে, তেমনি শষ্যদানাও থাকে। বড় সঞ্চয়ী পাখী। ঘুঘু যায় ওদের বাসায় বৃষ্টি মরসুমে শষ্য খুঁজতে । তরকাকমা তখন ঘুঘুর ছানা ছো মারতে যায়।

যখন জুম ও মাঠ ফসলে ভরে যায়, ঘুঘু দম্পতি গাছের ডালে বসে কাঁদে সারা দুপুর। এত ভালো ফসল। বাচ্চারা থাকলে কত খেতে পারতো। মালিরায় গল্প শুনে তরকাকমা পাখীর বাসা খুঁজতো গাছের কোঠরে কোঠরে। মণিমুক্তা পায়নি। তবে অনেক রঙ-বেরঙের পালক, ছড়ার পাথর নুড়ি, অনেক কিছু পেয়েছিল।

মালিরায় লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। ইস্কুল, লেখাপাড়া দুঃস্বপ্নের চেয়েও তখন অলীক। সারা পাহাড়ে এক থেকে এক নাগাড়ে একশো পর্যন্ত গুনতে পারা লোক দু-তিনজন ছিল কিনা সন্দেহ। শুধু তিল কার্পাসের হিসাব জানার জন্য বন্ধুদের নিয়ে সপ্তাহের প্রত্যেক হাটবারে নামতো হাটে। দস্তখত করতে না জানলেও লাগবে জুমের হিসাব, কোন জুমে কত বীজ ধান লাগবে। ঋণ

দাদন আনলে কার কত সুদ শোধ করতে হবে। তিল কাপাস, তুলা, ধান, পাট সব জুমের ফসলের হিসেব মুখে মুখে মিলিয়ে দিতো। মালিরায় মাঝে মধ্যে সময় পেলেই যেতো মেরগোচানের সঙ্গে। শিখতো হাতী শিকার। বুনো পাগলাহাতী পর্যন্ত শিকার করতে ভয় পায় না। মেরগোচান ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কানের নীচে, অথবা মাথার কপালের উপর অংশে গর্তো মতো যে জায়গাটা আছে সেখানে নিশানা করে গুলি করলে যত দুর্দান্ত হাতীই হোক না কেন নড়তে পারবে না। প্রচন্ড চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। মালিরায় মেরগোচানের কাছেই জেনেছিলো বনের এক ধরনের পাতা আছে। টক জাতীয়। ওই পাতা চোঙায় ঢুকিয়ে সেদ্ধ করলে যে রস তৈরী হয়, মরা হাতীর দাঁতের গোড়ায় ওই রস ঢেলে দিয়ে এক রাত রাখলে যত বড় দাঁতই হোক না কেন পরদিন একটু নাড়া দিলে খুলে আসে । মালিরায় ওই হাড়, দাঁত নিয়ে বেঁচতো গোবিন্দ পাড়ায়, জারমনি ত্রিপুরার কাছে । জারমনি ত্রিপুরা রসে ভিজিয়ে হাঁটুর হাড়, দাঁত নরম করাতে কেটে আংটি বানায়, বালা বানায়, বেঁচে । ত্রিপুরী মেয়ে, চাকমা মেয়েদের কাছে ওই হাড়ের অলংকার খুব প্রিয়। তবে ত্রিপুরীদের মধ্যে যারা কেওয়া গোষ্ঠির লোক মানিকপুর, গন্ডাছড়া এলাকায় থাকে ওরাই বেশী পছন্দ করে এই অলংকার ।

কাঁধে বন্দুক ফেলে উপত্যকায়, ছড়ায়, পাহাড়ে দিনরাত বেড়ানো মালিরায়ের নেশা। পাহাড় অঞ্চলে দা- কুড়াল কোদালের মতো বন্দুক রাখতে বাধানিষেধ ছিল না। রাজার আমল। অনুমতিপত্রসহ বন্দুক কেনাবেচা হতো । বিশেষ করে গ্রামের রোয়াজা, চৌধুরী হলে-তো কোন কথাই নেই। সরকারী বন্দুক নামমাত্র দামে মঞ্জুর হতো। ডাকাত বা বন্যজন্তুর উপদ্রব থেকে গ্রাম রক্ষার অজুহাতে কার্টিজ বন্দুক, দো-নলা, কেপদার, অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আসতো রোয়াজাদের ঘরে। রোয়াজাদের দায়িত্ব ছিল গ্রামে তহশীলদার গেলে রাজার খাজনা আদায় করে দেওয়া। কুমড়া, চাল, তিল, ধান খারা ভরে জমা করতো রোয়াজার বাড়ী। তহশীল বা দারোগাবাবুর বাড়ীতে পাঠাতে তহশীল বা দারোগাবাবুর খাওয়ার জন্য মদ, শুয়োর, মুরগী সবই দিতো গ্রামবাসীরা। চারভাগের একভাগ আনতো তহশীলদার বাকী তিন ভাগের মালিক হতো রোয়াজা। আইন-কানুন রক্ষা, সমাজের অনুশাসন চালানো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ যাতে কেউ করতে না পারে, সেই স্বার্থেই বন্দুক দিতো রাজারা। তাছাড়া গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কলহ, বিবাদ, মারামারি প্রতিদিনের ঘটনা।

রাজার অনুগ্রহ যারা পেত না তারাও বন্দুক যোগাড় করতো। শাখান পাহাড়ের চূড়ায় সাবওয়াল, তালাকসি, বেলিয়ানচিপ্, মনপুই গ্রামে লুসাইরা থাকে। ওরা ভাল বন্দুক বানায় । বেঁচে। ওদের কাছ থেকে বন্দুক কিনতো লোকে। তা ছাড়া প্রতি মহকুমাতে রাজার অনুমতি নিয়ে বন্দুক কারিগরও ছিল। চিটাগাঙ, কুমিল্লা, করিমগঞ্জ থেকে আনতো বারুদ তৈরীর সোহাগা, গন্ধক, লোহার নল। কোন দোকানে এইসব সরঞ্জাম সস্তা ছিল তা জানা ছিল মালিরায়ের । বন্দুক বানানোর হাপড়, লোহা কাটার করাত, ফুটো করার যন্ত্র, লোহার পাত, ছাতার শিক দিয়ে স্প্রিং সবই মজুত ছিল মালিরায়ের ঘরে। এই সবের জন্যই যুবকরা আকৃষ্ট হতো বেশী। একবার মালিরায়ের বাপ কাশী, গয়া তীর্থ করতে গিয়েছিল। সেখান থেকেই এইসব সরঞ্জাম কিনে আনে।

মালিরায় নিজের হাত দিয়েই বন্দুক বানায়। সিলেট জিলার শ্রীমঙ্গলের কাছে কোন একটা চা-বাগানের ফ্যাক্টরী থেকে ভালো ভালো শক্ত লোহার নল কিনে আনে। ঘরে এনে সুযোগ

পেলে বন্দুক বানিয়ে বেঁচে। মালিরায়ের বন্দুক সুন্দর ও মজবুত। বড়ই গাছের ডাল পুড়ে আংটা বানায়। সবচেয়ে ভাল পোক্ত লাউয়ের পুরনো শক্ত খোলস পুড়ে আংটা হয়। ভাল করে আংটার সঙ্গে সোহাগা, গন্ধক পরিমাণমতো মিশিয়ে সেদ্ধ করে জল শুকোয়। তবে পাত্রটা পাতলা ডেকচি হলে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর। পাশের রিয়াং পাড়ায় কড়াইতে সেদ্ধ না করে, এনামেলের হাঁড়িতে সেদ্ধ করতে গিয়ে বিস্ফোরণে চোখ-মুখ কপাল পুড়ে মুক্তিরামের। সে এক বিদঘুটে চেহারা। শিশুরা রীতিমত ভয় পায়। তখন থেকে মালিরায় খুব সাবধান। কড়াই ছাড়া বন্দুকের বারুদ তৈরী করা যায় না। তারপরে মশলা রোদে শুকিয়ে দিন তিনেক পরে টাটকা করে। সীসের টুকরো মিশিয়ে বন্দুকে পুরে। নলে প্রথমে তুলো দিয়ে তারপর বারুদ, তারপর সীসে এরপর আবার তুলো দিয়ে বরাক বাঁশের কাঠি দিয়ে চাপ দিয়ে ঠাসে। বিস্ফোরণের জন্য দেশলাইয়ের কাঠির বারুদ বা খোলসের বারুদ লাগা কাগজটাকে ব্যবহার করে কেপ তৈরীর কাজে। বুনো হাতীর উৎপাত তখন নিত্যদিনের ঘটনা। শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি পড়ে তখন উঁচু টীলায় ওঠে। জুম ক্ষেতে গেলং-ধান পাকতে শুরু হয়। শ্রাবণ মাসেই হাতী তখন দল বেঁধে ঢোকে জুমে। জুমিয়া চীৎকার দেয়, আগুন জ্বলে বাঁশের আগায়। উঁচু করে সেই আগুন তুলে ধরলে হাতীর পাল জুম ছেড়ে চলে যায়। বিপদ কিন্তু দলছুট নিঃসঙ্গ হাতী নিয়ে। আগুন দেখলেও ভয় করে না। চুপ - চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বেশী চীৎকার হৈ - চৈ করলেও বিপদ। জুমের অস্থায়ী টংঘরে এসে আক্রমণ করতে পারে। ধাক্কা দিয়ে ঘর ভাঙে। মদ বা মদের পিঠা থাকলে কথাই নেই। ঘ্রাণ পেলে বেড়া ভেঙে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে তছনছ করে মদ খেয়ে যায়। ধান, চাল কিছু খায়, কিছু ফেলে। কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালে শুঁড় দিয়ে ধরে তুলে আছড়াতে আছড়াতে হাড়গোড় থেঁতলিয়ে মাংস পিন্ড বানিয়ে ফেলে যায়। এসব জেনেও মালিরায় হাতী শিকারী মেরগোচানের সঙ্গে শিকারের নেশায় দিনরাত ঘুরে।

গোবিন্দ পাড়ার নবদ্বীপ। কেওয়া গোষ্ঠীর লোক। জঙ্গল থেকে ফেরার পথে এক বিরাট বুনো হাতীর সঙ্গে দেখা। হাতী ওকে ধরে ডান হাটুর নীচের অংশটা ছিঁড়ে দেহ থেকে আলাদা করে ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়। কপাল ভালো একবারে মারেনি। এখনো সে ছেঁড়া পা নিয়ে পঙ্গু হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। নিজ চোখে নবদ্বীপকে দেখেও মালিরায় ভ্রূক্ষেপ করে না।

মালিরায় ছেলেবেলা থেকেই রিয়াং আসলং বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে অসীম সাহসে বনে বনে ঘোরে। কোথায় কখন কোন মরুসুমে হাতীর পাল বিচরণ করে তার জানা। বুনো হাতীর পাল দেখা পাওয়া প্রায় লোকের ভাগ্যে জোটে। কিন্তু হাতীর সঙ্গম দেখা পাওয়া লোক খুব বিরল। মালিরায় তার বন্ধুদের নিয়ে এসব দেখে। মালিরায় প্রায়ই যায় মায়ুং তুইছা ছড়ায়। হাতী ছাড়াতো উপরে উঁচু টীলা থেকে এই ছড়ার মাথায় হাতীর পাল দেখা যায়। মালিরায় লক্ষ্য করে দূর থেকে দাঁতাল হাতীর দাপট। অপূর্ব রহস্যময় তাদের চলাফেরা, খেলা, ছোট ছোট শিশু হাতীদের জন্য বড় হাতীদের মমতা। কখন গাছ ভাঙে, জল শুড়ে নিয়ে গায়ে ঝাড়ে। সামান্য বৃষ্টি হলে উল্লাস চীৎকারে বন মুখরিত করে। পাতার পুটলা জড়ো করে মাটিতে পায়ে গর্ত করে রাখে। আবার তোলে। হাতীর পাল চলে গেলে বিস্ময়ে দেখতে হয় কোন মনুষ্য শিশুর খেলার চিহ্নের মতো। খাড়া টীলা হাতী উঠতে পারে না। গায়ে গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে টীলা পাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। ঘ্রান শক্তি খুবই প্রখর। মানুষের গন্ধ পেলে তাড়া করতে চায় কিন্তু কাটা বন দেখলে থমকে দাঁড়ায়।

মৌচাক গাছে থাকলে গন্ধ টের পেলে ওই গাছের ধারে-কাছেই ভিড় করে। তাছাড়া মুরগীর ডাকে হাতী খুব ভয় পায়।

হাতী ঘুম পেলে শুড় বাঁকিয়ে শুঁড়ের অগ্রভাগ মুখে পুরে, মাথা গাছে ঠেস দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়। হাতী যত গাছ ভাঙে, উচু ডাল ভেঙে ভেঙে ফেলে, বাঁশের আগা নুইয়ে মট মট ভেঙে রাখে। কালেশ্বর হরিণ ওই পথেই চলে। হরিণ কেন প্রকৃতির এমনই নিয়ম। হাতীর লেদা খুঁজে খুঁজে বন শূকর খায়। বুনো হাতীর পাল যেদিকে ধায় পেছনে পথ ধরে বন শূকরও হাঁটে।

কোন হস্তিনীর সঙ্গম কামনা জাগলে ঘন ঘন ঘ্রাণ নেয়। দাঁতাল হাতীসহ নির্জনে চলে যায় সবার অলক্ষ্যে। মালিরায় আসলং তিনজন আর রিয়াং দু'জন ছেলেকে নিয়ে দূর টীলা থেকে লুকিয়ে দেখে। অনেক উঁচু হওয়ায় নীচ থেকে হাতীরা ওদের দেখতে পায় না। বিরাট এক সুন্দি গাছে মাথা ঠেস দিয়ে হস্তিনী দাঁড়ায়। পেছনে দাঁতাল হাতী অন্য তৃণভোজী চতুষ্পদ জন্তুর ভঙ্গীমাতে রমণ সুখে লিপ্ত হয়। নিশ্চুপ হয়ে মালিরায় ওরা দেখে পৃথিবীর বৃহত্তম চতুষ্পদ জন্তুর শৃঙ্গার রমন লীলা। পুরুষ হাতী শুঁড় উর্দ্ধে তুলে হস্তিনীর পেছনে কোমরের নীচ দিকটা ঠেস দিয়ে যখন দাঁড়ায় মনে হয় সাক্ষাৎ গনেশ দেবতা বুঝি পৃথিবীতে অবতার হয়ে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নিঃশব্দ নাচ নাচছে। কখনো আবার দ্বিপদ প্রাণীর মতে মুখোমুখি শোয়। শুড়ে শুড় জড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ রাখে। এই অবস্থায় কেউ যদি ওদের বিরক্ত করে হাতী পাগল হয়ে ওঠে। বা অন্য কোন দাঁতাল হাতীর সাক্ষাৎ হলেও মারামারি শুরু হয় ।

মালিরায় দেখেছে গুলি করে হাতী মরে না, আর ক্ষতস্থানে পোকা মাছি বসে ডিম পাড়ে। মাছির ডিম যত বিড়-বিড় করবে হাতী অসহ্য যন্ত্রণায় পাগল হয়ে হিংস্র উন্মত্ত রূপ ধরে দিক-বিদিক ছোটে।

হাতীর দাঁতের গুড়িতে দাঁতের ভিতরটা ফাপা। ফাপা অংশের ভেতরে ঘন থিকথিকে তরল সাদা পদার্থ থাকে। কখনো ওই তরল পদার্থের ভেতরে শক্ত পাথর জন্মে। পাথর জন্মালে হাতীর যন্ত্রণা বাড়ে। লোকালয়কে ভয় পায় না। দলছুট হয়ে যেদিকে পারে মেদিনী কাঁপানো চীৎকার তুলে ছোটে । বাঁশ করুল খুব প্রিয়। শ্রাবণে কচি বাঁশে ধারালো বাকলা ছাড়িয়ে অখের মতো চিবোতে ভালোবাসে। দাঁতে পাথর হলে ঐ সব প্রিয় খাদ্য তাদের ভাল লাগে না। এমন কি জুমের কুমড়া, খাকলু, ধান কোন কিছুই তাদের আটকে রাখতে পারে না। ওই সময় হাতী বধ না করলে মানুষ হোক গরু হোক সামনে যা পারে মেরে থেতলে ছুটে যায়। এমন ধরনের একটা হাতী মেরেছিল মালিরায়।

মরার পর দাঁতের ভেতরেও ওই পাথর পাওয়া যায়। হাতীর দাঁতের ঐ পাথরকেই গজমোতি বলে। পাথর নিতে জানার কৌশল জানতো না। থাইথাক মুনির কাছে জেনেছিল। জানলেও বিক্রির জায়গা জানতো না । সামান্য টাকার বিনিময়ে আসামের এক মুসলমান দাইদার (মাহুত) কিনে নেয়। হাতছাড়া করার পর জানতে পারে দাইদার তাকে ঠকিয়েছে।

মালিরায় শুধু হাতী নয়। বাঘ-ভালুকের পেছনেও ছুটতো। কার্তিক বা অগ্রহায়নে যে সময় থোকা থোকা ঘুমচাক ফোটে। হলুদ খেত্রা ফুল গন্ধ ছড়ায়। জুমিয়ারা বুঝে এটা ভয়ঙ্কর সময়। বাঘের সঙ্গম মরসুম। বাঘ-বাঘিনী গহন বনে বিড়ালের মতো ঘন-ঘন গর্জন করে। মানুষকে তখন ভয় পায় না। পাঁচদিন-সাতদিন একই গহন বনে গর্জনে মাতিয়ে তোলে। গুলি করলেও যায়

না। একা কেউ বনের পথে চলাফেরা করে না। চলাফেরা দূরে থাক, ঘুমচাক বা খেত্রা ফুল কানে দেয় না কেউ। তখন মালিরায় ছোটে বন থেকে বনান্তরে। বাঘ শিকারে। জীবনে তবু বাঘ শিকারে সফল হয়নি। একটা মাঝারি দাগের বাঘ মারতে পেরেছে মাত্র। ঐ বাঘের মাংস খুলে, বাঘের ছালের ভেতর ঘর পুরে নকল বাঘ বানিয়ে জুম খেতে রাখে। ভয়ে বানর, শূকর, হরিণ, কালেশ্বর, সজারু, খরগোস কেউ আসে না।

হাতী মারা গেলে ডলু বাঁশের টুকরো দিয়ে চামড়া ছাড়ায় কেটে কেটে। বিশেষ করে হাতীর পায়ের দিকে চর্বি থাকে প্রচুর। আগুনে পুরে অল্প ঝলসিয়ে চামড়া ছাড়লেই বেরোয় থরথরে চর্বিযুক্ত সুস্বাদু মাংস। মালিরায়ের গ্রামে প্রায়ই হাতীর মাংসের ভোজ চলে। সঙ্গে শিকারে কেউ যাক বা না যাক। মালিরায় মাংস এনে সারা গ্রামে প্রায়ই বিলিয়ে দেয়। হাতীর মাংস বড় বড় টুকরো করে ভাজে। ভাজার পর ঘন্টা তিনেক ঝুল দিয়ে সেদ্ধ করলে মাংস থরথরে নরম হয়ে যায়। তখন প্রায় মদের আসর জমে মালিরায়ের ঘরে। আসলং রিয়াং যুবকরা দল বেঁধে এসে খায়, গান গায় ফূর্তি করে। মালিরায়কে ঘিরে বসে সবাই, শিকারের গল্প শোনে।

সজারু দু-ধরনের। একটা আকারে বড়, আরেকটা ছোট। বড় সজারুর পরিত্যক্ত গর্তে রাম কুকুর - বাচ্চা বিয়োয়। মালিরায় এইসব খুব নিখুঁতভাবে নিরিক্ষণ করে। গভীর জঙ্গলে সে রামকুকুরের একজোড়া বাচ্চা পেয়েছিল। বাচ্চাদের কিছু করেনি। খেয়াল করে শুধু রামকুকুরের গতিবিধি। রামকুকুর হরিণ, শূয়োর শিকার করে। ওদের গতিবিধি খেয়াল করলেই বুঝতে পারে হরিণ বা শূয়োর কোনদিকে গেলে পাওয়া যাবে। হরিণের আসা যাওয়ার পথে চারদিক ঘিরে রামকুকুর লতায়-পাতায় পেচ্ছাপ করে ভিজিয়ে রাখে। তাড়া করলেই হরিণ নির্দ্দিষ্ট পথে আসে। এলেই চোখ সাময়িক অন্ধ হয়ে যায় কুকুরের পেচ্ছাপ লাগতে না লাগতেই। তখন রামকুকুর দৌড়তে দৌড়তে হরিণের পেছন দিকেই কামড় বসিয়ে দেয়। দৌড়তে দৌড়তেই খাবলা-খাবলা মাংস নেয় রামকুকুরের দল। হরিণ ক্লান্ত, রক্তাক্ত হাপিয়ে হাপিয়ে হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে যায়। লাথি মারতে চায় তীব্র বেগে। কিন্তু শক্তি প্রায় নিঃশেষ. থাকে শুধু প্রাণের মৃদু স্পন্দন। এরই মধ্যে রামকুকুর তাড়িয়ে মালিরায় দুর্ধর্ষ সাহসে হরিণ ছিনিয়ে আনে রামকুকুরের মুখ থেকে।

তবে মালিরায় কোনদিন রামকুকুর মারে না। ভাদ্র মাসে জুমে ধান পাকলে শূয়োর নামে। তখন রামকুকুরের দল বা পাল এসে শূয়োর শিকার করে ফসল বাঁচায়। অবশ্য রামকুকুর মারাও খুব কঠিন।

এই এলাকায় ফাঁদ বানাতে যারা ওস্তাদ তাদের মধ্যে মালিরায় একজন। থাইথাকমুনি অভিজ্ঞ মানুষ। বাড়ী তার চন্দ্রদাস রোয়াজা পাড়ায়। রীতিমত চন্দ্রদাসের কাছে গিয়ে ফাঁদ বানানো. পাতানো শিখে। ফাঁদের নাম দৌপথুং'। ফাঁদের দড়ি কত উঁচুতে থাকলে কোন জন্তুর ফুসফুস বিদ্ধ করবে, এই মাপ জানার মধ্যে ফাঁদ পাতার কেরামতি। এই কেরামতিতে ওস্তাদ স্বরকুমার থাইথাকমুনি। আর জানে মালিরায়। এই সমস্ত গুণের জন্যই রিয়াং হোক, আসলং হোক. মালিরায় নামের মধ্যে সকলেই একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণ অনুভব করে। থাইথাকমুনি মালিরায়কে আপন ভায়ের মতো দেখতো। বিশেষ করে ওর - বৌ সাং বুরুং তাকে দেবতা ভাবতো।

এই সাংবুরুং যখন সবে মাত্র যুবতী তখন রাজার আমল। রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার সিংহাসনে। রাজা মহারাজারা রাজধানী থেকে কৈলাশহরে যেতে আখাউড়া

হয়ে রেলগাড়ীতে সমসেরনগর পর্যন্ত যেতেন; তার পর হাতী চড়ে যেতেন কৈলাশহর, মনু, ছৈলেংটা, ছাওমনু অঞ্চলের রাজার নামে শাসন করতো রাজার সনদ প্রাপ্ত দলপতি, চৌধুরী, দফা সর্দার প্রভৃতি। এদের সাহায্যের জন্য থাকতো বিরাট এলাকা জুড়ে একজন তহশীলদার। দলপতি, সর্দ্দার, চৌধুরীদের জন্য পাগড়ী, মোহর, লাঠি, ঝান্ডা, গদ অনুযায়ী রাজবাড়ীর প্রতীক হিসাবে পেতো।

মনু নদীর উজানে, বাখাছড়ার পারে পারে বা মালদ ছড়ার শিয়রে যে সমস্ত পার্বত্য পাড়া, গ্রাম আছে তার শাসন ভার ছিল দলপতি সুপতিফার উপরে। তিন'শ ছিয়াত্তর ঘরের খাজনা আদায়, ওদের ভালো মন্দ দেখা, বিচার শালিশি সব কিছুর উপর ছিল সুপতিফার কর্তৃত্ব। রাজার রক্ষী বাহিনীর, যারা বিনন্দিয়া আলং নামে পরিচিত তারাও দলপতি সুপতিফাকে জিজ্ঞেস করে পাড়ায় পাড়ায় খেতো। তখন ঘর প্রতি খাজনার হার ছিল পাঁচ টাকা। দলপতির আদেশে পাড়ার রোয়াজা বা চৌধুরীরা খাজনা আদায় করে দলপতির ঘরে পৌছাতো। দলপতিরা ঠিক মতো কাজ করে কিনা দেখার জন্য রাজবাড়ী থেকে আসতো মিসিপ। মিসিপদের নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত। মিসিপ বা কালেক্টরের দায়িত্ব থাকতো রাজারই কোন আত্মীয়ের উপর। এদেরকে গ্রামবাসীরা কর্তা বা ঠাকুর বলেই সম্বোধন করতো। অনেকে ডাকতো আবার মহারাজা বলেও। এতে কর্তারা খুশীও হতো। সঙ্গে ক্রোকের পরোয়ানা আছে। দলপতি, সর্দার চৌধুরী এরা রাজার সনদ প্রাপ্ত; খাজনা দিতে হয় না। একই তহশীলদারকে দিয়ে খাজনা আদায় করে। আদায় না হলে রাধাঠাকুরের কাছে সব বৃত্তান্ত জানাবে। কর্তাঠাকুর বাহিনী পাঠিয়ে যার যা কিছু আছে কেড়ে আনে। আসবাবপত্র শুধু নয়। কারো ঘরে হরিণ সিং, বনরুই এর চামড়া, বাঘের চামড়া বা টিয়া, ময়না, এমন কি কেউ কেউ শখ করে হরিণ বাচ্চা পালে। কিছুই রেহাই দেয় না। যা পায় তাই উচিয়ে নিয়ে যেতো।

মেয়েদের অলঙ্কার, টাকার মাল্য জোরে খুলে কেড়ে আনতো, শুধু অলংকার নয় মান মর্যাদা, সতীত্ব, নারীত্ব সবকিছুই লুঠে নিতো বিনন্দিয়া আলংরা। কেউ কিছু বলার সাহস নেই। ওরা যে রাজার লোক। যত অত্যাচারই করুক প্রজারা নিতো ওইটাই রাজার ফরমান।

রাজবাহিনী আসার খবর পেলে মেয়েরা নোংরা কাপড় পড়ে থাকতো। অলংকার পরতো না। এবং সুন্দরী মেয়েরা কালি-ঝুলি মেখে বিশ্রী হয়ে থাকতো। কেউ কেউ গহন বনের মধ্যে জুম খেতে নির্জন, নিঃসঙ্গ টংঘরে মেয়েদের লুকিয়ে রাখতো। কলাপাতার ঠোঙায় ভাত পাঠাতো।

সুপতিফা দাপটশালী সর্দার। মেডেল, পাগড়ী, রূপার মদ খাওয়ার নল রাজবাড়ী থেকে পেয়েছে। সুপতিফা বারণ করেছে কেউ পাড়া ছেড়ে যেয়ো না বলে। কোন বিপদ হবে না। বরং নির্ভয়ে কেউ কিছু দেওয়ার থাকলে রাজবংশীকে দিতে পারে। অভয় পেয়ে উঠোনে উঠোনে সুপতিফা পাড়ার মেয়েরা, বউরা ধান ভানে। এমনিতে খালি গায়ে বক্ষ উদাস করে থাকে।

এই বিরাট দুর্গম অঞ্চলে আসে রাজবাড়ীর কর্তা রাধা - ঠাকুর। বিরাট হাতীর পিঠে লোহার চেয়ার। চেয়ারে নরম গদী আটা। সাজানো হাতীর গলায় ঘুঙুর। ঝুম ঝুম বাজিয়ে জানান দিতো রাজার লোক আসছে। সঙ্গে স্তাবক, সিপাহী, বিনন্দিত, অন্য কর্মচারী লাগিয়ে সত্তরজন লোক। তখনকারদিনে সত্তরজনের একটা বাহিনী যাওয়া মানে এক বিশাল অভিযান।

রাস্তায় গাছ কাটা দেখলেই বিনন্দিয়ারা জেরা করতো, কে কেটেছে, কেন কেটেছে, অনুমতি

আছে কিনা। দন্ডি করতো টাকা। যে পাড়ায় রাজবংশী যায় খুশী হলে তাকে রক্ষী বাহিনীর সহকারী হিসাবে নিয়োজিত করে। স্মারক হিসাবে খাকি প্লেন্ট, খাকি জামা, আর পিতলে মাথা মোড়া একটি লাঠি। পেতল বাঁধা, একটা লাঠিই যথেষ্ট। এর দাপটে গ্রাম-পাহাড় থর থরিয়ে কাঁপতো।

রাধা ঠাকুর আসবে সুপতিফার ঘরে। পনেরো দিন আগেই পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুপতিফা পাড়া মালদ ছড়ার পারে। ছড়া থেকে পাড়ায় উঠার পথের ঘাস, আগাছা, ছেটে চেষে একেবারে পরিপাট। চৌধুরী, রোয়াজারা পাড়ায় পাড়ায় তিতুনের লোকজন ঠিক-ঠাক করে, অপেক্ষায় থাকে প্রস্তুত হয়ে। তিতুন মানে বিনা পয়সার আদিবাসী বেগার। রাজার কর্মচারীরা পাহাড়ে আসা যাওয়ার পথে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় জিনিসপত্র বয়ে নেওয়ার জন্য অথবা পথ প্রদর্শক হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করতো। এদের জন্য কোন মজুরী দিতে হতো না।

রাধাঠাকুর এসে অস্থায়ী শিবির পাতবেন দলপতি সুপতিফার ঘরে। গ্রামের লোকজন ধুমধাম করে বাঁশ বেতের কারুকাজ দিয়ে ঘর সাজায়। নতুন নতুন ঘরে বোনা রঙ-বেরঙের পাছড়া, চাদর কাপড় দিয়ে বারান্দায় চাঁদোয়া টাঙায়। কেউ বিছায়। কখন কোন বেলা কার ঘরে মুরগী কাটা হবে, শূয়োর কাটা হবে সবই প্রস্তুত। সুপতিফার নির্দেশে ঘরে ঘরে রাধাঠাকুর আর তার বাহিনীর জন্য কলস কলস মদ তৈরী। কেউ ক্ষীরের জন্য কাউন ধান, কেউ বা খাসা চাল সুপতিফার ঘরে পৌঁছায়। মালদছড়া থেকে সুপতিফার উঠোনে ঢোকার রাস্তার দু-পাশে কলা গাছ পুঁতে দু'কলস জল ভরে মঙ্গল ঘট রাখা। কলস থেকে কলসে সূতা বাঁধা। গ্রামের প্রায় সব পুরুষই জড়ো হয়েছে রাধাঠাকুরকে স্বাগত জানাতে। রাজার বংশ রাধাঠাকুর ওই সূতো ছিড়ে এগিয়ে যায়। সুপতিফার হাতে হাতে ধরে অন্য কয়জন পারিষদ সহ রাধাঠাকুরকে খাঁচা ঘরের বারান্দায় তুলে।

রাধাঠাকুরের সিপাই, বিনন্দিয়া সবাই উঠোনে। শুধু বিশ্বস্ত কয়জন স্তাবক খাচাঘরের বারন্দায় ওঠে। কারো কিছু বলার থাকলে কেউ সরাসরি বলা নিষেধ। নিয়ম হলো কোন পারিষদকে দিয়ে রাধাঠাকুরের কানে পৌছাতে হবে। রাজদর্শনের জন্য নীলোফা, রোয়াজা, কর্ণমুণি চৌধুরী, তাং কারায় চৌধুরী, কন্যারাম রোয়াজা আরো অনেকেই হাজির বিভিন্ন পাড়া থেকে। সবাই একে একে কলস কলস মদ ঢেলে রাধাঠাকুরের পা ধুঁয়ে দেয়।

ঘর প্রতি তখন খাজনা পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা খাজনা দিলে তহশীলদার রসিদ দেয়। তিন টাকা দিলে রসিদ পাওয়া যায় না। তবে রাজার খাতায় দেশের বাসিন্দা হিসাবে নাম ওঠে। এক বছর খাজনা বকেয়া থাকলে থালা, বাসন, ক্রোক করার রীতি। ভয়ে সারা পাহাড় থরো থরো কাঁপে। কর্তা ঠাকুর আসায় এক শিশুর মা যেমন বক্ষ আবরণী বাঁধে, দুই তিন শিশুর মায়েরাও বক্ষ আবরণী দিয়ে বুক বাঁধে। মাথার খোপায় ফুলের মালা। মেঘের গুরুম গুরুম শব্দের মতো গাইল সিয়াতে ধান কুটার শব্দ। নজর সবার সুপতিফার বারান্দায় বসা কর্তার দিকে। আশি বছরের প্রৌঢ়ও নাতি-পুতি জড়ো করে দূর থেকে রাজপুরুষকে দেখায়। কেউ এত তন্ময়। সিয়া গাইলে না ঢোকে খুদ কুড়া খুঁজতে আসা শূয়োরের মাথায় পড়ে। শুয়োরের আর্তনাদে তন্ময়তার ঘোর ভাঙে।

অনেকে আবার ভয়ে - লাজে ঘরের ভেতর গা লুকিয়ে মাথা বের করে দরজার ফাঁক দিয়ে রাজবংশীর দিকে তাকায়। রাজবংশী যেমন তেমন। বিনন্দিয়া, সিপাইরা চোখে চোখে সুযোগ পেলেই অশ্লীল ইসারা দেয়। ভাবটা এমন যেন নগ্ন কোন যুবতীকে দেখছে।

পিঠে বেতের ধাড়া তুইলাঙ্গাতে কলস রেখে দল বেঁধে মালদ ছড়ায় জল আনতে যায় একদল মেয়ে। সাংবুরুং নাম পেয়েছে ওর জন্মের বছর জুম খেতে প্রচুর আগাছা ছিল বলে। রাধা ঠাকুরের চোখ যায় ওই গায়ে আগুনরঙা লাল মেয়েটার দিকে। গলায় রুপোর মালা সূর্যালোকে চোখ ধাধাঁয়। বাহুতে রূপার বাজু, কব্জিতে বাংরি। বক্ষ আবরণী রিসা দিয়ে বুক বাঁধা থাকলেও কর্তা ঠাকুরের চোখে উদ্যত বক্ষ বাঁধা যেন মানতে চায় না। চোখ দুটো গোলাকার পাতলা ভুরু। ঠাকুরের দিকে তাকায়না। না দেখা ওই দৃষ্টিতে যেন রাজপুরুষের বুকেও উদাসী ভাব জাগায়। বুকের তুলনায় সরু কোমর। নাভিপদ্মের চারদিক জুড়ে মসৃণ কোমলতা।

চলতে ফিরতে ছড়াট ভরাট যৌবনের ঢেউ হয়ে নিতম্ব দোলে। উপরের ঠোট জন্ম থেকেই ছোট। মনে হয় কারণে হাসে। হাঁসি নয় পৃথিবী মূগ্ধ করা একি যাদু। ওই যাদুতেই রাধাঠাকুরের বুকে শিহরণ উঠে।

বারান্দা থেকে শিকারী চোখ সাংবুরুং এর দিকে নিবন্ধ রেখেই সুপতিফাকে হাঁক দেয়। কর্তা বলে কাছে হাত জোড় করতেই বলে এক্ষুনি যাও, ওই মেয়েটা দিনরাত আমার সঙ্গে থাকবে শোবে। ভেবো না ওকে নিয়ে যাব। যাবার সময় ঠিক ওর মা-বাপের কাছে পৌঁছে দেবো।

সুপতিফা কি বলতে চেয়েছিলো। রাজবংশীর ক্রুদ্ধ চাউনি দেখেই কথা বন্ধ হলো। নিজেই এগিয়ে গিয়ে সাংবুরুং এর বাপ ওড়াফাকে ডেকে বলে; কর্তা তোমার মেয়েকে পছন্দ করেছেন, উনি আদেশ দিয়েছেন, উনি যতদিন থাকবেন ততোদিন সাংবুরুংকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে চান। রাজবংশী লোক তো খুব মেজাজে চলে। খুশী হলে তোমাকে হয়তো ভাল পুরস্কারও দিতে পারে। অবশ্য বিয়ে করে তোমার মেয়েকে নেবে না।

উড়াফা-উড়াফার বৌ দুজনে সুপতিফার পা জড়িয়ে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদে বলে ঠাকুরকর্তা যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে খুশী হয়ে বিয়ে দেবো। বিয়েও করবে না। শুধু ভোগ করে ছেড়ে দেবে, বাপ হয়ে এই অসম্ভব কথা মানবো কি করে। জীবিত থাকতে এটা হতে দেবো না। ওকে এমন করে সপে দেওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু অনেক ভালো।

আসতে আসতে সুপতিফা বলে

তাউক মা বাই তাউ খুম বাকি খালাইমলে এনি বাকি বাখামাইসিনো।

মুরগী হাসে প্রেম করে কি লাভ

হাঁস যাবে জলে, মুরগী যাবে পাহাড়ে।

সুপতিফা এসে কর্তাকে জানায় । কর্তা শোনেই ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে। এত বড় সাহস, আমাকে অপমান করেছে। ওকে আমি ভোগও করব, বিয়েও হতে দেবো না। আমি বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া তো থাক। সারা এলাকায় জানিয়ে দিও। ওই মেয়েকে বিয়ে করলে রাজ আদেশে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এমন কি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত।

রাধাঠাকুর মদের নেশায় বিভোর, তার উপর উড়াফা প্রত্যাখান করেছে তার আদেশ। রেগে লাল। চীৎকার দেয় দীনদয়াল। হাদ্যমুনি!

দু'জন বিনন্দিয়া এসে হাজির । ঠাকুর আদেশ দেন সাংবুরুংকে নিয়ে এসো। যদি ভালোয় ভালোয় না আসে জোরে চেংদোলা করে আনবে। আর কেউ বাধা দিলে লাঠির পিতলের মাথা যেন বাধাদানকারীর মাথায় ফাটে।

সাংবুরুং শোনেই ওর মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। বিনন্দিয়া দু'জন গিয়ে বুঝায়। মানে মানে চলো। ঠাকুরের যা মেজাজ দেখলাম। তুমি না মানলে সারা গ্রামে জুলুম করবে। একধার আগুন দিয়ে সারা গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করবে। ওরা দেশের মালিক, তোমরা আমরা প্রজা মাত্র। কান্নাকাটি করেও লাভ নেই। মানসম্মান থাকতে চলে এসো।

সাংবুরুং কোন কথা শোনে না। বিনন্দিয়া দু'জন মুখে কাপড় চেপে, একেবারে চেংদোলা করে নিয়ে চলে। উড়াফা হা হুতাশ করে, বুকে চাপড়ায়। মাটিতে গড়ায়। সাংবুরুং এর মা নিজের চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঁদে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপতিফার বাড়ী টেনে হিচড়ে নিয়ে আসে সাংবুরুংকে। দেহ প্রায় অর্ধনগ্ন, বুকের কাপড় খসে গেছেরাস্তায়। চীৎকার করতে যাতে না পারে মুখে কাপড় চাপা দেওয়া। সাংবুরুং আর কর্তাকে নিয়ে রাখলো আলাদা ঘরে । চারদিকে আবার বিনন্দিয়া পাহাড়া দেয়।

আতঙ্কে ভয়ে পাড়ার লোকজন ঘরের ভেতর । শুধু দূর থেকে ডুকরে ডুকরে চাপা কান্না শুনতে পায়। ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন। কেউ বেরিয়ে আসার সুযোগ নেই। সাহসও নেই। সাহস থাকলেও কে যাবে সাহায্য করতে । সাহস মানেই মৃত্যু। অনেক কান্নার পর একসময় সাংবুরুং শান্ত হয়। বাধ্য হয়ে নিজেকে ধরা দেয় কর্তাঠাকুরের লালসার ফাঁদে। দশ বারোজন বিনন্দিয়া পাহাড়ায় রেখে বাকী সবাইকে পাঠায় পাড়ায় পাড়ায় খাজনা আদায় করার অভিযানে।

সপ্তাহ খানেক পরে খাজনা আদায় করে লোক লস্কর ফিরে আসে। সাত সাতটি বিনিদ্র রজনীর ধকলে চোখ কোঠারাগত, কাঁধে গালে কাপড়ের দাগ দিয়ে বন্দিনি সাংবুরুং তখন মুক্তি পায়। কর্তা ঠাকুর যাবার বেলা দয়া করে ত্রিপুরী মেয়েরা মাথায় বাধে ওই রকম একটি কাপড় সাংবুরুং এর কাধে ছুঁড়ে ফেলে হাতীতে চড়ে চলে গেলো। ফিরেও তাকালো না। পেছনে থাকে শুধু সাংবুরুং এর বুক ফাটা চীৎকার । মা তুমি মেয়ে করে জন্ম দিলে কেন?

পরের সপ্তাহে সাংবুরুং এর বাপ গোটা পরিবার নিয়ে মনের দুঃখে জঙ্গলের গভীরে অনেক দূরে রাখা ছড়ার পারে ঘর বাঁধে। চন্দ্রদাসরোয়াজা পাড়ায়। তবুও ভয় রাজবাড়ীর লোকেরা আবার যদি আসে। পাহাড় জুড়ে রটে গেছে এই মেয়েকে বিয়ে করলে মৃত্যুদন্ড হবে। ওই পাড়া থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণ পূর্বে পাহাড়ে উঠলেই মালিকরায়ের গ্রাম অঙ্গদরোয়াজা পাড়া । ঘটনা শোনে মালিরায় ছুটে আসে দলবল নিয়ে চন্দ্রহাসপাড়ায় । দুঃখীনি সাংবুরুংকে সান্ত্বনা দেয় থাইথাক মুনির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পাকা করে। তোমার গ্রামের নপুংসক পুরুষ আমরা নই। যারা মা মেয়ের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, তাদের পৃথিবীতে থাকার অধিকার নেই। মালিরায় সমস্ত রিয়াং আসলং যুবকদের জড়ো করে আগুন ছুয়ে শপথ করায় যে কোন মূল্যে থাইথাক মুনি আর সাংবুরুংকে রক্ষা করার । রাজা, বিনন্দিয়া যারাই আসুক এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ওদের গায়ে ফুলের টোকাও লাগতে দেবো না।

এই পাড়ার থাইথাক মুনির কাছেই ফাঁদ বানানো কৌশল শিখতো মালিরায়। কোন রকম বুঝিয়ে সুজিয়ে থাইথাক মুনিকে রাজী করায় সাংবুরুংকে বিয়ে করতে। সুন্দরী সাংবুরুং। রঙ ফর্সা। পাহাড় আলো করার ওই রূপ দেখে থাইথাক মুনিও খুশী। ভয় ছিল অবশ্য। তবুও একমাত্র ভরসা সমস্ত রকম বিপদ থেকে মালিরায় বাচাতে পারে। একটা অসহায় মেয়েকে উদ্ধারের অপরাধে

যদি মৃত্যুদন্ড হয় হোক।"

পাথরে খাঁজ কাটা মূর্তির মতো মেদহীন পেশীবহুল চেহারা মালিরায়ের। পাহাড় ডিঙিয়ে, ছড়া পার হয়ে, খাড়া উপত্যকার পথ ধরে দুরন্ত বেগে দৌড়ায় নিজের গ্রাম পার হয়ে পাশের রিয়াং পাড়ায়। যে রিয়াংরা সহজে আসলংদের সঙ্গে মিলতো না। মালিরায় এর উদ্যোগে রিয়াং আসলং, মিলে একাকার। রিয়াং পাড়ায় সমচন্দ্র রিয়াং এর ছেলে সপ্তরায়। ওর সাথেই মালিরায়ের ভাব বেশী। সপ্তরায় সাহসী ততটা নয় তবে ধীর স্থির, মনটা খুব বড়। বুদ্ধিও খুব প্রখর । কারো চেহারা দেখলেই লোকটা লোভী না দয়ালু, কপট না উদার সহজেই বুঝতে পারে। সে আবার রিয়াং ছেলেদেরকে নেতৃত্ব দেয়। মালিরায় আর সপ্তরায়ের বন্ধুত্বে এক নতুন শক্তি জেগে ওঠে। রিয়াং ও আসলংদের মধ্যে এতো ঐক্য আগে ছিল না। কিন্তু চোখের সামনে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি জাগরিত হচ্ছে তাতে নীলোফায়ের মনে আতঙ্ক। এই শক্তি হয়তো তাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করবে। যে রিয়াংদের অনেকে চেষ্টা করেও হাতে আনতে পারেনি, সেই রিয়াং যুবকরাই এখন মালিরায় বলতে অজ্ঞান।

মালিরায়ের বাপ তয়াংরায় আগে বছর বছর ঋণ নিতো । দেড় দুইটিন ধানের বীজ চাইতে এসে দিনে চারবার অনুরোধ করতে আসতো। এখন ছেলের ক্ষমতায় ধরাকে সরাজ্ঞান করে। আগে এলে বলতো তুমিই মা-বাপ, তুমিই জাতি বংশ রক্ষা করবে, তুমি আছো বলেই তোমার কৃপাদৃষ্টিতে আমরা বেঁচে আছি। সেই সমস্ত স্তোকবাক্য বহুদিন ধরে তয়াংরায়ের মুখ থেকে কেউ শোনে না। চলায় ফেরায় কেমন স্বাবলম্বী ভাব দেখায়। সামনা সামনি অবমাননা করেনি তবে আগের মতো বিনম্র নতজানু হয়ে থাকার ভাবটা এখন নেই।

এমন সময় গ্রামের ধন্যকুমার একদিন নালিশ জানায়। ওর জুমের টংঘর থেকে কাপাসের ভরা খাঁচা চুরি গেছে। নীলোফা লুফে নেয় সেই সুযোগ । ধন্যকুমারকে শিখিয়েছে বিচার যখন বসবে তখন তুমি ব'লো - চুরির আগের সন্ধ্যায় মালিরায় কয়েকজন রিয়াং ছেলেকে নিয়ে টংঘরে এসে বসে তামাক খেয়ে গেছে। যাওয়ার সময় ওদের চোখ ছিল কাপাসের খাঁচার দিকে।" ধন্যকুমার বলে এতবড় মিছে কথা বলব কি করে ।" তুমি অবশ্যই বলবে, এক খাঁচা কাপাস নয় তিন খাঁচার দাম দেবো।" ধন্যকুমার দ্বিধাগ্রস্থ, বলবে কি বলবে না। নীলোফা তখন বলে - যদি এই কথা বলতে না পারো তা হলে কোন সাহায্যের জন্য কোনদিন আমার কাছে আসবে না। " ধন্যকুমার চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই ধন্যকুমারের ছেলে বাঁশীমনি এসে হাজির। মুখ কাঁচুমাচু করে পায়ে ধরে বলে দোষ আমি করেছি, বাবাকে না জানিয়ে একটি কাপাসের খাঁচা সরিয়ে ছিলাম। এখন মারুন, কাটুন, সব আপনার হাতে। নীলোফা তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু সবসময় ভয়। গোপনে ধন্যকুমারকে শেখানো ষড়যন্ত্রের কথা যদি ফাঁস হয়ে প্রচার হয়। রোয়াজার এই সব আচরণে গ্রামের মানুষ খানিকটা এড়িয়ে চলতে চায় রোয়াজাকে।

গ্রামের সবার মুখে একই কথা মাং কুং হা ছেইং খে মারুহা মুনুও অর্ধফলা-ফাঁদের কাঠ পাতলা হয়ে খাটাস হাসে।

মালিরায়ের জনপ্রিয়তা যত বাড়ে নীলোফার ঈর্ষা বাড়ে তত। গ্রামে কারো বিপদ আপদ হলে রোয়াজার কাছে যাওয়াই রীতি। কিন্তু গ্রামের মানুষ রোয়াজাকে এড়িয়ে মালিরায়ের কাছেই যায়। ভীড় বেশী মালিরায়ের ওখানেই।

রোয়াজার এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয়। অপমানে রোয়াজার দাঁত কির্‌মির করে। এখনি রোয়াজার অবস্থা ভাল। এক বছরের ধান নিয়ে তিন বছর পর্যন্ত চলার ক্ষমতা সে রাখে। কিন্তু বড় কৃপণ। শুধু পয়সার হিসাব করে। বিনা সুদে কাউকে কোন দিন এক পয়সাও সাহায্য করেনি। না করলেও মানুষ অভাব অভিযোগে তার কাছে যেতে বাধ্য। কেউ ধানের বীজ ধার চায়, আবার কেউ নিদান মাসে ধান বা টাকা ঋণ আনতে যায়। পরিশোধ করার ক্ষমতা না থাকলে সহজে ঋণ দিতে রাজী নয় নীলোফা। যদিও বা দেয় উপযুক্ত জামিনদার থাকতে হবে।

মালিরায়ের জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে রোয়াজা এখন অন্য চাল চালে। ঋণের জন্য কেউ এলে তাকে বসিয়ে তামাক খাওয়ায়। মালিরায় সম্পর্কে বিষোদগার করে। মানুষও এমন প্রকৃতির, সুবিধা পাবার জন্য মালিরায় সম্পর্কে বদনাম রটায় রোয়াজার কাছে গিয়ে। এতে অবশ্য ফল ভাল ফলে। ঋণ পেতে বেশী অনুরোধ উপরোধ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রধান বাধা ঘরে।

নীলোফার মেঝামেয়ে মানরুং। বাপের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাথা এগিয়ে. গামছার খুঁট মুখে খুঁটতে খুঁটতে তন্ময় হয়ে বাপের কথা শোনে। এমনিতে বড় লাজুক। মাত্র তার চেহারায় যৌবনের উঁকি ঝুঁকি। পথে উঠোনে, ছড়ার পাশে মালিকরায়কে দেখে। চোখাচোখি হয়। অলস চাহনিতে চোখের পাতা নামে লাজুক লতার মতো। কিন্তু ঐ চোখাচোখিতে মনের গভীরে একটা দুর্বোধ্য ব্যথা ওথাল পাতাল করে।

মালিরায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুনলে মনে কষ্ট লাগে। কিসের জন্য এই কষ্ট তা বুঝিয়ে, গুছিয়েও বলতে পারে না। জানে না বলেই বাপকে সোজাসুজি বলে ফেলে- ঠেকায় পড়ে লোক এসেছে সাহায্য চাইতে, কিছু করতে হয় করো, শুধু শুধু পরনিন্দা করে কি লাভ।

মেয়েটা আদুরে ! মালিরায়ের জন্য একটা গোপন দরদ ওর মনে সযত্নে রেখাপাত করছে, এটা কমবেশী সে আঁচ করতে পেরেছে। আজ কাল মালিরায় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনলে মানরুং এর বিরক্তি লাগে। মানরুং নিরুত্তর থাকে। বাপের নিষ্ঠুর স্বরূপটা বড় ভয়ঙ্কর।

একশিরা রোগী বাবুকুমার। বারমাস ভোগে। বিছানায় শুয়ে গোঙায় ছটফট যন্ত্রনায় । অবুঝ তিনটে ছেলে। খিদে পেলে মা-বাপের হাড়-মাংস চিবিয়ে খাওয়ার উপক্রম। এতগুলো পেটের খোরাক যোগাবে কে? বাবুকুমারের বৌ শঙ্খছড়ি ছাড়া হাল ধরার কেউ নেই। এর বাড়ী, ওর বাড়ীতে, ধান কুটে । কখনো কারো ঘরে বাচ্চার দোলনা ঠেলে। কারো বা ঘরে সারাদিন চরকি ঘুরিয়ে কাপাসের বীজ ছাড়ায়। কখনো কোন বাড়ীতে সদ্য কোন প্রসূতী অচল হলে শঙ্খছড়ির ডাক পড়ে ঐ বাড়ীর কাজকর্ম চালিয়ে নিতে। এমনি করে বড় কষ্টে চলে ওর দিন। কাজকর্ম করতে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু বিপদ হচ্ছে ওর ছড়ানো ভরা যৌবনের উদ্যত ঢেউ। বয়স ত্রিশ হলেও মনে হয় আঠার বছরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ইদানীং বেশীর ভাগ খাটতে হয় গিরিকুমারের ঘরে। তার স্ত্রী সূতিকা রোগী। গ্রামের একেবারে দক্ষিণের বাড়ী। গিরিকুমারের স্ত্রীর চলাফেরা তো দূরে থাক, জীর্ণ-শীর্ণ অস্থি চর্মসার দেহ। মুখে সবসময় অরুচি। প্রসবের পর এটা খায় না ওটা খায় না। কোন রকম একটা কাঁথা জড়িয়ে নিজেই বিছানার চাদর হয়ে লেপটে থাকে। দয়া করে কেউ রান্না বাড়া করে দিলে একমুঠো খায়। নইলে কোটরাগত চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে ফেকাশে মুখে চেয়ে থাকে। বড় সন্তান দুটোকে খাওয়ায়। কোথায় ঘুমায় খবর রাখে কে। কোলের বাচ্চাটাও মায়ের

বুকের দুধ না খেয়ে এখন যায় তখন যায় অবস্থা। শঙ্খছড়ি ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু সব সময় আসা যাওয়াও আবার বিপদ। আসতে যেতে রোয়াজা এমনভাবে তাকায় যেন গিলে ফেলবে দু-চোখ দিয়ে। ঠোঁট ফুটে উঠে লোভাতুর জৈবিক খিদের তাড়নায় ভরা লোলুপ হাসি। ওই হাসি দেখলে শঙ্খছড়ি ভয়ে শিউরে উঠে।

শঙ্খছড়ি সারাদিন গিরিকুমারের ঘরে কাজ করলেও, ওই বাড়ীতেই রান্না করে ভাতের ডেলা, কলাপাতায় পুটলা বেঁধে ঘরে আনে। স্বামী আর বাচ্চাদের খাওয়ায়। আসার সময় একটু দেরীও হয়। নীড়ে থাকা পাখা না গজানো পাখীর ছানা যেমন বার বার গলা বাড়িয়ে ঠোঁট মেলে মা - বাপের পথ চেয়ে থাকে তেমনি স্বামীসহ ছেলে মেয়েরা বারান্দায় বসে পথের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে কখন আসবে মা ভাতের ডেলা নিয়ে। কেউ আবার দেরী না সয়ে এগোয় দক্ষিণ দিকে। রাতে কোনদিনই থাকে না গিরিকুমারের ঘরে। অবশ্য কোন কোন দিন হাতে, পায়ে, কোমড়ে এমনকি সারা গায়ে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথায় গিরিকুমারের বউ জড়ো সড়ো হয়ে উঠে। উনুনের পাশে বসে শূয়োরের তেল গরম করে রাতভর ডলতে ডলতে একটু আরাম পায়। তেমন রাতে শঙ্খছড়ি গিরিকুমারের ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য। রাত কাটানো নিয়ে ফিসফিসিয়ে একটা গুঞ্জন ওঠে মেয়ে মহলে। পুরুষদের কানেও যায়। গিরিকুমারও শোনে। তবে ওইসব কথায় কান দিলে সংসার অচল হয়ে পড়বে। শঙ্খছড়িকে না রেখে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করাতে পারে । কিন্তু বেচারী এত দিন কাজকর্ম করে ঠেকা চালিয়েছে। দুম করে তাকে তাড়াবে কেমন করে। নিজে যখন ঠিক আছি যে যাই বলুক ধরনের এক নির্বিকার বেপরোয়া ভাব নিয়ে থাকে।

কাত্রিরুং এই গ্রামের পরিত্যাক্তা। রোয়াজার ঘরে কাজকর্ম করে। সংসারে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল বিয়ে হয়েছে ক'বছর আগে। কেউ কেউ বলে কাত্রিরুং রোয়াজার রক্ষিতা। অনেক বছর ধরে কাতিরুং এর ঘরে রোয়াজার ঘন ঘন আসা যাওয়া। ঘরে একটা মাছ বা মাংস এলে গোপনে কাতিরুঙের ঘরে নিজেই গিয়ে দিয়ে আসে। কেউ বলে কাত্রিরুং রোয়াজার পোহাতী। বুনো হাতী ধরার জন্য ওকে রেখেছে। ভিন্ন গ্রাম থেকেও অচেনা কোন কোন নারী দেখা যায় ওর ঘরে। জিজ্ঞেস যে করবে এমন সাহসও কারো নেই। বোবার মত সবই বুঝে কিন্তু বলে না।

একবার রোয়াজা কাত্রিরুংকে পাঠালো বাবুকুমারের ঘরে শঙ্খছড়িকে বুঝিয়ে ডেকে আনতে। শঙ্খছড়িকে সরাসরি কাত্রিরুং, বলেই ফেলে রোয়াজাকে তুমি খুশি করতে পারলে, তোমার ঐ রোগী স্বামী আর বাচ্চাদের নিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। কাপড়-চোপড়, এবং খোরাক রোয়াজা চালিয়ে নেবে ! রোয়াজার বড় শখ আমার মত তোমাকেও কাছে পাবার। আর তুমি যদি স্বামীকে ছাড়তে পার তাহলে রোয়াজা তোমাকে দু-নম্বর বউ করে রাখবে ঘরে। ভেবেচিন্তে দেখো। তোমার ভালোর জন্যই বলছি। শঙ্খছড়ি ভয়ে শিউরে উঠে। তুমি কি বলছো, রোয়াজাকে আমি বাপের মতো মনে করি। কাতিরুং শঙ্খছড়ির আক্ষেপে কান না দিয়ে বলে, তুমি বড় ভাগ্যবতী। পেট ভরে খাবার - গলা, হাত, কান ভরে অলংকার সবই পাবে । তোমার বাচ্চারাও তোমারই সঙ্গে থাকবে। এমন সুখ কটা নারীর কপালে জোটে । রোয়াজাকে পাবার জন্য কত নারী পাগল; আর সে নিজে থেকেই তোমাকে নিয়ে একটু ফূর্তি করতে চায় এতে তোমার আপত্তির কি আছে। আর বয়সে তোমার বাপের মত হলে কি হবে রোয়াজার যৌবন এখনো অটুট। যৌবন আছে বলেই তোমাকে এত সাধাসাধি। আমার মতো গাল-টাল ভাঙলে, দাঁত পড়লে, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। নিরুপায়

হলে শেষ পর্যন্ত শঙ্খছড়ি পায়ে ধরে বলে, যা বলেছো, বলেছো। আর কোনদিন এমন পাপের কথা শোনাতে এসো না। রোয়াজাকে গিয়ে শুধু বলবে, তাকে আমি বাপের মতো দেখি। ছোট বেলায় বাপ হারাবার পর থেকেই রোয়াজাকে বাপের মত সম্মান করে আসছি। গিয়ে আমার প্রণাম জানিও । কাত্তিরুং ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে বলে গেল, একদিন কিন্তু আফসোস করতে হবে। এবং সেদিন আর তোমার জন্যে রাস্তা খোলা থাকবে না। শঙ্খছড়ি জবাব দেয় আমি সাধারণ নগণ্য এক নারী। লোকে এই কাহিনী শুনে আমাকে যাই বলুক কিন্তু উনার মতো এত বড় রোয়াজা সম্পর্কে কি ভাববে, দিদি তুমিই চিন্তা করে দেখো।

এত অমায়িকভাবে রোয়াজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হবে রোয়াজা অন্দাজ করতে পারেনি। মনে তার আগুন জ্বলে। ওকে তো পাওয়া গেল না, আবার ওর কাছে সারাজীবনের জন্য এই প্রস্তাব পাঠানোর ফলে ছোট হয়ে থাকতে হবে। মুখোমুখি হলেই বাইরে কিছু না বললেও মনে মনে লম্পট, কামুক বলে চিহ্নিত হয়ে থাকতে হবে, ওর মতো নারীর সামনে - ঠোঁটে নুন লাগা জোঁকের মতো সংকুচিত হয়ে বাঁচা অর্থহীন। রোয়াজা সিদ্ধান্ত নেয় গিরিকুমারকে সব খুলে বলার। পিরিতের মানুষ যখন শঙ্খছড়ি মনের কথা সে খুলে বলবেই । আর গিরিকুমারকে কোন[illegible] একটা প্যাঁচে ফেলে শাস্তি দিলেও যাই বলুক লোকে তাকে বিশ্বাসই করবে না। ভাববে শত্রুতা করে বদনাম রটাচ্ছে। অন্যদিকে পরোক্ষাভাবে জানান দেওয়া দরকার যে রোয়াজাকে প্রত্যাখ্যানের ফল কত ভয়াবহ। রোয়াজার ঘুম আসে না । শয়নে স্বপনে শঙ্খছড়ি তার মন দখল করে বসে আছে। এত ক্ষমতাশালী রোয়াজার বুকের গহনে কি এক কামনার আগুন জ্বালিয়েছে। নিজের কাছে নিজে বড়ই অপমানিত । প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে যেন উন্মাদ করে তোলে। সাত পাঁচ ভেবে দু'দিন পরে রোয়াজা একা নিজেই গিয়ে উঠল বাবুকুমারের ঘরে । সঙ্গে কিছু চাল, মুরগী, এক বোতল মদ। রোয়াজাকে দেখে বিস্ময়ে তাকায় বাবুকুমার। এতবড় সম্মানিত মানুষের পদার্পন কেন কি জানি। কোন রকম নড়ে চড়ে বিছানা থেকেই রোয়াজাকে প্রণাম জানায়। রোয়াজা গিয়ে বাবুকুমারকে জানায় তোমার অসুস্থতা বেড়েছে, আগে তা জানাওনি কেউ। নইলে দেখতে আসতাম। যাক সুবিধা অসুবিধা জানাবে আর তুমি যখন অসুস্থ বউটাকে বা ছেলেটাকে পাঠাতে পারো কিছু লাগলে আমার জন্য। রোয়াজা হয়ে তোমাদের এই দুঃসময়ে কি নীরব থাকতে পারি? তোমরাই আমার ছেলেমেয়ে। আমি না দেখলে তোমাদের দেখবে কে?

ছেঁড়া একটা কাপড় বিছিয়ে বাবুকুমার বলে, বসুন -কথা ঠিকই । কিন্তু যাবে কে, বউটা সকালে মাইদুপুরে বাচ্চাদের খাইয়ে কাজ খুঁজতে বেরোয়। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে। না গিয়েও উপায় নেই। ও বাইরে না গেলে খাওয়াবে কে। মনে মনে বলে লাওড়ি নুক্দাক্ বেত্রা ইয়াফাইক" টাকপড়া লোকের আবার চিরুনী। অর্থাৎ রোগীর আবার বউ।

মাইদু হচ্ছে ভাতের আঠালো লাড্ডু। জ্বলন্ত আংঠায় পুড়ে প্রাতঃরাশ করায়। চাল, মুরগী, মদ রেখে রোয়াজা বলে - না এইগুলি রাখো। আর কালদুপুরে কাউকে পাঠিয়ে দিও। বউ যখন কাজকর্ম করতে যায়, সেই বা আসবে কি করে এর চেয়ে একটা ছেলেকে পাঠালে আধমণ চাল আনতে পারবে।

শঙ্খছড়িকে রাতে সব জানায়। অজানা একটা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু। অসহায় স্বামীটার জন্য বড় করুণা জাগে। অসহায়, রুগ্ন, অথর্ব হোক তবু তো স্বামী। তার ছায়াতেইতো সে সংসার

পেতেছে। সুস্থ থাকার সময় প্রাণঢালা ভালবাসার অভাব হয়নি। কাত্তিরুঙের জঘন্য প্রস্তাব না জানানো ভুল হবে। আর জানালেও তো তার স্বামীর করার কিছু নেই। বড় অথর্ব হওয়ায় অসহায়তার জ্বালায় ধিকি ধিকি দগ্ধ হবে। ভাবতে ভাবতে হৃদয়ের মর্মস্থলে বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ পাখীর মতো ছটফটিয়ে উঠে প্রাণ। অসহায় মনের ক্ষোভ অশ্রুধারা হয়ে নীরবে বইতে থাকে। ইচ্ছে করে স্বামীর কাছে সবকিছু খুলে বলতে। কিন্তু চাইলেও বলতে পারে না, কিসের যেন একটা বাধা। অবশেষে নাকের জল, চোখের জল একাকার হয়ে যায়। শঙ্খছড়ি অঝোরে কাঁদে বুকভাঙা ব্যথায়।

কেন! কি হলো আবার! রোয়াজা এসে এত দরদ দিয়ে সাহায্য করল! আর তা শুনে তুমি কাঁদছো! একি অদ্ভুত! কেন? আমি পেট ভরে খাওয়াতে পারি না বলেই এত দুঃখ!

শঙ্খছড়ি কাঁদতে কাঁদতে একে একে সব ঘটনা জানায়। বিস্ময়ে ছোট ছোট চোখ দুটো বিস্ফোরিত বাবুকুমারের। রোয়াজা পারে না এমন কাজ নেই। তবে কথায়-বার্তায় রোয়াজার বদ উদ্দেশ্য থাকলে তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৌকে পাঠানোর জন্যই বলতো। বরং বলে গেছে বৌ যখন কাজে ব্যস্ত, কোন ছেলেকে পাঠাতে। তা হলে রোয়াজার কি দোষ। ওই কাত্তিরুং। বড় বিপজ্জনক নারী। আসলে গোটা ব্যাপারটাই বোধহয় ওর চক্রান্ত। তা ছাড়া রোয়াজা ঋণ হিসাবে তো সাহায্য দিতে বলেনি। একেবারে মাগনা। কিন্তু রোয়াজার মতো কৃপণ এই অঞ্চলে নেই। এত কৃপণ লোকটা হঠাৎ এত উদার বা দরদী হওয়ার কারণটাই বা কি? অনেক প্রশ্ন মাথায় এসে ভীড় করে। বোলতার মত হুল ফোটায়। সবচেয়ে বড়কথা এই দুঃসময়ে এই সাহায্য কি অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করবে। আজ এই উদারতা আবার কাল কিছু চালের জন্য বউটাকে আমার ঘরে কাজে পাঠাও যদি বলে? তখন কি হবে? শেষ পর্যন্ত যখন যা হবার হবে। আগে খেয়ে বাঁচি। নিজের চোখে কিছু দেখিনি। নিজমুখেও যখন কিছু বলেনি । তাহলে অকারণে এত ভাবনা ভেবে লাভ কি? বরং কাত্তিরুং সম্পর্কে সাবধান হয়ে থাকা উচিত। কখন কার কুচক্রের বলি হতে হবে বলা যায় না।

নিজের অচল শরীরটাকে কোন রকমে টেনে রোয়াজার ঘরে উপস্থিত হয়। রোয়াজা নিজে উঠোনে নেমে বাবুকুমারকে ধরে ধরে সিঁড়ি উঠতে সাহায্য করে। টংঘরের বারান্দায় বসিয়ে একটা লাঙ্গি বের করে টানতে দেয়। ওর ঘরে দু'জনে বসে তামাক খায়। বাবুকুমার অভিভূত। ভুল করেও ওর বৌ সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি। বরং বলে তোমার বউটা সাক্ষাৎ দেবী। নইলে এত কষ্ট করে সংসার চালায় কি করে? যাক্, কাত্তিরুংকে দিয়ে তোমার ঘরে আমি চাল পাঠাচ্ছি। তুমি কষ্ট করে নিতে পারবে না। রোয়াজার মেয়ে মনরুং বাপের এত আদর ঐ অথর্ব লোকটার প্রতি দেখে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা তার বেড়ে যায়। রোয়াজার মনের চক্রান্তের জাল কিভাবে বিস্তৃত তা সে জানে না। এর পর থেকে প্রশ্রয় পেয়ে বাবুকুমার প্রায় রোজই দেহটাবে টেনে হিচড়ে রোয়াজার ঘরে যায়। রোয়াজার সান্নিধ্য পেয়ে অল্প হলেও রোয়াজার প্রসাদ পাচুয়া মদ এক চুমুক পায়। যখনই বাবুকুমার এসে বসে কাত্তিরুং কাজের আছিলায়, কখনো সিঁদল খুঁজতে, কখনো ক্ষারপানি বানানোর শুকনো কচি বাঁশের ছাই খুঁজতে আসে। ঘর থেকে যেতে স্বগতোক্তির মতে শুনিয়ে যায় - মাই কুরুই, চাকার নাগো। অর্থাৎ যেখানে ধান নেই; শুধু মাড়া দিয়ে সেখানে লাভ নেই। বোঝাতে চায়; যতই রোয়াজা বাবুকুমারকে খাতির করুক না কেন বউটার মন পাওয়া সহজ কথা নয়। একদিন কি পরিকল্পনা করেছে কি জানি। রোয়াজা যখন

বাবুকুমারকে নিয়ে বারান্দায় তামাক টানে তখন কাত্তিরুংকে সে ডেকে বলে — দেখ দেখি, কাল থেকে আমার পেচ্ছাপটা পরিস্কার হচ্ছে। কতই ঘরে আছে, একটুকরো থলিবাও নিয়ে এসো। কতই মনে গুড়। থলিবাও এক জাতীয় বুনো আলু। গুড়দিয়ে কাঁচা থলিবাও চিবিয়ে খেলে পেচ্ছাপ পরিস্কার হয় এবং হাত পায়ের ফোলাও কমে।

তখন রোয়াজা তামাক টানছে। কয়েক মুহূর্ত দেরী করে কাত্তিরুং দু-তিনটে থলিবাও নিয়ে অসে। চোখ মুখ বিরক্ত বিরক্ত ভাব । এসেই বলে থলিবাও খুঁজতে গিয়ে যে দেখেছি তা আর বলার মত নয়।

রোয়াজা কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে কোথায় আবার কি দেখলে। আর বলো না। গেলাম থলিবাও খুঁজতে খুঁজতে একেবারে দক্ষিণের বাড়ী, গিরিকুমারের বউকে পেলাম কোন রকমে ঘাটে যাচ্ছে স্নান করতে। বেচারী হাঁটতেও পারে না। একবার বসে কয়েকপা হাঁটে, আবার বসে আবার চলে। ফেরার পথে হঠাৎ শুনি গিরিকুমারের ঘরে চাপা নারী কণ্ঠের আওয়াজ। ঘরে কেউ নেই। ছেলে মেয়েরাও বাইরে খেলাধূলো করছে। এগিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম, তা আর মেয়েলোক হয়ে মুখে বলার নয়।

রোয়াজা ধমকে বলে-মেয়েদের পেটে কথা থাকে না আবার নমুনা করছো। খুলে বলে কি দেখেছ।

বগতিরুঙ বলে গিরিকুমার ঐ বাবুকুমারের বউ শঙ্খছড়িকে জাপটে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! স্বামীটা এত অসুস্থ, সেদিকে ওর খেয়াল নেই. দিনদুপুরে প্রেমে মজে আছে। লজ্জা সরমের বিন্দুমাত্রও অবশেষ নেই। সম্পর্কে মামী। ভাগ্নে আর মামীর এই অবৈধ সম্পর্কের কথা শোনালে দশজনে কি বলবে। আগুনে গর্জন তেল দিলে যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠে, রোয়াজাও তেমনি জ্বলে উঠল। কপট ক্রোধে বলে দেখলে বাবু, গ্রামে কি চলছে। আমি রোয়াজা হয়ে এটা সহ্য করি কিভাবে। এর একটা বিহিত যদি না করি, লোকে বলবে, আমার প্রশ্রয়ে এইসব হচ্ছে। আবার এও বলবে আজকাল রোয়াজার ঘরে বাবুকুমার ঘন ঘন আসে যায়। নিশ্চয়ই বাবুকুমারকে প্রশ্রয় দিয়ে রোয়াজা এই সব অঘটন ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করছে। না - না এগুলো বরদাস্ত করা যায় না। আর তুমি স্বামী হয়ে এটা যদি মানো তাহলে তোমাকে ভুগতে হবে। বাবুকুমার নিরুত্তর। অদ্ভুত বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকায়। প্রতিবাদের ভাষা যেন সে খুঁজে পায় না।

একে ডেকে, ওকে ডেকে এক কলকি তামাক টানার সময়ের মধ্যেই গ্রামের লোকজন একে একে জড়ো হয় রোয়াজার বারান্দায়। নারীরাও ভীড় করে। কয়েকজন মুরুব্বীকে সামনে বসিয়ে রোয়াজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। নারীঘটিত ব্যাপার বড় অদ্ভুত ব্যাপার। সর্বকালেই তার বাজার রমরমা। নারী-পুরুষ, বুড়ো, জোয়ান, সেই ঘটনাকে শুনতে বা জানতে সকলেই ভীড় করে। অদ্ভুত কৌতূহলে নিষেধ থাকলেও অযথা ভীড় সেখানে দেখা দেবেই। প্রথমে কাতিরুং এর মুখ থেকে ঘটনার বিশদ বিবরণ শোনে। অতঃপর রোয়াজা জিজ্ঞে[illegible] গিরিকুমারের বউকে। এবার তুমি বলো দেখি, যখন স্নান করতে ঘাটে যাচ্ছিলে, তোমার [illegible] দেখা হয়েছিল কিনা, আর তখন তোমাদের ঘরে কে কে ছিল।

গিরিবৌ হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিলে বলে, [illegible] থা, তবে এটা ঠিক যে, ঘাটে যাবার সময় পথে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল

রোয়াজা বলে, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে সেটা বিচার করব আমরা। সোজাসুজি বলো তুমি যখন স্নানে গিয়েছিলে তখন তোমার ঘরে শঙ্খছড়ি এবং গিরিকুমার ছিল কিনা । গিরিবৌ বলে — থাকলেও কোন খারাপ কিছু ঘটেনি।

রোয়াজা বলে ঘটেছে কি ঘটেনি, সে কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি, বলেওনি সেই কথা। খালি ঘরে তোমার স্বামী ও শঙ্খছড়ি ছিল, ওরা কি করেছে না করেছে তা তুমি যখন স্নানে গিয়েছিলে তখন তোমার ঘরে শঙ্খছড়ি ছিল, ওরা কি করেছে না করেছে তা তুমি থাকলেতো দেখতে। যাক যা বোঝার বুঝেছি। এবার শঙ্খছড়ি, তুমি বলো তোমার কোন বক্তব্য আছে কিনা?

রোয়াজার চোখ থেকে কৃত্রিম একটা আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন। শঙ্খছড়ি দশজনকে প্রণাম জানিয়ে বলে, আমাদের ঘরে খাওয়া দাওয়া নেই। পরের বাড়ীতে কাজ করি। গিরিকুমারের ঐ রকম কোন কুৎসিত মনোভাব আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি। রোয়াজা চীৎকার করে বলে ওই সব বাজে কথা ছাড়ো। আসল কথা, গিরিবৌ স্নান করতে যাবার সময় শুধু তোমরা দু'জন ছিলে কি না । শঙ্খছড়ি কেঁদে বলে, ছিলাম বলেই কি খারাপ কিছু করেছি।

শঙ্খছড়ির দিকে মুখ ভেংচিয়ে বলে খারাপ কিছু করোনি। রোগা বউটাকে বাইরে পাঠিয়ে ওর স্বামীকে দখল করার তালে ছিলে না? তোমাকেতো অন্যরকম ভাবতাম । তুমি যে এত নীচ, চরিত্রহীনা, এটাতো আন্দাজ করতে পারিনি।

রোয়াজা এবার ডাকে গিরিকুমারকে। যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি তবু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, অপরাধীর বক্তব্য রাখার অধিকার সবসময় আছে।

গিরিকুমার মুরুব্বীদের পায়ে ধরে প্রণাম জানিয়ে বলে - কাত্রিরুং যখন থালিবাও আনতে যায় আমি বারান্দায় বেত কাটতে বসেছিলাম। ওকে আমিই তো ঘরে ঢুকে থালিবাও দিয়েছি। ও যে সমস্ত কুৎসিৎ দৃশ্যের কথা বলছে ওইগুলো মিথ্যে। আমি যেকোন দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। বাঘের দাঁত ছুঁয়ে বলতে পারব যে ওই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

রোয়াজা উত্তেজিত হয়ে বলে বাঘের দাঁত ছুঁয়ে বললে কি! সে আমিও জানি। আমিও বাঘের বাপ, আমাকে কি তুমি নিরীহ খরগোস ভেবেছ! মামীর সঙ্গে একটু দূর হলেও বাবুকুমার তোমার মামা। মামীর সঙ্গে এত বড় পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারলে? জমায়েত দশজনকে জিজ্ঞেস করে রোয়াজা-আপনারা মুরুব্বীরা আছেন। সব শুনে আপনাদের কি মনে হলো ? যা বোঝার আমরা সবাই বুঝেছি। ঠিক না?

সভার মধ্যে প্রায় নিশ্চুপ। কে একজন বললো, শুধু আপনিই যা ভাল মনে করেন তাই রায় দিন। বেলাও অনেক গড়িয়েছে। অসহায় বাবুকুমার ফ্যাল ফ্যাল করে কি বলতে চেয়েছিল রোয়াজার উন্মত্ত চীৎকার শুনে আর সাহস করেনি।

রোয়াজা যেন রাগ সামলাতে পারে না। হাতের বাঁশের হুঁকোটা দিয়ে পিটতে পিটতে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। চীৎকার করে উন্মাদের মতো, আমি যতক্ষণ রোয়াজা এই সমস্ত পাপ অবাধে চলতে দেব না। বাখলা কুমার! বাখলাকুমার! গেল কৈ! বাখলাকুমার রোয়াজার অনুচর। রোয়াজার আদেশ, গিরিকুমারের পিঠে সাত বেত, এবং ঐ ছিনাল মেয়েটার পিঠে পাঁচ বেত লাগাও । আর তাতেই শেষ নয়, শূয়োরের অন্ডকোষের মালা বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে সারা গ্রামের ঘরে ঘরে পরিক্রমা করাও। ভাগ্নে মামীর এই সম্পর্ক জঘন্য। অর্ধেক মাথা মুন্ডন করে দাও ওই পুরুষটার।

আর মেয়ে মানুষ বলে ওর মাথা মুন্ডন করাচ্ছি না রোয়াজার আদেশ তামিল হলো। ঢোল বাজিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরিয়ে পেছনে দল বেধে কৌতুহলী শিশুরা। অনেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকায় নির্মম শাস্তির দৃশ্য। রোয়াজা এমন ভাব দেখায় যেন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার। কৌশলে নিজের ক্ষমতা কতটুকু তাও বুঝিয়ে দেয়। সর্বোপরি পরোক্ষ অথচ ভয়ঙ্কর হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিল রোয়াজার বিরুদ্ধাচরণ করলে এমন পরিণতি হবে।

শাস্তি দিয়ে আবার দুই পরিবারের লোক ডেকে এক এক মণ ধান পাঠিয়ে দেয়। বোঝায় সে কত মহান। কঠোর শাস্তি দিচ্ছে শৃঙ্খলার স্বার্থে। আসলে ব্যক্তিগতভাবে কারো শত্রু নয়। এমনতরো একটা ভাবমূর্ত্তি গড়ে তোলে। ধান দিয়ে যাতে আবার বিক্ষোভ-অসন্তোষ নিয়ে কোন বিস্ফোরণ না ঘটুক তার জন্য সচেতনভাবে এই উদারতা দেখায় ।

রোয়াজা এমনিতেই এক ক্ষুদ্র রাজার মর্যাদা নিয়ে থাকে। কারো বাড়ীতে গেলে তাকে সবাই নতুন কাপড় বিছিয়ে বসিয়ে, প্রণাম জানিয়ে, মদ, ডিম, মাংস, দিয়ে আপ্যায়ন করে। জুমের ধান কাটা, মাড়া দেওয়া, বয়ে আনা, প্রত্যেক বাড়ী থেকে এক একজন পুরুষ মিলে করে দেয়। কেউ যদি মরে যায় তাকে পোড়াতে হলেও রোয়াজার অনুমতির দরকার হয়। যে কোন বিয়েতে প্রস্তাব যতই পাকা হোক চূড়ান্ত অনুমোদন রোয়াজার কাছ থেকে নিতে হবে। বিয়েতে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে রোয়াজা অনুপস্থিত হলে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে না। বউ ছাড়াছাড়ি, অবৈধ বিবাহের দন্ডী, চুরির শাস্তির বিধান, অন্য কোন অপরাধের শাস্তির বিধান সব কিছুতেই রোয়াজার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

এত ক্ষমতা করতলগত হওয়া সত্ত্বেও নীলোফা বিচলিত। সবসময় উদ্বিগ্ন, কখন হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়।

গ্রামে যে দিন বিচার শাস্তি চলে মালিরায় ওইদিন গ্রামে ছিল না। গিয়েছিল অনেক দূরে গহন জঙ্গলে রামকুকুর ধরতে। সবুজ পাতা রঙের পাখী। দেখতে অনেকটা কবুতরের মতো। কেউ হরিমল পাখীও বলে। ককবরক ভাষায় বলে তাউবেং। থাকে গহন বনে লোকালয় থেকে বহুদূরে উঁচু টিলার পেটে। কুঁই-কুঁই -কুঁই-ই-ই ডাক দেয় মিষ্টিসুরে। ভোরবেলা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে পাহাড় উপত্যকায় শীত কাটায় তখন রাম কবুতরের ঝাঁক বেরোয়। একটা দুটো নয়, বিরাট বিরাট ঝাঁক। কুয়াশার ঠান্ডা পাখায় মাখাতে ভালবাসে। জুমে জুমে তখন তিল সংগ্রহ চলে কারোর, কারোর বা শেষ। জুমে নেমে তিল খুঁটে খুঁটে খায়। বেশী তিল খায় বলেই রাম কবুতরের রঙ চকচকে সবুজ। বটের গুটি খায় চৈত্রে। আবার কানচারা গাছের ফল খেতে ভালবাসে।

এই পাখীর ঝাঁক যখন উড়ে বেশী উঁচুতে উঠে না। প্রায় পাহাড়ের গায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে। সোজা তাদের গতি। বেশী ওঠা-নামাও করে না। সামনে কোন বাঁধা মানে না। তখনই দুই পাহাড়ের ফাঁকে জাল পাতে শিকারীরা। কুয়াশার ঘনত্ব যত বেশী এই পাখীরা জালে আটকায়ও তত বেশী। মালিরায় লম্বা বাঁশ দুটোতে ব্যানারের মতো বিরাট জাল খাড়া খরে চুপ করে বসে থাকে । পাখীর ঝাঁক কুয়াশার অন্ধকারে ওই ব্যানারের মত জালে আটকায়। সেদিন প্রায় শ'খানেক কবুতর ধরে মালিরায়। খাঁচা ভরে আনে। আসার পথে ওর রিয়াং বন্ধু সপ্তরায়কে দুটো পাঠিয়ে দেয়। রিয়াং আসলং সবাই মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে রামকবুতর খায়।

গ্রামে ঢুকেই পাহাড়ী রীতি অনুযায়ী প্রথমে রোয়াজার ঘরে দু'টো পৌছায়। কয়েকটা

পথের মধ্যেই বেঁচে, কয়েকটা নিজের আত্মীয় স্বজনদেরও দেয়। কিন্তু যেখানে যায় সেখানেই আজকের গিরিকুমার ও শঙ্খছড়ির ঘটনা শোনে। এমনিতে রোয়াজার সামনে কেউ কিছু বলেনি। এখন কিন্তু অধিকাংশ গ্রামবাসীই বলছে এটা অন্যায়। কাত্তিরুংকে দিয়ে পাতানো বিরাট একটা ষড়যন্ত্র। শঙ্খছড়ি, বাবুকুমার পুরোনো ঘটনা জানায় একে একে। রাত্রেই ঠিক হয় যুবকদের জড়ো করে যে কাল থেকে চারজন - পাঁচজন করে ঘরে ঘরে ঢুকে রোয়াজার ষড়যন্ত্র ফাঁস করবে। শুরু হলো পুরোদমে প্রচার।

রোয়াজার কানেও আসে সেই প্রচার । নিজেকে নিজে ঠিক রাখতে পারে না। কলকির পর কলকি তামাক টানে । চাপা উদ্বেগে নিজেই নিজেকে জঘন্যতম পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শে ঠোঁট কামড়ায়। ক্রুরভাবে মাথা নাড়ে। কাউকে কিছু না বলে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেয় যারা তারা সব কিছু পারে।

বাপের ক্রুরভাবে মাথা নাড়ানো দেখে মানরুং ভয় পায়। কি জানি কোন সর্বনাশের দিকে ঘটনা গড়াতে চলেছে। আশংকা করতেই দু'দিন পর দেখা গেল দুই আগন্তুক রোয়াজার বাড়ীতে এসে হাজির। একজনকে চিনে গ্রামের সবাই। নাম পূর্ণভদ্র। এই পাহাড়ের কুখ্যাত ডাকাত। ওকে দেখতেই বোঝা যায় সর্বনাশের আভাষ। ভাড়াটে খুনীর কাজ করে।

পাড়ার ছেলেরা ছুটে গিয়ে মালিরায়কে পূর্ণভদ্রের আগমনের কথা জানায়। মালিরায়ও কম না। নীলোফা যে বিলের মাছ, মালিরায় সেই বিলের বক। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলো কন্যারামের বাড়ী। কন্যারাম রোয়াজা হলেও বিরাট ডাকাত সর্দার। এলাকায় পরিচিত ভয়ঙ্কর নাম। হিংস্র জন্তুর ভয় যেমন আছে পাহাড়ে তেমনি ডাকাত দলের অত্যাচারেও পাহাড়বাসীরা অতিষ্ঠ। বড় বড় কয়েকটা ডাকাত দলের এই শাখান্ পাহাড়টা মুক্ত বিচরণভূমি । থানা, কোর্ট কাছারী, পুলিশের বাধ-বাধন থেকে বহুদূরে ডাকাত দলের অনবরত লুণ্ঠন, খুন, গৃহদাহ, এমন কি ধর্ষণ পর্যন্ত বাদ যায় না। আইন-কানুন তাদের হাতে। রাজার শাসনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বল্গাহীন অবস্থায় চলে তাদের শাসনও। যে কোন পাড়ায় পর পর তিনটি গুলির আওয়াজ হলে লোকে বোঝে ডাকাত। এটা জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত সংকেত। ডাকাতরা নিজেরাই গুলি করে এই সংকেত জানায়।

কন্যারাম, তাংকারায়, রেজাচন্দ্র, ভাগ্য, প্রভৃতিরা এই পাহাড়ে নৃশংস প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। কন্যারাম, রোয়াজার দলে আগ্নেয়াস্ত্র তো বেশীই, লোকজনও প্রায় ষাটজনের মতো। কন্যারাম নিজে ডাকাতি করতে যায় না। কিন্তু তার দল রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে চিটাগাঙের মায়ানী বন, রিজার্ভে পর্যন্ত হানা দেয়। সোনা, টাকা, কাঁচা টাকার মল, রুপার অলংকার, পিতল বাসন, কাপড় সব লুঠ করে জমা রাখে কন্যারামের হেফাজতে । নিজে কন্যারাম দু'হাতে বন্দুক চালাতে পারে। হাতের নিশানাও অব্যর্থ। উড়ন্ত পাখী বা ছুটন্ত চিল অনায়াসে গুলি করে ফেলতে পারে। অনেকে বলে কন্যারাম উদার। বড় বড় ধনীদের কাছ থেকে ধান, চাল লুঠ করে নিয়ে গ্রামের গরীব মানুষকে বিলিয়ে দেয়। ডাকাত দলকে নির্দেশ দেওয়া আছে তার শিশু কিংবা কোন নারীর উপর অত্যাচার করা চলবে না।

কন্যারামের দল যেখানে ডাকাতি করবে আগেই অতিথি সাজিয়ে ওই পাড়ায় একজন ডাকাতকে পাঠানো হয়। সব খবরাখবর সংগ্রহ করে তবেই অভিযান চালায় লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে।

কন্যারামের কথা লঙ্ঘন করে ওর দলের কোন একজন মালিধর পাড়ায় নাকি একটা কিশোরীকে আক্রমণ করেছিল। অভিযোগ আসতেই কন্যারাম ওই ডাকাতকেনিয়ে যায় বাখাইছড়াতে। লোকজন দিয়ে বাঁধ বাঁধে। এক দিকে জল বাড়ে অন্যদিকে একটা গর্ত খুঁড়ে নারী নির্যাতনকারীকে গুলি করে ফেলে দেয়। তারপর বাঁধ ভেঙ্গে জল ছাড়ে। ছড়ার গর্তেই সেই কবরখানার আর চিহ্ন থাকে না। এমন নিষ্ঠুর নৃশংস কাহিনী শুনে পাহাড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। আবার কন্যারামের প্রতি আস্থাবিশ্বাস ও বাড়ে স্বাভাবিকভাবে। কন্যারামের আইনে বিশ্বাসঘাতক বা নারী নির্যাতনকারীদের মৃত্যুদন্ড ছাড়া অন্য দন্ড নেই। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী মুলতঃ তাংকারায়। সামনাসামনি সমাজের কোন বিচারে বসলে দুজনেই আবার খুব বন্ধু বন্ধু ভাব দেখায়।

এই পাহাড়ে তাংকারায় ডাকাতের দলবল আছে যেমন তেমনি ছাউমনু থানার দারোগা পুলিশের সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক। নীলোফার ঘরের আগন্তুক পূর্ণভদ্র তাংকারায়েরই বিশ্বস্ত অনুচর। নীলোফর সঙ্গে তাংকারায়ের গোপন চুক্তি হয়েছে। কন্টকশূণ্য আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে পৃথিবী থেকে মালিরায়কে সরাতে হবেই।

তংকারায় বড় বিপজ্জনক মানুষ। সহজ-সরল পঞ্চাশ-ষাট রিয়াং পরিবারকে নতুন জুম চাষের পাহাড় দেবে বলে ফুসলীয়ে নিয়েছিল মায়ানীবনের গভীরে, গহন বনে। কোথায় জুম চাষ। চারদিক থেকে বনের ভেতরে ঘেরাও করে ইচ্ছে মতো ওদের রুপোর মালা, বাসনপত্র, টাকা সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। তখন জনসাধারণের মধ্যে কয়েকজন রুখে দাঁড়ায়। আহত হয়ে পালিয়েও বাঁচে। কিন্তু তখনকার মতো বাঁচলে কি হবে। ওই লোকগুলো ফটিকরায় বাজারে কয়দিন পর গিয়েছিল। ফটিকরায় থানায় ওদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ জানিয়ে, থানার দারোগাকে আয়ত্তে এনে ওদেরকে গ্রেপ্তার করায়। আবার তাংকারায় নিজেই গিয়ে থানা থেকে ওদের জামীনে ছাড়িয়ে আনে। বিনিময়ে শূয়োর, মুরগী, কাঁচাটাকা, কাপাস ইত্যাদি দিয়ে তাকে খুশী করতে হয়। দলে লোক কম। কিন্তু কুট কৌশলে কপটতায় ওর সাথে তুলনা চলে না কারো। সুযোগ বুঝে সাপ হয়ে কামড় দেয়। আবার কখনো ওঝা হয়ে বিষ ঝাড়তেও পিছুপা হয় না।

তাংকারায়ের নিজের দলে সাহসীর সংখ্যা কম হলেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে চাকমা ডাকাত রেজাচন্দ্রকে ব্যবহার করে। কারণ ওর ডাকাতির কায়দাও আলাদা। যে গ্রামে যাবে আগেই লোক পাঠিয়ে কখন যাবে, কি রান্না হবে জানিয়ে দেয়। এত দুঃসাহসের পেছনে মূল শক্তি হল তংকারায়। উত্তর লংতরাই পাহাড়ে তার বিচরণ ক্ষেত্র। মানিকরায় রোয়াজা পাড়ায় ডাকাতি করতে যায়। শুয়োরের চাখুই, শূয়োরের ভুরুল দিয়ে রান্না করা বুকে নামক খাদ্য, বিন্নী চালের আওয়ান পিঠা, মুরগীর কলিজা ভোগ সাজিয়ে খাইয়ে দিয়েও রেহাই পায়নি। সব লুঠ করে। কিন্তু পথে গুরুচরণ রোয়াজা পাড়ার কাছে এলে, কন্যারামের দল গিয়ে গুলি করে। মৃতদেহটা একটা উঁচু পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয়. কেউ খোঁজও পায়নি। কাকপক্ষীও জানতে পায়নি।

রেজাচন্দ্র ডাকাতের মৃত্যুর পর তাংকারায় দুর্বল হয়েছে। তবু নতুন করে সাজিয়ে তোলে পূর্ণভদ্রকে। পূর্ণভদ্র একসময় হাতীর মাহুতের কাজ করতো বনে বনে। আসামের হাতীর মুসলমান মহাজনরা এলে হাতী ধরার, খেদার কাজের ঠিকা নিতো। এক বার এক বুনো হাতী ওকে ধরে আছাড় মারে। এতে একটা পা ভেঙে যায়। কিন্তু কোনরকম কলা কৌশল করে হাতীর শুড়ের প্যাঁচ থেকে পাহাড়ের ঢালুতে লাফিয়ে বাঁচে। এর পর খোঁড়া পায়ে হাঁটে। ওই ভাঙ্গা পা নিয়েই ডাকাতি

করে, খুন করে, দৌড়তে পারে। সামান্য পয়সার বিনিময়ে সে করতে পারে না এমন কাজ নেই। পয়সা যোগান দেয় তাংকারায়।

নীলোফা তাংকারায়ের মারফতে মালিরায়কে খুন করতে নিয়োগ করেছে— ওই খোঁড়া পূর্ণভদ্রকে । পূর্ণভদ্র কখন কোথায় কোন ঝোপের আড়ালে থেকে গুলি করবে টেরও পাবে না কেউ। অতর্কিতে আক্রমনের কাজে ওস্তাদ। এই পূর্ণভদ্র একমাত্র ভয় পায় কন্যারামকে। সেই কারণেই মালিরায় কন্যারামের কাছে গিয়ে হাজির। সম্পর্কে কন্যারাম মালিরায়ের পিসতুতো ভাই। যে দিন নালিশ সে দিনই কন্যারাম দলবল সহ পূর্ণভদ্রকে বাড়ী থেকে ধরে এনে মারতে মারতে সোজা হাজির হল নীলোফার ঘরে। নীলোফাকে পিছমোড়া করে বেঁধে বন্দুক তাক করতেই মনরুং সামনে কাঁপিয়ে পড়ে। মালিরায় মানরুঙের বাঁধার সামনে নিথর অবশ হয়ে গেলো। বাপের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে মালিরায়ের পা জড়িয়ে ধরে।অসহায়-অবলার করুন আবেদন, আমাকে পিতৃহীনা করার আগে আমার বুকে গুলি কর। নিস্তেজ হয়ে পড়ে মালিরায়ের হাত পা। কন্যারাম তখন বলে, নীলোফা এবার তোমার মেয়ের মুখেরদিকে চেয়ে ক্ষমা করলাম। তবে তুমি যে যড়যন্ত্র করেছিলে আমার মালিরায়কে মারার জন্য তা যদি সফল হতো, কি হতো ভেবে দেখো। চিন্তা করলে আমার গা শিউরে ওঠে ।

নীলোফা তখন বাক-শক্তিহীন । গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখে মুখে ভীষণ আতঙ্কের ছাপ । কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না তাকে ছেড়ে দেবে বলে। ভাড়াটে খুনী পূর্ণভদ্রের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা । গাল ঠোঁট কেটে, রক্ত ঝড়ছে। গালে থুতনিতে শুকনো রক্ত কালো হয়ে জমাট বাঁধে।

সম্বিত ফিরতেই নীলোফা শপথ করে আর কোনদিন এমন ঘোরতর পাকা চিন্তা করবে না। কন্যারাম মুচকি হেসে নীলোফার বারন্দায় বসে এক কলকি তামাক টেনে বিজয়ী বীরের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে নীলোফা তোমার যদি আপত্তি না থাকে মালিরায়ের সাথে মেয়েটাকে বিয়ে দাও। সুখে থাকবে। আর তুমি নিজে উদ্যোগী হয়ে রিয়াং, আসলং বিবাদ মিটিয়ে ফেলো । কয়দিন মানুষ বাঁচে। অন্ততঃ তুমি শান্তিতে মরতে পারবে।' কন্যারাম চলে গোলো।

অপমানে, রাগে, ভয়ে নীলোফার ঘুম আসে না । শরীর -দুর্বল। ঘর থেকে বেরোয়না। কথায় আছে হাতী ফাঁদে পড়লে চামচিকেও লাথি দেয়। সেই হুকোর পিটুনি খাওয়া গিরিকুমার এসে হাজির। আক্ষেপ করে বলে রোয়াজা ধর্মের ঢোল আপনি বাজে, আমাকে শূয়োরের অন্ডকোষ গলায় ঝুলিয়ে পরিক্রমা করিয়েছ, তুমিই গ্রামের মা-বাপ, আজকে তোমার আচরণেই তোমার পক্ষে গ্রামের কেউ লাঠি বন্দুক ধরলো না। নীলোফা নিরুত্তর। ধীর স্থির ভাবে নিজে নিজেই বিবেচনা করে দেখে যে কন্যারামের প্রস্তাবটা মন্দ নয়। শত্রুতা বাড়িয়ে মানসিক জ্বালায় দগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই এর চেয়ে মঙ্গল, মালিরায়কে মেয়ে দিয়ে হাতের মুঠোয় আনা। আরো প্রভাব বিস্তার করা।

এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নীলোফা মগ্ন। আগের মতোই মালিরায় শিকারে গেলে, হরিণ পেলে সামাজিক রীতি অনুযায়ী মাথাটা রোয়াজার বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেয়। এতে কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

রোয়াজা বাইরে কোথাও গেলে, লাকড়ি কাটা, জুমের কাজ, সবই দলবল নিয়ে করে দেয় মালিরায়। [illegible] সব কাজে রিয়াং ছেলেদেরকেও নেয়। নীলোফার ঘরে চালার ছাউনী হবে একদিনে মোটা মোট[illegible]গের মুঠো কেটে আনে। কেউ বেত চিরে, কেউ বাঁশ কাটে আবার কেউবা চালায়

ছনের গোছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে তোলে। কেউ চালায় বসে ছণ মেলে, ছাউনি পেতে বেত দিয়ে বাঁধে। এদের মধে আসলং, রিয়াং ভেদাভেদ নেই। সবাই এসে কাজ করে। মানরুং কখনো জল, কখনো তামাক সাজিয়ে কলকি ভরে হুঁকো এগিয়ে দেয়। তৃষ্ণা না পেলেও ঘন ঘন জলের ঘটি নিয়ে ছোটে। চোখে তার ক্লান্তির মধ্যেও খুশীর ঝিলিক খেলে। জল খাওয়ানোর অজুহাতে বার বার আসে যায় মানরুং।

চালায় তখন ছনের আঁটি মেলতে মেলতে সপ্তরায় ঠোঁট টিপে হাসে মালিরায়ের দিকে চেয়ে। আস্তে আস্তে বলে, বিয়ের আগেই যেন মন-প্রাণ ধন সব সঁপে দিতে চায়।

নীলোফা বিস্ময় ভরা চোখে মালিরায়ের সংগঠিত শক্তির প্রকাশটা দেখে। একদিনে সাতদিনের কাজ যন্ত্রের মতো করে যাচ্ছে। কারো চোখে মুখে ক্লান্তি বিরক্তি বা অবসাদের কোন চিহ্ন দেখে না।

কাজ শেষ হলে কয়েক কলস মাইনি চালের লাঙ্গি মদ বের করে ছেলেদের পান করতে দেয়। মদের আসর জমে। চোখে মুখে রক্তিম আবেশের আমেজ জড়ানো। নীলোফা সবাইকে ডেকে বলে, - আমার ছেলেরা, আমার বংশ ধারার সন্তানরা, আজকে আমি অনুতপ্ত, অনেক ভুল করেছি। তোমরা ছোট রিয়াং,আসলং মিলে মিশে চলছো ভালকথা। তবে মুখে মুখে বন্ধুত্ব করলে চলবে না। সপ্তরায় আর মালিরায় মিলে দাংদুয়া করো। দাংদুয়া মানে বন্ধুত্ব পাতানোর সামাজিক অনুষ্ঠান। ভোজসভা করে একটা বড় শূয়োর কেটে লোকজন ডেকে বন্ধুত্বের শপথ নিতে হবে। এর জন্য সামনের পূর্ণিমা তিথিটাই ভালো। দাংদুয়ার খরচপত্র সব আমিই বহন করব। আর তোমাদের আপত্তি না থাকলে অনুষ্ঠানটা আমার ঘরে করতে চাই। কি বলো। সবাই সায় দেয়।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি। নীলোফার ঘরে গম গম। লোকজনের প্রচুর সমারোহ। সপ্তরায় এর আত্মীয় স্বজন, তাদের সর্দার কর্ণমুমিসহ মুরুব্বিরা হাজির। নাতিন মনুর আট-পাড়া থেকে রোয়াজারা, সর্দাররা এসেছে। মানিকপুরের এগারজন দলপতি। মালিধর এলাকার চৌদ্দজন ছোট বড় সর্দার, এরা সবাই উপস্থিত। সকাল থেকেই অনুষ্ঠান চলছে। কলস কলস লাঙ্গি মদ সাজানো। তার উপর বোতলের মদও প্রচুর। বড় বড় দুটো খাসি শূয়োর মেরে আগুনে ঝলসিয়ে কেটে কুটে রান্না। তার উপর আবার একটা বিরাট কালেশ্বর হরিণও। নীলোফা বাঁশের হুঁকো টানতে টানতে লোকজন আপ্যায়ন করে। কখনো রান্নার দিকে ফাঁকে গিয়ে দেখাশুনা করে। সপ্তরায় ও মালিরায় সেজে গুজে যে আসে তাকেই প্রণাম জানিয়ে বোতল এগিয়ে দেয়। রাখাইছড়ার জলে অচাই একটা মুরগী কেটে ভুরুল বের করে। ভুরুলকে সে নেড়ে চেড়ে ভুত, ভবিষ্যৎ, শুভাশুভ বিচার করে।

কিছুক্ষণ নিরিক্ষণ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, অপূর্ব বন্ধুত্ব হবে। কেউ কাউকে ঠকাবে না। গ্রাম-দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষেও এই দাংদুয়া বন্ধুত্ব উপকারে আসবে। তবে শেষ জীবনে ছাড়াছাড়িও হতে পারে। কোন ঝগড়া-বিবাদ করে নয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে দুজনের একজন এই পাহাড় ছেড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার সংকেত পাচ্ছি। রিয়াং, আসলং গুরুজন মুরুব্বীদের পা ছুঁয়ে একে একে দুই বন্ধু মিলে প্রণাম জানায়। নতুন কাপড় একজন আর একজনকে উপহার দেয়। নিজেদের বাপ - মাকেও প্রণাম করে।

পাথর, কাপাস, ধান, মরিচ, মাটি, জল ছুঁয়ে দুজনে সভাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা দেয় - সুদিনে, দুর্দিনে, উৎসবে-পার্বনে, অনাহারে - আহারে একজন আর একজনের পাশে থাকবে। এই বন্ধুত্ব আমৃত্যু অটুট থাকুক।

আনন্দে যুবকরা আত্মহারা। কেউ মদে বিভোর হয়ে ঢলে, কেউ মাদল বাজায়, কেউ কোমড় দুলিয়ে নাচে টালমাটাল পায়ে। মেয়েরাও বাদ যায় না। কেউ বাঁশের দাংদু বাজায়, দুংদাং, দুংদাং শব্দে । কেউ বা আবার সুরে-বেসুরে ধরে সোজাকথায় আনন্দের নামে বিরাট হট্টগোল। তারই মাঝে ফুটে ওঠে এক অনাবিল মুখরতা।

নীলোফাকে গলায় জড়িয়ে ধরে কর্ণমুণি রিয়াং। সপ্তরায়ের বাপ সমচন্দ্র ভীড়ের মধ্যে মালিরায়ের বাপ তয়াংকে খোঁজে । দুজনে গলাগলি করে কাদে। অদ্ভুত আনন্দ ধারার মধ্যেই বিচিত্র মিলনের সুর বাজে। রিয়াং, আসলং দুই গোষ্ঠির সেতু বন্ধনের সমারোহ অনুষ্ঠান।

কণ্ঠে আবেগ কারো, কারো চোখে জল। কেউ আবার হেলায়-ফেলায় অগোচরে, নেশার ঘোরে। চোখের জলে দুই গোষ্ঠির দেয়াল গলে যেন ঢলে পড়ে।

নীলোফার মেয়ে মানরুং টং ঘরের নীচে উঠোনে এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে । অনেক ঝড়ের ধকল যাওয়া বালুচরের মুখে দেহে কেমন একটা রুক্ষতা। তবু দীর্ঘস্থায়ী রিক্ততর, বিষন্নতার হা-হুতাস যেন আজকে থমকে দাঁড়িয়েছে। নিরাশার দমক হাওয়ায় ব্যথা ভরা চোখ দুটো জ্বল-জ্বলে হয়ে উঠে অপূর্ব এক আশার উজ্জ্বলতায়। নাকের. নীচে অষ্টমী চাঁদের মতো নোলক ঝিকিমিকি চমকায়। ঠোঁটের মিটমিটে হাসিতে সুখকর সংসারের অনাগত স্বপ্নের অজানা লু.কাচুরি খেলা।

মাস -দুয়েক পরেই বিয়ে হলো মানরুঙের সঙ্গে মালিরায়ের । তবে তিন বৎসর জামাই খাটার শর্তে। আসলং হোক; রিয়াং হোক জামাই খাটা এক কঠিন রীতি। বলা যায় পুরুষ মানুষটা তিন বৎসরের জন্য শ্বশুরবাড়ীতে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা। ভোরে উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, শ্বশুরের হুকোতে জল বদল করা, এমন কি সকালে চুলোয় আগুন ধরানো পর্যন্ত জামাইকে করতে হয় ।

স্বামী-স্ত্রী মিলে ধান কুটে কখনো। কখনো লাকড়ি কেটে ঘরে জমায়। দূরের পাহাড়ী ছড়ায় গিয়ে মাছ ধরে কখনো। শ্বশুরের আদেশ মতো উঠ-বস করা। ঘরের ছন, বাঁশ, বেত সব কিছু করতে হয়। তা ছাড়া জুম চাষের ঝক্কি, ঝামেলা সব তাকেই পোহাতে হয়। প্রথম প্রথম অসুবিধা হতো। মানরুঙের মার সাথে বনিবনা কম। বুড়ো শ্বশুর কিন্তু মোটামুটি মানিয়ে নেয়। বুড়ী কিন্তু নিমেষে নিমেষে ছিদ্র অন্বেষণ করাটাকে মজ্জাগত করে ফেলেছ। জামাইটার জন্য সহানুভূতি খুব কম।

অথচ নীলোফা মুরগীর কলজেটা বা শুয়োরের চর্বিযুক্ত মাংসের টুকরোটা জামাইকে না দিয়ে কোনদিন খায় না। জামাই কিছুক্ষণ অনুপস্থিত থাকলেই বুড়ীকে বকে বলে পরের ছেলেকে আদর করতে না জানলে বুড়ো বয়সে ঘরে মরে থাকবে। কেউ আর দেখতে আসবে না। মৃত্যুর পর এই ছেলেটাইতো তোমার শ্রাদ্ধ শান্তি করবে,তীর্থে তোমার অস্থি বিসর্জন করবে। আড়াল থেকে মালিরায় সব শোনে কোন এক লজ্জাবনত মৌনবধূর মতো। এক এক বার ইচ্ছেও হয়েছিল বউটাকে ছেড়ে চলে যাবে। এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর সয় না। আবার ভাবে কি দোষ মানরুঙের। এটাযে পাহাড়ী জীবনের অভিশপ্ত কঠোর নিয়ম। এই নিয়মের ঘূর্ণিপাকে পড়ে তার মতো ডানপিটে ছেলেকেও কাবু হয়ে একেবারে ভাজা মাছ উলটিয়ে খেতে পারে না ধাঁচের মানুষের অভিনয় করতে হচ্ছে।

কেউ বলে এই প্রথা থাকা ভাল। কণের বাপ মারা তারা চিরকালই এই প্রথার পক্ষে

থাকে। এই প্রথা আছে বলেই বৌ-এর প্রতি দরদ, ভালবাসা, কর্মক্ষমতা স্বাবলম্বী হওয়ার দৃঢ়তা বাড়ায়। জামাই-বউ ছাড়াও বউ এর আত্মীয় স্বজনকে কত কাছে টানতে পারে এটা তারই পরীক্ষা।

কেউ বলে, মেয়েটা খাইয়ে - পরিয়ে এতদিনে বড় করলাম তার কি কোন দাম নেই। মেয়ের এতদিনের ভরণ-পোষণের খরচা খাটুনী দিয়ে পরিশোধ করার আর এক নাম জামাই খাটা। সেই জন্য সামাজিক বিধিও আছে খাটুনী দিয়ে নিতে রাজী না থাকলে দাক্ষা নির্ধারক করেও নিয়ে যায়। দাক্ষা মানে নগদ, মেয়ে বিয়ের জন্য পুরুষরা যে পণ দেয়।

ধূসর অতীতে নারী শাসিত দেশে পুরুষদের নিয়ে যেতো নারীরা। কালক্রমে নারীর প্রাধান্য কমছে। প্রাধান্য খর্ব হলেও তারই প্রতীক হিসেবে জামাই খাটার প্রথা রয়ে গেছে সযত্নে। দিন যত যায় ক্রমশই তা অবলুপ্তির পথে যাচ্ছে এই প্রথা। বিলুপ্তির পথে চললেও গ্রামে পাহাড়ে ষোল আনা ঠিকআছে। তবে কোন কালে জামাই খাটার মেয়াদ ছিল বারো বছর। সমাজপতিরা মিলে কমিয়ে আনে তিন বছরে। সমাজ বিকাশের ধারা যত ভিন্নতর হয় তত ঢিলে ঢালা হয়ে আসে সমাজ অনুশাসনের নিয়মগুলো।

যে রোয়াজা একসময় তাকে দেখলেই বিদ্বেষে জ্বলে উঠতো, জন্ম থেকে চিরশত্রু বলে যাকে চিনতো কালের ধারায় সেই রোয়াজার সব চেয়ে বিশ্বস্ত আত্মীয় এখন মালিরায়। জরাজীর্ণ বার্ধক্য পীড়িত জীবনের শেষে ঠেস দেওয়ার মতো অবলম্বন এই মালিরায়।

মালিরায়কে এখন কিছুক্ষণ না দেখলেই বুড়ো বিচলিত হয়ে পড়ে। প্রিয়জন বলে কোন বিপদ বুঝি হলো বলে আশংকায় সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকে ।

একবছর যেতে না যেতেই মালিরায়ের বড় মেয়ের জন্ম হয়। নাম রাখে সিদাবী। তখন থেকে মালিরায়কে সিদাফা বলেও ডাকে। সিদাবীর জন্মের পর রোয়াজা আর রোয়াজার বউ শিশুটাকে নিয়ে মজে থাকে। রোয়াজা পিঠে নিয়ে ঘুরবে না রোয়াজা বৌ পিঠে নিয়ে ঘুরবে, এই নিয়ে বুড়ো-বুড়ীতে কলহ।

মানরুঙ বিয়ের পর যত না সুন্দরী ছিল সিদাবীর জন্মের পর আরো যেন সুন্দরী হয়ে ওঠে। দেহে আগে কোমলতা ছিল না। দিন যায় মালিরায়ের চোখে মানরুঙকে যেন আরো কোমল লাগে। গোবিন্দপুর বাজারে মানরুঙকে না নিয়ে গেলে বাজারটা যেন তার খালি লাগে।

গোবিন্দরোয়াজার নাম অনুসারে গোবিন্দপুর নাম। গোবিন্দপুর বাজার বলতে দুই মুসলমানের দোকান। মনির মিঞা আর আহমেদ মিঞা। দুই ভাই। চট্টগ্রামের পার্সী বাজার থেকে এসেছিল। চিঁটা, নুন, বিঁড়ি, ছড়ী, মাছের শুটকী এবং সিঁদল এই দোকানের পসরা। মনির মিঞার দোকানটা অবশ্য একটু আলাদা। এই সমস্ত পসরা ছাড়াও বাবাজির বাঙরি নামক রুপোর বালা, কাঁচা টাকা বা সিকি আধুলির মালা, আংটি ও কানের নানা রকমের অলংকার ছিল। আর ছিল মিঠাই। মিঠাই বলতে সট্‌কা, নকুলদানা, বাতাসা এবং শক্ত শক্ত কুকিস বিস্কুট। হাটবারে দুই সারি বসতো। তিল, কাপাসের মহাজনরাও আসতো ফটিকরায় থেকে। কিছুটা পথ নৌকায়, কিছুটা পথ পায়ে হেটে। এখন অবশ্য পাহাড়ের নীচে থালছড়াতে বসে। হাটবারে রোয়াজার ঘর গমগম করতো, মালিরায়ের বাড়ীর লোকেদের ভিড়ে। মালিরায়ের বাপ তয়াং রায় আনতো এক পুটলা মিঠাই, মালিরায়ের ভাই থাকসা রায়, মালিচান ওরাও আসতো সিদাবীকে একটু কোলে করে হাসিয়ে কাঁদিয়ে চলে যেতো যে যার ঘরে। ভাইঝির জন্য একটা কিছু দিয়ে যেতো।

সিদাবীকে হাটবারে মালিচান আর থাকসা রায় দুই কাকা মিলে নিয়ে আসে হাটে। সিদাবীর জন্য কুকিস বিস্কুট, ছোট হাতের বাঙরি অরো কত কি কিনে দেয়। সিদাবীর তখন ওটা কি, ওটা কি, কেন, এই ধরনের হাজারো প্রশ্নে বিব্রত হয়ে উঠে কাকুরা।

ততদিনে মালিরায়ের আর এক ছেলে জন্মে। নাম তার উড়াইমনি। সে বছর দেড়েক হতেই জামাইখাটা শেষ করে বাড়ী ফেরে মালিরায়। ঘর গৃহস্থী পুরোদমে চালায়। গ্রামের এখন ষোল আনা মোড়ল। সিদাবীও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠে। সিদাবীর যখন প্রায় বার বছর বয়স তখন মালিরায় সাতসন্তানের জনক। উড়াইমনির পর উড়াইবতী, দারিমকি, কাংসিমণি, দ্বরানন্দ, সর্ব কনিষ্ঠজন পুষ্পদা।

লোকে বলে মানরুঙ পূণ্যবতী, ভাগ্যবতী। নইলে এত অল্প বয়সে সাত-সাতটা সন্তানের মা হতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে নাদুস নুদুস। ছেলেমেয়েরা যেমন সবল তেমনি ওদের মাও। মানরুঙকে দেখিয়ে যে কোন ছেলেকে বালিকা বলে জামাই খাটানো যাবো। আসল কারণ যেমন খাটুনি করে তেমনি খায়। মালিরায় নিজে শিকারী। এমন কোন বেলা নেই, যে বেলা ওদের মাংস ছাড়া খেতে হয়েছে। তাই কঠোর পরিশ্রম করলেও দেহে রুক্ষতা নেই। ভোগ, বিলাসিতা, প্রাচুর্য্যের প্রতিফলন গায়ে। কোমলতা ও প্রাণে উচ্ছলতায় উপচে পড়া, ভরাট যৌবনের দোলায় শরীর দোলে সারা বন আলো করে। এদিকে অসুরের মতো শক্তি মালিরায়ের দেহে। গ্রামের পাঁচ - পরিবার মিলে যে জুম কাটে একা সে ঐ ধরনের জুম চাষ করে। বাড়তি সুবিধাও আছে অবশ্য। শ্বশুর নীলোফা রোয়াজা দুহাত ভরে জামাইকে সাহায্যে করে। বলা যায় বীজ ধান থেকে শুরু করে কামলা খরচ, নিড়ানী, ধান কাটা, ফসল তোলা, সব কিছুতেই অঢেল পয়সা ঢালে।

লোকসংখ্যার দিক দিয়েও,গ্রামে এখন তারাই বেশী। মালিরায়ের বোন বিপচ্ছড়িকে এই গ্রামেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরকুমারের কাছে। তা ছাড়া মালিচান, থকসারাই, দুইভায়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক। সর্বোপরি রোয়াজার বংশের সংখ্যাটাতো সঙ্গে আছেই।

যখন মালিরায়ের বংশ জুড়ে ধনে জনে রমরমা তখন ওর রিয়াং বন্ধু সপ্তরায়ের ঘরে অমাবস্যার মতো অন্ধকার জমাট বাঁধে।

এতদিন পরেও সপ্তরায়ের ঘরে কোন সন্তান এলোনা। গ্রামে তার বয়েসী সবাই ছেলে মেয়েদের নামে পরিচিত। সতীর বাপকে বলে সতীফা, কেউ হয়ত মনেলফা, কেউ বা সত্যফা। তখন তাকে কেউ অমন ডাকে ডাকে না তবে বানচিফা ডাকে। বানচিফা মানেই শূন্য সন্তানের বাপ। এতে রাগ করলেও প্রকাশ করে না। মনে মনে বড় ব্যথা লাগে। সমাজে আচার বিচারে বসলে মর্যাদা যেন কম কম লাগে।

পুরুষ হয়ে যে মানুষ সন্তান পায় না তাকে দেখা অমঙ্গল। ওকে দেখে শিকারে গেলে শিকার মিলে না। বিয়ের প্রস্তাব দিতে গেলে বিয়ে ভাঙে। প্রথম জুম কাটবে বলে কেউ যদি যাত্রা করে, পথে কোন না কোন বাধা আসবেই। এই ধরনের একটা ধারনা পাড়া জুড়ে। সপ্তরায় জানে কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করে না। পুরুষত্বের একটা অপূর্ণতার গ্লানিতে, অপমানে বুকটা কুরে কুরে খায়। কাছে পিঠে অনেক মুখরা মেয়েলোক ঠোঁট টিপে হাসে। ওর সামনে কাপড় চোপড় শিথিল করে স্নান করতেও লজ্জা করে না। বয়স্ক মুখরা দু-একজন তো বলেই ফেলে অস্ত্রহীন সৈনিককে ভয় পাওয়ার কি আছে। কেউ বলে ওর টাকা আছে, যাও দুদিন ঘর করে টাকা পয়সা

লুটে নিয়ে এসো, এতে তোমার সতীত্ব নষ্ট কিছুতেই হবে না। এই ধরনের কথা উড়ে এসে জুড়ে বসে কানে। মনে মনে অনুসন্ধান করে, দোষটা ওর বউ রূংবাংতির না, নিজের। কখনো ভাবে রূংবাংতিকে ছেড়ে অন্য কোন বউ আনবে। তাতে যদি অন্য বউ এর ঘরেও সন্তান আসে, তখন দোষ পড়বে তার। কেউ বলে ভিটে মাটীর দোষ। রূংবাংতি তাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। অন্য কাউকে বিয়ে করা মানেই যে ভালোবাসার অমর্যাদা করা। অমর্যাদা করা ছাড়া উপায় নেই। বংশের একটা চিহ্ন থাকবে না। এত নিষ্ঠুর পরিণতি ভাবতে গিয়ে সপ্তরায় শিউরে উঠে। রূংবাংতির পেটে সন্তান কিন্তু আসে। প্রসবের সময় শুধু মরা সন্তান বেরোয়। পর পর তিন তিনটে সন্তান হয়েছে। বৈদ্য, অচাই, কত আসে। কত অনুষ্ঠান যে করেছে তার ঠিক নেই। অচাই বৈদ্যের আগমন দেখলেই ঠোঁট টিপে হাসে গ্রামবাসীরা। এসেই মুরগী কাটে, শুয়োর কাটে, তারপর একটা কবচ দিয়ে যায়। এত কবচ রূংবাংতির কোমরে, হাতে, গলায় মাদুলী পড়ার জায়গা নেই। আগন্তুক দেখলে টীপ্পনী কেটে বলে কেউ-

সামুং কুরুই খে লুই বাই থুংদি
লুই কুরুই খে রাং বাই থুং লি

অর্থ হলো কাজ না থাকলে পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলো, আর পুরুষাঙ্গ না থাকলে টাকা দিয়ে খেলো। এসব কথা সপ্তরায়ের কানেও পৌঁছে, অশান্তি বাড়ে।

সপ্তরায়ের অশান্তি উদ্বেগ বুঝে মালিরায়ও বিচলিত। মালিরায় নিজে বেরোয় বৈদ্য খুঁজতে। মাস খানেক পরে দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে নিয়ে এলো এক নামকরা বৈদ্য। নাম তার তংমাং অচাই। রূংবাংতিকে দেখেই বলে "তোমার এই নাদুস নদুস চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি তোমার পেটে সন্তান টিকবে না। সন্তান বাঁচাতে হলে তোমাকে অনেক কিছু মানতে হবে। তোমার দেহের এত তেল পেটের সন্তান সহ্য করতে পারে না। গাইল সিয়ার কাজ হরদম করবে। ধনী ঘরের বউ বলে ঘরে বসে থেকোনা। পাহাড়ের নীচে থেকে জল আনবে। আনাজ তরকারী খুঁজতে যেয়ো। উঁচু নীচু পাহাড়ের ধার ধারবে না। যত পারো পরিশ্রম করবে। শুয়োরের তেল, বা অন্য কোন জন্তুর তেল খাওয়া নিষেধ। খাওয়ার সময় বাঁশ কুরুল, কলার থুর, কলা একটা গাছ, কচু এসব খাবে। তা ছাড়া একটা অপদেবতা গর্ভ-অবস্থায় তোমার সঙ্গ নেয়। কালো জোড়া মুরগীর বলি দিয়ে পুজো দেব। তা ছাড়া জাড়িবুটির একটা ঔষধ দেবো। দশমাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার বিশ পঁচিশ দিন আগে ঔষধটা খেয়ো। মঙ্গল বা শনিবারে খাবে। দু'দিনেরমধ্যে পেটের ব্যথা হবে। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে সন্তান প্রসব হতে বাধ্য। সন্তান জীবিত হলে আকারে হবে কিন্তু ছোট, একেবারে মানব শিশুর মতো। তবে কয়েক মাস বুকের দুধ খেলে চেহারা ভালো হবে। রুংবাংতি মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো গিলে ফেলে।

পুজো দিল অচাইকে দিয়ে। মুরগী, কলস ভরে মদ, ধুতি, নগদ টাকা, অনেক কিছু দিয়ে খুশী করে অচাইকে বিদায় জানায়। মালিরায়, সপ্তরায় অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে অনাগত শিশুর আগমনের জন্য।

রুংবাংতি কঠোরভাবে পালন করে সমস্ত নিয়ম। চেহারায় অবাঞ্ছিত মেদ কমে। আগে রানীর মতো ভারিক্কি চালে চলতো। মেদ কমে ক্ষিপ্র পাখীর মতো এখন চলাফেরা করে। দশমাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার বিশদিন আগেই ব্যথা ওঠে পেটে। এবার সত্যি সত্যি এক জীবন্ত কন্যা সন্তান

আসে। কুমায়ুক মানে ধাত্রীরা নামাকরণ করে থাকে। রীতি অনুযায়ী মেয়ের নাম হলো পনদিরুং। বানচিফা নাম ঘুচে। সপ্তরায় তখন থেকে পনদিফা নামেই পরিচিত হলো।

বাঁচবে কিনা আশঙ্কা ছিল। তিনমাস যেতে না যেতেই মেয়েটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। দোলনা দোলে। হাত পা ছোঁড়ে। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা আদর করে এর কোলে ওর কোলে নিয়ে দৌড়ে, ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে, লোক গীতির সুর টেনে টেনে এর কোল থেকে ওর কোলে যায়। এমনকি ছোট ছোট মেয়েরা ঝগাড়া বাঁধায় কোলে নেওয়ার অধিকার নিয়ে । সন্তানের মধুময় উপদ্রব বাড়ে, সপ্তরায় আর রূংবাংতি দুজনে আরো কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী হয় মালিয়ারের কাছে। এই সন্তান যেন নিঃসন্তান দম্পতির মাঝখানে মালিরায়ের অকৃত্রিম স্মরণীয় উপহার।

পনদিফা পরম আগ্রহে লক্ষ্য করে ঘর অলো করে পানদিরুং এর দিন দিন বেড়ে উঠা। পানদিরুনের ওই হাসি মুখ, আব্দার, অভিমান, রাগের উপদ্রব পনদিফা মেনে নেয়। প্রতিদিন এক একটি করে ফরমায়েস। আজ তাউকখুরাজা পাখীর ছানা আনতে হবে। বাপ ছুটে যায় ভৃঙ্গরাজ আনতে পাহাড়ে। কাল বলবে বাঁশের চিরুণী আনতে হবে মা, বাপ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বাঁশের চিরুনী ঘরে আছে, তবু আরেকটা যোগাড় করো। ঘরে খেতে বসলেই মাংস খাবে না, গোদক খাবে না, চাখুই খাবে না, ভাত খাবে না। আবার গ্রামের লোকে ডেকে নিয়ে যা দেয় তাই খায়। তখন কোন বাছাবাছির ধারধারে না।

দেখতে দেখতে পানদিরুং বাপের তামাক সাজতে শিখে, মায়ের কাছে কাপড় বোনা শিখে। কাপড় রঙানোর লতাপাতা, গোটা চিনে বন থেকে শিকড়বাকড় লতাপাতা খুঁজে খুঁজে এনে মদের পিঠা বানাতেও শিখেছে। পূজাপার্বণের দিনে বিরনি ধানের আওয়ান পিঠা বানাতে জানে। গ্রামে ঘুরেঘুরে গান শিখে, শোনে শিখে। আসলিং পাড়ায় গিয়ে দস্তুর মতো দাংদু বাজানো শোনে — দেখে শিখে।

বাখাইছড়ার শিয়রে ওখাপাড়া থেকে মাইল সাতেক দূর। সেখানে পুরানো বাঁশবন । বছর বারো আগে সপ্তরাই সেখানে সেই টিলাতেই জুমচাষ করেছিল। তখনকার আগুনে পোড়া গাছের গুঁড়ি পচে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। রূপই, মিরতিঙ্গা বাঁশের পুষ্টতা কতো, কতটুকু পুরু দেখেই বোঝে মাটি কত উর্বরা। মাটির উর্বরতা ফলে ফসলে ফলদায়িনী হওয়ার দম্ভের চিহ্ন ওই পুরু বাঁশে ফুটে ওঠে।

এই টিলাই জুমের জন্য মনোনীত। জুম কেটে আগুন জ্বেলে টিলা সাফ হয়। ধান, কুমড়ো, চিনার, মকাই, সব কিছুই একসাথে মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বোনে। গাইরিং বানায় জুম খেতে। গাইরিং মানে জুমে গিয়ে কাজ করে থাকার ঘর। গ্রামের দশ জন জুমিয়ার মতো মেয়ে, মা কাজ করে, জুম পাহারা দেয়। প্রথম প্রথম সকালে কলার পাতায় ভাতে গোলা মোড়ে পিঠের খাড়ায় ভরে জুমে যেতো। দুপুরে কাজের ফাঁকে জুমের গাইরিং ঘরে বসে খায়। ফাঁকে ছড়া খেতে লাটি, চিংড়ি ধরে আনে চোঙায় ভরে। কেটে কুটে নুন মরিচের সাথে কচিকলার থোর মিশিয়ে সেদ্ধ করে।

বাঁশের কাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে চোঙার শাকসব্জী মাছ নুন মরিচ একাকার, গন্ধ ছড়ায় পেটের খিদের আগুনে উস্কে দিয়ে দ্বিগুণ রাগায়। ঝাল ঝাল স্বাদ। সঙ্গে জুম ধনিয়া ঘুঞ্জুর পুই থাকলে হুসহাস করে খাওয়ার কি মজা। মাতাল বাতাসে ঠান্ডা ভিজে ভিজে ভাব। ওই ভিজে বাতাস চোখমুখে গায়ে মেখে প্রাণ জুড়িয়ে গাইরিঙে বসে গোদক দিয়ে পচাভাত খাওয়া স্বর্গসুখের

চেয়েও সুখকর। দেহের ক্লান্তি অবসাদ ঝেড়েদুচোখ বুজে আসে অদ্ভুত এক আমেজে ।

বাঁশবন পুরনো ছিল তাই খুচানো ধান বৃষ্টির পরশ পেতে না পেতেই নেচে ওঠে। দু-দুবার নিড়ানী আগাছা সাফ করতেই পুষ্টধানের গোছায় পোয়াতি নারীর মতো বাতাসে অলস হয়ে হেলে দুলে। শ্রাবনের প্রথম সপ্তাহ কুমড়া ধরে জুম ভরে; চিনার পাকা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। জুমের পথের পাশে পাশে খুঞ্জুর পুই জুমের ধনিয়া মশলা পাতা মান্দার দেখতে অনেকটা তুলসী পাতার মতো এ মুইলর বাস্তা শুকনো মাংসে গন্ধ এলে কলার থোড়সহ গোদক বানিয়ে নিলে দুর্গন্ধ আসে না। বরং মুইলক বাস্তার গন্ধে স্বাদ বাড়ে।

থরে থরে জুমের ফসল বাড়ে। বানর, ভালুক হরিনেরা ওৎ পেতে বসে থাকে কখন জুমের মালিক একটু সরবে। সবাই কুমড়ার লোভ সামলাতে পারে না। তাছাড়া শ্রাবণ মাসে প্রায়ই বৃষ্টি হয় যখন তিন চারদিনেও তুলতে চায় না। এতদূরে রোজ রোজ আসাযাওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার। তার উপর ছড়াগুলো পাহাড় ধোয়া বৃষ্টির জলে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। ছড়ার উজানে হেঁটে হেঁটে যাওয়া দূরে থাক, ছড়া পার হতেই প্রাণ যায় যায় অবস্থা ।

বর্ষায় শ্রাবণের জল পাহাড়ে ধুয়ে যখন নামে ; এই ছড়া তখন বাঘিনীর মতো ফুঁসে ফুঁসে ছোটে। ধারালো নখের আঁচড়ে ঘামমাটী খুঁড়িয়ে ছাড়িয়ে বড় বড় পাথর গড়িয়ে গুড়িয়ে নুড়ি বানায়। শেকড় বাকড় সহ মিরতিঙ্গা বাঁশের ঝাড় পর্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে পথ চলে। বড় বড় চামল, কড়ই পারুল, গাছ দুমড়ে মোচড়ে জুমিয়ারা তখন গ্রাম ছেড়ে সপরিবারে গোটা সংসার নিয়ে গাইরিঙে যায়। মুরগী শুয়োর,কুকুর, থাল ঘটি, কাপড় কাঁথা, কাপড় বোনার যন্ত্রপাতি সব কিছু নিয়ে পাহাড়ে ওঠে। গ্রামে থাকে একেবারে থুরথুরে বুড়োবুড়ী বা পঙ্গু দু' একজন। পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব না, তেমনি পাড়ায় বাড়ী ঘর পাহারা দিয়ে থাকতে হয়। সপ্তরাই এর বুড়ো বাপ ঘর পাহারা দিয়ে থাকে বুড়ীকে নিয়ে।

শ্রাবণের প্রথম গাইরিঙে ওঠে সপ্তরাই, পনদিরুং আর তার মা ফসল কাটার মরসুম কাটাতে। নামতে নামতে অগ্রহায়ণের শেষের দিকে। শীতে হাওয়া আসবে, কুয়াশা নামবে ওরাও তখন পাহাড়ের জুম থেকে গ্রামে নামবে।

পানদিরুং গাইরিঙে এসে চঞ্চল হয়ে ওঠে চিং চিং পাখীর মতো। জুমের খেতে ঘুরে ঘুরে দেখে, চোখ জুড়িয়েও শেষ হয়না। চিং চিং পাখী পুচ্ছ নাচায়, ডাল থেকে ডালে লাফায়, তখন সবাই ভাবে খঞ্জনী। কিন্তু বুকে আবার সাদা ডোরা দাগ। বুঝিয়ে দেয় বাইরে চঞ্চলা মনটা তার দোয়েল পাখীর মতো ধীর স্থীর।

পনদিরুং বাপের আদুরে আব্দারে মেয়ে। সপ্তরায় যদি বলে তামাক ভরে কলকি আনতে । তামাক ভরে কলকিতে আংরা তুলে নিজে টানতে টানতে ধোয়া বের করে অর্ধেক তামাক শেষ হলে বাপের দিকে এগিয়ে দেয়। মেয়ের এই দুষ্টমি বাপ মেনে নেয়। গতবছর আশ্বিনে ধানকাটার শেষ দিনে ধানদেবীকে আনতে জুমে গিয়েছিল পানদিরুং। ''আমা মাইরুংমা'' ফসলের দেবী। ধানকাটা শেষ হলে স্নান করে পবিত্র হয়ে কুমারী কোন মেয়ে জুমক্ষেতে যায়। ধানের শীয না কেটে গাছ মাটিসুদ্ধ খুঁড়ে নতুন গামছায় বেঁধে, সেই ধান নিয়ে ঘরে তোলে। দেবীর পূজো হয়। ধান দেবীকে কুমারী ছাড়া অন্য কেউ আনতে পারে না। কুমারীকেও আবার নতুন পাগড়ি মাথায় বাঁধতে হয়। ঋতুবতী হওয়ার আগে পর্যন্ত পনদিরুং এর এই অধিকার ছিল। তখন

তার দুষ্টুমি মানাতো। এখন মানায় না।

পানদিরুং এখন ডাগর মেয়ে। চাউনি লজ্জা মাখানো। তবু চোখে ছলা কলা খেলিয়ে কথা বলা ফোটে। পাহাড়ে জুমিয়া ছেলেরা যেন দস্তুর মতো ওর দিকে তন্ময় হয়ে তাকায়। সুখকর অস্বস্তিতে প্রাণে দোলা দেয়। কিন্তু বাধা দেয়ার ইচ্ছে হয় না। বরং নিজেকে আরো সুন্দর করার চাপা সাধ জাগে। চুলে এলামেলো পাখীর বাসা আর থাকে না। পরিপাটী করে তিল তেল মেখে সযত্নে খোঁপা বাঁধে। হরিণের হাড়ের কাটা দিয়ে বাঁধা চুলের খোঁপায় আবার বুনো ফুলের গুচ্ছ। গলা ভরে রামকলার বীচির মালা, বুকের উপর সিকি আধুলির রূপোর মালা দোলে। যখন হাসে সারা শরীর দোলে, গালেও টোল পড়ে। ডিগামূলি বাঁশপোড়া আঙরা ধোয়া ক্ষারপানি হাড়িতে ভরে ঘাটে যায়। মাথা সাফ করে গায়ের ময়লা কাটায় রোজ। গায়ে যেন আগুন রাঙা রঙ আসে।

কখনো চৈত-মাসের শেষে ভোরে নাগেশ্বর ফুল পেলে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখে বোতলে। জল মিশিয়ে মাথায় মাখে, গায়ে মাখে যাতে সুগন্ধ ছড়ায়। গায়ের রমনীয় কোমলতা বাড়ে।

আগে দামাল মেয়ের বাধা বাঁধন হারা চলাচল। এখন অচিন কাউকে দেখলে মুখটা নত হয়ে ওঠে লাজুক লতার মতো। বাপ মায়ের চোখা চোখা কথা এখন মনে বিঁধে। এদিকে যেয়োনা, ওর সাথে কিসের কথা। অমুকের ঘন ঘন আসা যাওয়া ভালো না। এমন তরো নিয়ন্ত্রণ আর শাসন ভালো লাগে না। সঙ্কোচ বোধও বাড়ে দিন দিন।

নিজে কাপড় বোনে। কাপাসের বীজ ছড়াতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টা দুং দুং সুং তুলা ধোনে। সূতা কাটে। গলা ছেড়ে গান গায়। গানের সুরে জানান দেয় নির্জন বনে সে আছে।

অনেকেই যেতো সপ্তরায়ের টংঘরের পাশ দিয়ে নিজেদের জুমে। এই পথ ছাড়া আসা যাওয়ার আরো পথ আছে। তবু এই পথেই জুমিয়া যুবকদের আসা যাওয়ার পথ। ফাঁক ফোঁকরে চোখাচোখি হয়। পনদিরুঙের চোখের চাউনিতে যুবকদের বুকে তীর হানে। ইই হিহি-হি! হি হি হি! দূর থেকেই হ্রেষাধ্বনি দিয়ে জানান দিতো নিজেদের আগমন বার্তা। হ্রেষাধ্বনি দেওয়া মানে রিয়াং সমাজের রীতি অনুযায়ী প্রেম নিবেদন। পনদিরুং সাড়া দিতো না, মিট্ মিট্ করে হাসতো। সেই হাসি সম্মতির না তাচ্ছিল্যের বোঝা বড়ো দায়। দেয় ধরা দেয় ধরা একটা ভাব। তবু ধরা দেয় না অধরা থাকে। বেসুরা সুর হলেও অনেকে প্রেমের গান গেয়েছে সাড়া মেলেনি। আসল নাম সুইনাইহা। ঠাট্টা করে লোকে ডাকে সনারুই। এই গ্রামেরই জুমিয়া ছেলে। বড় লাজুক। মনে ইচ্ছে থাকলে কোনদিন পানদিরুংকে চোখ তুলে দেখেনি। মাদল বাজায় দারুণ। পাহাড়ী গীটার চমপ্রেঙ, সারিন্দা, বাঁশী এইসব নিয়ে আপন মনেই ডুবে থাকে। বিয়ের পরে সুইনাইহা বা রাঙা জামাই নামের অধিকারী। সুইনাইহা নামটা না ডাকতে না ডাকতে লোকে ভুলেও গেছে।

ছোটবেলাতেই মা বাপ হারা। সুনারুই মানে অনাথ। বড়বোনের জামাই ওকে লালন পালন করে। সেইজন্যই সবসময় নিজেকে ঋণী ভাবে। কঠোর পরিশ্রম করে মনে মনে বোন জামাই এর ঋণশোধের চেষ্টা করতো। অবসর পেলেই বেত চিড়ে খাড়া নেউলি, চাটাই ঝাপি বোনে।

তখন শ্রাবণ মাস। আগে দুবার বাছাই হয়ে গেছে। জুমে শেষ নিড়ানির সময়। জুম খেত আগাছায় ভরে গেছে। দলে দলে যুবক যুবতীরা যায় জুম নিড়ানির কাজে। আজ যদি সাফিরাইএর জুমে নিড়ানি তো কাল হবে জরহানের জুমে। কাজ বিনিময়। এক আদিম জীবন যাত্রার যৌথরীতি।

নোয়াতিয়া যুবক যুবতীদের সাথে রিয়াং যুবক যুবতীরা মিলে একসঙ্গে কাজে যায়।

জোড়া জোড়া যুবক যুবতী পাহাড় ঢালুতে বসে নিড়ানী হাতে। কার সাথে কার জোড়া মিলবে বাছাই করার দায়িত্ব দাওয়ার । দাওয়া মানে মাদল বাদক। যে মাদল বাজিয়ে পেছনে পেছনে গিয়ে ধাওয়া করে কাজের গতি বাড়াতে। কোন সুন্দরীকে সঙ্গিনী করবে তার জন্য অনেকে দাওয়াকে গোপনে বিড়ি খাওয়ায়। লাঙ্গি মদ দিয়ে বিশেষ রকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে।

মাদলের তালে তালে নিড়ানী চলে । গুণগুণিয়ে রসের কথাও কয়। নিড়ানীর চেয়ে তন্ময়তা বাড়ে যখন নিড়ানী কাঁচিতে মন থাকে না। অনেকে ধানের কচি চারা কেটে ফেলে বা আগাছা বাদ দিয়ে মগদানার চারা বা মরিচ চারা তুলে ফেলে। মাদল বাদক কাং সিমুনির চোখ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সতর্ক চোখে ধরা পড়লেই গালি গালাজ দেয়। গান বানিয়ে অপমান করে । মাদল কিন্তু থামে না।

যুবক যুবতী ক্লান্তি অবসাদ ভুলে যায়। কাজে অনুপ্রেরণা, প্রতিযোগিতার মনোবল দ্বিগুণ বাড়ে দাওয়ার তালে তালে। এর মধ্যেই কেউ হ্রে যাধ্বনি তোলে । হাসে। গায়। কর্মচাঞ্চল্যে পাহাড়ের ঢালু হয়ে উঠে মুখর। মান, অভিমান, অপমান, লজ্জা, রাগ সবকিছুরই প্রকাশ এখানে । কারো আশা ভাষা পায়। কেউ আবার ব্যর্থ প্রেমে দিশেহারা। অনেকে চেয়েও পায় না। কোন দৈবের বশে পনদিরুঙের জোড়া হওয়ার ভাগ্য জুটে সুইনাইহার। সুনারুই এর প্রথম প্রথম মনে মনে খুশী, তবু লাজিয়ে উঠে চোখ মুখ। ওই লাজিয়ে ওঠা মুখ দেখেই ভালো লাগে পানদিরুঙের। নিড়ানী খেতেই অনেকদিনের চেনা দুজনে আরও নতুন করে দুজনাকে আবিষ্কার করে। নিড়ানী কাজ শেষ । কেউ যাতে না শোনে এমন করে সুইনাইহাকে বলে সন্ধ্যেবেলা আমাদের জুমের টংঘরে এসো। হাওয়াও বড় মাতাল সেখানে। কথা হবে । কিন্তু কি কথা! প্রেম নিবেদন করবে ! না, ফসলের কথা, অড়হর ধানের বীজ কেন ফুটে নাই— সে সব বলবে, ভেবে কুল কিনারা পায় না।

আস্তে আস্তে সঙ্কোচ কাটে। লজ্জার পর্দা আর থাকে না। দিনের শেষে বনের ঝিঁঝিরা সন্ধে আরতি শুরু করে। কর্মক্লান্ত জুমিয়ারা হাত পা ধুয়ে টংঘরে ওঠে। মেয়েরা খাবারের গামলা নিয়ে শূয়োর ডাকে, কোন পাহাড়ী বউ চিয়ক কোমল আদুরে ডাক দিয়ে মুরগী খাঁচায় তোলে। পাহাড়ে গামাই ও চামল বনের ঝোপে বা চামর দোলনে মিরতিঙ্গা বনের খাঁচায় লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগীর মতো সূর্য তখন আস্তে আস্তে ডুব দেয়।

সুইনাইহার তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চাদর জড়িয়ে পনদিরুং এর টংঘরের দিকে যায়। হাতে কোন দিন চমপ্রেঙ, কোনদিন বাঁশী বা সারিন্দা। পানদিরুংদের বারান্দায় বসে বসে চমপ্রেঙ বাজায়। পানদিরুং ঘরে হয় তুলা ধোনে — না হয় সূতা কাটে। পনদিফা, পনদিমা তামাক টানতে টানতে শুয়ে পড়ে। রিয়াং সমাজে প্রেমিক কোন যুবককে বাঁধা দেওয়ার রীতি নেই। বাঁধা দেওয়া দূরের কথা। নিজেরাও শৈশবের ধূসর অতীত প্রেমের স্মৃতিতে ডুবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, চোখে জল নামে প্রতিদিন এমনি রাত বাড়ে। তফ্লমা পাখীও গহন বনে ফ্লাং ফ্লাং ফ্লাং ডাক দিয়ে, প্রেমিকাকে রোজ কাঁদায়। ওই পাখীর ডাক বড় নির্জন, বড় করুণ। অকারণে বিরহের সংকেত যেন বাজায়। সুইনাইহার ঘরে ঢোকে তামাক খাওয়ার অছিলায়। চমপ্রেঙ বাজায়। কখনো সারিন্দার তারে বাজে হরবোলার ডাক। কখনো দোলনা ঠেলে [illegible] কোন নারীর ঘুমপাড়ানি গান। কখনো

শ্মশানে আলুথালু চুলে স্বজন হারানো নারীর প্রিয়জন ডেকে বুক ভাঙা বিলাপের বিষাদ সুর।

নিশুতি রাতে সারিন্দার সুবের মুর্চ্ছনায় দুজনার হৃদয়ের না - বলা কথা সুর পায়। তন্ময়তার ঘোরে অবশ হয়ে আসে পানদিরুং। বুক থেকে কি যেন একটা মধুময় অনুভূতি গুমড়িয়ে গুমড়িয়ে গলায় এসে নিঃশ্বাস আটকাতে চায়। উনুনের আলোচ্ছটায় পানদিরুঙের কাছাকাছি থেকেও যেন অনেক যোজন দূরে থাকার ব্যথার অনুভবে অথবা কি জানি দৈবের কোন অজানা কারণে কেউ যদি কারো কাছ থেকে ছুটে যায়।

সারিন্দার তার হয়ে নিজেই বাজতে চায় পানদিরুং। সুরের মূর্ছনা তাকে মাতাল করে। রিয়াং প্রেমিক প্রেমিকা গলকুরাম সারেথীর অমর প্রেমের গান আসে ভয়ের কণ্ঠে। একজন গাইলে অন্যজন কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে আবার গান ধরে। সুইনাইহা গায় —

ব্রুইফনাদিহা কাওখুহা বাই।
স্মাই তুইদে তামা সেই
স্মাই হরদেই কুতুংমা সেই
স্মাই হুং দেই ক্রাক যা সেই
সত্য য়াক বাই ফেরক মাইয়া
সত্য খা হা দুইয়া
তুইয় খুইসয়ে ক্লে মইয়া
সত্যলে কুতো লেখা ছাপাফ ইয়া, হব খসই নো
খাম পাই মাইয়া

অর্থ হলো তোমার মনে একটা ছোট মেয়ের কথা কি অদ্ভুত, নদীর চেয়েও বড়। আগুনের চেয়ে উত্তপ্ত। পাথরের মতো শক্ত তোমার শপথের সত্যতা। যা কোনদিন প্রত্যাখ্যান করতে পারব না। তোমার প্রেমের সত্যতা মাটি নয়, যে জলে গলে যাবে। তোমার প্রেমের সত্যতা লেখা কাগজ নয় যে আগুনে পুড়ে যেতে পারে।

পানদিরুং আবার গান ধরে প্রত্যুত্তরে — "আতা! কলুক সায়ই তঙলাইদে তঙলাইদে সিফাং সিয়াফাং মা তঙলাইমি নিলো বু তাউক বু চেয় বু আরু বু এ মায়াজাল বুনাং মি মায়াজাল কাউতাই মাইয়া। দুঃখতর দুঃখ বাই খায়াকমলে জাবীনদার ফ য়ৌক তঙকমাইয়।

দাদা, বুঝি কি বুঝি না এমন সময় থেকে তোমারা সঙ্গে থাকতে থাকতে লাসার আঠায় জড়ানো পাখীর মতো বা জালে আটকানো মাছের মতো প্রেমের এক অদ্ভুত মায়াজালে জড়িয়ে গেছি। যত লড়ছি সে জাল ছিড়তে পারি না। আরো বেশী আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাধা হয়ে আটকে যাচ্ছি। প্রতি নিমিষে তুমি খুব কাছে থাকলেও মনে হয় অনেক দূরে। আরো কাছে না পাওয়ার দুঃখ বোধে আমি পুড়ে মরছি। সরকারের হাতে বন্দী আসামী কত শক্ত দড়ি দিয়েবাধা থাকে। তাকেও জামীনদার নিয়ে মুক্ত করা যায়। আমি দুঃখিনি, প্রেমের বাঁধনে বাধা পড়েছি, এই বাধনে জামীন কোথায় পাই।

গাইতে গাইতে কাঁদে অঝোরে পানদিরুং। কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার গায়— মায়ানিজাল বাই খায়াক মলে জাবীন বাই য়োকমাইয়া বাও কথাং তঙমলে খবিনাইয়া, কতৌক ফাসীসে খুইসিয়ানো কতৌক দুবি আং থ্ইনাংফ আশানছ পুসইয়া বাও কুথুই কুলফ নাইসাও নাইলো আং থাংন লামা পানথব লাম্প্রা, লাং বাঙঅ পানথর সামচুরি কাইনাং নাই সে জরম্ আং

উংমাওয়ে যা হুকসৌং ওয়াসনুক সে উং সাওয়ে নাই।

মায়াজালে বন্দিনি আমি, তবু তা পূর্ণতার ব্যথায় পুড়ে মরি। কোন জামীনদার আমাকে মুক্ত করতে পারবে না। গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে পারলে বাচি। ঘুঘু দম্পতির নীড় বাধা কোন উঁচু ডালের বাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব। ঘুঘুর প্রেম দেখতে দেখতে নিজের প্রেমের কথা রোমন্থন করব। মরতে মরতেই রোমন্থন করব। তোমাকে না পাওয়ার ব্যথার এই মনুষ্য জন্মে থেকেই গেলো। এই জগত থেকে মরণের পর যেখানে যাই তোমার অপেক্ষায় থাকব। আমার চলে যাওয়ার পথ দীর্ঘ। সেই পথে পথে বাঁশের পাতায় পিঠ বেধে বেধে পথের চিহ্ন রেখে যাব। যেমন করে শ্মশানে যাওয়ার পথে মানুষ স্মৃতি চিহ্ন রাখে। যেতে যেতে ওই পথ ধরে তুমি পাবে আমাকে অচিন কোন জুম খেতে নতুন কচি বাঁশের গায়ে লতা হয়ে জন্মাব। তুমি জন্ম নিও সেই কচি বাঁশ হয়ে । তুমি আর আমি পরস্পরকে জড়িয়ে সুন্দর পৃথিবীকে দেখব। তারকণ্ঠেও। গান গেয়েগেয়ে নাচে। উনুনের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে অবাধ্য কাচুলীর নীল ভ্রমরের পাখা। কাচুলীতে ভ্রমরের নীল পাখা লাগানো অভিজাত রুচি। পলকহারা চোখে সুইনাইহা বাজায়। শুধু জীবনের সবকিছু সমর্পণ করার বাজনা বাজে। তালে তালে নাভিপদ্ম দুলিয়ে, নিতম্ব কোমরে ঢেউ তুলে। ঘুরে ঘুরে হাতের বাহুর রূপোর বালা, মালা ঝুমুর ঝামর বাজিয়ে নাচে। গলার স্বর - সুর বাঁধা বাধন মানে না। জুম থেকে জুমে, গাছপালায়, পাহাড় উপত্যকায় নেশার ঘোর লাগায় সেই দূর প্রবাহিনী সুরের মুর্ছনা। স্বর্গের অপ্সরা যেন বনদেবী হয়ে টংঘরে নাচে ।

রাত নিঝুম । পনদিফা রাত গভীর হলে খুক খুক কাশতে কাশতে জানিয়ে দেয় রাত গভীর । নাচ থামে । ছল ছল চোখে টং ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সুইনাইহাকে । যেতে দিতে মন চায় না, তবু যেতে দিতে হয় । ব্যথাতুর চাউনি মেলে পানদিরুং । বিরহ মিলনের খুশী মেশানো বিষাদের আবেশ বুকে নিয়ে সুইনাইহা [illegible] টংঘরের দিকে এগোয় । বিরহিনী পেঁচা বউ 'হুতুম', 'হুতুম' ডাক দিয়ে গাছের খুরল থেকে পুরুষ পেঁচাকে ডেকে ডেকে কাঁদে । উড়ন্ত পতঙ্গ ধরতে ধরতে রাতচরা পাখীরা চাক্-চাক্চাক্ চকোর [illegible] ব্ ডেকে ডালে ডালে নিঝুম রাতের ঝুমুর বাজিয়ে বিভোর প্রেমের ইতি টানে । তবু অন্তরে বেজে [illegible] সেই গান -- "হুকসৌং ওয়াসলুক নুং উংসাওফ হুকসৌং দুং সৌক আং উঙে ফ মা তংনাই [illegible] বুড়া ইয়াকে খা[illegible] ইয়া ত[illegible]ই খেল । খুইম খুই বাহা থুইলাইয়াক নাহনো ।.........

ওয়াসলুক মানে নতুন জুম খেতের কিনারে জন্মানো নতুন বাঁশ । সেই বাঁশে জড়িয়ে থাকে দুং সুক লতা । ওয়াসলুক থাকলে দুংসুক থাকবেই । ওয়াসলুক দুংসুক এর মতো যার [illegible]বন একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে । মানুষ [illegible]ণশীল । তুমিও ওয়াসলুক হয়ে জন্ম নেবে, [illegible] আমার প্রেম যদি সত্যি হয় আমিও দুংসুক লতা হয়ে তোমাকে জড়িয়ে আবার জন্ম নেব ।

শ্রাবণের শেষ দিক । [illegible] গাছে থোকা থোকা মকাই । ফলের ভারে গাছের আগা নুয়ে পড়ে । মাটিতে গড়ানো সবুজলতার ফাঁকে ফাঁকে হলদে চিনার । চালুর গায়ে ঝুলে সাদা সাদা থাক্‌লু । এদিকে ওদিকে বেগুন, মরিচ, [illegible]ইকাং উদ্ভিদের সজীব সবুজ সমারোহ । কোথাও অড়হর ঝোপ, কোথাও বাতাসে দুরু দুরু কাঁপন ধরা বাতেমা [illegible] পাতা । পাশে পাশে থুর [illegible] [illegible] ধরো ধান । কোথাও মাথায় ফুলের খোঁপা নিয়ে দাঁড়ানো [illegible] খেত । মাঝে মধ্যে জুম বা[illegible] পুষ্ট বাতাসে গন্ধ বিলায় ।

জুম জাত ফসলের মেলানো পসরা সারা পাহাড় জুড়ে । বানর, ভালুক, সজারু, বুলবুল, ভৃঙ্গরাজ, আরো কতো পশুপাখী, কীট পতঙ্গদের ভোজ উৎসব শুরু মরসুম । গাছে গাছে খুবলে ডালে, গর্তে চারদিকে এক ভোজের হিড়িক । আমিষ নিরামিষ সবরকম খাবার মজুত । গেলেই হয় ।

বিপদ শুধু জুমিয়াদের । দিনরাত নারী পুরুষ, শিশু মিলে সবাই সজাগ । যাদের ঘরে লোকজন বেশী তারা খুব ঠেকে না । যত ঝক্কি ঝামেলা শুধু পন[illegible] । বাড়ীতে লোকজন কম হলে কি হবে । জুমটা বিরাট । বাপ, মেয়ে, মা দৌড়ে কুল কিনার [illegible] না । চিনার খেত তছনছ রাতভরা বুনো ইঁদুর নেমে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবলা খাবলা গর্ত [illegible] চিনার ফলে । কোনটা পুরোপুরি খায়নি । এদিক ওদিক চিবিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেছে । প্রথমে জানতেই পারেনি । সকালে চেরুংমা পোকার ঝাঁক উড়ে বনবন শব্দ শুনে গিয়ে দেখে, চিনার চেরুংমা ক্ষেতে সর্বনাশ । চিনার বাকলের গন্ধে চেরংমা পোকার ঝাঁক উড়ে এসে বসে । পানদিরুং ডাক দেয় । বৌকে মেয়েকে । পনদি গিয়ে কয়েকটা চেরুংমা ধরে হাত, পা, পাখা ভেঙে জড়ো করে । ছোটবেলায় ছুটে ছুটে চেরুংমা ধরে আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার মজা লুটতো । এখন বড় হয়েছে, বোঝে । বোঝে বলেই চিনার খেতের সর্বনাশ দেখে মন দুঃখানো ব্যথায় ভরে । চেরুংমা খাওয়ার আনন্দ বাপ মেয়ে সবাই উপভোগ করে । সজারু ঢোকার পথ খুঁজে । সজারু যে পথে আসে সেই পথে বেরোয় । বাঁশ চুখিয়ে, বেতের ফাঁসির গিঠ বানিয়ে ফাঁদ পাতে ওই সজারুর আসা যাওয়ার পথে । ওই পথে চলাফেরাও বিপজ্জনক । সজারুর ছিটকে পড়া ধারালো কাটা যদি বিঁধে সারা বছর অচল হয়ে থাকতে হবে ।

পরদিন একটা সজারু ফাঁদে লাগে । কেটে-কুটে খাকলু দিয়ে খেতে বসে সবাই । পনদির গলা দিয়ে গ্রাস যেতে চায় না । এত সুস্বাদু মাংস সুইনাইহাকে না দিয়ে খাবে কেমন করে । খেতে বসে ওর আনমনা ভাব দেখে , মিটমিট হেসে ওর মা বলে, বেচারা সুইনাইহার ভালো খাবার প্রায় জোটে না । একটু মাংস রেখে দাও না । পনদি এটাই অপেক্ষা করছিল যেন ।

মকাই খেতের পাশে একটা মুইচিং গাছ । গাছের পাতা দিয়ে গোদক বানায়, অথবা 'চাখুই' (মানে-ক্ষার) বানিয়ে মুইচিং দিলে খিদে বাড়ে । কবে কোনদিন কোন ধনেশ পাখী দূর পাহাড়ের মুইচং গোটা খেয়ে এখানে বিষ্ঠা ত্যাগ করে গেছে । সেই বিষ্ঠা থেকেই মুইচিং গাছ উঠে । এখন ডালপালা মেলে বিরাট । বয়সেও প্রায় দশ বারো বছর হবে ।

রোজ ভোরবেলা মুইচিং গাছের তলা দিয়ে এক পাল বানর নামে মকাই খেতে । কাক, টিয়ার ঝাঁক এসে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে মকাইদানা খুলে খায় । পনদি পাখী তাড়ায় । হা আ আ ই-ই-ই-ই-ই ! আওয়াজে ! পাখীর ঝাঁক উড়ে যায়, বানরগুলো কিছু খায় না । গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে মকাই ক্ষেতে ডাল ভাঙে পাতা ছিড়ে । ডিগ পাকা বাছে না । চিবিয়ে চিবিয়ে গাল পুরে, ফুলিয়ে এদিক ওদিক পিট্ পিট্ চায় । ধনুক দিয়ে গুলতি ছুঁড়ে পনদিফা । একটার গায়ে লাগলে বাকি সব ছুটে পালাতো প্রথম প্রথম । পালে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা বানর । যেদিকে নামে সেদিক শেষ । এখন গুলতির গুলি লাগলেও পরোয়া করে না । পনদিফার হাত-কাঁপে । নিশানা মেলাতে পারে না ।

পনদি[illegible] একটা কুকুর আছে । শিকারী কুকুর । লেলিয়ে দেওয়ার আগে খাপ পেতে

ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকতো। কাছে এলে ঘাড়ে কামড়াতে চাইতো। পারতো না, তবু দৌড়ে বানরদেরকে জুমের ত্রিসীমানা পার করে দিয়ে আসতো। বানরদের সঙ্গে একটা লোচ্চর বানর থাকে। বড় চেহারা। হৃষ্টপুষ্ট। হেলে দুলে ভারিক্কি চালে চলে। মোটা লেজের লোম ঝাকড়া ভাবে ফুলিয়ে এমন একটা ভাব দেখায়, সেই যেন বনের রাজা। বানরীদের এমন বুকে ঝুলন্ত শিশু স্তনের দুধ টানতে টানতে বুকের সঙ্গে লেপটে থাকে। লাফায়, দৌড়ে, আঁকড়ে ধরা বানর শিশু পড়ে না। ওদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ওই বড় লুচ্চা বানরটার। সব বানর দৌড়ে জুম পার হয়ে গেলে তবে লাল পাছাটা চুলকাতে চুলকাতে ধীরে ধীরে জুম থেকে বেরোয়। কুকুরটা কাছে গেলে এমন করে মুখ ভেংচায়। কুকুরটা ঘাড়ে ধরতে সাহস করে না।

হঠাৎ একদিন লুচ্চা বানরটা রেগে কুকুরের একটা কান ধরে ফেলে। হাতের নখ দিয়ে এমন ভাবে খামচে ধরে ছোটার উপায় নেই। কানে হাত ধরেই একটা কড়ুই গাছের ডালে লাফ দিয়ে কুকুরটাকে ঝুলিয়ে ওঠে। বানরের হাত থেকে ছুটবার জন্য ছটফট করে কেং-কেং-কেং আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দেয় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন দুষ্ট বানর হাতের মুষ্ঠিতে কানটা একটা ডালে ঘষ ঘষ ঘষতে থাকে। নখ দিয়ে খামচে একটা চোখ উপড়ে ফেলে। কুকুর যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ তোলে। হঠাৎ উপরে ডাল থেকে আরো উপরের ডালে নিয়ে ধপাস করে ছুঁড়ে ফেলে।

একেবারে হাড়গোড় গুঁড়ো হওয়ার উপক্রম। তবু কোন রকমে বেঁচে যায়। কুকুরটাকে এমন শিক্ষাই দিয়েছে। এরপর থেকে বানর তাড়ানো দূরের কথা ও বানর দেখলে উল্টা টংঘরে এসে লুকিয়ে থাকে। ঘেউ ঘেউ করে প্রাণ বাঁচানোর ডাক ডাকে। কানা চোখের ঘা শুকিয়েও শুকায় না।

এরেমধ্যে আসে বৃষ্টি। দিনরাত ধরে পচা বাদল। বাইরে বের হওয়া দুরূহ ব্যাপার। টংঘরে কাপাস কাটা সুতোর কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে রাজার লোক এসে খবর দিলেও যাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। এত আরাম। তার উপর পাশেই উনুনে আগুন। এই সুযোগেই ভিজে ভিজে বানরের পাল আসে মকাই গাছে। অড়হরের কঁচি গোটা চিবিয়ে ছিবড়া বানায়। কচি ধানের শীষে তখনো দুধ জমেনি। সে শীষ চিবোতে ওদের কেমন ধরনের মজা কে জানে। অন্যদিকে দৌড়ে। শীতে ঠক ঠক কাঁপে। ঠোট কালো হয়ে উঠে। বানর তাড়িয়ে এসে বারান্দায় ভিজা শরীরের বাঁশের হুকোয় তামাক টেনে একটু চাঙ্গা হয়েছে কি জানিনা। হঠাৎ দেখে সেই লুচ্চা বানর আবার দলবল নিয়ে ধানক্ষেতের উপর। কয়দিন ধরে ভিজে ভিজে বানর তাড়াতে তাড়াতে অতিষ্ঠ পানদিরুং। যা হবার হোক ভাবনিয়ে হতাশায় বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর রেগে ভিজে ভিজে বৃষ্টির মধ্যে ছুটে যায়। তিনবার টিলা পার হয়ে সুইনাইহার জুমের টংঘর। সুইনাইহা তখন উনুনের পাশে বসে মহাসুখে চেরুংমা পোকা পুড়ে পুড়ে খাচ্চে। ভিজে জবুথবু পানদিরুঙকে দেখে বিস্মিত। সব শুনে মুরগীর পালকবাঁধা কয়েকটা তীর বাঁশের চোঙায় তুলে ভরে ভিজতে ভিজতে এলো পানদিরুঙের টংঘরে। সুইনাইহা কোন নামী শিকারী বা তীরন্দাজ নয়। তবু চেষ্টা করে দেখে। প্রথম তীরটা পায়ের কাছে দিয়ে চলে যায়। সামান্য রক্ত ঝরতে তাকে। পেটের রক্ত দেখে বাকী বানরগুলো খক খক আওয়াজ দিয়ে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে ঝাকুনি খেয়ে সর্দারকে ঘিরে দাঁড়ায়। রক্ত পরা জায়গায় চিমটি দিয়ে খামচে খামচে টানে। নিজেও নখ দিয়ে চিমটি ধরে টানে এমন করে পেটের নাড়ীভুড়ি হিড় হিড় করে টেনে দেখতে দেখতে নাড়ী ভূড়ি, ভূরুল বের

হয়ে মুখ খিঁচিয়ে বানর সর্দার লুটিয়ে পড়ে । বাকীরা ওদিকে টেনে হিচড়ে কিছুক্ষণ বাদে বনে দলবেঁধে ঢুকে গেল ।

বানরের উৎপাত কোন রকম সামাল দিলেও পাখীদের উৎপাত বেড়েই চলে । শ্রাবণ শেষ, ভাদ্রের শুরু । জুমে ধান কাটার মরসুম । অন্ধকার থাকতেই কাছে পিঠে গাছ গাছালিতে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া । বাচমা পাখীদের সাথে নামে ভৃঙ্গরাজ । বৃষ্টি তখনো মাঝে মধ্যে নামে ।

এবার শুধু বেশী বৃষ্টিতে ভিজেছে এমন । সারা জীবন রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেড়ে উঠে । তবুও কয়দিন ধরে খুস্ খুসে কাশি । কাহিল হচ্ছে শরীর । বিকেল হলেই গায়ে জ্বর । শীত শীত ভাব । বুকের হাড়ের ভেতরও একটা কেমন জানি চিন্‌চিনে ব্যাথা । বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকে । সামান্য একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে ওঠে । এক আঁটি ধান কেটেছে কিনা কেটেছে মাথা বন্‌বন্ করে ঘোরে । হাতে পায়ে কোন শক্তি নেই । কথা বলতেও ইচ্ছে করে না । বুকের বেতরে চাক্ চাক্ কফ । খুসখুসে কাশির সঙ্গে মাঝে মধ্যে একটু আধটু বেরোয় । আঠালো কফ্ । বন তুলসীর পাতার রস খাওয়ালে ভাল হবে । কেউ বলে গরম জল নুন দিয়ে কুলকুচি করলে ভাল হবে । তাই সকাল-সন্ধ্যাই কুলকুচি করে । দিন যায় বুকের পাঁজরের ব্যথা বাড়ে । পানদিরঙের খান কিছুতেই মুখে রুচি হয় না । খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ । পনদিফা অচাই ডাকলো । শুরু করে মুরগী কেটে পূজো এবং সঙ্গে বোতল বোতল মদ দেওয়া । নদীর পূজো, লংতরাই পাহাড়ের দেব পূজা, শেষ আর হয় না । কিন্তু ভাল হওয়া তো দূরের কথা বরং এখন দলা দলা জমাট বাঁধা রক্ত আসে । চোখ দুটির কোটর কয়দিনে অনেক গভীরে যায় । হাতের আঙ্গুলের গিঁটগুলো বেরোয় । চামড়ায় একটা রক্তহীন ফ্যাকাশে ভাব । হাত-পা অসম্ভভ ভাবে জীর্ণ শীর্ণ । সব সময় হুকো টানাই তার অভ্যাস ! এখন হুকো টানকে ইচ্ছে করে কিন্তু মুখের কাছে নিলেই দমকা কাশি । একবারও টান দিতে পারে না। কেউ বলে বাসক পাতা ছেচে রস গরম করে মধুর সাথে খাওয়ালে ভালো । কত বাসকপাতা খাওয়ানো হলো কিন্তু ভালো হওয়ার নাম নেই । রোগের কোন উপশম নেই । আবার কে একজন বলেছে সদ্য ডিম ফোটা লাল পিপড়ের বাসা ছোট পিঁপড়ে সহ চেপে ধরলে যে রস বেরোয় তা অব্যর্থ ঔষধ । সারা পাহাড়ে অন্যসময় লাল পিপড়ের বাসার অভাব হয় না । দরকারের সময় কাছে পিঠে একটাও মিলে না । পনদিফা সুইনাইহাকে ডেকে বলে দেখোনা আমি খুঁজেছি কিন্তু কাছে পিঠে একটাও পাই না ।

সুইনাইহা ছোটে লাল পিপড়ের বাসা খোঁজ করতে । কাঠ-ঠুকরা পাখী নাকি ওই লালপিঁপড়ের বাসায় ঠুকরে ঠুকরে পিপড়ে খেতে ভালবাসে । ছড়ার পারে একটি গাছের ভাঙা ডালের কোটরে একজোড়া কাঠঠোকরা থাকে । কোটর খেয়াল করলেই বোঝা যাবে কোন দিকে উড়ে যাচ্ছে ।

সুইনাইহা গেল ছড়ার পাড়ে । ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো চুপচাপ বসে থাকে পলকহারা চোখে ওই কোটরের দিকে চেয়ে । দুদিন বসে খেয়াল করে মিরতিঙ্গা বাঁশের বনে কাঠঠুকরা ঘন ঘন যায় । ওদের গতিবিধি দেখে সুইনাইহা গভীর মিরতিঙ্গা বনে ঢোকে । খুঁজতে খুঁজতে সত্যি আবিষ্কার করে লাল পিঁপড়ের বাসা । কোন রকমে বাঁশ কেটে পিঁপড়ের বাসা নামায় । লাল পিঁপড়েগুলো দলে দলে কামড়ে ধরে সুইনাইহাকে । আর কামড় কি সাধারণ কামড় । অসহ্য জ্বালা আর তার চেয়েও বড় জ্বালা পনদিরুং কি আর ভালো হবে । দুর্বল অবস্থা দেখলে সবাই বৈদ্য সাজে

ঔষধের কথা বলে । রোগীর মনেও সন্দেহ । বোধয় এইবারেরটা ভাল ঔষধ । এইবার এইবার করে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে । গায়ের সেই আগুন রাঙা রঙ কোথায় । অনেকদিন পাহাড়ের নীচে চাপা পড়া ঘাসের মতোই ফ্যাকাশে রক্তহীন । শরীরের পোড়া পোড়া হাড় ভেসে উঠে ।

ভাদ্র মাসের ধানকাটাও শেষ প্রায় অনেকটা । পনদিফারও ধান আধা কাটা, আধা মাড়ানো এবং আধা জুম । তোতা পাখীদের ভোজ উৎসব শুরু হয়েছে । তাড়াবার কেউ নেই । কাপাস গাছেব গুটিতে ফুল আসার সময় । দেখার সময় নেই । পনদিফার অচাই, বৈদ্য ডাকতে ডাকতেই দিন যায় । কে দেখবে ফসল । সে সর্বক্ষণ রোগীর পাশে । এক মুহূর্তও রোগী ছেড়ে যায় না । বাইরে তোতা ঘুঘুর ঝাঁক নামে । ধানের শিষ্ ভেঙ্গে অর্ধেক মাটিতে ফেলে অর্ধেক চিবোয় । এত কাজের মরশুম । তবুও ফাঁক পেলেই সুইনাইহা পনদিফার টঙে আসে । পানদিরুঙের কাছে এসে বসে । বড় মমতায় পনদি অদ্ভুতভাবে ক্লান্ত চোখ মেলে সুইনাইহার পানে তাকায় । কোমল দরদী হাতের স্পর্শ পাওয়া যেন কত কালের সৌভাগ্যের । রোগ না হলে বুঝি সুইনাইহার ভালোবাসার গভীরতা মাপা যেতো না। এমনতরো অনেক কথা ভাবে পন্দি । এমন সময় কপালের উপর টুপ্টাপ্ ফোঁটা উষ্ণ জল । পনদি জীর্ণশীর্ণ হাতে সুইনাইহার চোখ মুছে দিয়ে বলে, এত মন খারাপ করছ কেন । সুইনাইহা আগে জড়ানো গলায় দুহাতে পনদির মুখে আলতোভাবে ছুঁয়ে বলে, পনদি, তুমি বাঁচো, তুমি ভালো হও । সামনের মাসেই তোমার ঘরে জামাই উঠবে । মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে এখনি বাঁচার আশা, সংসার পাতার স্বপ্নের জাল বুনে যায় সুইনাইহা । আর ওই স্বপ্ন ঘিরে নাচে পনদির বাঁচার দুর্ণিবার আকাঙ্খা । যা তার সাথে যাওয়া পাঁজরের গভীরে কোন স্থানকে আন্দোলিত করে বার বার । পন্দিফার বন্ধু মালিরায় অন্যদিকে জুম করেছিলো । পন্দিফার জুম থেকে প্রায় মাইল বার তের দূরে বেশ কয়েকমাস হলো দুজনে দেখাশুনা হয়নি । পনদির অবস্থাও জানে না । জুম কাটতে না পারায় লোকমুখে খবর শুনে মালিরায় এলো ছেলেদের নিয়ে সঙ্গে আরো প্রায় শ-খানেক নারী-পুরুষ । এসেই ধান কাটতে নামে । কয়েক জনে ধান মাড়াই ঝাড়াই করে । মোটামুটি ধান কাটা শেষ ; তবে মাড়াই এর কাজ প্রায় চারভাগের তিনভাগ সম্পূর্ণ করে দেয় । এর তিনদিন পরে মালিরায় ভাল মাইলি ধানের মদ, মুরগীর কলিজা, কচি নরম হরিণের মাংস, পাকা ফল, জুম মালতী ধানের সুগন্ধী চাল বোঝাই করে নিয়ে এল । রান্না হলো, সবাই খেলো । পন্দিও অনেক কষ্টে এক গ্রাস বড় আশা করে মুখে তোলে । পন্দিকে খাওয়াতে না পেরে মনের দুঃখে মালিরায় চলে গেলো কোন এক ভাল বৈদ্যের অনুসন্ধানে ।

পন্দির গলা ভাঙা, স্বর আসে না । খুব জোর দিলে স্বর আসে । তাও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা । সামান্য দু একটা কথা বললেই ক্লান্তিতেই দুচোখ বুজে আসে । পন্দি বলে, আমি ভাল হলেও গলার স্বরকি আবার আগের মত হবে ? সুইনাইহা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, -- স্বর শুধু আসবে না, আগের মত রাতভর তুমি গাইতেও পারবে । শরীরে শক্তি তুলে নাচতে পারবে ।

পন্দি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । সুইনাইহার কথাগুলোতে ক্ষীণ আশা জাগলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, কষ্ট হয় । পান্দির কাছে পিঠের অচাই, বৈদ্য, কবিরাজি ঔষধ শেষ হলো । নিজে ছুটে গেল ধর্মনগরে । সেখান থেকে এক অচাইকে নিয়ে আসে বন্ধুর মেয়েকে দেখার জন্য । ততদিনে অসুস্থ পন্দিরুংকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এল তারা ।

অচাই এসে পূজো দেয় । মুরগীর ভুরুল কেটে ছড়ার জলে দাঁড়িয়ে নিরিক্ষণ করতে করতে বলে -- রোগীর অবস্থা বিশেষ ভাল নয় । প্রতিবেশী কেউ শত্রুতা করে অপদেবতা চালান করেছে । যাক্ রোগ যখন ধরেছি অপদেবতাকেও চিনেছি কাজেই ভাল করতে সময় লাগবে না । যেভাবে কাকের রক্ত দিয়ে ওরা এতবড় সর্বনাশ করেছে সেই সর্বনাশা অপদেবতাকে ওদের দিকেই ফিরিয়ে দেবো । এর জন্য দরকার অনেক উপকরণ । ছড়ার পারে নতজানু হয়ে সুইনাইহা, পন্‌দিফা এবং মালিরায় । অচাই এর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য প্রস্তুত এমন একটা ভাব ।

অচাই বলে, -- মেয়ের শুধু অসুখই ভাল হবে না, গলায় যাতে কোকিলের কণ্ঠ ফিরে আসে তারও ব্যবস্থা করছি । কোন রকমে এক জোড়া ছোট পাখী যোগাড় করতে হবে কাকের বাসা থেকে । কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে । কথা ফুটবার আগে ওরা কাকও নয় কোকিলও নয় । এই সময় ওদের আনতে পারলে ওদের কেটে ওদের যে সুমধুর কণ্ঠ থাকে তা বসিয়ে দেব পন্‌দির কণ্ঠে । অপদেবতাকে কাকের রক্ত দিয়ে মন্ত্র পড়ে পাঠিয়ে দেবো যে এই শত্রুতা করেছে তার কাছে ।

পাখীর ছানা আনতে হবে মঙ্গলবার বা শনিবারে । যে আনবে সে সারাদিন উপোস থাকতে হবে । অপবিত্র হলে চলবে না । যার জন্য আনবে সেও যদি সেদিন অপবিত্র হয় তাহলেও আনা নিষেধ । নইলে অপদেবতা ঘাড় মটকে দেবে ।

সুইনাইহা সব শোনে । খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল একটা কাকের বাসা । দুংরাইফা বাড়ীর পাশে একটা গর্জন গাছ । সেই গাছে ঝাঁক ঝাঁক কাক থাকে । মাঝে মধ্যে রাত দুপুরেও কাকের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে । কাকের উৎপাতে দুংরাইফা একটা মুরগী পালতে পারে না । মুরগীর ডিম ফেটে ছানা বেরোতেই উঠে এসে ছোঁ মেরে কাক নিয়ে যায় । দুংরাইফা কাকের উৎপাতে অতিষ্ঠ । ভেবেছিল গাছটা কেটেই ফেলবে কিন্তু গাছটা এমন জায়গায় দাঁড়ানো, কাটলে সোজা ঘরের উপর পড়বে । প্রায়ই বিরক্ত প্রকাশ করতো দুংরাইফা । কাকগুলো এমন বেহায়া বাইরে ওদের ওৎপাতে মরিচ, মকাই, পর্যন্ত শুকানো যায় না । সেখানেই গেল সুইনাইহা । গ্রামেই গর্জন গাছের মগডালে নির্দিষ্ট দিনে মঙ্গলবারে দুপুরে গাছে ওঠার প্রস্তুতি । গাছের নীচে গ্রামের লোকজন দাঁড়িয়েছিল কৌতূহলে । অনেকে অপদেবতার ভয়ে যার যার ঘরে গিয়ে বেড়ার ফাঁকে তাকায়, সুইনাইহা গাছের নীচের মাটিতে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে বলে - 'মা বসুন্ধরা তুমিই সিদ্ধেশ্বরী । আমার পন্‌দিকে ফিরিয়ে দাও, ওকে বাঁচাও, পন্‌দি তুমি বাঁচো, তুমি বাঁচো, তোমার কোন পাপ দোষ নেই যদি কিছু থেকে থাকে আমায় দিয়ে দিয়ো, তবু পনদি তুমি বাঁচো' বলতে বলতে আবেগে কাঁদে সুইনাইহা । পাশে দাঁড়িয়ে রংবাংতিও কাঁদে । পনদিফা, মালিরায়, মানরুং তারাও কাঁদে । পনদিফা, মালিরায় বলে, কিচিং (বন্ধু) দেখছো ছেলেটার কত ভালবাসা । কত কাতর হয়ে প্রার্থনা করছে । এই প্রাণ ঢালা প্রার্থনার কি দাম পাবে না ! মালিরায় জবাব দেয় বাঁচলে এর জন্যই বাঁচবে । দেখছনা পন্‌দির জন্য ছেলেটা প্রায় পাগল । ''পনদি তুমি বাঁচো'' কি আকুল কাকুতি । বাতাসে গাছে, পাখীর গানে কীট পতঙ্গের পাখার ধ্বনিতে, সারা বন যেন একই চাওয়ার অনুসরণ তোলে । একই আওয়াজ -

'পনদি, তুমি বাঁচো ।'

গর্জন গাছের মগ ডাল অনেক উঁচুতে । গাছের নীচের দিকে কোন ডাল নেই । বাধ্য হয়ে

বাঁশ দিয়ে মই বানায়। মই দিয়ে অনেক উঁচুতে একটা ডালে কোন রকম ধরে, এবার অন্য উপরের ডালে যেতে হবে। ঝোঁপের আড়ালেই কাকের বাসা। ওখান থেকে নীচের দিকে তাকলে মাথা ঘোরে। গাছে উঠে নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। সুইনাইহাকে ঘিরে কাকগুলো বিকট আর্তনাদের তান তোলে। মাথার উপরে উড়ে উড়ে ঘোরে। অনেক উঁচুতে সাহস করে গিয়ে হাত পা থর্ থর্ কাঁপতে আরম্ভ করে। পাখীর ছানা ধরতেই চি চি আওয়াজে পাখী সন্ত্রস্ত্র ডাক ডাকে। কোন রকমে একটা ধরে হাতের মুষ্ঠিতে অনুভব করে টুক্ টুক্ পাখীর ছানার উষ্ণ ভীত প্রাণস্পন্দন। একটা ধরে পিঠের বেতের ঝুড়িতে রাখতেই এক ঝাঁক কাক এসে ঠোঁকরাতে আরম্ভ করে। এমন অবস্থা ছানাটিকে ছাড়তেও পারে না, রাখতেও পারে না। কাকগুলো উড়ে ধারালো নখে মাথার চুলে আকড়ে ধরে ঠোকরাতে আরম্ভ করে। চিৎকার দেয় সুইনাইহা। কার চিৎকার কে শুনে। মাথার উপর ঠোঁকর দেওয়া কাকের সাথে পাখার ঝাপটা মেরে আরও কাক আসে। চোখের দিকে ঠোকরাবার চেষ্টা করে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে চোখ বাঁচাতে কাক তাড়াতে নিজের অজান্তেই হাত উঠে যায় ডাল ছেড়ে। আর কোন কথা নেই। ডালে ডালে ঠেস খেয়ে সুইনাইহা ধপাস করে মাটিতে পড়ে। লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখে নাক মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে সুইনাইহা অচেতন। হাড় গোড় দলা মচা।

থেতলানো দেহটা কিছুক্ষণ স্পন্দনহীন নিথর পাথরের মতো শক্ত হয়ে এলো। ধরাধরি করে মালিরায় পনদিফা মাথায় জল ঢালে। মুখে জল ছিটোয়। চোখ উল্টিয়ে নিশ্চল একটা চাহনি ছাড়ে। চাহনিতে একটা ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ ভাব। সে যেন বলতে চাইছে পৃথিবী তুমি এত নিষ্ঠুর! সুইনাইহার মৃত্যুর পরদিন থেকে পন্দিরুং প্রতিদিন শ্মশানে ভাত, মাংস উৎসর্গ করতে যায়। কাঁদে, বিলাপ করে স্বরভাঙ্গা গলায়। নিজের পাঁজর ব্যথা ভরা বুকটা চাপড়ায়। পা দুটো ছড়িয়ে, চুল এলো মেলো। নিজের সামান্য শক্তিও নেই, তবুও যায় প্রিয়জনকে ক'ফোটা চোখের জল উৎসর্গ করতে। শ্মশানে সাদা একটা পতাকা উড়ানো ছোট টং ঘর থাকে। সেখানে সকাল সন্ধ্যা স্মৃতি তর্পণ করে কাঁদার নিয়ম।

পানদিরুং এলোমেলো চুল ছেড়ে বিলম্বিত সুরে গান ধরে বুক মোচড়ানো দুর্বোধ্য জ্বালায় সুইনাইহা তুমি এসো, তোমার পথ চেয়ে তোমারই পছন্দের খাবার সাজিয়ে বসে আছি। শুনেছি স্বর্গের কাছে লাইরমা দেবীর রাজবাড়ী। মর্ত্তের মানুষের অপেক্ষায় লাইরমা দেবী পথে দাঁড়িয়ে থাকে। সাবধান ওই দেবীর দেওয়া খাবার যতই সুস্বাদু হোক তুমি খেয়ো না। যদি স্পর্শ করো পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যাবে। কোনদিন আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে না। স্বর্গে হাটার সরু পথের গলি, কোথায় নিয়ে তোমাকে ছাড়বে টের পাবে না। তুমি বলছিলে মৃত্যুর পর নতুন জুমে কচি বাঁশ হয়ে জন্মাবে। আমি রোজ জুমে গিয়ে কচি বাঁশ দেখলেই জড়িয়ে ধরে কাঁদি। কোন সাড়া মিলে না। তোমাকে না পেলে আমিও মরব। জুমে দুংসৌক লতা হয়ে জন্মাব। নির্জন গহনে তুমি না এলে শুকিয়ে শুকিয়ে মরব।

আতা আতা আয়ই -- তুমি কত আকুল হয়ে সেদিন বলেছিলে পনদি তুমি বাঁচো। পনদি তুমি বাঁচো! পনদি তুমি বাঁচো! গাছে উপত্যকায় নদীর পারে অথবা নির্জন কোন পূজোর টংঘরে বসলেই 'পন্দি তুমি বাঁচো'র প্রতিধ্বনি আমি শুনি। তোমাকে খুঁজে পাই না। আতাই ই ই! আতাই ই ই! তুমি কথা দিয়েছিলে আশাপূর্ণ হলে ডম্বুরে গিয়ে সংক্রান্তির দিন ভোঁড়া পাঠা বলি

দেবে, রূপোর মালা কিনবে আসার পথে ।

স্বরভাঙ্গা গলার সেই বিলাপের গানে কোন শব্দ নেই তবু ক্ষয়ে ক্ষয়ে ব্যথা করা বুক চাপড়ানো শব্দে স্বর্গ মর্ত এক নিঃশব্দ ভূকম্পনের মতো তোলপাড় ওঠে । কয়দিন পর হঠাৎ লোকজন চমকে উঠে । দাং দাং কফাতা দাং দাং দাং দাং কেকাতা দাং-দাং মৃত্যুর ঢোল করুন বাঁশি সহ পনদির উঠোনে ছুটে গেল মালিরায় বাড়ীর লোকজন নিয়ে । বাঁশের মাঁচায় পনদির মরদেহ তুলে নিয়ে যাচ্ছে সুইনাইহার শ্মশানের পাশে । ছলছল চোখে তাকিয়ে মালিরায় অসহায় বন্ধু পনদিফার দিকে আসে মালিরায় সপ্তরায়কে জড়িয়ে ধরে কাঁদে । এমন অমর প্রেম কোথায় পাবে । সুইনাইহা আর পানদিরুং চলে গেলেও এদের প্রেম মানুষ ভুলবে না । আজ থেকে এই পাড়ার নাম হবে তখাপাড়া । তখা মানে কাক । এর পর থেকেই এই গ্রামের নাম তখাপাড়া । তখা পাড়ায় নিশুতি রাতে ঠাকুরমারা পনদির কাহিনী শুনিয়ে নাতিনাতনীদের কাঁদায়, নিজেরাও কাঁদে আজও ।

লংতরাই

লংতরাই পাহাড় উঁচু টিলার গায়ে বিস্তৃত জুম ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কাপাস ফুল বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে। কাপাস ক্ষেতের উপরে ভাসছে তিল গাছের থোকা থোকা ফল। আর একবারে নীচু হয়ে জুমের লাল, সবুজ, হলুদ রঙ ধরা মরিচ। কাপাসের সাদা ওড়নার নীচে পাহাড়ী জামা, বিচিত্র রংয়ের বাহার। টিলার মাঝখানে অরহড় গাছ, উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে। কোথাও আবার চিনার, থাকলু, কুমড়া লতা থরে থরে।

য়ংচরিং সকাল বিকাল বাজিয়ে যাচ্ছে তার ঘন্টার মতো ধ্বনি। য়ংচরিং এক ধরনের পতঙ্গ, গহন বনে থাকে। জুমিয়ারা জানে য়ংচরিং-এর এ ডাকের মানে। তিল কাপাস ফোটার সময় হয়েছে। ঘরে ঘরে 'অয়ংচরিং' ধ্বনি।

জরকামুনি ভোরবেলা বেরিয়ে যায়। তিল ক্ষেতে যাবে। শিশির তখনো শুকোয়নি ভালো করে। বেতের মুঠি নিয়ে তিল ক্ষেতে এসে হাজির হয় সে। তিল গাছের শাখা নুইয়ে দিয়ে নীচের দিকে ভাঙে। বেত দিয়ে নীচের দিকে মুখ করে ভালো করে বেঁধে রাখে। তিল এমনি করেই গাছে গাছে শুকানো হয়। জুম ক্ষেতে জরকামুনি একা আসেনি। এসেছে অন্যান্যরাও যারা তার সঙ্গে সঙ্গেই জুমে এক সঙ্গে কাজ করে। জরকামুনিদের এ ভাবেই কাজ করতে হয়, একে য়াক শুকসিম বলে। যৌথ শ্রমের বিনিময় প্রথা। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকেই এভাবে চলে আসছে। একের কাজে অন্যরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। গভীর অরণ্য জীবনে একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, ফলে এই প্রথা তাদের জীবনে বড়ো একটা অংশ জুড়ে আছে।

তিল ক্ষেতে এখন জরকামুনি ও তার সঙ্গীরা। তিল শুকানো শেষ হলে, দশ পনেরো দিন পরে বেঁতের খাড়ায় করে এসে নিয়ে যাবে। গাছ নাড়লে খোলস ভেঙ্গে তিল ঝড়ে পড়বে খাড়ার ভিতরে ভিতরে।

এ কয়দিন তিল গাছের ডগা ভাঙতে হচ্ছে তাদের। দুপুরে রোদ তীব্র হয় মাথার ঠিক উপরে। কাজ করার মতো শক্তি প্রায় কারো থাকে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজ ছেড়ে জুমের টংঘরে গিয়ে কুসুমল বাজায়। কুসুমল মানে পাহাড়িয়া বাঁশী। জুমের টংঘরকে জরকামুনিরা গাইরিং বলে। গাইরিঙের সামনে একটা বড়ো বারান্দা, তাদের ভাষায় সাংসি। পাহাড়ী বাতাস মাতাল হাতীর মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাংসিতে। জরকামুনিদের শরীর এই বাতাসে শীতল হয় প্রাণ জুড়োয়।

জরকামুনি সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে কুসুমল বাজায়। কুসুমল এর কোমল সুর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ভেসে যায় দূরে। দুপুরে রোদে, মুলি বাঁশের বনে, পাহাড়ের লুঙ্গায় জালি বেতের বনে মায়া বিস্তার করে এই সুর। দূরে দূরে আরো অনেক জুম ক্ষেত, অনেক গাইরিঙ। মুগ্ধ নীরবতা ঝরে পড়ে এই গাইরিঙগুলিতে, উদাসীন দুপুরে ঝিমোয়।

সোজা উত্তর পশ্চিমের টিলায় এক গাইরিঙ। সেখানে লাল মরিচ এবং কাঁচা মরিচ আলাদা করতে ব্যস্ত একটি মেয়ে। মাথা নীচু করে একমনে চাংলেঙ নামক বেতের কুলায় আলাদা

করে রাখছে পাকা মরিচ । হাতের কাছে লম্বা বেতের দড়ি । অনেক দূরে বাঁধা তিল ক্ষেতে মৃত্তিঙ্গা বাঁশের ঠপঠপি । দড়ি টানলেই বাঁশের চেরা টুকরোয় টান পড়ে, ছাড়লেই হাততালির মতো আরো জোরে শব্দ হয় । একে ওয়াখ বলে । ওয়াখ দিয়েই জুমের পাখী তাড়ানো হয় ।

তিল ক্ষেতে বন ঘুঘুর ঝাঁক । উড়ে যায় ওয়াখর আওয়াজে । আবার ফিরে আসে । তিল গাছের নরম ডালে বসলে গাছের ডগা হেলে, নুইয়ে পড়ে । মাটিতে ঝড়ে পড়ে তিল । মহানন্দে খুঁটে খুঁটে খায় । তবু ভালো, বন ঘুঘুরা চুকুর কুউ চুকুর কুউ ডেকে ডেকে ঝাঁক বানাতে সময় নেয় । মুস্কিল হচ্ছে, চঞ্চল বুলবুলিরা । ফুরুৎ ফুরুৎ মরিচ ডালে পুচ্ছ নাচিয়ে লাফায় । নিজের লেজে লাল টুকটুকে ফোটা, তবু লাল মরিচ দেখলে ওদের কেমন জ্বালা ধরে যায় । শেষ না করে যেতে চায় না । মুখের বুলিতে বুলবুলিরা নাকে সুর টেনে বলে, বন্দুক এল, ধনুক এল, দোয়ায় গুরু, দোয়ায় গুরু । ওয়াখ বাজালেও বুলবুলিরা ভয় পায় না । হাতে বাজানো বাঁশের ঠপঠপি দিয়ে তাড়াতে হয় । ওয়াখ নয়, ওয়াই আফফা । হাতে বাজানো বাঁশের ঠপঠপিটাই ওয়াই আফফা ।

ওয়াই আফফা বাজাতে বাজাতে এই মেয়েটা আনমনা, উদাসীন চোখের দৃষ্টি সুদূরে । জরকামুনির বাঁশীর সুর ওকে মুগ্ধ করেছে । না হলে দুদিন ধরে অমন আনমনা হয়ে থাকে কেন ?

বাঁশীর সুর থামে না । মেয়েটির হাতে রূপার বালা টুংটাং বাজে । দূর থেকে জরকামুনি শোনে না, তবে হাতের রূপার বালা রোদে ঝলকায়; জরকামুনির চোখ ধাঁধায় । ওয়াই আফফার তালে তালে মেয়েটির বক্ষ আবরণী দোলে । জুমের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে মেয়েটির খোলা চুল ।

মেয়েটির নাম সাজেরুঙ । জরকামুনির পরিচিত । কথা হয়নি কোনদিন । তবু জরকামুনির মনে হচ্ছে, কবেকার কোন টংঘরের সাংসিতে নীরব জ্যোৎস্নায় কতো কথা যেন হয়েছে । আপন মনে সে বলে, সুন্দরী হলেই সবাইকে চেনা চেনা মনে হয় ।

অচেনা জুমিয়া কিশোরীকে দেখলে গান গেয়ে গেয়ে জিজ্ঞেস করার রীতি রিয়াং সমাজে প্রচলিত । বাঁশী থামিয়ে বিলম্বিত সুরে হ্রেষা ধ্বনি তোলে—হুঁ হি্ হি্ হি্ । পাহাড়ে পাহাড়ে হ্রেষা ধ্বনি আছড়ে পড়ে, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে । মেয়েটি চঞ্চলা হয়, বুকের ভেতর বিকলা করে, তবু চুপ করে থাকে । মরিচ বাছার ভান করে আনমনা ভাব দেখায় । জরকামুনি টের পায়, এই চুপ করে থাকার অর্থ । বনপাখী সহজে ধরা দেয় না । আবার হ্রেষাধ্বনিতে মুখর হয় সারা উপত্যকা ।

মরিচ থেকে চোখ তুলে চারদিকে দ্রুত তাকায় মেয়েটি । না ধারে কাছে কেউ নেই । তবু দ্বিধা । একটু ভয় । ঠোঁট কেঁপে উঠে অযথা আবেগে । তারপর, সমস্ত শক্তি দিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে হ্রেষাধ্বনিতে মর্মরিত করে তোলে সারা জুম ক্ষেত । অপূর্ব এক উত্তেজনায়, আবেগে তোলপাড় হয় জরকামুনির হৃদয় । পাহাড় থেকে পাহাড়ে হ্রেষা ধ্বনি আদিমতম ভালবাসার প্রতীক । এখনো চির নতুন । জরকামুনি মাথায় গামছা বেঁধে বাঁশী রেখে আবার তিল ক্ষেতে নেমে যায় । সারা দেহে কর্ম তৎপরতা এসেছে । ভালবাসার সমস্ত তাড়না কর্মঠ হাতের পেশীতে সঞ্চারিত হয় । তিল গাছের শাখা বাঁধতে বাঁধতে গান গেয়ে উঠে জরকামুনি । পূর্ব পুরুষের মুখে এই গান একদিন সরব হয়ে উঠেছিল । রিয়াং সমাজের এই রীতিই চ'লে আসছে । গানের মধ্য দিয়েই প্রেমিক তার

প্রেমিকাকে প্রণয়ের সব কথা মন খুলে জানায়। বহু বংশ পরম্পরায় এই রীতি চলছে ধারাবাহিক।

বুকতই হাপুংনি তক বা ফাইজাকখা
তকনারই চকবুইমা, বুকতই তুইবুংনি
আ, বা ফাইজাকখা। বিষতং চালাই চালাই
নাইয় সে মুখচিনদা কইরেঙ মা
(কোন পাহাড়ের পাখী তুমি
লেজ নাচিয়ে কেন তুমি এলে
কোন নদীর ঝাঁক হারা মাছ
কেন তুমি অচিন জুমে এলে
বাঁকা চোখের চাহনি দেখে
চেনা চেনা লাগে)

মেয়েটিও জুমিয়া, কথার ছলা কলা জানে। লোকগীতির কলি খুঁজে খুঁজে, কিছুক্ষণ পর জবাব দেয় গানের সুরে।

হাপিং থাকলেঙ খাকনিলে কাইয়া
নুংবাই মালায়নি ছকইয়া
(অরহড় ক্ষেতের ফসল মাড়াতে আসিনি
এসেছি তোমার জন্যে)

এই উত্তর আসবে, ভালো করেই জানে জরকামুনি। চটপট সে আবার জিজ্ঞেস করে পরিচিত গানের কলি নিয়ে —

তকমূঙ তর জাংখ ওয়াই পাইহা
চন্দনা তামানি খ ওয়াইয়ালা
(সব পাখী নীড় বাঁধে
চন্দনা পাখী কেন বাঁধে না ?)

কথার সুর অন্যত্র। সব মেয়েরাই দাম্পত্য প্রেমের নিগড় বাঁধে, বিদেশিনী, কেন এখনো প্রেমের বন্ধনে পড়ো নি ?

সাজেরুঙ এবার অহংকারী হয়। মেয়েরা এই সময় অহংকারী না হয়ে পারেনা। ধরা দেবে, ধরা দেবে এমন ভাব দেখিয়েও ধরা দিতে চায় না। ওয়াই আফফা বাজিয়ে গাইতে থাকে সাজেরুঙ।

য়াকরাই তাকপিক বুতুই যঙহালে
সরখিলুং হুক বা চা মাইনাই দে।
(গোড়ালি যার ডিমের মত পাতলা
সে কেমন করে নুড়ি পাথরে জুম করবে)

সাজেরুঙ এবার মোক্ষম কথাটিই বলে। পুরুষের আসল জায়গায় ঘা দেয়। যারা অলস

বিলাসী, কর্মবিমুখ, তারা পাথর পাহাড়ে দুর্গম জঙ্গলে জুম চাষ করতে পারে না । তাদের মতো মানুষের সঙ্গে প্রেমের প্রশ্ন উঠেই না । একই কথায় অন্য অর্থও যেন বোঝাতে চায় । দুর্গম, বন্ধুর পথে ডিমের মতো গোড়ালি পায়ে হাঁটা অসম্ভব, তেমনি এই পুরুষ আমার মতো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার অনুপযুক্ত ।

জরকামুনির পৌরুষে বাধে, আহত হয় সে । আহত অথচ ক্ষোভে রাগে ভালবাসায় অভিমানে উত্তর দেয় জরকামুনি,

হাপুং হা রিরি হা ওয়ান জুইমা
হুক বা চায়াকনি তা ক্রিদি
তুই ব তুই রিদি তুই ওয়ানজুইমা
কাটি চায়াকনি তা ক্রিদি
(ভয় পেয়ো না, তুমি ভয় পেয়ো না
মসৃন হোক জুমের ওই নীল পাহাড়
সেথায় তবু খুঁজবো না ক্ষুধার আহার
ভয় পেয়ো না ! তুমি ভয় পেয়ো না
তুমি ভয় পেয়ো না ! ভয় পেয়ো না !
পাহাড়ের জলাতে জলের রঙ
হোক নীল, হোক স্নিগ্ধ শান্ত
তবু আমি ওখানে ঘাট বাঁধতে যাবো না
ঘাট বাঁধতে যাবো না, আমি ঘাট বাঁধবো না)

গান শুনে লজ্জায় চমকে উঠে সাঁজেরুঙ । বিদ্যুতের মতো ঝট্‌তি বেগে গাইরিঙ থেকে সে চলে যায় । মুখে সেই দুষ্টমির হাসি । জরকামুনির বুকে আঘাত হানে এক কেমন করা মূর্চ্ছনা তুলে । জরকামুনি দুটি তিল গাছে হাত রেখে করুণভাবে সেই গাইরিঙের দিকে তাকিয়ে গান গায় । নিঃসঙ্গ বিরহের জ্বালা বুকে মিটি মিটি জ্বলে ।

তুইনি আবালাং নুংব থাংখে
আংব থাংখে তগুলে সইলাংলাং
(ছড়ার জলের সঙ্গীহারা চাপিলা
বিরহ জ্বালায় বুক তার চঞ্চলা
তুমি চলে গেলে, তেমনি জ্বলবো একলা)

জরকামুনি বিলম্বিত সুরে গান গেয়ে গাইরিঙে ফিরে আসে । মাইচু খুলে খেতে থাকে । মাইচু পাতার মোড়কে বাঁধা ভাতের মচা । গ্রাস মুখে ঢুকেনা । বুকের ভেতর তোলপাড় হয় । নাকে মুখে কয়েক গ্রাস গুজে দিয়ে তিল ক্ষেতে আবার নেমে যায় । বিকেল নেমে আসে জুম ক্ষেতে । য়ংসারুই-এর ডাক শোনা যায় । য়ংসারুই বন পতঙ্গ, এর ডাক মানেই জুমিয়াদের ছুটির ঘন্টা । ধীরে ধীরে গাইরিঙ ছেড়ে, জুম ছেড়ে, গ্রামের দিকে পা বাড়ায় জরকামুনি ও তার সঙ্গীরা ।

যাবার আগে ঘরে ফেরার সাড়া জাগে জুমের পাহাড় জুড়ে । কেউ কাপাস ঠেসে ঠেসে

খাড়ায় ভরে । কেউ তিল বাঁধে কাপড়ে, তারপর খাড়ায় ভরে । কেউ কেউ মরিচ ভরতে থাকে । পাতা কেটে খাড়ায় রাখে । ঘরের রান্নার জন্যে সবজি তরিতরকারী জুম থেকে তুলে নেয় । ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি চলে । হ্রেষা ধ্বনি মুখরিত সন্ধ্যায় জুমে সূর্যের আলো মুছে যায় ।

দলে সাজেরুঙ, পনদিরুঙ, ওয়াইসিরুঙ এবং আরও অনেক মেয়ে । যুবকের দলে জরকামুনি, কুশারায়, বিদ্যাজয়, ধনবান, খরগরায় এবং আরো কয়েকজন যুবক । প্রাণ প্রাচুর্য ও যৌবনের টগবগে তারা ছুটছে । উচ্ছল যুবক যুবতীরা যাচ্ছে । সাজেরুঙের খাড়ায় যেতে যেতে নিঃশব্দে একটা মাটির ঢেলা পিছন থেকে ঢুকিয়ে দেয় জরকামুনি । পনদিরুঙ, ওয়াইসিরুঙ খিলখিল হেসে উঠে, লুটোপুটি খায় । কুশারায়, ঘন ঘন হ্রেষা ধ্বনি দেয় - ই হি্ হি হি্ হি্ । ধনবান আবার জরকামুনির খাড়া থেকে কলার থোর তুলে নিয়ে সাজেরুঙের খাড়ায় রাখে । এরই মধ্যে বিরহের সুরে গান গায় পনদিরুঙ । বুকের কোন গোপন ব্যথা বনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় । জরকামুনি পথের পাশে বনখুদুরিয়া গাছ উপড়ে এনে মাটি সহ ওয়াইসিরুঙের মাথায় দেয় আশীর্বাদের ঢঙে । কেউ কেউ আগে দৌড়ে যায়, কেউ বা পিছনে পড়ে যায় । মাটিতে গড়াগড়ি খায় কেউ কেউঃ। হাসাহাসি দাপাদাপিতে পাহাড়ী এলাকা ভরে উঠে ।

সামনেই গলাছড়া পাহাড়ী ধারা বইছে কলকল ধারায় । ছড়ার পাড়ে নীল জলের পাশে দাঁড়ায় ঘরে ফেরা জুমিয়ারা । পিঠ থেকে সবাই খাড়া নামিয়ে রাখে মাটিতে । লাজানো চোখ, কৌতুকের হাসি ঠোঁটে নিয়ে মেয়েরা ফিস ফিস করে একে অপরের কানে কি যেন বলে উঠে ।

ওয়াইসিরুঙ বড়ো ডানপিটে মেয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেংচি কেটে বলে জরকামুনিকে -- যাও না, তোমরা, পুরুষরা অন্য ঘাটে যাও । আমরা এখানে স্নান করবো । জরকামুনি তার দল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না শোনার ভান করে । ঠোঁট টিপে হাসতে থাকে । সাজেরুঙ এবার কথা কয় -- 'নির্লজ্জ ! মেয়েরা বিবস্ত্র হয়ে স্নান করবে জেনেও নড়তে চায় না ।'

বাঁকা চোখে মেয়েদের দিকে তাকায় । খিল খিল হাসে । হাসতে হাসতে জরকামুনি ওয়াইসিরুঙের পিঠে আলতো ধাক্কা দেয় । যাও না জলে খুশী মতো চান কর গে । আমরা সবাই উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকব ।'

মেয়েরা কিছুদূরে আড়ালে গিয়ে শুরু করে বিবস্ত্র জলকেলী । কেউ ডুব দেয় । কেউ মৎসাগন্ধা কন্যার মতো জলে কোমর ডুবিয়ে থাকে, উর্ধাঙ্গ জলের বাইরে । কেউ আবার নীল জলে ভাসতে থাকে । জলতরঙ্গে বক্ষজোড়া ছলাৎ ছলাৎ নেচে উঠে । এর মধ্যে টুপ করে জলে ঢিল পড়ে । পাশেই জরকামুনি উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে । যেন কিসসু জানে না সে । জল কাদা ছিটিয়ে জরকামুনিকে কিম্ভুতকিমাকার করে মেয়েরা । মেয়েরা চটপট উঠে দাঁড়ায় চড়ার পাড়ে । শরীর থেকে জল টপ টপ করে ঝরে পড়ে । কাপড় নিংড়ে খাড়ার কাছে যায় । ওয়াইসিরুঙের দেহভরা যৌবন । চোখে মুখে ছলাকলা । বলে, 'আতা জরকা আমার খাড়াটা একটু তুলে দাও ।' জরকা তুলে দিলো বটে । কিন্তু সাজেরুঙের খাড়া তুলতে গিয়ে ইচ্ছা করেই মাটির দিকে চেপে রাখে । হাসির নিক্কন বাজে সাজেরুঙের । এই ফাঁকে ওয়াইসিরুঙ জরকামুনির পটুলি বাঁধা পোষাক, চিরুনী, আয়না নিয়ে চম্পট দেয় । ঝোপে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে । সাজেরুঙ খাড়া ছেড়ে ওয়াইসিরুঙের পেছনে দৌড়ায় । ছুটে গিয়ে টান দেয় বক্ষ আবরণীর কোণা

ধরে । ওয়াইসিরুঙ ধাক্কা দিয়ে বক্ষ আবরণী সামলে দৌড়ুতে থাকে হেসে হেসে ।

সাজেরুঙ গাল ফুলিয়ে সাপিনীর মতো ফুঁসে ফুঁসে একা একা চলে যায় । গাঁয়ের মাঝখানে উঁচু টংঘর ! সাংসিতে কারুকাজ করে ফুল তোলা । বোঝা যায়, দোয়াইনক । যুবক ছেলেরা এখানে রাত্রে থাকে । প্রত্যেকের বিছানাপত্র সাজিয়ে রাখা সামরিক শিবিরের মতো । ঘরের ভিতরে বাদ্যযন্ত্র রাখে সিম্বাক নামক মাচার উপর । চমপ্রেঙ (পাহাড়ি গীটার) সুমুল (বাঁশের বাঁশী) খাম (পাহাড়ি মাদল) । যৌথ চাষ বা যৌথ শ্রমের সূচনা হয় এদের জীবনে দোয়াইনক পরিবেশ থেকে । বাঁশের পাখা ছোটবড়ো খাড়া, চেঙপাই, মেয়েদের কাপড় বুনার যন্ত্র, চুলের কাঁটা যা হরিণের পায়ের হাড় দিয়ে তৈরী, সিরিং মানে বাঁশের চিরুনী । সবকিছুই যুবকরা বানায় এই দোয়াইনকে বসেই । সন্ধ্যার পর জমতে থাকে যুবকরা । জরকামুনি মৃত্তিঙ্গা বাঁশ নিয়ে সাজেরুঙের জন্য চিরুনী তৈরী করতে বসে যায় । তসীরাম বসে পড়ে চেঙপাই সমাপ্ত করতে । বিদ্যাজয় বেতের পাখায় কারুকাজ করে । সূক্ষ বেতে বুনতে থাকে কাইসনী, যা বীজ বোনার সময় কোমরে বাঁধে । ঝাপি বানায় রনসাই । আপন মনে খাম বাজিয়ে গান গায় মাইলাইহা, সঙ্গে সুমুল ধরে বানাসাই । পাহাড়ি গীটার চমপ্রেঙের তার লেপুং নামক লতা বাঁধে কুশারায় । অন্য কজন গল্প করতে থাকে নির্জন কোণে বসে ।

দোয়াইনক একদিকে যৌথ জীবন যাত্রা সূচনা করে, অন্যদিকে শিল্প সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখে আদিম ধারায় ।

জরকামুনির মনটা উড়ু উড়ু । সাজেরুঙের সাংসিতে সন্ধ্যোবেলা না বসলে বুকটা বড়ো হাহাকার করে । হাতের চিরুনীটা কোনরকম শেষ করেই রওয়ানা দেয় সাজেরুঙের পিসীর বাড়ির দিকে । সঙ্গে চার পাঁচজন বন্ধু । সাজেরুঙ এই গ্রামে নতুন, বাড়ি অনেক দূরে গঙ্গা নগরে খমুপাড়ায় খোয়াই নদীর পাশে । এখানে তার পিসীর বাড়ি । মাস তিনেক হলো বেড়াতে এসেছে ।

যেতে যেতে জরকামুনির দল প্রথমে পায় প্রকারায়ের টংঘর । সাংসিতে বসে বুড়ো তামাক খেয়ে খক খক কাশে । বিশ্বরামের কুকুর দুটি ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে । সামনেই বলিরায়ের বাড়ি, সন্ধ্যেবেলা ধান কোটে । উধাবন রিয়াং তার বারান্দায় কাচকু রাজার রূপকথা নাতি নাতনিদের বলে শোনায় । মইতারাম বারান্দায় বসে দা দিয়ে বাঁশের লাকড়ি ফাড়ে । তারপরেই সাজেরুঙের বাড়ি । দূর থেকেই সাজেরুঙ শুনতে পায় জরকামুনির সুমুল । তার মন হুঁ হুঁ করে ওঠে । বলা যায়, অবলারে বিকলা করে বনবাঁশীর মূর্ছনা । সাজেরুঙকে জরকামুনি ভালোবেসে নাম দিয়েছে খুচাকতী । ঠোঁটে তার লাল রঙ, তাই খুচাকতী ।

জরকামুনি দল নিয়ে বসে সাজেরুঙের সাংসিতে । সুমুল তখনো থামে না । তাকে ঘিরে অন্য যুবকরা বসে । ঘরের ভিতর উনুনের পাশে সাজেরুঙ, বিদ্যুৎ চমকানো হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় । বাঁশের হুঁকোতে তামাক ভরে সাজিয়ে এগিয়ে দেয় সাংসির যুবকদের ।

উনুনের পাশে তুলা ধুনে ধনুক দিয়ে । ধনুকের দুং দুং দুং ধ্বনির মধ্যে অপূর্ব ছন্দ । দোলে তরঙ্গে তরঙ্গে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ । ঘরে বাতি থাকে না । লাকড়ি জ্বেলে আগুনের আলোয় কাজ করে । লাকড়ি শেষ হলে বাইরে উঠোন থেকে লাকড়ি এনে জ্বালাতে যায় । উনুনের পাশেই সুতো কাটে সাজেরুঙের পিসী । সাজেরুঙের চোখে মুখে খুশি খুশি ভাব । হাতের বালা টুংটাং

বাজে । বুড়ি টের পায়, বোঝে সাজেরুঙ একসাথে ঘরের লাকড়ি কেন জ্বালাতে চায় । লাকড়ি শেষ হলেই বাইরে লাকড়ি আনতে যাবে, আসা যাওয়ার আছিলায় চোখে চোখে কথা । এতো উনুনের আগুন জ্বলছে না, জ্বলছে পীড়িতির আগুন ।

সাজেরুঙ যখন লাকড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, জরকামুনি বাঁশী বাজিয়ে হাতের কনুই দিয়ে পাশের যুবকটিকে খোঁচা দেয় । বুঝিয়ে দিলো, লাকড়ি আনার অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য । ফিক করে হেসে ওঠে সাজেরুঙ । আড়চোখে একবার জরকামুনিকে দেখে নেয় ।

ঘরটা অন্ধকারে ডুবানো । মধ্যে উনুনের কাঁপানো আলোয় ঝলকানো সাজেরুঙের মুখ । রুক্ষতাহীন চুলের গোছা বুনো ফুলের সঙ্গে খোপায় বাধা । আলোয় চিক চিক করে । পাতলা দুটি ভূরুর নীচে লজ্জাচকিত চোখ দুটি গভীর । কাজল দেওয়ার অভ্যাস নেই । তবু দৃষ্টিতে মায়ামাখা আবেশ । ঠোঁট দুটি লাল । বদ্ধ ঠোঁটজোড়ার গভীরে না বলা কথা বলার চাপা ব্যাকুলতা থমকানো ।

গলা ভরে দোলে বুনো রামকলার বীচি দিয়ে গাঁথা মালা । বনের মেয়ে, বনের সাজসজ্জাতেই মানায় । উদ্ধত যৌবনের বেগ সংযত করে হাতে বোনা বক্ষ আবরণী গায়ে । কানে মোটা মোটা ছেঁদা । তাতে রূপোর বড় রিং ঝকমক করে । মেদহীন পুষ্ট দেহে কোমরে এক স্বল্পবাস । নিরাবরণ দেহের স্বল্পবাসে প্রতি নিমেষে তীক্ষ্ণ সতর্কতা । Pinki Pal

পাশেই তার পিসী । সাজেরুঙের চোখ দেখে বোঝে । ওর বুকটায় পাখীটা ব্যাকুল হয়ে ডানা ঝাপটায় । বুড়ী মর্মে মর্মে জানে সেই ডানা ঝাপটানির ব্যাকুলতা, জ্বালা । যৌবনে অভিভাবক তার সামনেও থাকতো । অস্বস্তিকর সেই পুরনো দিনের পরিবেশে তাকে কত ব্যথায় কাজের ভান করে থাকতে হতো । হাতে কাজ, মন বারান্দায় ঘন ঘন উঁকি দিত । সুমুলের সুরে হাহাকার করতো বুক । ভাবতে গিয়ে অতীত মধুময় স্মৃতিগুলি তাকে কেমন উতলা করে আজও । কর্কশ মুখে ওদের মিলনের আনন্দকে বিড়ম্বিত, বিষাদে ভরে তোলা পাপ । প্রকান্ড হাই তুলে ঘুম পাওয়ার ভান করে বুড়ী ঘুমোতে যায় ।

বুড়ী উঠতে না উঠতেই যুবকরা উনুনের পাশে ঘিরে বসে । বুড়ীর নির্বাক উদারতাকে কৃতজ্ঞ, শান্ত দৃষ্টিবলে ধন্যবাদ জানায় সাজেরুঙ । ঠোঁটের কোণে, চোখের দুয়ারে খুশীর ঝিলিক । লজ্জা জড়ানো হাতে তামাক সাজিয়ে দেয় । যুবকরা মুখ নত করে । আবার দুং দুং দুং তুলা ধুনে । হাতে ভরা ঝকমকে রূপোর বালা ঝুমুর ঝামর বাজিয়ে । ভাবটা এমন আপন মনে তুলা ধুনে । আপন মন যে তখন আপনার নয় । যুবকদের বুঝতে কষ্ট হয়নি । বিশেষ করে জরকামুনির ।

জরকামুনি সাজেরুঙের দিকে মুগ্ধ তন্ময়তার ঘোরে । সাজেরুঙ বিব্রত । লাকড়ী ঠেলার ভান করে এদিক ওদিক চোখের তারা ঘুরায় । যেতে যেতে চোখের তারা জরকামুনির দৃষ্টিতে ডোবে । লজ্জাচকিত চাউনী চমক দিয়ে বুক খামচে আবার হারিয়ে যায় । জরকামুনির বন্ধু তসীরাম বাঁশের হুঁকোতে তামাক টানে । ট-ট-টর ! টটটর । তামাক টানের এক মেজাজী ছন্দ । ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার আড়াল থেকেই (মেঘদূত নয়) ধুম্র দূতের মতো নয়নে নয়ন মিলানোর বিচিত্র খেলা দেখে । ফিক ফিক হাসে । দুং দুং দুং ধনুক চলে । মেঘের মতো কণা কণা তুলো উড়ে । কারো মুখে কথা নেই । জরকামুনির আরেক বন্ধু বিদ্যাজয় । হাসি মসকরা পছন্দ করে, নীরব নীরব থাকা তার

ভালো লাগেনা। সাজেরুঙের হাতের ধনুক কেড়ে নিয়ে বলে—রাখ তোমার ধনুক তুলা। এতজন এসেছি, একটু গল্প গুজব করব। এমন ব্যস্ত ভালো লাগে নাকি। নাকি তোমার ভালো লাগে না ? না লাগলে আসবনা।

সাজেরুঙের মুখে লাজের ছিটা লাগে। একটু বিরক্তি বিরক্তি ভাবও ফোটে। --কেন ! ভাল লাগবে না। হাতের কাজ হাত করছে, মুখের কাজ মুখ করবে, ধনুক কি আর আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ? তুলা ধুনা বন্ধ না করে কথা বলা যায় না বুঝি।

গম্ভীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে তসীরাম -- না। যায় না। চাপা হাসিতে সারা মুখ কেঁপে উঠে সাজেরুঙের। মাথা নোওয়ানো, ঘাড় বাঁকানো ভাবে 'ফানসুই' বানায়। ফানসুই মানে ধুনা তুলার উপর বেলনার মতো মসৃন কাঠি দিয়ে গোল সলতে বানায়। সেই সলতে থেকেই সূতো তৈরী হয়।

মানুষকে হাসাতে কাঁদাতে জানে জরকামুনির বন্ধু বিদ্যাজয়। এই বিদ্যা তার জন্মগত। সেই সুবাদে গ্রামে গ্রামে তার পরিচয়। রিয়াং সমাজের যত সব রূপকথা তার জানা। বুড়ো বুড়ীদের পাশে বসে রুপকথার গল্প আহরণ করে। লংতরাই বনশ্রেণী মুখর থাকে প্রেমের আবেদন নিবেদনের হ্রেষা ধ্বনিতে। পাহাড়ী জীবনে শৈশব, কৈশোর এমন তরো। জরকামুনি সাজেরুঙ দুজনেই আনন্দ বিষাদে মেশা চোখের নেশায় হ্রেষাধ্বনির কলরব তুলেছে অনেক দিন। গানের কলি খুলে হারে হারে আনন্দ বেদনার মালা গেথে পরস্পরকে পরিয়েছে। মুখোমুখি বসে কিন্তু কোনদিন কথা হয়নি। চোখের, মুখের ছলাকলা, বাঁকা-চোরা কথার লেনা দেনা সব কিছুই হয়েছে। তবু নিবিড় মিলন ব্যাকুলতার এক কলধ্বনি বুকের গভীরে। সাজেরুঙের চোখ তুলে দূর থেকে চাওয়া, জরকামুনির বুকে কাঁপন ধরায়। মুখোমুখি হলে দুজনেই মৌন। অদৃশ্য লাজুক লতায় আষ্টে পৃষ্ঠে জড়ায় মন। লতার কাঁটায় খোঁচা লাগে হৃদয়ে। সেই প্রকাশ কথা বা শব্দে হয় না। পলক হারা উদাস চোখে কেবল ভাসে।

জরকামুনি পাড়ার দশটা ছেলের মতোই সাজেরুঙের ঘরে সন্ধ্যে বেলা যায়। কথাবার্ত্তা খুব একটা হয় না। চোখাচোখি হয় ঘন ঘন। নিশ্বাস কেড়ে নেয়। রুদ্ধ হৃদয়ের যত সব না বলা কথা মনের সীমানায দলিয়ে পাকিয়ে ওঠে। দুমড়ে মুচড়ে বেরোতে চায়। লাজে, সংশয়ে কাঁপা ঠোঁটের দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে আবার। একেই বলে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

সাজেরুঙ পাড়ায় আবার ঘুরে ঘুরে জরকামুনির প্রশংসা শোনে। নিজে কোন মন্তব্য করে না। মন দিয়ে শোনার মধ্যেই আপনহারা ভাবটা ফোটে। জরকামুনিও সাজেরুঙের প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। তবু কাউকে বলেনি মন খুলে। খোলামেলা সম্মতির জন্য অধীর। সম্মতি জানবে কেমন করে ? দ্বিধা নিয়েই দিন কাটে। বলবে বলবে করেও বলা হয়নি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তারই ভয়ে।

বন্ধুদের কাছেও মনের কথা প্রকাশ করেনি। যদি কথা না রাখে। প্রত্যাখানের অপমান, লাঞ্ছনা কত দুর্বিসহ ভাবতে গিয়ে জরকামুনির মাথা ঝিম ঝিম করে। জানাজানি হয়ে গেলেও বিপদ আছে। হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়। বন্ধুদের মধ্যে কেউ ঈর্ষা করে যদি ঝুট ঝামেলার সৃষ্টি করে। বিড়ম্বনা বাড়বে ছাড়া কিছুই হবে না। প্রেমের কথা বলা কঠিন। কখন কি যে হয় বলা

যায় না । তবু মনের ভারটা কমিয়ে দেয় বিদ্যাজয়কে জিজ্ঞেস করে কথার পিঠে কথা টেনে । সাজেরুঙ মেয়েটা দেখতে শুনতে খারাপ নয়, তাছাড়া ওর হাতের তৈরী কাপড়ে একটা ঝিলিক দেয় । তোমার কেমন লাগে ?

বিদ্যাজয় বড় অভিজ্ঞ । বহু প্রেমের ভাঙ্গা গড়ার সাক্ষী । সব প্রেমিকের খবর তার জানা । সহজ ভাবে উত্তর দিয়েছিলো -- কেমন যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বলবো, ভাল খারাপ জিজ্ঞেস করার ভান করে পছন্দটা জানিয়ে দিচ্ছ মাত্র । এখন জানি খারাপ বললেও তোমার ব্যথা লাগবে । মনে মনে আমাকেই সহ্য করতে পারবে না । পিছুও হঠবে না । কোন ছেলে যদি জিজ্ঞেস করে অমূক মেয়েটা কেমন ? জানবে মতামত চাওয়াটা অজুহাত মাত্র । আসলে মনের সিদ্ধান্তটাই জানিয়ে দিচ্ছে ।

জারকামুনি তর্ক বিতর্কে যায়নি । কথাটা তারই মনের কথা । আপত্তি করার মতো কারণ খুঁজে পায়নি । তখন থেকেই বিদ্যাজয় জরকামুনির দুর্বলতা চিহ্নিত করে । বিদ্যাজয়ও যায় সাজেরুঙের ঘরে জরকামুনির সাথে । ঘটকের মতো ভালোবাসার জটিল বাধা খুলে দিতে চেষ্টা করে । তার উপর সাজেরুঙ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে সম্মতির কথা । মনে দ্বিধা থাকলে, মাথা বেদনা, পেট খারাপ কত অজুহাত দেখিয়ে ঘুমোতে পারত অন্য মেয়ের মতো । তা করেনি ।

বিদ্যাজয় অদ্ভূত প্রকৃতির ছেলে । মেয়ে পুরুষ বুড়ো বুড়ি সব আসরেই তার অবাধ আনাগোনা । সে মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, ভাবায় । এই বিচিত্র আনন্দেই বিভোর । পশু পাখীর ডাক ডেকে মানুষ চমকায় । বুলবুলি, বনঘুঘু, বটকল, শুকর শিশু, হরিণ, কুকুর সব জন্তু জানোয়ারের স্বর অবিকল নকল করতে জানে । গ্রামের যত খিট খিট লোকদের কণ্ঠ তার রপ্ত । অনন্ত রিয়াং পাড়ার সর্দার । মেজো বউকে ডাকে কাঁদো কাঁদো স্বরে -- ফুইনামা আ ! আ ! আ ! বলে ।

বিদ্যাজয় ওই ঢঙে ডাক দিয়ে নতুন বউকে ক্ষেপায় । ওকে দেখলে গ্রামের যে কোন বাড়ীর কুকুরগুলো একসাথে লেজ নেড়ে সোহাগী ডাকের কলরব তোলে । শ্বাশুড়ী বউ এর ঝগড়া, বুড়ো স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া বাধলে মন দিয়ে শোনে । সেই ঝগড়াই আবার আসরে আসরে জমিয়ে শোনায় । লোক হাসায়, লোক ক্ষেপায়, কখনো কাঁদায় ।

ওকে সবাই যেমন স্নেহ করে তেমনি যমদূতের মতো ভয়ও পায় । ভয় না পেয়ে করবে কি ! নারাজ বৌকে রাজী করানো বা পোষ মানানোর সমস্ত যন্ত্র ওর বংশ পরম্পরায় জানা । নতুন মেয়ে যদি প্রেমে না পড়ে ওর কাছে গেলে মেয়ে ভুলানোর কৌশল বাতলে দেয় । পাড়ায় পাড়ায় অনেক প্রেমের ভাঙ্গা গড়ার সাক্ষী সে ।

মৈত হাম রিয়াং এই গ্রামের যুবক । ভালবাসতে চেয়েছিলো বান্ধবী ছড়া গ্রামের সুন্দরী মেয়ে রূং বাংতীকে । রূং বাংতীর মা বাবা কেউ মৈত হামকে পছন্দ করতো না । রূং বাংতী ওর নাম শুনলেই রেগে যেতো । ব্যর্থ হয়ে মৈত হাম বিদ্যাজয়ের শরণাপন্ন হয়েছিল । লবণ মন্ত্র পড়ে, মরিচের গুড়া, শুটকী দিয়ে কলার পাতায় মৈত হামের হাতে দিয়ে বলেছিলো -- কোন রকমে যে কোন তরকারীর সাথে যদি রূং বাংতীকে খাইয়ে দিতে পার তাহলেই সব হাসিল হবে । মৈত হাম গ্রামের এক বিধবাকে দিয়ে সেই মন্ত্র পড়া নুন মরিচ রূং বাংতীকে খাওয়ায় । রূং বাংতীর জ্বর আসে । রূং বাংতী জ্বরের ঘোরেই প্রলাপ বকে মৈত হামকে ডাকে । জ্বর ভালো হলো । কিন্তু রূং

বাতী দিশেহারা চোখে মৈত হামকে খুঁজে খুঁজে ঘুরে । কয়দিন পর রূং বাংতীকে নিয়ে মৈত হাম পাড়া ছেড়ে পালিয়ে গেলো । তখন থেকেই বিদ্যাজয়ের নাম এলাকায় ছড়ায় রূপকথার মতো । আতঙ্ক সঞ্চারী বিদ্যাজয়ের নাম অনেকেরই ঘুম কেড়ে নেয় ।

বিদ্যাজয়ের বাড়ীতে লোকজন খেতে গেলে বড় চিন্তা করে খায় । ওর বাপও নাকি দারুণ মন্ত্র জানতো । মন্ত্রের গুণে বড় বড় গাছ পাতা ঝড়িয়ে শুকনো ডালপালা নিয়ে রাখতে পারতো । শুয়োরের বড় মাংসের টুকরা সেদ্ধ করতো । সেদ্ধ টুকরার ভেতরে কাঁচা মাংসের টুকরো মন্ত্র পড়ে ঢুকিয়ে দিতো । সেই মন্ত্রপড়া মাংস খেতে দিয়েছিলে দবারাম রিয়াংকে ।

দবারাম রিয়াং পেট ফুলে বিছানায় পড়ে । সাতদিন বিছানায় থাকে । কত ঔষধ কত কবিরাজ চিকিৎসা করেও ভালো হয় না । বোতল বোতল মদ, অনেক মুরগী কেটে পূজা দিয়েও দবারামকে বাঁচাতে পারেনি । অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনী কতগুলো বিশ্বাসের ভিত মজবুত করে রিয়াং সমাজে । সে বিশ্বাসের ধারা থেকে জরকামুনিও মুক্ত নয় । অন্ধ বিশ্বাসের বিচিত্র শিকড়গুলো শিরায় শিরায় ছড়ানো ।

জরকামুনিও আতঙ্ক মিশ্রিত বিশ্বাস নিয়ে বিদ্যাজয়ের বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে চলছে । জরকামুনির আপ্রাণ চেষ্টা সাজেরুঙকে বশে আনতে । নিতান্তই যদি প্রেমে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে শেষ অবলম্বন হবে বিদ্যাজয়ের মেয়ে ভুলানো মন্ত্রশক্তি । তারই মোহে বিদ্যাজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে জমে দিন দিন ।

আজকের সান্ধ্য আসরে আসার সময় কথা দিয়েছে জরকামুনিকে এক সঙ্গে সাজেরুঙকে হাসাবে কাঁদাবে বলে । হঠাৎ আপন মনে বিদ্যাজয় উনুন থেকে উঠে ঘরের মাচা থেকে দুটি কাপড় নেয় । একটা জড়ায় বুকে বুক আবরণীর মতো । অন্যটা নাভিপদ্ম বের করে কোমরে জড়ায় ।

সাজেরুঙের পাশেই ছিল চরকা । চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূতো কাটতে শুরু করে । শরীরটাকে কোমল মেয়েলী ভঙ্গিতে বাঁকায় । গলায় রামকলার মালা পড়ে সাজেরুঙ যেমন স্ফীত বুক দোলায় তেমনি দোলে বিদ্যাজয় । কখনো সাজেরুঙের লাজে চমকানো চোখের মতো চোখের পাতা থির থির নাচায় । ফানসুই ধরে টানার ভঙ্গিমায় হাতের বালা বাজে, সামলায় ।

কখনো সাজেরুঙের কণ্ঠ নকল করে পিসিমাকে ডাকা অনুকরণ করে । উঁচু পাহাড়ে উঠার সময় ঘাড় সামনে বাঁকিয়ে চোখের তারা উপরে তুলে, ঠোঁট কামড়ে কামড়ে চলার ভঙ্গী দেখায় । না হেসে কেউ পারে না । গোটা বাড়ির মন আর চোখ কেড়ে নেয় বিদ্যাজয় । পাহাড়ে উঠার সময় হঠাৎ জরকামুনির স্বর শুনে থমকে চমকে চমকে চাওয়ার নমুনা যেমন সাজেরুঙের মুখে ভাসে তেমনি নিখুঁত অভিনয় করে বিদ্যাজয় । রাত ঘনায় । মুক্ত হাসির খলো খলো ধারায় সারা টংঘর থর থর কাঁপে ।

ঢং তামসায় ক্লান্ত বিদ্যাজয় উনুনের পাশে ঘাম মুছে মুছে তামাক টানতে বসে । সাজেরুঙ লজ্জা সরম ছুড়ে বলে দাদা একটা গল্প বলো । সাথে সাথে সবাই.. চেপে ধরে, বায়না করে গল্প শোনানোর । মুখ গম্ভীর করে তামাক টানে । মনের অতল তলে গল্পের সন্ধানে । এক এক জনের এক এক চাহিদা । কেউ বলে রূপকথার গল্প বলো, কেউ শুনতে চায় পূর্ব পুরুষের শিকারের কাহিনী ।

বাঁশের হুকোটা তসীরামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিদ্যাজয় গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করে । আজকে রূপকথাও বলব না, শিকারের কাহিনীও অনেক শুনিয়েছি । আজকে বন মানুষের ঘটনা শোনাব । ঠাকুরদাদার ছেলেবেলার ঘটনা । বাবার তখন জন্মতো দূরের কথা । ঠাকুরদা তখন বিয়েই করেনি । ঠাকুরদার বয়েস তখন দশ এগারো । এই লংতরাই পাহাড়ের গভীর অরণ্যের ভিতর বন মানুষ থাকতো । দেখতে মানুষের মতো চেহারা । মুখ নাকি লম্বাটে । মাথার মতো সারা শরীরে লোম । চুলের রঙ লালচে মতো । দেখতে মানুষের চেয়ে বেঁটে খাটো । বেঁটে খাটো হলে কি হবে, শরীরের পেশীতে চার জনের শক্তি ।

আমাদের লংতরাই পাহাড়ের মধ্যে যেখানে উঁচু উঁচু পাথরের পাহাড় সেখানে ওরা বাসা বেঁধে থাকতো । খাড়া পাথরের পেটে গুহার মতো গর্তকে বেছে নিতো বাসা বাঁধার জন্য । যেখানে কোনো কাক পক্ষী যেতে পারতো না । সেই সব নির্জন জায়গাতেই ওদের আস্তানা । পাহাড়ের ছড়ায় ছড়ায় ঘুরতো কাকড়া, চিংড়ির খোঁজে । বড় বড় পাথর উল্টিয়ে পাথরের নীচের কাকড়া ধরে খেতো । এক একটা পাথর এখন আমরা দশজন মিলেও নাড়তে পারব না । কাঁচা কাকড়া, চিংড়ি, শামুক ছিল ওদের খাদ্য । পুরুষ, নারী দুটো এক সঙ্গেই থাকে । সকালে পুরুষরা পূর্ব দিকে গেলে, নারীরা যেতো পশ্চিমে । সন্ধ্যে বেলা ফিরে দু'জনে মিলতো গুহায় এসে । নিরিবিলি জড়িয়ে রাত কাটাত । পায়ের পাতা পিছন দিকে মোড়ানো । ছড়ার পাড়ে পলিমাটিতে পায়ের উল্টা দাগ দেখে বুঝা যেতো বন মানুষের পায়ের দাগ । বাচ্চাদের মতো নাকি পা-গুলো ছোট ছোট । জিভটা এত ধারালো যে চাটতে চাটতে জীব জন্তুর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারে । একা কোন মানুষ পেলে চিবিয়ে নাড়ীভুড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে খেতো । তবে মানুষের সাড়া শব্দ পেলে কাছে আসে না । আমার ঠাকুরদাদা লংতরাই পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে জুমচাষ করতে যায় । কাছে পিঠে তখন কোন পাড়ার চিহ্ন ছিল না । পাশে একটা উঁচু পাথরের পাহাড়ে ঝর্ণা । দিনের বেলাতেই সেখানে রাতের মতো অন্ধকার । সেই উঁচু পাথরের পাহাড়ে অনেক উপরে একটা গুহা । ওই গুহাতেই থাকতো এক জোড়া বন মানুষ ।

প্রায়ই ছড়ার কিনারে শামুকের খোলস, কাঁকড়ার শক্ত খোলস, নখ দেখা যেতো । মানুষের পায়ের মতো উল্টানো পায়ের দাগ চোখে পড়ত ছড়ার কিনারে । দেখতে নাকি বাচ্চাদের পায়ের সমান । সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরদা, আর ঠাকুরদার বাপ ওই ছড়া দিয়ে আসে । একটু একটু অন্ধকারে তারা স্পষ্ট দেখতে পায় একটা বেটে খাটো উলঙ্গ মানুষ । ছপ ছপ জল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে । মাঝে মধ্যে উলঙ্গ মানুষটা দাঁড়ায়, পাথরের নীচে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে । খেতে খেতে হাঁটে । আবার কোন জিনিষ হারিয়ে গেলে খোঁজার মত নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁটে । হঠাৎ পিছনে ঠাকুরদা, আর ঠাকুরদার বাপকে দেখে দৌড়ে লাফিয়ে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে পালিয়ে যায় । ঠাকুরদা কেন ! ওই আমলের প্রায় সবাই ওদের দেখতে পেত । মেয়েরা তো ভয়েই যেতে চাইতো না ।

তখন ভাদ্র মাস । ধান কাটার সময় । বিকেলে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল । সবাই জুম থেকে গাইরিঙে গিয়ে উঠে । (গাইরিঙ মানে জুমের অস্থায়ী ঘর) হঠাৎ শোনে উ ! উ ! উ ! উ ! করে কে যেন চীৎকার দিয়ে ডাকে । ঠাকুরদা ভাবছিল এই বৃষ্টিতে আবার কে ডাকছে । বারান্দায়

বেরোয়। দেখে ঢালুতে জুম ক্ষেতের আড়ালে আড়ালে লাল চুল ওয়ালা বন মানুষ। কাচা চিনারের গোটা তুলে খাচ্ছে আপন মনে। হঠাৎ চোখাচোখি হয় ঠাকুরদার সঙ্গে। বড় একটা চিনার তুলে প্রাণপনে দৌড়ে জঙ্গলের দিকে নেমে যায়। চিনারটা বোধ হয় গুহায় থাকা সঙ্গীর জন্য নিয়েছিলো। প্রায়ই খুব ভোরে বা সন্ধ্যেবেলা চিনার, মমফল চুরি যেতো।

বেশ কিছুদিন পর দুপুরবেলা ঠাকুরদাদার বাপ গ্রামের অনেককে ডেকে গাইরিঙে মদ খেতে বসে। এমন সময় শোনে একটা মানুষ বড় দুঃখে কাঁদছে। অঝোর কান্নার সাথে বৃষ্টিও পড়ছিল মুষল ধারে। ওই কান্নাতেই যেন আকাশও কাঁদে। বন থেকে বনে পাহাড়ে করুণ কান্নার দুঃখ ছড়ায়।

গাইরিঙ থেকে লোকজন বেরোয় চারদিকে। তন্ন তন্ন করেও দুঃখী মানুষকে খুঁজে পায়নি কেউ। হঠাৎ ঠাকুরদা পাশের টীলায় চীৎকার করতে থাকে। সবাই টীলায় গিয়ে দেখে উঁচু চামল গাছের ডালে সেই বন মানুষটা। দু'হাতে মানুষের মতো মুখ ঢাকা। ডাল বরাবর পা দুটো ছড়ানো। লোমশ বুকটা কেঁপে উঠছে কান্নার আবেগে। নিশ্বাস যেন থমকে বেরোতে চায়। নীচের মানুষগুলো এক সাথে হৈ হৈ করে। একবার শুধু বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে বিস্ময়ে তাকায়। বিরহের জ্বালায় করুণ মুখটা দেখে ঠাকুরদার চোখও নাকি ছলছল করে উঠে। বন মানুষটা ছিল পুরুষ। সঙ্গিনীকে হারানোর জ্বালায় বোধ হয় অমন বুক ভাঙা কান্না। এত লোকজন হৈ চৈ শুনেও তার কান্না থামেনি। অন্য সময় মানুষ দেখেলেই পালিয়ে যেত। সেদিন বন মানুষটা এত অসহায় তবু পালাতে চেষ্টা করেনি। চরম হতাশায় মানুষ দেখেও ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন ব্যথায় কেঁদে চলছিল। কেউ ভয় পায়। কেউ বলে কত অমঙ্গলের পূর্বাভাষ কে জানে।

ঠাকুরদার বাবারা নাকি কুড়াল দিয়ে গাছটা কাটতে আরম্ভ করে। কুড়ালের ঘায়ে [illegible] গাছটা থর থর কাঁপে। নির্বিকার বন মানুষটা তাকিয়েও দেখে না। যেন মনে শুধু আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল। বৃষ্টিতে জবুথবু হয়ে কাঁপে। অনেকে গাছ কাটতে বাধা দিয়েছিল। অনেকে সেই বাধা শোনেনি। গাছটা কাত হয়ে ডাল পাতা সহ নুইয়ে পড়ে। [illegible] মট করে ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে লুটায়। বন মানুষটার দুঃখের কারণ কেউ বোঝেনি। আত্মহত্যা করতে এসেছিল কিনা তাইবা জানতো কে! মানুষ হোক বা বনমানুষ হোক ব্যথা দুঃখ সবারই আছে। মুখের আদল বদলে গেলে কি হবে। মানুষের মতো বন মানুষেরও প্রেম পীড়িতি, দুঃখ ভালবাসার জ্বালা কত বিষম! ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলাম।

গাছে চাপা পড়ে বন মানুষটা মারা যায়। মৃত্যুর সময়েও চোখ দুটি দু'হাতে ঢাকা। দুঃখ ভরা পৃথিবীর মুখ দেখার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না। মাথাটা থেতলানো ছিল। রক্ত গলগলিয়ে বেরোয়। শরীরের অর্ধেক জ্বালা ধরা বুকটা সহ গাছের নীচে চাপানো। ঠাকুরদা বলেছিলো কোন অজানা অভিমানে বা দুঃখে চোখ তার ঢাকা।

তিন চারদিন পরে। আরেকটা বনমানুষী আসে। মাথায় লম্বা চুলগুলি এলোমেলো। নিজেই যেন নিজের চুল টেনে কেঁদেছে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে। গাছের ডালে জুমের ক্ষেতে, ছড়ার পাড়ে পাড়ে পুরুষ সঙ্গীটাকে ডেকে ডেকে কাঁদে। সেই চামল গাছের গুড়িতে বসে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ে, কখনো কপাল চাপড়িয়ে কাঁদে। আকাশের দিকে মুখ তুলে। ভগবানের কাছে

নালিশ জানানোর ভঙ্গীতে ।

ঠাকুরদার বাপরা এই করুণ দৃশ্য দেখে খুব অনুতাপ করেছিলো । পরদিন পাগলিনী সেই বনমানুষী রাত্রি বেলা ঘরের পাশে চুপি চুপি দাঁড়ায় । ছল ছল চোখে আঙ্গুলে বেড়া ফাঁক করে পুরুষ সঙ্গীকে খুঁজতে থাকে । ঠাকুরদাদারা ভয়ে জুম ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসে আর কোনদিন সেই পাহাড়ে জুম করতে যায়নি ।

গল্প শেষ । উনুন ঘেরা পরিবেশটা বদলে গিয়ে থমথমে । বনমানুষীর কান্নার সুর তখনো সবার বুকে বাজে । ব্যথাকাতর চোখগুলো ছলছলিয়ে উঠে বিস্ময় কৌতূহলে । গল্পের ডানায় চড়িয়ে এক স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে নিপুণ কথক বিদ্যাজয় । বিদ্যাজয়ের মন্ত্রশক্তি কতদূর কে জানে । গল্পের মোহে মুগ্ধ পাহাড়ী যুব আসরকে মুখোমুখি দাঁড় করায় লংতরাই পাহাড়ের অতীত রহস্যময় লীলাখেলায় । সেখানে মানুষে বনমানুষে প্রতিবেশী, বনমানুষ আর বনমানুষীর মিলন বিরহের বিষণ্ণ সুরে পৃথিবী দুঃখী ।

জরকামুনি ভাবে তার মৃত্যুর পরেও হয়তো সাজেরুঙ অমন অসহায় কান্নায় কাঁদবে । ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করে বিদ্যাজয়কে— আচ্ছা বনমানুষীটা শেষ পর্যন্ত গেল কোথায় ?

বিদ্যাজয় জবাব দেয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে । পুরুষটার মৃত্যুর পর বছর দু'এক নাকি লংতরাই পাহাড়েই ছিল । কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াত মধ্যে মধ্যে লোকালয়ের পাশে এসে । এরপর কেউ দেখেনি । ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলাম ওটা নাকি বর্ত্তমান বাংলাদেশের মায়ানী বনে চলে গেছে । লংতরাই, আঠারমুড়াতে আরো কয়েক জোড়া বনমানুষ থাকতো । এখন সব অবলুপ্ত । মানুষের নিঃশ্বাস নাকি ওরা সহ্য করতে পারে না । পাহাড় জঙ্গল আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে । আমরাই বা ক'দিন থাকতে পারব কে জানে । বনমানুষটা মায়ানী বনে চলে গেলেও এখন কি আর বেঁচে আছে । কখন মরে গেছে হয়তো । বন্ধু বিনে কেউ কি আর বাঁচে ।

সাজেরুঙের চোখের কোণে দু ফোটা শিশির । জরকামুনি এমন দিশেহারা হবে তাকে হারালে । বিদ্যাজয়ের চোখে ধরা পড়ে সেই বিষণ্ণ মুখ । বিদ্যাজয় মানুষ কাঁদানোর সাফল্যে খুশী খানিকটা । নিজের হাতেই তামাক সাজায় কলকিতে ।

থমথমে পরিবেশটাকে বিষাদের রঙ মেশাতে চায় আরো । বলতে থাকে—বনমানুষী কেন । যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রেম করে । প্রেম করলেই ব্যথা থাকে । কত নারী নীরবে ডুকরে ডুকরে কাঁদে । ক'জনে খবর রাখে । পুরুষরাও প্রেমিকা হারিয়ে সারা জীবন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে । কেউ আবার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে দেশান্তরী হয় । অনেকে মনে করে একটা যখন গেছে আরেকটা বিয়ে করলেই চলে । চলে না । সংসারে ঝগড়া বিবাদ যেমন আছে প্রেম ভালবাসাও আছে । যারা বিবাদের অজুহাতে একবার ছেড়ে যায় তারা ফিরে আসে না ঠিক । কিন্তু মন থেকে কেউ মুছতে পারে না । বারবার সুখ দুঃখের স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে আর মানুষকে কাঁদায় । এই দুঃখিনী বন মানুষীর বুকের ভিতর প্রকান্ড জুমের আগুন নিয়ে কতদিন হাহাকার করছিল আমরা কি আর জানি ।

তসীরাম নীরব । কিছুটা ঘুমও পাচ্ছে । ঢুলু ঢুলু চোখ । বড় একটা হাই তুলে বলে -- আজ দুঃখের গল্পই শুনলাম । একজন না একজন একটা গান ধরো । বিদ্যাজয় বলে -- তুমি গাওনা ।

বসে বসে কত ছিলিম তামাক টানলে তার হিসাব তো নেই বলার ঢঙে নিজেরই লাজ লাগে তসীরামের । জরকামুনিও সায় দেয় । ঠিক বলেছে তসীরাম । একটা গান গাও বিদ্যাজয় । বিদ্যাজয় নারাজ । এতক্ষণ তো বক বক করছি এবার না হয় সাজেরুঙ একটা গাইবে । সাজেরুঙ মাথা দুলিয়ে লজ্জায় হঠাৎ জড়ো সড়ো । এই পরিস্থিতির জন্য তৈরী ছিল না । আমার গলায় ঠান্ডা লেগে কদিন ধরে সর্দি কাশি । তোমরা কেউ গাও । কথাটা পরোক্ষভাবে জরকামুনিকে বিদ্ধ করা ।

জরকামুনি কিছুক্ষণ নীরব থাকে । সম্মতি জানায় মাথা নেড়ে । গুন গুন করে আওড়ায় একটা ছোট্ট গানের কলি ।

জরকামুনি উনুন থেকে লাকড়ি সরিয়ে আগুনের আঁচ কমায় । আলো ছায়ায় মুখগুলো কখনো ঝলকায় কখনো বা আঁধারে মিলায় । আলো আঁধারের লুকোচুরিতে গান ধরে জরকামুনি । সঙ্গে সুমুল বাজায় তসীরাম । কবেকার কোন পূর্ব পুরুষের রচনা কারো মনে নেই । কুহকিনী কোন প্রেয়সীর ছলনায় ভুলানো কোন বেদনার্ত প্রেমিকের হাহাকার বুকের ব্যঞ্জনা । চিং চং পাখীর রহস্যভরা চরিত্রের সাথে আলেয়ার মতো কোন রূপসীর তুলনায় ভরা গানের কলি না জানে জরকা তবু গায় ।

চিংচিং চিংচং তক চিংচংমা
খাকলা নাইখে ব খঞ্জনী শাও
খিতং নাইখেলে তকলা শাও
শা হুংনি রূপ দা কুনুইমা ।

পুচ্ছ নাচানো চিংচং পাখী
বুকের রূপে তুমি, খঞ্জনী
লেজ দেখলে তুমিই দোয়েল
একই প্রাণে কেন দ্বৈত রূপ ।

কামার শালার লোহা পেটানোর শব্দ ওই পাখীর ডাকে । তাই পাখীর নাম চিংচং । সাদা বুকের নরম পালক দেখলে মনে হয় খঞ্জনী পাখীর প্রেমের উদার আহ্বান । লেজের নাচনে আবার অস্থির চঞ্চলতা । দিশেহারা চমকে চমকে লাফিয়ে চলা দোয়েলের ছলনা ভরা প্রেম । কোনটা আসল কোনটা নকল । কোনটা মুখ কোনটা মুখোশ চেনা বড় দায় । দ্বৈত রূপের দরিয়ায় প্রেমিক হাবুডুবু খায় । কিনারা মিলে না । গানের রূপে অরূপ রূপের রঙ মাখে । সুরের টানে ভুরু বাঁকিয়ে উঠে, নজর ছোটে দূর কোন স্বপ্নের আঙিনায় । অধরা আলেয়ার মতো প্রেয়সীকে ধরতে ছোটে মনের পাখী । সাজেরুঙের লাজানো চোখে ছলছলিয়ে উঠে এক বিষণ্ণ আবেগ ।

বিষণ্ণ চোখের ভাষায় তবু যেন অহমিকার ক্ষীণ লুকোচুরি । চোখের ভাষা মুখে ফোটে না । না ফোটা যত কথা ঠোঁটের কোণে থির থির কাঁপে । এত দ্বিধা দ্বন্দ্ব বুকের ভেতরটা ফালা ফালা করে চিরে জরকামুনির ।

চিংচং পাখীকে কেউ বলে পন্ডিত পাখী । ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা । ওরা বাসা বাঁধে পাহাড়ী নদীর খাড়া পাড়ে । গর্ত খুড়ে খুপরি বানিয়ে নদীর উপর উড়ে বেড়ায় । গর্ত এমন মাপে বানায় যাতে

জলের উপরতল স্পর্শ না করে । বৃষ্টি হবে না খরা হবে আগেই জানে চিংচং পন্ডিত । আর চিংচং পন্ডিতের বাসার উচ্চতা দেখেই পাহাড়ী মানুষরাও বোঝে এবার বর্ষা প্রবল না দুর্বল । বৃষ্টির উপর নির্ভর করে জুমের ফসল । এতো করে পৃথিবীকে চেনা জানা পাখীটা সাধারণ প্রেমের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করে । সেটা বড় বেদনার ।

বিচিত্র লংতরাই, বিচিত্র তার পাখীর জগৎ, তেমনি বিচিত্র মানুষের জীবন ধারা। চিংচং শিখে মানুষ থেকে, না মানুষ শিখে চিংচং পাখী থেকে এই দুরূহ দ্বন্দ্ব চলেছে দিবানিশি । পাখীতে মানুষে মেশামেশি পৃথিবীর রঙ আলাদা । মানুষ, পাখী, গাছ গাছালি সবই প্রকৃতির সন্তান । রূপে, রঙে আকারে আলাদা আলাদা । তবু তার মধ্যে এক অদৃশ্য সূতোয় বাঁধা সমস্ত জীবন । মানুষের কান্নাহাসি, পাখীর পিক্ পিক্ পিউ পিউ, গাছ গাছালির থর থর ঝরঝর -- সব মিলিয়েই পৃথিবীর মিলন ঐকতান । বিষাদে আনন্দে, বিরহ মিলনে, আবেগে অনুরাগে, রাগে অভিমানে সেই ঐকতানের মূর্চ্ছনা মুখর উপকরণে ভরা ।

রহস্যভরা চিংচং আর আলেয়ার মতো সাজেরুঙ । দু'জনার প্রাণ আছে রূপ আছে । তবু তারা কুহকিনী । পুরুষের প্রাণকে কাঁদায়, হাসায় । হাসি কান্নার মেশামেশিতেই প্রেমের সুধার মাধুর্য্য । অবুঝকে বোঝানো যায় সহজে । সমজদার যদি বুঝেও না বোঝার ভান করে তাহলে জীবন বড় কঠিন । লজ্জা, অহমিকা, জড়তা ভরা সাজেরুঙের মন । রূপক গানের কলি খোলে আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে সাজেরুঙের মন । সবাই নীরব । মন্ত্রমুগ্ধ সাজেরুঙ ধীরে ধীরে কেমন যেন উদাসী হয়ে আসে । পলক হারানো তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যায় মন । গানের সুরে মন উজাড় করা আবেগ সঞ্চার করে জরকামুনি । গানের ফাঁদে চঞ্চলা চিংচং যেন ধরা দেয় ।

পাখীর নীড়ের মতো ছল ছল চোখ সাজেরুঙের । মন্থর চোখের চাউনিতে ফোটে মরমী আবেদন । বিষাদের ছায়া মাখা মুখে করুণ আকুতি -- আমাকে ভুল বুঝো না । রাগে, অনুরাগে, বিরহ, মিলনে মুখরিত রাত । দূরে দূরে ঝিঁঝির ডানায় নৈশ কলরব । অচেনা অজানা পাখীর শিসে রাত নিঝুম । আকাশ ভরা প্রেমিক প্রেমিকা তারাদের মিটমিটে গোপন কথা । নিবিড় রাতে টুপ টাপ ঝরে সাজেরুঙের চোখের শিশির । জরকামুনির বুকে টুক টুক ব্যথা জাগে । দুর্বোধ্য সে বেদনার ভাষা । কোমল হাতে সাজেরুঙের চোখ মুছে দেয় । তসীরাম তন্ময়তার ঘোর ভেঙে দেয় ধনুকে গুণ ছিঁড়ে । গুণ ছেঁড়া ধনুক আবিষ্কার করে সবাই হাসে । সাজেরুঙও হাসে । কলরোল মুখর রাত থমকে দাঁড়ায় সাজেরুঙের পিসেমশাই ভারী গলায় যখন গলা খাকারী দেয় । একে একে যুবকরা চলে যায় দোয়াইনকে মানে যুবক শিবিরে । এমনি ধারায় এক একটা রাত চলে যায় মধুময় অভিসারে ।

জ্যৈষ্ঠ মাস । পাহাড় জুড়ে অভাব । জরকামুনিরও ঘরের খোরাক শেষ । উঠোনে ধান কাটার গাইল পরিত্যক্ত, শ্যাওলা ধরা । ঘরে ধান ফুরিয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর সংকেত । মুরগীর কুঠরির দুয়ার দিবানিশি খোলা । মুরগী শেষ অভাবের জ্বালায় । ওয়াক রৌ এর কাদা শুকিয়ে খা খা । ওয়াক রৌ মানে শুয়োর রাখার ঘর ।

সকাল বিকাল কচু সিদ্ধ চলছে বাড়ি বাড়ি । সঙ্গে কয়েকটা কাঁঠাল বীচি । উপোস বাঘিনীর মতো হিংস্র । গ্রামের লোকের চেহারায় ভাসে । জারকামুনির বুকের পাঁজর গোনা যায় । তার মা

বয়েসে বুড়ী নয় । অনাহারে বুড়ীর মতো চোখ কোটরাগত, কোলে কালি । বাপ শয্যাশায়ী । চলতে ফিরতে লাঠি ভর করে । যদিও লাঠি ধরার বয়স হয় নি । ঘোলাটে চোখ মেলে ভর দুপুরে ভয়ংকর বার্তা শোনে আয়ুং মাই এর । আয়ুং মাই বনপতঙ্গ, দুভিক্ষের বার্তাবহনকারী । কেউ বলে নিদান পোকা, কেউ বলে ভাত খুঁজা পোকা । সমস্ত পাহাড়ি মানুষের নীরব অনাহারের জ্বালা ঘোষণা করে আয়ুং মাই । আতংক, দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী কবল থেকে মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়, নিঃশক্তি মানুষগুলোর । বনের লতা ঝোপ, কচুশাক, কাঁঠালবীচির উপর নির্ভর করে মানুষের বাঁচার চুড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হয় ।

যদিও মরশুমে কাঁঠাল পাকে । রাত দিন বন থেকে বনান্তরে ডেকে চলে হাককাসই । যাকে বৌ কথা কও বলি । যাযাবরের মত জীবন যাদের তারা কাঁঠাল পাবে কোথায় ? বাঁশের করুল খেয়ে অন্য সময় অনাহারে কাটানো যায় । এ সময় তাও পাওয়া যায় না । পাওয়া গেলেও তা একেবারে কচি, মাত্র অঙ্কুরোদগম হয়েছে ।

জরকামুনির গ্রাম থেকে উত্তরে মাইল চারেক দূরে আসাম আগরতলা সড়ক । বর্ডার রোড সংস্থা মেরামত করে । রংকারায়, জরকামুনির বাপ, একদিন সেখানে কাজ খুঁজতে গেলো । কাজ পেলো বটে, কিন্তু কাজের খাতায় নাম লেখাতে ত্রিশ টাকা ঘুষ দিতে হয় । টাকা যোগাড় করতে পারেনি । যারা থালা ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে ঘুষ দিতে পেরেছে, তারাই কাজ পেয়েছে । কাজ পেলেও অনেকেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছে সপ্তাহখানেক পরে । বর্ডার রোড সংস্থার মাসান্তে মজুরী । এতদিন খাবে কি ? তার উপর কখন তাদের মর্জিমাফিক ছাটাই করবে, তাও অনিশ্চিত

লংতরাই পাহাড়ই মানুষের শেষ ভরসা । অফুরন্ত সম্পদ বাঁশ, কাঠ, পাথর থরে থরে সাজিয়ে বসে আছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য পসরা খুলে । যারা দেখে শুনে চিনে জেনে আনতে পারে তারাই বাঁচে । জরকামুনির মা বেরোয় পিঠের ঝাঁকা নিয়ে । যুবতী, কিশোরী বুড়ি আরো অনেক দল বেঁধে খাবার খুঁজতে যায় । জির জির অস্থিচর্মসার হাতে মাটি খুঁড়ে খুঁজতে থাকে বন আলু । কেউ বা খুঁজে বনের পাতা, কেউ খুঁজে অসময়ের কলার মোচা, চামল বনের ফল ।

গহন অরণ্যের মাঝখানে কোন পাহাড়ী ছড়ার কিনারে জন্মায় এক জাতীয় বন্য গোটা । থাইথয় নামক এই বুনো গোটা দিয়ে অনেকেই জীবন ধারণ করে । জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকা শুরু হয় । হলুদ রঙের এই পাকা ফল বুলবুলিরা খুব ভালোবাসে । বুলবুলির ফুরুৎ ফুরুৎ ওড়া দেখে রিয়াং মেয়েরা থাইথয় ফলের ঠিকানা খুঁজে ! নারী, কিশোরী, বুড়ী, ছোট ছেলেমেয়েরা দলে দলে ছুটে বন্য ফলের অন্বেষণে । বাকল ফেলে থাইথয় খেতে মিষ্টি লাগে বেশ । কিন্তু থাইথয় দিয়ে পেট ভরে না ।

তাছাড়া লংতরাই পাহাড়ের গভীরে খুইচাং নামক বন গোটা ধরে । জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে লাল রঙের বনচারিনীদের ডাকে । কত গান, কত রহস্য কথায় বনের পরিবেশ বদলায় । কচু লতার মতো বিস্তৃত গাছে থোকা থোকা ফল । এক এক গাছে মন দুই তিন ধরে । এই খুইচাং বা বনডুমুরও এক সময় ফুরিয়ে যায় ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিক কেটে গেছে । বাকি মাস খাবে কী । তাছাড়া এখনো আষাঢ়

মাসের দুর্ভিক্ষ আসতেও বেশী দেরী নয়। সেই মাসের খোরাক যোগাড় করতে ছুটে পাহাড়ী নারীরা। সঙ্গে যুবতীরা সাজেরুঙ, ওয়াইসিরুঙ পনদিরুঙ আরো অনেকে। বুড়ীরা পেছনে পেছনে যায়। বুড়ীদের মধ্যে জরকামুনির মা-ও আছে। ভাতের স্বাদ একমাত্র কুঙ্গা নামক আলু দিয়ে মিটানো যায়। কাটা কাটা কচুলতের গোটা। মাটির ভিতর লুকানো থাকে। লংতরাই পাহাড় যেন সযত্নে উম দিয়ে রেখেছে ক্ষুধার্ত জুমিয়াদের নিদান দিনের সম্বল করে। মাটির ভিতরে এই জাতীয় আলু নিয়ে রিয়াং সমাজে কত রূপ কথা, কত কাহিনী, কত গান প্রচলিত তার হিসেব নেই। মুগুর দিয়ে ছেঁচে কুঙ্গা নামক আলু রোদে শুকানো হয়।

শুকানো কুঙ্গা আলুর সাথে ডিগা বাঁশ পোড়া ছাই ধোয়া জল মিশানো হয়। একে কুঙ্গা চায়ই বা কুঙ্গাক্ষারপানি বলে। কুঙ্গার পাতা দিয়ে কেউ কেউ ঘরের চালা বাঁধে ছনের অভাবে। কুঙ্গা ধরে ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই কুঙ্গা আলু দুর্দিনের সঞ্চয় করে রাখে জরকামুনির মা।

কিন্তু কতদিন এভাবে চলবে ?

অন্য বন আলু পাওয়া যায় না। যাওবা পাওয়া যায় তা হচ্ছে থাসের। লাল বন আলু। প্রকৃতি কত নিষ্ঠুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের লাল বন আলু সারাদিন সিদ্ধ করেও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হয় সাদা আলু, অর্থাৎ খাখুই। খাখুই লংতরাই পাহাড়ে বিরল। পাওয়া যায় না বললেই চলে। জরকামুনির মা একটা লুঙ্গায় আপন মনে খুঁড়ে যাচ্ছে হাড়্ডিসার হাতে টাককল চালিয়ে। হঠাৎ চোখমুখ দীপ্ত হয়, ভাজপড়া চোখের কোলে উল্লাস ফেটে পড়ে। চীৎকার করে উঠে জরকামুনির মা খাখুই ! খাখুই !

বাকিরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। মাটি সরাতে সাহায্য করে তাকে। মাটি থেকে বেরোল অনেকগুলো সাদাবন আলু। ক্লান্তি আর উপোসের মাঝখানেও পাহাড়ী ছোট গোল গোল চোখগুলি বিস্ফারিত হয় একসাথে। লংতরাই এর গুপ্তধন আবিষ্কারের উত্তেজনায়, খুশীতে। সবাই ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়, বেতের ঝাঁকায় তোলে। গ্রামের দিকে পা বাড়ায়।

ঘরের অনাহারে ক্লিষ্ট মুখগুলিতে আজ কতদিন পরে হাসি দেখা যাবে !

গ্রামের উত্তরপূর্ব লংতরাই পাহাড়ে চূড়া থেকে তরতর করে নামছে এক পাহাড়ী ছোট নদী। খিলংতুইছা। অর্থটা বড় নোংরা। মল বহমান ছড়া। কবেকার কোন অচিন মানুষের দেওয়া নাম, কে জানে ! এক সময়, আসাম-আগরতলা সড়ক প্রথম তৈরীর সময় বিহার থেকে মজুররা এসেছিল। ওরা শিবির পাতে খিলংতুইছার তীরে। ওই নোংরা নামের জন্যে এরাই দায়ী। নাম নোংরা হোক, খিলংতুইছা দুঃখিনী জুমিয়া নারীর মতো দিবানিশি কাঁদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জুমিয়াদের সহানুভূতিতে। গহন অরণ্যের মাঝখানে কলকলানীর এক মরমী ভাষায় দূর থেকে ডাকে জুমিয়াদের ! ওই ডাকেই ছুটে যায় জুমিয়ারা। নদীর বুকে বড় বড় পাথর। নীল জলের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য। পাথর সংগ্রহ করে জুমিয়ারা। বড় বড় ঠিকাদারেরা কিনে নেয়। শ্যাওলা ধরা পাথর বড়ো পিচ্ছিল। জরকামুনি, তার বাপ রংকারায় এবং আরো অনেকে যায় পাথর সংগ্রহে। সারাদিন পাথর সংগ্রহ করে। ফেরার পথে পাথরের গর্ত থেকে শামুক, চিংড়ি মাছ খুঁজে আনে।

সেদিন, বেলা শেষে সবাই ঘর ফিরতে উদ্যত। রংকারায় আসছে না। খিলং তুইছার

পাড়ে চালতা গাছের নীচে সবাই জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ । বুড়ো তখনো ফিরেনি । বন ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত নেমে আসে পাহাড়ে । খিলং তুইছার পাড়ে চালতা গাছের নীচেও । জরকামুনির বুক ডিপ ডিপ করতে শুরু করে । উঁচু টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে আপা-আ-পা । আ-পা ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় । রংকারায়ের খোঁজ নেই তবু ।

সন্ধ্যা আরো ঘনায়, গভীর হয় । এ পাহাড় ও পাহাড়ে গ্রামের লোকজন ছুটে যায় । চারদিকে ডাকাডাকি । হৈ চৈ । আকাশ, বাতাস, পাহাড় সব ছাপিয়ে জরকামুনির চীৎকার । আ-পা ! —

জরকামুনির গলা শুকিয়ে কাঠ । অজানা আশঙ্কায়, আতঙ্কের ছায়া তার মুখে । বুকের উপর খিলং তুইছার একটা বড়ো পাথর চেপে আছে যেন ! ভয়ে বিহ্বল জরকামুনি বন্ধু তসীরামকে জিগ্যেস করে ।

'এ সময় খিলং তুইছায় বুনো হাতী নামে । কি জানি, আপাকে মেরে ফেললো কি না ! —

-- 'আরে না, না ! তুমি অতো ভেবো না তো !'

-- আমার খুব ভয় করছে, তসীরাম, যদি হাতীতে —

তসীরাম বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'আগে ভাগে কুমঙ্গলের চিন্তা মাথায় এনো না । হাতী ঠান্ডা জায়গা ভালো বাসে ঠিক । আর, সূর্যের আলোও এখানে এসে পৌঁছায় না । হয় তো সে আসতে পারে । এই গরমে না এসে যাবেই বা কোথায় ? কিন্তু এতো লোক কাজ করছি কেউ না কেউ টের পেতাম ।'

'আশ্চর্য !' জরকা অনেকটা আতঙ্কগ্রস্তের মতো বিড় বিড় করে 'এত বড় জন্তু কতো নিঃশব্দ চলে । কাছে এলে টের পাবার জো নেই ।'

'তুমি শুধু শুধু আশঙ্কা করছো ।' তসীরাম জরকামুনিকে সান্ত্বনা দেয়, বুঝায় । 'টের না পেলেও অন্তত হাতীর পায়ের দাগ বা লেদা ছড়ার কিনারে নিশ্চয় দেখা যেতো ! আর, বুড়ো হাতীরা একা চলে না । দল বেঁধে ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলে । কই কদিন ধরে, ডালপালা ভাঙ্গার কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি !'

জরকামুনির ভীতি কমে না । আশঙ্কাজর্জরিত সে অন্য সম্ভাবনা দেখায় । 'কিন্তু খোঁড়াদাঁতলা লংতরাই তো কোনদিন দলের সঙ্গে থাকে না । একদম একা একা থাকে ।'

তসীরাম বলে, সে তো ভাই বনের দেবতা । এক নিমেষে লংতরাই পাহাড়ে, আর এক নিমেষে আঠারমুড়ায় যেতে পারে । যাকে তাকে ও আক্রমণও করে না । যার কপালে লেখা তারাই তো শুধু ওর কাছে মরে । দেখলে না, বলরাম গ্রামে হালাম ছেলেটা কি নৃশংসভাবে মারা গেল, তার গলাছড়া গ্রামেই রবিরায়ের ঘর ভেঙে লুটিয়ে দিয়ে ওর বৌকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে ।

জরকামুনি কথা বলে না । চোখের সামনে যেন এক নিষ্ঠুর অপেক্ষা । কখন দেখবে বাপের সেই থেতলানো রক্তাক্ত দেহটা । মনে মনে মানত করে । হে লংতরাই দেবতা বাবাকে যদি বাঁচাও আগামী জুমের ফসলের সময় একটা বড় শুয়োর কেটে পূজো দেব । মানত করে আশ্বস্ত হতে পারে না । মনের মধ্যে ভাসে লংতরাই হাতীর নৃশংস ঘটনাগুলো ।

লংতরাই পাহাড়ে সেই হাতীটার স্বাধীন সাম্রাজ্য । পাহাড়ী মানুষের বিশ্বাস ওটা হাতী নয়

দেবতা । ওর ইচ্ছা অনিচ্ছাতেই ফসল ফলে বা নষ্ট হয় । ইচ্ছে করলেই ওর শুভ দৃষ্টিতে মানুষ ধনী, গরীব হতে পারে । পেছন দিকে সেই প্রকান্ড দাঁতাল হাতীর একটা পা ছোট । খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে । লোক মুখে সেই দাঁতাল হাতী নিয়ে কত উপকথা । কেউ বলে ওই হাতীটা অনেক আগে পালা হাতী ছিল । অধুনা বাংলাদেশের আলীনগরে থাকত মালিক । মাহুত নাকি চড়াতে নিয়ে আসে লংতরাই পাহাড়ে । পিছনের পায়ে শেকল বেঁধে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় । আস্তে আস্তে পালা হাতী বন্য হলো । শেকলটার বাঁধনে পায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে । এক সময় শেকলটা খুলে যায় । ফলেই নাকি পা-টা ছোট । মানুষ সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা । বহুদিন পোষ মেনে রয়েছিল বলে মানুষের চোখ দেখলেই ভাব বুঝতে পারে । মানুষ তাকে খোঁড়া করেছে, এই ক্রোধে মানুষকে সহ্য করতে পারে না । মানুষ দেখলেই ক্ষেপে যায় ।

আবার কেউ বলে হাতীটা অলৌকিক । স্বয়ং দেবতা । গুলি করলেও মরে না! বহু শিকারীর হাতের নিশানা ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে । ওই হাতীটার চলার পথ দুর্গম থেকে লোকালয় বা লোকালয় থেকে দুর্গম অরণ্য । যে নারী বন্ধ্যা, ওই হাতীর পূজো দিলে নাকি সন্তান পায় । ওই হাতীকে স্বপ্নে দেখলে জুমের ফসল দ্বিগুণ হয় সে বছর । নানা বিশ্বাস, নানা কল্প কথা ওই হাতীকে কেন্দ্র করে লোক মুখে চলছে । সেই হাতীর স্বভাব বড় বিচিত্র । পাগলা কিনা কে জানে । তবে দশটা বন্য হাতীর স্বভাবের সাথে মিলে না । একেবারে সমাজচ্যুত । নির্জনে একা একা বন থেকে বনে ঘোরে আপন নেশায় বিদিশার মতো ।

বন্যহাতীরা পালে পালে যখন চলে সেই দাঁতাল হাতী কিন্তু নিঃসঙ্গ । সেই দাঁতাল হাতীকে লংতরাই বাবা বলেও ডাকে কেউ কেউ । জ্যৈষ্ঠ মাসে গরম পড়লে ঠান্ডা জায়গা খুঁজে বেড়ায় । গভীর অরণ্য ছায়ার ভিতরে পাহাড়ী নদীতে ওর বিচরণ ভূমি । বলরাম গ্রামে কয়েক বছর আগে এসে গভীর রাত্রে আক্রমণ চালায় । ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যখন, ধাক্কা দিয়ে টংঘর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পায়ে দলিত করে । ঐ ঘরের একটা ছোট্ট শিশু পালাতে পারে নি । শুড় দিয়ে জড়িয়ে আঁছড়ে আঁছড়ে মেরে ডলে ডলে চেপ্টা পিঠার মত বানায় । অনেকক্ষণ সেই রক্তাক্ত পিঠা শুড়ে নিয়ে পিঠ চুলকিয়ে লুঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে । সেই নৃশংস দৃশ্যটা মনে হতে না হতেই জরকামুনির সারা পায়ে কাঁটা ফোটে । পায়ের চলা টাল মাটাল। বুকটা আতঙ্কে হিম হয়ে আসছে । আবার মনে হয় আরো বীভৎস তারই দূর সম্পর্কের মামীর নৃশংস মৃত্যুর কথা । সেও মারা গেছে ওই দোর্দন্ড প্রতাপশালী লংতরাই বাবার হাতে । তখন জরকামুনি বারো তের বছরের কিশোর । কৈশোরের সেই ঘটনা এখনো জীবন্ত স্পষ্ট !

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে ছিল নক্সাকচুতে । রিয়াংরা বাড়ীর পাশে উঁচু বড় গাছের ডালে একটা কুটীর বানায় । সেটাই হচ্ছে নক্সাকচু । বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে । বন্য হাতীর উৎপাত থেকে বাঁচার এই রণকৌশল আজও অব্যাহত ।

সেই রাতে সবাই নকসাকচুতে উঠে হাতীর শব্দ পেয়ে । গর্ভবতী ছিল তার মামী । রবিরায়ের বৌ । পেটের ভারে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছিল, তার উপর বাঁশের সিঁড়িটা ছিল নড়বড়ে । সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাতী শুড় উঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রকান্ড আওয়াজ তোলে । সেই মেদিনী কাঁপানো গর্জনের নামই বুঝি বৃংহীত । গাছে গাছে নকসাকচু থেকে আর্তনাদের কলরোল

পাড়ে চালতা গাছের নীচে সবাই জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ । বুড়ো তখনো ফিরেনি । বন ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত নেমে আসে পাহাড়ে । খিলং তুইছার পাড়ে চালতা গাছের নীচেও । জরকামুনির বুক ডিপ ডিপ করতে শুরু করে । উঁচু টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে আপা-আ-পা । আ-পা ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় । রংকারায়ের খোঁজ নেই তবু ।

সন্ধ্যা আরো ঘনায়, গভীর হয় । এ পাহাড় ও পাহাড়ে গ্রামের লোকজন ছুটে যায় । চারদিকে ডাকাডাকি । হৈ চৈ । আকাশ, বাতাস, পাহাড় সব ছাপিয়ে জরকামুনির চীৎকার । আ-পা ! —

জরকামুনির গলা শুকিয়ে কাঠ । অজানা আশঙ্কায়, আতঙ্কের ছায়া তার মুখে । বুকের উপর খিলং তুইছার একটা বড়ো পাথর চেপে আছে যেন ! ভয়ে বিহ্বল জরকামুনি বন্ধু তসীরামকে জিগ্যেস করে ।

'এ সময় খিলং তুইছায় বুনো হাতী নামে । কি জানি, আপাকে মেরে ফেললো কি না ! —

-- 'আরে না, না ! তুমি অতো ভেবো না তো !'

-- আমার খুব ভয় করছে, তসীরাম, যদি হাতীতে —

তসীরাম বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'আগে ভাগে কুমঙ্গলের চিন্তা মাথায় এনো না । হাতী ঠান্ডা জায়গা ভালো বাসে ঠিক । আর, সূর্যের আলোও এখানে এসে পৌঁছায় না । হয় তো সে আসতে পারে । এই গরমে না এসে যাবেই বা কোথায় ? কিন্তু এতো লোক কাজ করছি কেউ না কেউ টের পেতাম ।'

'আশ্চর্য !' জরকা অনেকটা আতঙ্কগ্রস্তের মতো বিড় বিড় করে 'এত বড় জন্তু কতো নিঃশব্দ চলে । কাছে এলে টের পাবার জো নেই ।'

'তুমি শুধু শুধু আশঙ্কা করছো ।' তসীরাম জরকামুনিকে সান্ত্বনা দেয়, বুঝায় । 'টের না পেলেও অন্তত হাতীর পায়ের দাগ বা লেদা ছড়ার কিনারে নিশ্চয় দেখা যেতো ! আর, বুড়ো হাতীরা একা চলে না । দল বেঁধে ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলে । কই কদিন ধরে, ডালপালা ভাঙ্গার কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি !'

জরকামুনির ভীতি কমে না । আশঙ্কাজর্জরিত সে অন্য সম্ভাবনা দেখায় । 'কিন্তু খোঁড়াদাঁতলা লংতরাই তো কোনদিন দলের সঙ্গে থাকে না । একদম একা একা থাকে ।'

তসীরাম বলে, সে তো ভাই বনের দেবতা । এক নিমেষে লংতরাই পাহাড়ে, আর এক নিমেষে আঠারমুড়ায় যেতে পারে । যাকে তাকে ও আক্রমণও করে না । যার কপালে লেখা তারাই তো শুধু ওর কাছে মরে । দেখলে না, বলরাম গ্রামে হালাম ছেলেটা কি নৃশংসভাবে মারা গেল, তার গলাছড়া গ্রামেই রবিরায়ের ঘর ভেঙে লুটিয়ে দিয়ে ওর বৌকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে ।

জরকামুনি কথা বলে না । চোখের সামনে যেন এক নিষ্ঠুর অপেক্ষা । কখন দেখবে বাপের সেই থেতলানো রক্তাক্ত দেহটা । মনে মনে মানত করে । হে লংতরাই দেবতা বাবাকে যদি বাঁচাও আগামী জুমের ফসলের সময় একটা বড় শুয়োর কেটে পূজো দেব । মানত করে আশ্বস্ত হতে পারে না । মনের মধ্যে ভাসে লংতরাই হাতীর নৃশংস ঘটনাগুলো ।

লংতরাই পাহাড়ে সেই হাতীটার স্বাধীন সাম্রাজ্য । পাহাড়ী মানুষের বিশ্বাস ওটা হাতী নয়

দেবতা । ওর ইচ্ছা অনিচ্ছাতেই ফসল ফলে বা নষ্ট হয় । ইচ্ছে করলেই ওর শুভ দৃষ্টিতে মানুষ ধনী, গরীব হতে পারে । পেছন দিকে সেই প্রকান্ড দাঁতাল হাতীর একটা পা ছোট । খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে । লোক মুখে সেই দাঁতাল হাতী নিয়ে কত উপকথা । কেউ বলে ওই হাতীটা অনেক আগে পালা হাতী ছিল । অধুনা বাংলাদেশের আলীনগরে থাকত মালিক । মাহুত নাকি চড়াতে নিয়ে আসে লংতরাই পাহাড়ে । পিছনের পায়ে শেকল বেঁধে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় । আস্তে আস্তে পালা হাতী বন্য হলো । শেকলটার বাঁধনে পায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে । এক সময় শেকলটা খুলে যায় । ফলেই নাকি পা-টা ছোট । মানুষ সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা । বহুদিন পোষ মেনে রয়েছিল বলে মানুষের চোখ দেখলেই ভাব বুঝতে পারে । মানুষ তাকে খোঁড়া করেছে, এই ক্রোধে মানুষকে সহ্য করতে পারে না । মানুষ দেখলেই ক্ষেপে যায় ।

আবার কেউ বলে হাতীটা অলৌকিক । স্বয়ং দেবতা । গুলি করলেও মরে না! বহু শিকারীর হাতের নিশানা ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে । ওই হাতীটার চলার পথ দুর্গম থেকে লোকালয় বা লোকালয় থেকে দুর্গম অরণ্য । যে নারী বন্ধ্যা, ওই হাতীর পূজো দিলে নাকি সন্তান পায় । ওই হাতীকে স্বপ্নে দেখলে জুমের ফসল দ্বিগুণ হয় সে বছর । নানা বিশ্বাস, নানা কল্প কথা ওই হাতীকে কেন্দ্র করে লোক মুখে চলছে । সেই হাতীর স্বভাব বড় বিচিত্র । পাগলা কিনা কে জানে । তবে দশটা বন্য হাতীর স্বভাবের সাথে মিলে না । একেবারে সমাজচ্যুত । নির্জনে একা একা বন থেকে বনে ঘোরে আপন নেশায় বিদিশার মতো ।

বন্যহাতীরা পালে পালে যখন চলে সেই দাঁতাল হাতী কিন্তু নিঃসঙ্গ । সেই দাঁতাল হাতীকে লংতরাই বাবা বলেও ডাকে কেউ কেউ । জ্যৈষ্ঠ মাসে গরম পড়লে ঠান্ডা জায়গা খুঁজে বেড়ায় । গভীর অরণ্য ছায়ার ভিতরে পাহাড়ী নদীতে ওর বিচরণ ভূমি । বলরাম গ্রামে কয়েক বছর আগে এসে গভীর রাত্রে আক্রমণ চালায় । ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যখন, ধাক্কা দিয়ে টংঘর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পায়ে দলিত করে । ঐ ঘরের একটা ছোট্ট শিশু পালাতে পারে নি । শুড় দিয়ে জড়িয়ে আঁছড়ে আঁছড়ে মেরে ডলে ডলে চেপ্টা পিঠার মত বানায় । অনেকক্ষণ সেই রক্তাক্ত পিঠা শুড়ে নিয়ে পিঠ চুলকিয়ে লুঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে । সেই নৃশংস দৃশ্যটা মনে হতে না হতেই জরকামুনির সারা পায়ে কাঁটা ফোটে । পায়ের চলা টাল মাটাল । বুকটা আতঙ্কে হিম হয়ে আসছে । আবার মনে হয় আরো বীভৎস তারই দুর সম্পর্কের মামীর নৃশংস মৃত্যুর কথা । সেও মারা গেছে ওই দোর্দন্ড প্রতাপশালী লংতরাই বাবার হাতে । তখন জরকামুনি বারো তের বছরের কিশোর । কৈশোরের সেই ঘটনা এখনো জীবন্ত স্পষ্ট !

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে ছিল নক্সাকচুতে । রিয়াংরা বাড়ীর পাশে উঁচু বড় গাছের ডালে একটা কুটীর বানায় । সেটাই হচ্ছে নক্সাকচু । বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে । বন্য হাতীর উৎপাত থেকে বাঁচার এই রণকৌশল আজও অব্যাহত ।

সেই রাতে সবাই নকসাকচুতে উঠে হাতীর শব্দ পেয়ে । গর্ভবতী ছিল তার মামী । রবিরায়ের বৌ । পেটের ভারে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছিল, তার উপর বাঁশের সিঁড়িটা ছিল নড়বড়ে । সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাতী শুড় উঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রকান্ড আওয়াজ তোলে । সেই মেদিনী কাঁপানো গর্জনের নামই বুঝি বৃংহীত । গাছে গাছে নকসাকচু থেকে আর্তনাদের কলরোল

থাল বাসন বাজানোর আতঙ্ক সঞ্চারী সমারোহ। রবিরায়ের বৌ এর কি হলো এগিয়ে দেখার সাহস কারো নেই। কেউ আগুন জ্বালিয়ে গাছ থেকে ছুঁড়তে থাকে। অনেক পরে রাত পোহানোর সময় কিছু দূরে বৈরা গাছের নীচে আবিষ্কৃত হলো গর্ভবতী মহিলার দলিত, লুটানো দেহ। পেটের উপর পা দিয়ে চেপে ডিমের মতো ফাটিয়ে হাতী চলে গেছে। রক্তাক্ত থেতলানো পেটের ভিতর নিষ্পাপ শিশুটির কি হলো কেউ দেখার সুযোগ পায়নি। সেই বীভৎস দৃশ্যই যেন আবার নতুন করে উঁকি দেয় তার মনে।

জরকামুনির পা অবশ হয়ে আসছে। দুরু দুরু বুক। হাতে মশাল নিয়ে বুক ঠেলে কান্না আসে। মাঝে মাঝে এলোপাথরি চীৎকার করে আপা! আ! আ! আ! মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার। গাছ পাতার খস খসানি তাকে চমকায়। নাক দিয়ে হাতীর গন্ধ খুজে। মাথায় হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে। তসীরাম সান্ত্বনা দেয়, এত ভাঙলে চলবে কেমন করে। আগে খুঁজি তারপরে যা হবার দেখা যাবে। আমার মনে হয় বুড়ো সারাদিন উপোস, হয়ত মাথা ঘুরে কোথাও অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ওঠ, ওঠ আরেকটু এগিয়ে দেখি। হাউ মাউ করে শিশুর মতো কাঁদে জরকামুনি।

প্রচন্ড উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রত্যেকেই বাঁশের লাকড়ি জ্বালে। তিন চার দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়ায়। বন পাহাড়, ঝোপ ঝাড়, ছড়ার আনাচে কানাচে চলতে থাকে ক্লান্তিহীন তল্লাসী। কারো মুখে কথা নেই। আগুনের আলোয় থম থমে মুখগুলোতে আতঙ্কের গম্ভীর ছায়া। হারানো সঙ্গীকে খুঁজে বের করার দৃপ্ত অঙ্গীকারে চোখগুলো জ্বল জ্বলে। পাতার ঝোপে পোকা মাকড়ের শব্দে কেউ চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উৎকণ্ঠিত কানে অপেক্ষা করে দুর্ঘটনার সংকেত। কেউ ভয়ে পিছনে ঘুরে নিজেদের সঙ্গীদের দেখে নেয়। ধীরে ধীরে অরণ্যের মাঝখানে অন্ধকার জমাট হয়ে দানা বাঁধে। পথে পথে লাকড়ির জ্বলন্ত অঙ্গার খসে পড়ে। আগুন নিভে যায়, আতঙ্ক বাড়ে। লাকড়ির মুঠো ঠিকঠাক করে শূন্যে বাতাসের মধ্যে জোরে জোরে নাড়ে। লাকড়ি আবার কখনো দপ দপ করে জ্বলে। নিশাচর পাখীর ডানার ঝাপ্টায় গা ছম ছম করে। ছড়ার জল ছলকে উঠে ব্যাঙ লাফায় যখন; জুমিয়ারা থমকে দাঁড়ায়। আবার হাঁটে। কেউ আবার ছড়ার কিনারে নরম মাটির উপরে হাতীর পায়ের দাগ খুঁজে। আগা ভাঙা বাঁশের চূড়ায় রাতের বাতাস ঘুরে ঘুরে শিস্ বাজায়। লোকে বলে ওই জাতীয় শব্দে বন দেবতা মানুষ ভোলায়। কেউ বলে বনের মধ্যে পরিচিত গলায় দেবতারা নাম ধরে ডাকে। ওই সব অপদেবতার পাল্লায় পড়লে রক্ষা নেই। রহস্য ভরা লংতরাই পাহাড়ের রাত বিচিত্র অলীক কাহিনী জীবন্ত হওয়ার জন্য উদ্যত। চেনা অচেনা পাখীর নৈশ আর্তনাদে কারো বুক ধড়পড়ায়। সমস্ত আতঙ্ক বিপদ উপেক্ষা করে জুমিয়ারা চালায় সন্ধানের দুরন্ত অভিযান। বাপকে খুঁজে বের করবেই এমনি এক গভীর বিশ্বাসে কদম কদম একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেসে চলে জরকামুনি।

পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে শোনে খস খস ঝোপ নাড়ার শব্দ। থমকে দাঁড়ালো জরকামুনি আর তসীরাম। হাত উঁচুতে উঠিয়ে লাকড়ির আলোয় নীচের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। কিছুই দেখে না। খস খস আওয়াজ বাড়ে। মৃত্তিংগা বাঁশের ঝোপ নীচের দিকে। খুঁপের ফাঁকে ফাঁকে কোন রকম পা আঁটকে উঠা নামার মতো সিঁড়ি। দা দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি কেটে সিঁড়িটা বানানো। খাড়া বেয়ে নীচে চলে গেছে ঝোপের বাঁকে।

শব্দটা কেমন কেমন সন্দেহ জাগায় । তসীরাম হাতের ধারালো টাককল উচিয়ে কিছুক্ষণ থেমে ন্যমতে বলে জরকামুনিকে । কখনো গাছের ডাল আঁকড়ে । কখনো গাছের শিকড় ধরে নামতে থাকে । ভুল করে বা নেহাৎ অবলম্বন না পেয়ে যখন কোন শুকনো বাঁশ ধরে মট মট করে বাঁশ ভেঙ্গে যায় । অবলম্বন হারায় । শিকড় লতা যা হোক একটা কিছু আকড়ে ধরে । তীব্র সতর্কতা থাকা সত্বেও ভয় । একবার হাত ফসকে গেলে সত্তর আশী ফুট নীচে মাটির ঢেলার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে । এর মধ্যে লাকড়িও নিভে বাতাসে । জোরে নাড়িয়ে আগুন জ্বালে । দুর্গম পাহাড় বেয়ে কিছুদূর নামতেই গোঙ্গানীর শব্দ কানে আসে । জরকামুনির গা শিউরে উঠে । কানের কাছে গরম হয়ে উঠে, বুকের ভিতর কাঁপে থর থরিয়ে । সামনেই দলানো পাকানো রংকারায়ের দেহ । বেতের খাড়াটা শূন্য । গড়িয়ে পড়ে আছে কাছে । পেটের ক্ষুদায় মাথা ঘুরছে । ঘুরার সময় খাড়ার দড়ি ছিড়ে টাল সামলাতে পারেনি । ঢাল্ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে । জরকামুনি সম্বিত হারিয়ে মাটিতে লুটায় ।

তসীরাম অচেতন দেহটার কাছে গিয়ে ডাকে । অ খুড়ো, খুড়ো । অনেক ডাকাডাকির পর দেহটা নড়ে । থোবড়ানো মুখে রক্তের ধারা তখনো বইছে । কিছুটা জমাট বাঁধা । রক্ত সরিয়ে এক পলক ফ্যাল ফ্যাল করে চায় । তসীরাম সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে চীৎকার করে প্রাণ, প্রাণ আছে ! প্রাণ আছে । প্রাণহীন পাহাড়ে পাষাণে প্রাণের স্পন্দন জাগায় । জরকামুনির হতাশায় অন্ধকার মনের কোণে একটা দ্বীপ জ্বলে উঠে ।

চীৎকার শুনে হাঁকাহাকি, ডাকাডাকিতে কলরোল নিশার নিস্তব্ধতা ভেঙে সবাই জড়ো হয় রংকারায়ের পাশে । বাঁশের মাচা বানিয়ে অচেতন দেহটা বয়ে নিয়ে এল গ্রামের কাছে ।

লংতরাই পাহাড়ের অচাই এল । অচাই মানে পুরোহিত । তলবাংহা নামক এই পুরোহিত সারা লংতরাই পাহাড়ে চিকিৎসা করে ঘুরে ঘুরে । নানা ধরনের গাছের বাকল, পাতার রস মিশিয়ে বেধে রংকারায়কে সুস্থ করে । সুস্থ হলেও রংকারায় আগের মতো ভারী কাজ করতে পারে না । অমাবস্যা পূর্ণিমায় কাজ দূরের কথা সারা শরীর ব্যথায় টন টন করে ।

এই দুর্ঘটনার পর গলাছড়া গ্রামের অনেকে পাথরের কাজ ছেড়ে দেয় । শুরু হলো ছন, বাঁশ, কাঠ, লাকড়ি কাটা । বাঁশ, ছন স্তূপাকার করে জমায় কেউ আসাম আগরতলা রাস্তায় । সেখানে বিক্রী হয়, ফরমায়েস আনে । আসতে যেতে লরী কেউ ভরে নিয়ে যায় । কেউ বা দেশী বিদেশী ঠিকাদারের যোগান দেয় । রংকারায় এখন ভারী কাজ বাদ দিয়েছে । মৃত্তিঙ্গা বাঁশের বেত চিরে মুঠো মুঠো বিক্রি করে । নতুবা উদাল গাছের বাকল তুলে দড়ি বানায় । অরণ্য আছে, তারাও আছে । অরণ্য বাতাসেই তাদের নিঃশ্বাস । গাছ গাছরার শিকর বাকরে তাদের শিরা উপশিরার রক্ত ধারা ।

উদাল গাছের বাকল কেন ! লংতরাই পাহাড়ই যেখানে জীবন, সেখানে সব কিছুই তো অরণ্যের দান । পেটে যখন দারুণ ক্ষুধার আগুন, সম্বল ওই বন আলু বা বন ডুমুরের গোটা । দুরন্ত শিশুরা এখানে খেলে বানরগিলা গাছের গোটা ধরে । বুনো রামকলার বীচির মালা গলায় নিয়ে সেজে মেয়েরা বনলতার মতো হেসে খেলে কাপড় রাঙায় বনের আস্ গাছের শিকড় দিয়ে । ছাতিম গাছের আগাভাঙ্গা চূড়া নিয়ে ঠাকুমার রাতের রূপকথা । বনবালাদের হৃদয় ভাঙা ব্যথার

কথা রূপ পায় বাঘ, ভালুক, হাতী নিয়ে রচিত লোকগীতির কলিতে । সন্ধ্যার ঘনঘটা নাইবা রইল । তবু নিরাবরণ জীবনের প্রকাশ বিকাশ গর্জন, আওয়াল, চামল, গামাইয়ের নিবিড় ছায়ায় । থরো থরো কাঁপন ধরা মৃত্তিঙ্গা বাঁশের পাতায় পাতায় নিঃশ্বাস ছড়ানো । রহস্য ঘেরা অরণ্যের মধ্যে পাহাড়ী ছড়ার মতোই ছোট ছোট মানুষগুলোর জীবনের কলকলানী । জীবনের দিগদিগন্ত জুড়ে খালি বন আর বন । সেই জীবন থেকে বন যদি কেউ কেড়ে নেয় । সেই জীবন তখন ধূসর রুক্ষ মরুভুমির মতো হাহাকার করে ।

বনদপ্তর কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে লংতরাই পাহাড়ের শিখরে । বাজারে বাজারে ঢোল পিটিয়ে ফরমান জারী করে জুম কাটা নিষেধ । বাঁশ, ছন, কাটা নিষেধ । বনজ সম্পদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় একটা চিরকুট কাগজের মতো নোটিশ দিয়ে । নিষ্ঠুর আইনের হাড়িকাঠে জবাই শুরু হলো লংতরাই পাহাড়ের অসহায় জুমিয়াদের । দা, কুড়াল কেড়ে নিল জুমিয়াদের হাত থেকে । পাড়ার যুবক তসীরাম দা ফেরত আনতে গিয়েছিল রাঙ্গাছড়া ফরেষ্ট অফিসে । দা দেওয়া দূরের কথা । তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিলে কোর্টে । জামীনে একসময় ছাড়া পেল তসীরাম । তবে জুমের ফসল মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হলো । তসীরামের পর রাবেহারিয়াং-এর পালা । জুম চায করার জন্য কিছু মুলি বাঁশের জঙ্গল কাটে । হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির বন্দুক ধারী বন বাবুরা । যায় কোথায় সোজা গ্রেপ্তার করে মামলা সাজিয়ে চালান দেয় কোর্টে । জামীনে আনার সুযোগ হয়নি । আদালতের সামনে সত্য কথাই বলেছিল । হুজুর আমি বাঁশ কেটেছি । এক মাসের জেল হয় । জেল থেকে এখনো ফিরেনি । শুধু বাঁশ কাঠ ছনেই নিষেধ নয় । নিষেধ বন্য জন্তু ধরা বা মারাও । রাঙ্গাছড়ার লোক, নাম চৈত্র মগ । শিকার ছিল তার নেশা । তার পুরনো জুমের ফসলে বুনো শুয়োরের পাল নামত । দাঁতাল শুয়োর একটা মারে । বনবাবুদের তাতেও আপত্তি । একটা শুয়োর মেরে মাসুল দিল গরু বেচে । একটা প্রবাদ আছে বাঘ নাকি সকাল বেলা সূর্য প্রণাম করে বলে -- প্রভু, দু'পায়া জন্তুর যেন দেখা না পাই । দু'পায়া জন্তু হচ্ছে মানুষ জীব । লংতরাই পাহাড়ের জুমিয়ারাও সকালে প্রণাম করে বলে দু'পায়া বনবাবুদের যেন দেখা না পাই ।

রংকারায় এত ঘটনা জানে । ভারী কাজ করার ক্ষমতা নেই । ঘরে আবার অভাবের তাড়না । জেনে শুনেই বনে যায় উদাল গাছের বাকল আনতে । ধরা পড়ে একেবারে হাতে নাতে বনবাবুর কাছে । বনবাবুকে দেখে পালাতে চেয়েছিল । পারেনি । গার্ডের দল পথ আটকে ফেলে । ওকে বাকল দিয়েই পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যায় । রাঙ্গাছড়া বন অফিসে নিয়ে মারধোর চালায় । বাচ্চা ছেলে একটা ছুটতে ছুটতে এসে নৃশংসভাবে মারধোরের কথা জরকামুনিকে জানায় ।

খবর শুনে জরকামুনির বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে যায় । ঢেকির পাড়ের মতো বুকের ভেতর ধুপ ধাপ লাফায় । দুশ্চিন্তায় মুখটা ভীষণ কালো । বাপকে খালাস করার জন্যে রাঙ্গাছড়া ফরেষ্ট অফিসে যেতে ভয় লাগে । কি জানি তসীরামের মতো বাপ ছেলেকে বেঁধে কোর্টে চালান দেবে কি না । না গিয়েও উপায় নেই । সকালে উপোস পেটে বাপটা পাহাড়ে গিয়ে ধরা পড়েছে । এখন পর্যন্ত একফোঁটা জলও হয়ত পায়নি । রাঙ্গাছড়া ফরেষ্ট অফিসের টীলা উঠতে হাঁটু ঠকাঠক কাঁপে । গলাটা শুকিয়ে কাঠ । তবু অনেক সাহস সঞ্চয় করে নিজেকে নিজে বলে যা হবার হবে ।

বাপের জন্য না হয় একটু মারধোর খাবো । এর বেশীতো কিছু হবে না ।

টীলায় উঠবার পথে দেখা হলো চেলাফ্রু মগের সঙ্গে । সেও এই এলাকার অধিবাসী । জরকামুনিকে দেখে বলে ভাতিজা, তাড়াতাড়ি যাও নইলে তোমার বাপকে চালান দেবে । ফরেষ্টের বাবুরা কাগজ টাগজ লিখে শেষ করলে গিয়ে কিন্তু কোন লাভ হবে না । ওরা আমার কুড়াল আটকে দিল । একটা মুরগী বেচে দশ টাকা দিয়ে তবে কুড়ালটা ফেরত পেলাম । তুমিও খালি হাতে যেয়ো না । কিছু না পারলেও অন্তত এক বোতল মদ নিয়ে ওদের হাতে পায়ে ধরে দেখো ছাড়ে কি না ।

জরকামুনি থমকে দাঁড়ায় । দ্বিধাগ্রস্ত মন । টাকা ছাড়া গিয়ে কোন লাভ নেই । আর এখন না গেলে যদি চালান করে দেয় তাহলে আরো বিপদ । আর এক্ষণ কোথায় গিয়ে টাকা যোগাড় করবে । ঘরে যদি টাকাই থাকতো তাহলে উপোস করার কি কারণ । গ্রামের সর্দার অনন্ত চৌধুরীকে অনুরোধ করলে হয়তো ভাববে, বাপকে ছাড়াবে । কিন্তু সর্দার টাকা ছাড়া মানবে না । চৌধুরী অনেককে ছাড়িয়েছে । দিন দিন কাজ করে তার সুদ আসল শোধ করেছে অনেকে । মাথায় কোনো বুদ্ধি আসে না । পাথরের মূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, টীলা থেকে নীচে নামে তরতর করে । হন হন করে হাঁটতে লাগল হাসমাই রিয়াং- এর বাড়ীর দিকে । বালাছড়া যাবার পথের পাশেই তার বাড়ী । বেলা তখন দুপুর । হাসমাই রিয়াং তার ঘরের বারান্দায় বসে কি যেন লিখছে ।

জরকামুনিকে দেখেই মুখ তুলে চায় । জরকামুনির অসহায় চোখ দেখেই বলে--- জরকা তোমার বাবার খবর নিয়ে এসেছ বুঝি । আমি সব শোনেছি । দেখি কি কি করা যায় । তুমি একটু বসো । মন্ত্রী, হাকিম, ডি এম সবার কাছে দরখাস্ত লিখেছি । বনের জুলুম বন্ধ করার জন্য । গ্রামের সবাই দস্তখত করেছে খালি তুমি আর তোমার বাবা বাকি । আগেও দুটি দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু প্রতিকার হয়নি । এবার দেখি কিছু করা যায় কিনা ।

জরকামুনি বোকার মতো চেয়ে থাকে । বিশ্বাস আছে হাসমাই রিয়াং-এর উপর । কিন্তু হাসমাই যা বলছে তা পারবে কিনা সন্দেহও জাগে । এই এলাকার লেখাপড়া জানা লোক হাসমাই । খয়রাতির দরখাস্ত, জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার দরখাস্ত, গরু, ছাগল, কেনা বেচার রসিদ সবকিছুই বিনে পয়সায় লিখে দেয় । কেউ মামলা-মোকদ্দমায় পড়লে হাকিম, দারোগা, তহশীলদার, ফরেষ্টার সবার সাথে নির্ভয়ে দায় দরবার করতে পারে । সে কাউকে বড় বেশী ভয় পায় না । জেল, থানা তার কাছে জলভাত । বন দপ্তরের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলেও গেছে । জেল থেকে খালাস হয়ে এসে আবার আগের মতোই দায় দরবার চালিয়ে আসছে ।

সে নিজে জুমিয়া । কিন্তু অন্য জুমিয়াদের চেয়ে অনেক আলাদা । দশ জনের মতো মদ খায় না । কথাবার্তায় খারাপ ভাষাও বলে না । পাহাড়ে যত দুঃখী কাঙাল আছে তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় । গ্রামের নিরক্ষর ছেলেদের জড়ো করে নাম লেখানো শিখাতে চেষ্টা করেন এতে কেউ কিছু দেয় ভাল । না দিলেও জোর করে না । জরকামুনিও তার বাড়ীতে দু তিন দিন এসেছিল নাম লেখা শিখতে । পরে অবশ্য আর আসেনি । হাসমাই রিয়াং জরকামুনিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয় । গলাছড়া গ্রাম, সত্যরাম চৌধুরী পাড়া গিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে । গলাছড়া গ্রাম থেকে

দুজনকে পাঠায় বাহুরীছড়া গ্রামে । চারদিকে খবর পাঠায় বিকেলে নারী পুরুষ যাতে সত্যরাম চৌধুরী পাড়ায় জড়ো হয় ।

সেখান থেকে জরকামুনিকে নিয়ে লম্বাছড়া, জহরনগর বাঙালী কলোনীর দিকে পথ ধরে । সেখানে বাঙালীরাও গরীব । উপোসে, অর্ধাহারে দিন কাটায় । তারাও পাহাড়ে বাঁশ, ছন কেটে বাঁচতে চেষ্টা করে । বনদপ্তরের জুলুমের চোটে নতুন কলোনী ছাড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে । হাসমাই এই খাড়া দুপুরে কানুর মার ঘরে গিয়ে বসে । কানুর মা বিধবা বুড়ী । কানু-ই একমাত্র ছেলে । বুড়ী তাদের দাওয়ায় বসিয়ে তামাক খেতে দেয় । বসে বসে কানুর কুড়াল কেমন করে ফরেষ্টররা ছিনিয়ে নেয়, সেই গল্প বলে । আস্তে আস্তে খালি গায়ে গামছা পড়ে হাজির হলো শশী সরকার, নীলকান্ত ঘোষ, হরিপদ দাস আরো অনেকে । সবার একটা কথা, বনের জুলুম বন্ধ না হলে এই দেশে থাকা যাবে না । ক্ষোভের সাথে নীলকান্ত ঘোষ জানায় লাঙলের জন্য একটা কাঠের ডাল নিয়ে ধরা পড়ে । গাই বিক্রি করে তবে লাঙলের মামলা থেকে রেহাই পায় ।

সবকথা শুনে হাসমাই গম্ভীর হয়ে বলে এই জুলুমের প্রতিবাদ করব আজ । তোমরা সবাই মিলে সত্যরাম চৌধুরী পাড়ায় যেয়ো । সেখান থেকে আমরা রাঙ্গাছড়া ফরেষ্ট অফিসে দল বেঁধে যাব । দেখি ওরা আজ কতজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে । কিছুটা ভয় আছে সবার । তবুও এক বাক্যে সায় দেয় । যা হবার হবে, এমনিতেই যখন মরছি, দেখি এক সাথে মরে লাভ হয় কিনা ।

শশী সরকার কথার পিঠে কথা টেনে জিজ্ঞেস করে--আচ্ছা ভাই ঃ তোমরা আমরা যখন পাহাড়ে যাই, আমাদের উপর এত জুলুম ! অথচ এই পাহাড়ে রবি দত্ত, মদন লাল জৈন, বেনু সাহা বড় বড় মহাজন ঠিকাদাররা সব শেষ করছে, ওদের কেউ ধরে না । এক একজন পাঁচটা সাতটা হাতী দিয়ে কাঠ টানে । কাঠও কি সাধারণ কাঠ ! গামাই, সুন্দি, চামল, শাল, আওয়াল । কত দামী দামী জিনিষ, ওদের কেউ জিজ্ঞেস করে না ।

নীলকান্ত ঘোষ কথা লুফে নিয়ে বলে, আরে, কি কউ বুঝিনা । ওরাই তো সরকার । আগে যে ফরেষ্টার ছিলেন কালো বেটে মত লোকটা, সবসময় পান খেতো । ঐ ফরেষ্টার বাবুর নাকি চাকরি চলে গেছে, জৈন মহাজনের কাঠ ধরেছিল বলে । ফরেষ্টার বাবু বেশ ভালই ছিলো, হাসমাই রিয়াং বলে । গরীবদের জুলুম করতো না । অন্য গার্ডরা দা, কুড়াল নিয়ে গেলে ফেরত দিতো ডেকে । নীলকান্ত ঘোষ বলে--হ্ হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি কোনদিন কারো সমান যায় ।

লম্বাছড়ার অধিবাসীরা জাতিতে বাঙালী । সবাই নিরক্ষর । সকাল হলেই দা হাতে নিয়ে আমবাসা বাজারে যায় । কেউ ঘর ছানি দেয়, কেউ বেড়া বুনে । বাজারে কেউ আবার মহাজনের মালপত্র লরীতে উঠায় নামায় । কেউ বেত চিরে মুঠো মুঠো বেচে । কেউ কোদাল নিয়ে মাটি কাটে । পাথর ভাঙে । অনেকেই পাহাড়ে যায় ছন, লাকড়ি, বাঁশ এনে বাজারে তুলে । হাসমাই এই গ্রামে প্রায়ই আসে । সবার সাথে তার চেনা জানা । জমিজমার হিসাব, কাঠের হিসাব, মাটি কাটার হিসাব করার জন্য অনেকেই তাকে ডেকে আনে । পড়ন্ত বিকেলে রোদ । সত্যরাম চৌধুরী পাড়ায় লোকজন জমে । নারী, বুড়ী, শিশু কেউ বাদ যায় নি । মৌন বিষাদ আতঙ্কের ছায়া সবার মুখে । সহানুভূতি, দরদ মিলানো চোখে জরকামুনির দিকে তাকায় । নানা জনে নানা প্রশ্ন, গাছের বাকলের

জন্য মারধোর করা ! এও কি কোনদিন সম্ভব । বুড়ো সত্যরাম চৌধুরী এখনো বেঁচে আছে । বয়স একশো বছরেরও বেশী । চোখের পাতা ঝুলঝুলে । শরীরটা ধনুকের মত বাঁকানো । গায়ের চামড়ায় অসংখ্য ভাজ, যেন লংতরাই পাহাড়ের মতোই বিস্ময়কর শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় ফ্যাকাশে রক্তহীন । হাতে বাঁশের লাঠি । ঘোলাটে চোখ মেলে চারদিকে তাকায় । উন্মত্ত নৃশংসতার সামনে সন্ত্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর দিকে ।

শত বছরের দেখা পৃথিবী আর মানুষ তার কাছে অচেনা অজানা । খক খক করে কাশে. বুকের জিরজিরে পাজরগুলোতে ভূমিকম্পের কাঁপন । পাঁজরের নীচে প্রাণটা টুকটুক করে লাফায় জটিল পৃথিবী থেকে মুক্তির আকুলতায় । বুড়ো ধীরে ধীরে এগিয়ে ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়ায় । কাশতে কাশতে বলতে শুরু করে, জুম বন্ধ । আমি বুঝিনা, কেন এই আদেশ ! পাপে পৃথিবীটা ভরে গেছে । দাদা ঠাকুর্দার কাছে শুনেছিলাম, একটা সময় আসবে যখন পৃথিবী পাপে পূর্ণ হবে, তখন সব ধ্বংস হবে । নিশ্চয় এই সময়টা এসে গেছে । না হলে এমন হবে কেন । গাছ মাটি থেকে উপড়িয়ে ফেললে বাঁচে না, তেমনি আমাদেরকেও যদি বন থেকে বের করে দেয়, আমরা বাঁচব না । নিজের কথা বলতে গেলে, আমি কদিন বাঁচব জানি না । আগামী শীতের নাগাল পাব কিনা সন্দেহ আছে । আমরা জেনেশুনে কোন অন্যায় করিনি । তবু কেন এই বিপদ !

এই সংসারে সবচেয়ে ছোট জীব পিঁপড়া, তাদেরও খাদ্য আহরণ করার অধিকার আছে আর আমরা মনুষ্য হয়েও সেই অধিকার নেই বুঝতে পারিনা । জুম বন্ধ হলে খাব কি ? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জুম বন্ধ হলে না খেয়ে মরবে । তারা তো কোন পাপ করেনি । ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে তারা কেনইবা জন্মাল আর কেনই বা মরবে ।

বলতে বলতে বুড়োর চোখ দুটি টলটলায়মান দরিয়ায় ভাসে । দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আসে, নিশ্বাসটা কেমন আবেগে থমকে দাঁড়াতে চায় । চারদিকে বুড়োর চোখে এলোমেলো রুদ্ধ দিগন্ত ! বেরোবার পথ খুঁজে পায় না । বুড়ো নিজেকে সামলে আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলে যেতে থাকে । ওরা যদি শিশুদের প্রাণ চায় তাহলে আমার প্রাণটা নিয়ে নিক । আমার সব ফুরিয়ে গেছে । এতেও যদি নিষ্পাপ শিশুরা রক্ষা পায় ।

সমস্ত মানুষগুলো বুড়োর করুণ যন্ত্রণার কথায় কেঁদে ফেলে । বুড়ো একটু দৃঢ় হয়ে বলে— বাবা হাসমাই ! বলো কি করতে হবে । যা বলবে সবার মঙ্গলের জন্য আমি তাই করব !

হাসমাই দাঁড়ায় । ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে আরম্ভ করে বলতে— বুড়োর কথা শুনলেন সবাই । জুম বন্ধ করতে আমরা দেব না । জুম বন্ধ করলে আমরা যাব কোথায় । দা কুড়াল কেউ কেড়ে নিতে এলে আমরা বাধা দেবো । তসীরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে---ঠিক কথা ! একটা দা কিনতে কুড়ি টাকা, কুড়াল একটার দাম কম করে পঞ্চাশ টাকা । দা কুড়ালই যদি না থাকে খাবো কি ? একটা বাঁশের বেত আনলেও রেহাই নেই । নদীর মাছ ধরতে মানা করে । সাপ, গুইল সাপ ধরতেও তাদের মানা । দামী গাছ গাছড়া ছাড়া, লাকড়ি কাটলেও রক্ষা নেই । এত নিষেধ থাকলে কোন্ জঙ্গল জাবড়া কেটে জুম করব ।

আতঙ্ক জড়ানো কণ্ঠে বিদ্যাজয় বলে এত নিষেধ । ওরা বলে টাঙ্গিয়া করে চল । টাঙ্গিয়া মানে জুম কেটে ধান বীজ রোপণের সাথে সাথে সরকারী বনবাবুদের গাছ গাছরার বীজ রোপন

করা । প্রতি বছর যদি গাছ গাছরা রোপণ চলে, কয়েক বছর পরে কাছে পিঠে জুম কাটার জঙ্গল থাকবে না । সব সরকারী বন রিজার্ভ হয় ।

হাসমাই চিন্তিত মুখে আস্তে আস্তে বলে -- জঙ্গলেই তো আমাদের গিরস্থির মাঠ । জঙ্গল থাকলে আমাদের মঙ্গল । একবার টাঙ্গিয়া করলে সারাজীবন ওই টীলায় আর কোনদিন উঠতে পারবে না । একটা ছাগল ঢুকলে ছাগলের দামের অর্ধেক দন্ডী আদায় করে ছাড়ে । ফরেষ্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছি, বাবু আমরা কি খেয়ে বাঁচব । সোজা উত্তর দিয়েছে -- আমি কিছু জানিনা, ওপরওয়ালারা জানে । ওপরওয়ালাদের কোথায় পাব । তিন চার বছরে পাহাড়ে টাঙ্গিয়া শেষ । মানে আমাদের দানাও শেষ ।

সত্যরাম চৌধুরী ফোকলা দাঁতে বলতে থাকে, চীপ কমিশনার এসে একশো একাশি ঘরকে দেখিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা লুঙ্গা জমি । প্রত্যেককে পাঁচ কানি মাপজোক করে সমঝায় । সঙ্গে প্রত্যেককে পাঁচশো টাকাও দেয় । কিন্তু পরের বছর ওই লুঙ্গাতেই আবার সেগুন চারা, গামাইর চারা বনবাবুরা লাগিয়ে দেয় । আমি গেছি প্রতিবাদ করতে । বলল -- কাগজ দেখি । কাগজ কোথায় পাব ! তারাই বলে অন্যদিকে আবার পাঁচ বছরের আগে জমির কাগজ দেবে না । তাহলে আমরা যাই কোথায় । যে পাঁচশো টাকা মঞ্জুর হয়েছিলো তাও আবার তিন চার কিস্তিতে । মুখে মুখে বুঝিয়েছিলো গরু, লাঙল কিনে চাষ করো । কিস্তি দিয়ে কি আর গরু পাওয়া যায় । চাঁদা ধার্য হয় এই পাওনার জন্য ঘর প্রতি কুড়ি টাকা, একটা মোরগ, এক কেজি চাল, একটা ডিম, এক বোতল মদ । অনন্ত চৌধুরী সহ পাড়ার সর্দাররা এই সব যোগাড় করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ।

তসীরাম বলে ঘরের ইঁদুরেইতো বেড়া কেটে সব সর্বনাশ করেছে । এখন পাহাড়ীরা অলস বলে বনবাবুরা গালিগালাজ করে । জঙ্গল না থাকলে মঙ্গল নেই । আমরাও মানি জঙ্গল থাকুক । কিন্তু মানুষগুলোকে রাখবে কোথায় । মানুষের জন্য একটা বিহিত ব্যবস্থা করা তো দরকার । সীমানা ঠিক করে বলুক না এতটুকুতে তোমরা জুম কর । তা কোনদিন মানবে না ।

বাখারায় রিয়াং এই এলাকাতে সর্দারের লোক বলে পরিচিত । বনবাবুদের সাথে তার মেলামেশা খাতিরও আছে । সে বলে বনবাবুদের কথামতো চল । পিটিশন টিটিশন কর জুম করতে হলে । সরকারের সাথে ঝগড়া বিবাদ করলে খামোখা বিপদ হবে । তোমরা কি সরকার বিরোধী হয়ে বাঁচতে পারবে ? সরকারই আমাদের মালিক, মালিক খুশী না থাকলে কেইস টেইস করে হয়রাণি করবে । হয়রাণির সময় তোমাদের কিছু হবে না, ঝড় ঝাপটা সামাল দিতে হবে আমাদেরকে । তাই বলছি ওই সব ঘেরাও ফেরাও এ যেয়ো না ।

বিদ্যাজয় রেগে বলে, ফালাও তোমার পিটিশন । কত পিটিশন দিয়েছি, মহুরী ধরে খালি লেখানোর খরচ বাড়ে । তসীরামের রাগ সবার জানা । এমনিতে সে নিরিবিলি ! তার ধমক আর ক্রুদ্ধ চোখ মুখ বাখারায়কে নিস্তব্ধ করে । লজ্জায় ভয়ে বাখারায় জড়োসড়ো । সমস্ত মানুষগুলোর ভ্রুকুটি চাউনীতে ঘৃণার আঁচ । বাখারায়কে যেন নিমেষে ভস্ম করে দিচ্ছে । হাসমাই উত্তপ্ত । মুখটা রেগে লাল । আবেগ জড়ানো কণ্ঠের স্বর গম্ভীর । কথার দৃঢ় আঘাতে মানুষের সংশয় দ্বিধা, ভয় সব চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায় । বলতে থাকে এই জোর জুলুম যত তীব্রই হোক সবাই মিলে আমরা রুখব । বনবাবুদের পোষা ভক্ত দু একজনের কথায় আমরা পিছু হঠব না । জুমের উপর জুলুম

মানে পেটে লাথি । সহ্য করা যায় না । বাখারায়দা বা যারা উনার মতো আছেন তাদের কাছে পরিস্কার অনুরোধ আপনাদের না পোষায় আপনারা চলে যান । কিন্তু সত্য মিথ্যা কথা বলে বিভেদ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না । বনে আমাদের জন্ম । বন আমাদের দেবতা । বন আমাদের স্বর্গ নরক সব কিছু । আমরা বনকে পূজা করি । বনের পাখী, বনের জন্তু জানোয়ার, বনের পতঙ্গ, বনের পাতা গোটা সব আমরা চিনি । ওরাও আমাদের চিনে জানে ভালোবাসে । সেই বন থেকে আমাদের তাড়ানো চলবে না । সমস্ত শক্তি বুদ্ধি দিয়ে আমরা এই ভয়াবহ সর্বনাশকে রুখব । আমরা কাঠ কেটে নষ্ট করি না । কাঠ দিয়ে আমরা কি বাবুদের মতো চেয়ার, টেবিল বানাই ! বড় জোর গাইল সিয়ার জন্য এক আধটা ডালপালা কাটলে কাটি । বনবাবুরাই দামী দামী গামাইর সেগুন বিক্রি করে পাহাড়টাকে লেংটা করছে । আমরা বাঁশ কাটি জুম চাষের জন্য । তাও কচি বাঁশ বন দেখলে রক্ষা করি । কচি বাঁশ বনে জুম চাষ হয় না । যাক ও সব কথা, চল সবাই । আমরা রংকারায়কে নিয়ে দল বেঁধে বন অফিসে বসে থাকবো । এতে মারপিট করে করবে ।

হাসমাই এর অঙ্গুলি সংকেতে সবাই উঠে দাঁড়ায় । পা বাড়ায় বন দপ্তরের দিকে । কারো পিঠে শিশু, কারো পিঠে বেতের ঝাকা । পায়ে পায়ে সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মতো হাঁটে । অনেক পায়ের পদক্ষেপে ধূলা উড়ে । রুক্ষ সবল পায়ের পেশীতে নতুন সঞ্জীবনের ধ্বনি । হতাশা দুমড়ানো বুকের গভীরে ঢেউ এর মতো আছড়ায় এক নতুন বিশ্বাস । শক্ত শক্ত নীরব মুখগুলোতে দৃঢ় অঙ্গীকারে জ্বলন্ত অঙ্গারের আঁচ । চোখগুলো জ্বল জ্বলে । হতাশায় ভেঙে পড়া দেহের ধমনীতে সঞ্চারিত এক উন্মাদনার অপূর্ব শিহরণ । দেহের কোষে কোষে তপ্ত রক্ত টগবগিয়ে ফোটে । বুড়ো সত্যরাম চৌধুরীর ঘোলাটে চোখ দুটিও অবিশ্বাস্যভাবে ঝলকায় । বিস্ময় আর অচেনা আশঙ্কায় ভরে । হাসমাই রিয়াং সবার আগে কদম কদম এগোয় ।

অফিসের টীলায় উঠতেই কে যেন এক বিকট চীৎকার দেয় । চীৎকারের অর্থ কেউ বুঝেনি । বুঝার আগেই একদল সিপাই লাঠি উঁচিয়ে দাঁত কামড়ে দমাদম শুরু করে । আর্তনাদের কোলাহলে চারদিক সন্ত্রস্ত । সবাই ছত্রভঙ্গ । যে যেদিকে পারে পালায় । কান্নার রোলে আকাশ বাতাস থরো থরো কাঁপে । মধ্যে মধ্যে সিপাইদের আতঙ্ক সঞ্চারী বাঁশী কানের পর্দা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় । নিমেষে চারধার জনশূন্য । হাসমাই মাথাফাটা অবস্থায় রাস্তায় লুটনো । নাক দিয়ে মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বেরোয় । মাথাটা কানের উপরে ফাটা । জামার হাতা দিয়ে মাথা মোছার চেষ্টা করে । কোন রকম উঠে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত হাত তুলে দূরে পলায়নরত নিরীহ পাহাড়ীদের ডাকে । বাতাসে রক্ত ভেজা জামার হাতাটা তখনো পতপত কাঁপে । নব প্রস্ফুটিত জবাফুলের উজ্জ্বল মেলানো পাপড়ির ঢঙে ।

বন দপ্তর, এরপর নিজেরা জুম করতে শুরু করে । শাল, সেগুন, গামাইর, কড়ুই নিজেরা বপন করায় রিয়াংদের নিয়ে । রোজ পাঁচ টাকা ধান কার্পাস অবশ্য জুমিয়ারাই ভোগ করতে পারে । এই প্রথা হচ্ছে টাঙিয়া । টাঙিয়া প্রথায় কাজ, সপ্তাহে যাদের ভাগ্য ভালো তাদেরই জোটে । তাও সবদিন নয়, কারো কারো উপোসের দিনে একদিনও জোটে না ।

রংকারায় ও জরকামুনি, বাপ-ছেলেতে মিলে চলে গেলো আমবাসা বাজারে । ঋণের জন্যে মহাজনের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে । কেউই ঋণ দেয়নি ।

জুম নিরাণীর সময় চলে যাচ্ছিল। তিনদিন হেঁটে মহাজন চৌধুরীকে শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পারে। তিনশত টাকা ঋণ চায় রংকারায় আর জরকামুনি। কিন্তু কত কঠিন ঐসব ঋণের শর্ত। কখনো জিজ্ঞেস করে কত কেজি কার্পাসের বীজে কত কাঠা জমি রোপণ চলে ? কত কেজি তিল বীজে কত কেজি তিল উৎপন্ন হয় ? সারা জুমে কত কাঠা জঙ্গল কাটা। সময়মতো ঋণ শোধ করতে আদৌ পারবে কি না। ফসল কাটার মরশুমে দাম যতো সস্তাই হোক, তার চেয়েও কম দামে ফসল দিয়ে ঋণ শোধ করতে রাজী কি না। সব কিছুতেই রংকরায় ও জরকামুনি রাজী হয়।

শেষ শর্ত দুটি বড়ো নির্মম। ঋণ দেবে দুইশত, শোধ করতে হবে তিনশো। তাও আবার গ্রামের সর্দার অনন্ত রিয়াং চৌধুরীকে জামিনদার করতে হবে। না হলে হবে না। কোথাকার কোন অচিন পাহাড়ীয়াকে কি বিশ্বাসে এতো টাকা দেবে।

রংকারায় ও জরকামুনি গালে হাত দিয়ে পথের পাশে ঘাসের উপরেই বসে পড়ে। চোখে দুশ্চিন্তার কালিমা। জরকামুনির বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়। অদ্ভুত এক কষ্ট। এখানে আসার আগে সাজেরুঙ-এর উপোসী মুখখানি দেখে এসেছে সে। সাজেরুঙের পিসি ক্ষুধার জ্বালা ভুলতে চায়। নিদান দিনের গান গেয়ে ভুলতে চায় ক্ষুধার কথা।

আসারি তানি বাইকাঙ বা মা
থাঙ ফ্রুলে নুক নাঙিয়া দো
ফাইফলে নুক্ বিখাদো
মাইপচানি বাকইয়ে খো মাইবিয়াদো
(নিদান দিনে হাওয়ায় দোলে
লাল বাইকাঙ ফুল
যাবার পথে ক্ষুধার জ্বালা
কেউ দেখেনি তারে
ফেরার পথে মাথায় বোঝা
কেমনে মাথায় তুলি তারে ?)

জ্যৈষ্ঠ মাসের হা অন্ন দিনগুলিতে সবাই ব্যস্ত অন্ন সংগ্রহে। দিন কাটে দানাপানি যোগাতে। বনে তখন বাইকাঙ ফুল লাল হয়ে বন আলো করে ফোটে। কেউ সেদিকে তাকাবার সময় পায় না। সময় থাকে না। দিনের শেষে মাথায় বোঝা, ঘরে ফেরার তাগিদ, ক্ষুধার্ত শরীর, সময় নেই ফুল নিয়ে খেলার, সময় নেই প্রেমে মাতোয়ারা হবার।

অসংখ্য দুশ্চিন্তা মাথায় জমা করে জরকামুনি। বাপ রংকারায়কে নিয়ে খুঁজতে থাকে অনন্ত চৌধুরীকে। সারা বাজার তন্ন তন্ন করে খোঁজে। পেয়েও গেলো। মহাজনের গদীর পেছনে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে।

চৌধুরীর রমরমা মরশুম এখন। মহাজনের ঋণের খদ্দের জুটিয়ে কিছু কিছু টাকা পায়। জরকামুনি, রংকারায় শুধু নয়, অনেকেই তাকে টানে মহাজনের কাছে জামিনদার করতে।

অনন্ত সর্দার জামিনদার হয়। পরিবর্তে নকুলের দোকানে চা, পান, বিড়ি আর এক বোতল মদ দিয়ে রংকারায় খুশি করে অনন্ত সর্দারকে।

সারা বাজারে রিয়াংদের ভীড় । অধিকাংশেরই চোখ কোটরাগত । বুকের পাঁজরের সবগুলি হাড় টেনে বেরিয়ে আসছে । যেন আস্ত কয়েকটা কংকাল বাজারে সোজা চলে এসেছে । হাঁটতে পর্য্যন্ত কষ্ট পায় অনেক । কেউ এসেছে ঋণ নিতে । কেউ আসে বাজারে গলার রুপোর মালা বেচতে বা বন্ধক দিতে । কেউ এসেছে ঘরের একমাত্র সম্পদ শুয়োর বা মোরগটা বিক্রি করতে ।

মহাজনদের ঘরে ঘরে ঋণ প্রার্থীদের ভীড় । মহাজনদের আবার ময়াল ভাগ করা । ময়াল মানে এলাকা । মাণিক মহাজনের ময়াল হচ্ছে জিয়লছড়ার রিয়াংরা । মাখনবাবুর ময়াল হচ্ছে লংতরাই-এর পাদদেশে । বিভূবাবুর আবার পাট কার্পাসের রমরমা ব্যবসা । হরিণছড়ার সারা অঞ্চল । চৈতন্যবাবু পাট কার্পাস তিলের জন্যে ঋণ দেয় বলরাম, বাগমারা এলাকায় । নগদ ঋণ তার খুবই কম । একটা মুদির দোকান আছে । নুন, বিড়ি, চাল ইত্যাদি চড়াদামে বাকিতে বেচে রিয়াংদের কাছে । প্রমোদবাবুর ভাড়াবাড়ির ময়াল জুড়ে দাদনের ব্যবসা ।

সেই ঋণ থেকে এখন মুক্তির সময় । ঋণটা শোধ না করা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই । ফসলের আগমনীতে ঋণ শোধের একটা তাড়ণায় মন অস্থির । যত আগে ঋণ দেবে সুদের হারও তত কমবে ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ঋণ শোধ করতে হয় কার্তিক মাসের প্রথম দিকে । গলাছড়া গাঁয়ের লোকরা পাট কার্পাস তিল ধান খাড়ায় করে নিয়ে আসে আমবাসা বাজারে । জুমের ফসলে সারা বাজার তখন ছেয়ে যায় । বাজার দরও তরতরিয়ে নেমে যায় । নিচের দিকে । ফসল আছে বলেই ছেলেমেয়েরাও বাজারে আসতে চায় । শীতের কাপড়ের জন্যে বায়না করে । ওয়াইসিরুঙ যুবতী মেয়ে । তার বাপ কথা দিয়েছিলো তিল কার্পাসের সময় হাতের চুড়ি, কাপড় বোনার জন্যে রঙীন সূতো কিনে দেবে । ওয়াইসিরুঙও বাজারে এসেছে বাপের সঙ্গে তিলের খাঁচা পিঠে নিয়ে । সাজেরুঙ এর শখ, মাথার তেল কিনবে, শুয়োরের তেল মাথায় দিতে ভালোবাসে না । পোড়া পোড়া গন্ধ । শুয়োরের তেল ভালোই কিন্তু বাজারের মাথার তেলে যে সুগন্ধ তা ঠিক পাওয়া যায় না । পন্দিরুঙও আসে বাজারে । গন্ধী সাবান কিনবে । লাক্স সাবান মেখে স্নানের বড়ো ইচ্ছে তার । গলাছড়া থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে আসাম আগরতলা রাস্তা । সেখানে এসে খালি লরীতে উঠে । হাঁস মুরগী বোঝাই করার মতো তারাও বোঝাই হয়ে বাজারে আসে ।

জরকামুনি আর তার বাপ রংকারায় আসে তিলের খাড়া আর কার্পাসের খাড়া নিয়ে । কার্পাস হবে প্রায় মণ দুয়েক । তিল হবে মণ খানেক । কার্পাসের দাম বাজারে একশো কুড়ি, তিল চলছে মণ প্রতি দুশো টাকা । সব মিলিয়ে বাপ ছেলেতে হিসেব করে মোট চারশো টাকা পাওয়া যেতে পারে ; ঋণ শোধ করতে তিনশো লাগবে । হাতে তখন থাকবে শ'খানেক টাকা । তা দিয়েই শুটকি মাছ, বিড়ি, কাপড় বোনার সূতো, পেঁয়াজ, জরকামুনির মায়ের জন্য সাদা, তামাক মলার চিটে আরো অনেক কিছুই কেনা যাবে । আর জরকামুনি মনে মনে কিছু রঙীন ছবিও এঁকে রাখে, ভালোবাসায় পূর্ণ কিছু ছবি । সাজেরুঙের জন্যে কিনে নিয়ে যাবে প্লাসটিকের চুলের ফুল, চিরুনী, মাথার ভৃঙ্গরাজ তেল ।

বাজারের মাঝখানে মাখন চৌধুরীর গদি । সামনে প্রকান্ড লোহার তুলাদন্ড নিয়ে মাপ নিচ্ছে তার কর্মচারী । পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ যুবক যুবতীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে । কারো পাট,

কারো কার্পাস, কারো খাড়ায় তিল, মরিচ । মহাজন চেয়ার নিয়ে বসে আছে; হাতে লাল কাপড় মোড়া হিসাবের খাতা । তুলাদণ্ডের দিকে চোখ রেখে হয়তো কথা বলছে, মাঝে মাঝে এক ফাঁকে দেখে নিচ্ছে খাতার হিসেব । ওজনের বাটখারা নিয়ে প্রত্যেকেরই অভিযোগ আছে । ক্ষোভ আছে । বেতের ঝুড়ি সহ ওজন নিয়ে হিসেবে ফের বাদ দিতে গিয়ে চার পাঁচ কেজি হয়ে যায় অনায়াসেই । অভিযোগ করে লাভ নেই । কাঁচা বাঁশ বেতের ওজন নাকি অনেক বেশী । দাঁড়ি পাল্লার বাটখারার সঙ্গে কয়েকটা ইটের টুকরো ! অনেক সাহস নিয়ে জরকামুনি সহসা জিগ্যেস করে "বাবু দাঁড়ি পাল্লায় ইট রেখেছেন কেন" ?

অপমান বোধ করে মাখন চৌধুরী । তাচ্ছিল্য আর রাগত সুরে জবাব দেয়—তুই কি করে বুঝবি ওজনের হিসেব ? অ্যাঁ ? দাঁড়ি পাল্লার ফের ভাঙতে ওটা কাজে লাগে জানিস না ?

ওজনের কর্মচারী জরকামুনির কার্পাস দেড়মণ ধরে । তিল হয় একমণের জায়গায় পৌণে একমণ । জরকামুনি প্রথমে বিস্ময় বোধ করে, তারপরই অদ্ভুত অসহায় মুখচোখে তাকিয়ে থাকে । বিষণ্ণ দুটি চোখ । এতটা কম যে আশা করেনি সে ।

মহাজন তখন উচ্চগ্রামে বলে যাচ্ছে, কার্পাসের দাম একশো আশি, তিল দেড়শো টাকা । মোট দাঁড়াচ্ছে তিনশো ত্রিশ টাকা । তোদের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসেব কিন্তু পরিস্কার ।

জরকামুনি ও তার বাপ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে । এসব কথা কানে ঢোকে না, তাদের বিশ্বাস ছিল অন্য রকম । বড়ো আশা করে -- ।

যাকগে, তোরা মরলে মহাজনও মরবে -- মাখন চৌধুরী তখনও বলে যাচ্ছে, জন মহাজন মিলে কারবার । তোদের এখন কিছু টাকার দরকার, না ? ত্রিশ টাকা পাবি । আমি কিছু বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি । গাঁয়ের বাজারে কার্পাস দিয়ে শোধ করে দিবি ।

রংকারায় বিলের হিসেব আর টাকার হিসেব মেলাতে পারে না । বাপ বেটা মিলে বার বার হিসেব করে মেলে না । রংকারায় শেষ পর্যন্ত সন্তানের মতো কতো যত্নে বড় করা ফসলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় । জলের দরে ফসল বিকানোর তিক্ত অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মানুষ রংকারায় ছেলেকে বোঝায়—তর্ক করে লাভ নেই বাবা । বরং বিপদে আপদে আর কোন দিন ঋণ পাবে না । মহাজন চটে গেলে বড় বিপদ । মনে নেই, এইভাবে ইষরাম রিয়াংকে হরিছড়া বাড়ী থেকে তিল চুরির কেইস দিয়ে থানায় রেখেছিলো আর কেইসের সাথী ছিলো ওই গ্রামের সর্দার দেবসাই রিয়াং নিজে। মহাজনের অনেক ক্ষমতা । থানা পুলিশ হাকিম সব ওদের কথায় উঠে বসে ।

দীর্ঘশ্বাস বুক টেনে বেরিয়ে আসে জরকামুনির । অসহায়ভাবে বাজারের দিকে রওয়ানা দেয় ।

মাখন চৌধুরীর গদীর পাশে বেতের খাড়া রেখে চলে গেল বাজার ঘুরতে জরকামুনি । ভীড় কমলে মাল ওজন দেবে, হিসেব করবে । সঙ্গে তার বন্ধু তসীরাম । তসীরাম মাল বিকিয়ে মহাজনের লেনদেন চুকিয়ে দিয়েছে বাজার শুরুর দিকে । রাস্তার পাশে বাংলাদেশের পুরানো জামা কাপড় সাজিয়ে ভীড় জমিয়েছে; খদ্দের হলো হালাম আদিবাসীরা । কেউ কোট কিনে নিচ্ছে দশ টাকা, বারো টাকা দামে । জরকামুনির পছন্দ মতো তসীরাম একটা পুরোনো জামা কিনে সাত

টাকা দিয়ে । গায়ের জামার উপর গায়ে দু'জনে যায় বাচাই দোকানের সাড়ির দিকে । ভাবটা এমন দোকান থেকে কেনা যখন পুরান হলেও নতুন । সামনেই পাহাড়ী অলঙ্কারের পসরা । চটের থালায় মেলে বসে আছে এই এলাকার নামকরা দোকানী হরিপদ বণিক । সামনে বিভিন্ন গ্রামের আদিবাসী যুবতীদের ভীড় । কেউ সিকি আধুলির মালা । কানের বড় বড় ছেদা ভরা কারুকাজ করা রিং । কেউ আংটি । কেউ আবার কিছুই কিনে না ফ্যাল ফ্যাল করে চায় । হালাম, ত্রিপুরী, রিয়াং মেয়েদের রঙীন বাহার । পাশে আবার চেনা অচেনা নানা গ্রামের চার পাঁচটা যুবক । বাঁকা চোখে কথা কয় কেউ । কেউ আবার লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমিকার ফরমায়েস মতো অলঙ্কার কিনে । অলঙ্কারের বিচিত্র ঝংকারে নেচে উঠে কত রঙীন স্বপ্ন । যারা কিনে তারাই বুঝে । কারো মুখে রাশি রাশি হাসি । কারো মুখে বিষাদের ঘন ছায়া । সামনে সুশান্ত দাসের চা-এর দোকান । দোকানের খুপরিতে তাদের গ্রামেরই বিদ্যাজয় । গোপনে ওই গ্রামের মেয়ে ওয়াইসিরুঙকে নিয়ে বসেছে চুপি চুপি লবঙ্গ খেতে ।

তসীরাম জল চাওয়ার অছিলায় দোকানে ঢুকে বেরিয়ে আসে । যেন জানান দিল -- দেখে ফেলেছি । কানাইবাবুর দোকানের পাশে বাঁশের চোঙে তেল ভরে বিকায় তার কর্মচারী । চোঙে তেল কম দিয়েছে তাই সেখানে গন্ডগোল বাধায় নালীছড়া গ্রামের এক মগ আদিবাসী ছেলে । উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আবার ঘোরে শ্রীমা স্টলের দিকে । এক ঠিকাদার পাহাড়ী, বাঙ্গালী শ্রমিকদের ডেকে ডেকে মজুরী মিটিয়ে দিচ্ছে । বিচিত্র মানুষের মিলন তীর্থ বাজার জরকামুনির মনটাকে উদাস করে । চেনা অচেনা ভীড়ে পায়ে পায়ে হাড়িয়ে যেতে ভাল লাগে । পাশে এক জটলা । চীৎকার করে 'মরে' 'মরে' 'মরে' মাছি মরে, মশা মরে, হালের গরুর দাউদের পোকা মরে, ছারপোকা মরে । পোটলা, পোটলা ঔষধ বিকায় লোকটা । ক্রেতারা সবাই চাষী, জুমিয়া । বাঙালী পাহাড়ী জাত বেজাত সবাই কিনে । অদ্ভুত বিস্ময়ে তাকায় জরকামুনি ।

ঘুরে ডানদিকে মৈ, লাঙল, জোয়াল বেচে এক মুসলমান । জরকামুনি, তসীরাম সবাইকে চিনে । তাদের গ্রাম থেকেই বরাবর লাঙল, জোয়ালের কাঠ কিনে । মুসলমানটা দুজনকে ডেকে বিড়ি খাওয়ায় । জুম ফসলের খবর নেয় । আরো কত সুখ দুঃখের খবর ।

যেতে যেতে মুখোমুখি হলো মতিকামারের । কুড়াল, কাঁচি, দা, টাক্কাল বানিয়ে বেচে । জরকামুনির কুড়াল আওয়াল গাছ কাটতে দাঁত ভেঙে গেছে । ঠিক করতে দিয়েছিলো । মহাজনের মাল সমঝে টাকা দেব বলে কুড়াল চেয়ে নেয় । মতি কর্মকার না বলেনি । লোহা লস্করের দাম বেড়েছে, দা, কাঁচি, কুড়াল বেচাকেনা কত কঠিন সে সব গল্প বলে । নীলু ঘোষ রসগোল্লা, আমিরতি, লবঙ্গ খোলা এনামেলের ফর্সায় মেলে বসে আছে । পাহাড়ী গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকটা সারাদিন দুধ সংগ্রহ করে । তসীরামের একটা গাই আছে, নীলু নিজে দুধ দোহায়, কিনে আনে । সেই সুবাদে দুজনকে ডেকে সে পানের খিলি খাওয়ায় । বসে বসে তসীরামের দেনা পাওনা হিসেব করে ।

বাজারের একেবারে উত্তরের কোণে মদের বোতল ভরা চটের ব্যাগ হাতে অবনী পাল । সে-ও পাহাড়ী গ্রাম থেকে মদ কিনে বাজারে এনে বেচে । সঙ্গে তার নাকে সিকনী ঝরা ছেলেটা । আগে ভূমিহীন কলোনীতে থাকত । মাঝে কদিন রিক্সা চালায় । এখন আর পারে না । মদ বেচে চাল কিনে । ছেলেটা চালের জন্য খালি এক থলি নিয়ে বাপের পেছনে পেছনে ঘুরছে । জরকামুনির

সাথে চিন-পরিচয় লম্বাছড়া ভূমিহীন কলোনী থাকার সময় । হলদেটে রঙের দাঁত বের করে পরিচয়ের হাসি হাসে ।

অবনী পালের পাশে মদ খেয়ে বমি করছে বিকট আওয়াজে একজন অচেনা রিয়াং । একটা নেড়ী কুকুর এসে সেই বমি চাটছে মহানন্দে । পাশেই আবার কপুরীর মা ডালের বড়া গরম গরম ভাজছে, বিক্রি করছে ।

কপুরীকে কেউ কোনদিন দেখেনি । তবে কপুরীর মা বললে এই অঞ্চলে সবাই চিনে ।

তেলিয়ামুড়ার পাইকার আগরতলার ব্যবসায়ী, লরী নিয়ে বাজারে আসে । জুমের মরসুমে জুমের ফসল কিনে, লরী ভরে নিয়ে যায় । এখানে দু তিনটে হোটেল আছে । সেখানে ওরা খায় দায় । ওখানেই পাড়ার নানান সর্দাররা জোটে । ফসলের দাম দর কেউ ঠিক করে দেয় । কোন সর্দার ওই হোটেলে মহাজনের খরচে খায় । খদ্দের জুটায় । এমনি ধারায় বাজার চলে । হোটেলে আবার বাংলা মদের ফোয়ারা ছুটে । রিয়াং, হালাম অনেকেই আসে ।

বিষ্ণু ধরের ছোট দোকান । ঝুমকা, চুড়ি, চুলের ফিতা, খোপার প্লাস্টিকের ফুল দোকানে মেলে পাহাড়ী মেয়েদের ভীড় জমিয়েছে । দোকানের পেছনে পাতলা লম্বা চুল দাড়ি নিয়ে বসে মঙ্গহা রিয়াং গাঁজার কলকি সাজায় । মাঝে মধ্যে বিষ্ণু ধরও কলকি টেনে আবার মেয়েদের হাতে চুড়ি ভরে দেয় । মুখে মুখে গল্প বলে, যায় দিন ভাল, আসে দিন কঠিন । মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখন আগের মতো নয় । মঙ্গহা সাধু শিকারী বাড়ী মন্দিরের পূজক । ভাব গম্ভীর মুখে সব কিছুতেই সায় দিয়ে যায় । তসীরাম আর জরকামুনি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প শোনে । বনবালাদের দিকে চোখে চোখ রেখে, আবার পলক হারায় । "দাম যখন পার দিও" বলে খোঁপায় গোঁজার প্লাস্টিকের প্রজাতি জরকামুনির পকেটে ভরে দেয় । জরকামুনি মৃদু প্রতিবাদ জানায় । বিষ্ণু ধরের বলিষ্ঠ আবদারের কাছে হার মানে । বিষ্ণু ধর পাহাড়ী গ্রামে ঝুমকা চুড়ি ফেরী করে । সাথে সাথে ফেরী করে পাহাড়ী বাঙালীর রাশি রাশি ভালোবাসা । ঝুমকা বেচে, চুড়ি বেচে পরিবর্তে নিয়ে আসে কুমরা, খাকুল, চিনার, যাবতীয় জুমের মরিচ । যেতে যেতে সাজেরুঙের প্রেমের কথাও জানে । তাই জরকামুনির পকেটে প্রজাপতি দিয়ে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি ভরা হাসি চমকায় । হাসির রস বুঝে মঙ্গহা সাধু হাতের কলকি সরিয়ে হাসে ।

ঘুরতে ঘুরতে দেখা হলো জরকামুনির সাথে সাফিরায় রিয়াং-এর বাড়ী । তার কর্মপাড়া গাঁওসভায় । সম্পর্কে জরকামুনির কুমই । কুমই মানে বোন জামাই । দুদিনের পথ হেঁটে বাজারে আসে । সাপ্তাহিক প্রত্যেক বাজারে আসতে পারে না । পনের দিনে একবার আসে লবণ, বিড়ি, চিটা বেরমান নিতে । বেরমান পুঁটি মাছের তেল ভিজানো শুটকি । পথে পাহাড়ের উপর কোন পাড়ায় রাতে আশ্রয় নেয় ।

কুমই জরকামুনিকে দেখে বলে — চল তোমার বোনের জন্য কয়েক মুঠা সূতা পছন্দ করে দাও । সূতা কিনতে চলে গেল রায় বাবুদের দোকানে । সবুজ সূতা, লাল সূতা বেছে বেছে পছন্দ করে জরকামুনি । সূতা কেনার ফাঁকে জানিয়ে দেয় সাজেরুঙের সাথে ভালবাসার কথা । কুমই শ্বাশুরীর জন্য জিলিপি কিনে পাঠিয়ে দেয় জরকামুনির হাতে । আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে সাজেরুঙের বংশ পরিচয় । জুমের কাজে নিপুণা কিনা । কাপড় কেমন বুনে, তুলা ধুনা কেমন

পারে । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেয় জরকামুনির বন্ধু তসীরাম ।

জরকামুনি দিনের শেষে আস্তে আস্তে এগোয় মাখন চৌধুরীর গদীর দিকে । দেনা পাওনার হিসেব, নিজের সদাই সব কিছু বাকী এখনও ।

হঠাৎ জরকামুনি পাশের চীৎকার শুনে চমকে উঠে । মুখ ঘুরাতেই দেখে নন্দীরাম রিয়াং হাতের ছাতা নিয়ে বৌ এর চুলের মুঠি ধরে বেদম মারছে ।

বৌটা এক হাতে শিথিল পরনের কাপড়টা সজোরে চেপে ধরে অন্য হাত উপরে তুলে ছাতার আঘাত ফিরানোর চেষ্টা করছে । লোকজন ভীড় জমায় চতুর্দিকে । কেউ হাসে, কেউ উঁকি দেয় । কেউ বলে মদ খেয়ে বৌ পিটছে । লোকজনকে দেখে নন্দীরাম ক্ষান্ত । জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে হাঁপিয়ে উঠে, পিটতে গিয়ে এত ক্লান্ত, কথা পর্যন্ত বলতে পারছেনা । বৌ তখন কাপড় সামলায় । সজোরে কেঁদে কেঁদে নালিশ জানায়, আমার শরীরে হাত দিলে ! এই পাপের ফল, ভগবান যেন হাতে নাতে দেখি । সত্য সত্য সত্য তিন সত্য । আমার চোখের জল বিনা দোষে নষ্ট হবে না । আমি যদি সাচ্চা হই এর ফল আজকে রাত্রেই দেখব ।

দেখ অভিশাপ দিও না । জিভটা ছাই দিয়ে ধরে উপড়ে ফেলব বলছি । মুখের জন্যই তো এত কান্ড ঘটল । মুখ যদি না সামলাও আবার খাবে বলছি ।

নন্দীরাম জরকামুনিদেরই প্রতিবেশী । মান ইজ্জত বলতে তোমাদের কিছু নেই । বাজারে এসে ঝগড়া করছ, লোকজনে কি বলছে দেখছ না । তসীরাম, জরকামুনি ওদের দিকে তাকিয়ে নন্দীরাম বলতে থাকে দেখ না ভাই ! তিল কার্পাস দুই খাড়া দুজনে নিয়ে এসেছি বাজারে । মহাজনের ঋণ সুদ-আসলে দিতে গিয়ে সব শেষ। হাতে মাত্র দশ টাকা আছে । এই দিয়ে কি সূতো, সিদল শুটকী পাওয়া যায় ? বার বার বলছি আর টাকা নেই । কিছুতেই বিশ্বাস করে না ।

আমি নাকি ওকে ঠকাচ্ছি । নিজের বৌ হয়ে যদি এটা বিশ্বাস না করে, বুঝতে না চায় কি করি বল ? নিদানের সময় কত কষ্টে ঋণ এনেছি তা আমিই জানি । তখন শুধু শুয়োরের মত গিলেছে । কোথা থেকে আসছে, কি করে শোধ করব চিন্তা নেই ।

সবাইকে উদ্দেশ্য করেই অসহায় অপরাধীর মতো নালিশের সুরে বলতে থাকে নন্দীরাম । বৌটার চুল আলু থালু । খোপা কাত করে বাধতে বাধতে বলে রোদ, বৃষ্টিতে বুকের রক্ত জল করে জুম করেছি, আর আজ ফসল বিকানোর সময় আমি এক ভাগের মালিকও হতে পারি না । বৌটার পিঠের শূন্য বেতের খাড়াটা তখনো রাস্তায় গড়ায় অবহেলে ।

জরকামুনি খাড়াটা তুলে দেয় নন্দরামের বৌ-এর পিঠে, -- চল বলছি, লোক হাসিয়ে লাভ নেই, সিধা চল, যা আছে তাই দিয়ে তুমি খুশী মতো খরচ করগে যাও । তবে কোনদিন আর বাজারে তোমাকে আনব না । বিড় বিড় করে বৌ আবার নন্দীরামের পেছন পেছন চলে ।

আশ্বিনের শেষ । ঋণ শোধ করেও ঘরে বেশ ফসল রয়ে গেছে । রংকারায় ছেলেকে বিয়ে করাতে চায় । জরকামুনির বন্ধুরা রংকারায়কে জানিয়েছে সাজেরুঙ আর জরকামুনির ভালোবাসার কথা । মুশকিল হচ্ছে, সাজেরুঙের বাপের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর । গঙ্গানগরে খমু পাড়ায়, খোয়াই নদীর পাশে । রিয়াংদের বারো গোষ্ঠী । জরকামুনিদের গোষ্ঠীর নাম বলসই, আর সাজেরুঙের বাপের গোষ্ঠী ওয়াইরেস । গোষ্ঠীর দিক দিয়েও বেশ ভালো । প্রেম পীড়িতি

হলেই সব হয় না, সামাজিক নিয়ম কানুনও আছে। সাজেরুঙও এতদিনে পিসীর বাড়ী থেকে চলে গেছে। বিয়ের প্রস্তাব কানাঘুষা শোনার পর কোন মেয়েই সেখানে থাকতে চায় না। সাজেরুঙও চায়নি।

একদিন, ভোর বেলা, দিনক্ষণ দেখে, কনে ঠিক করতে রওয়ানা দিলো জরকামুনির বন্ধুরা। বর সংগে যাওয়ার নিয়ম নেই, জরকামুনিও গেলো না। দামী চাদরে মাথায় পাগড়ী বাঁধে আন্দ্রারা। আন্দ্রা বর পক্ষের লোক। হাতে ছাতা। সঙ্গে জরকামুনির মা আর বাপ রংকারায়। রংকারায়ের হাতে বল্লম। কাছিম শিকারে ব্যবহৃত বল্লম আর একটা দা নেওয়া রিয়াংদের রীতি। জরকামুনির মায়ের পিঠে খাড়া, খাড়ার ভিতরে চার কোণায় চার বোতল মদ। সঙ্গে আন্দ্রা বলতে দু'জন, বাঁশীরাম ও বানাসাই। রংকারায়ের মাথায় পাগড়ি। তার বল্লম দেখে সবাই বুঝতে পারে বিয়ের সূচনা করতে যাচ্ছে।

গলাছড়া থেকে রাঙ্গাছড়া গাড়ির লাইনের পাশে গিয়ে সবাই দাঁড়ায়। লরী বা কোনো খালি গাড়ি পেলে তাতে চড়ে যাবে আমবাসা। আমবাসা থেকে লরী করে পথের পাশে খুশিবন পাড়ায় গিয়ে নামতে হয়। সামনেই বালুছড়া বেঁকে গিয়ে তেতেয়া গ্রামের উঁচু পাহাড় পেরিয়ে খোয়াই নদীর পূর্বে খমু পাড়া। গভীর অরণ্য, পাহাড়ের মাঝখানে উনিশ বিশটা টং ঘর।

আন্দ্রা আসবে, একথা আগেই জানতো। বল্লমটা মাটিতে পুঁতে টং ঘরের সাংসিতে ওঠে সবাই। ঘরের বেড়াতে আবার দা গুঁজে, রংকারায় আন্দ্রাদের নিয়ে বসে। হুঁকো হাতে বেরিয়ে এল সাজেরুঙের বাপ। এগিয়ে দেয় রংকারায়ের দিকে। বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কোনোদিন কোনকালে এই গরীব ঘরে আসেন নি আপনি, আজ হঠাৎ কী মনে করে পায়ের ধুলো দিতে এলেন?

রংকারায় তামাক টানতে টানতে বলে — লোক মুখে আপনার মেয়ের অনেক গুণের কথা শুনেছি। শুনে ভাবলাম, ওয়াইরেস গোষ্ঠীর লোক। আগেও আপনাদের সঙ্গে এরকম মধুর সম্পর্ক হয়েছে। আপনার মেয়েকে পেলে আমাদের এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারে, তাই এলাম।

সাজেরুঙের বাপ বলে, আসুন আসুন। ঘরের ভেতরে এসে বসুন। ঘরে নিয়ে আন্দ্রাদের বসায়। সাজেরুঙের বাবার নাম কৌরেঙফা। বয়সে প্রায় রংকারায়ের সমান। রংকারায় পাহাড় ডিঙিয়ে এসে বড়ো ক্লান্ত। কোমরে ব্যাথাও আছে একটু। কৌরেঙফা চোখে ইসারা দেয় ক্লান্ত অতিথিদের মদ দিয়ে আপ্যায়ণ করা হোক। কৌরেঙের বৌ এক বোতল মদ বের করে পতা দিয়ে রংকারায়কে প্রণাম করে এগিয়ে দেয়। পতা হলো মদ খাওয়ার বাঁশের চোঙ। সবাই একটু মদ খেয়ে অবসাদ ঝাড়ে।

রংকারায় আন্দ্রাদের বলে—এবার কনের বাপ-মাকে একটু আপ্যায়ণ করো। আন্দ্রা দুজন খাড়া থেকে এক এক জনে এক এক বোতল করে, দু'বোতল হাতে নেয়। বানাসাই কনের বাপকে প্রণাম করে পায়ের কাছে মদের বোতল দুটি রাখে, অন্যদিকে বাঁশিরাম রাখে দু বোতল কনের মায়ের পায়ের কাছে।

কৌরেঙফা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে—এসেছেন ভালো কথা। কিন্তু এত খরচ পত্র করে

এলেন কেন ? আমার মেয়েকে দেখতে এসেছেন, সে তো কাপড় বুনতে জানে না । রীতি মতো বাপ মায়ের কথাও শোনে না । বেগুনের ক্ষারপানি পাতে দিতে, গোদক দেয় । এমনি অকর্মণ্য মেয়ে । গায়ের রঙটাই যা ফর্সা, ভিতর তত সাফ নয় । তার উপর আমি গরীব মানুষ, আমাদের সঙ্গে আপনাদের মতো ধনী মানুষের সম্পর্ক কী সাজে ?

রংকারায় জবাব দেয় আমার ছেলেও অতো ভালো না । ভাই, অনেকে তিন বেলা খায়, আমার ভাগ্যে একবেলা কোন রকম জোটে । আর সম্পর্ক তো সমানে সমানে হয় । লাজ লজ্জার কোন কারণ নেই । আমার ছেলেকে আপনারাই মানুষ করবেন । ভালো মন্দ দেখাবেন ।

কৌরেঙফা জবাব দেয়, ঠিক আছে । মেয়ের পিসি, পিসেমশাই তাদেরও একটা মত আছে । তারাই ওকে এতদিন লালন পালন করেছে । আমার বড় জামাই, কাকা, দাদা সবার একটা মতামত জিজ্ঞেস করে, আপনাদের জানাবো ।

রাতে সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে । পরদিন ভোর বেলা আন্দ্রাদের নিয়ে রংকারায় ঘরে ফেরে । সাজেরুঙ লজ্জায় পাশের ঘরে কাকীমার সাথে ছিলো । কোনো কথা বলেনি । এই অনুষ্ঠানকে রিয়াংরা বলে কৌসুমবা ওয়াখাকাইর ।

আন্দ্রারা কনের বাড়ী ভালো করে লক্ষ্য করেছে । রামকলার বিচিত্র মালা চোখে পড়ে কিনা, নতুন তৈরী কাপড় ঘরে কেমন সাজানো -- সব লক্ষ্য করেছে । চরকায় মাকড়সার জাল লেগে আছে কিনা, আন্দ্রারা তখন বুঝতে পারবে: মেয়েটা তাহলে অকর্মণ্য । উঠানে ধানের গোলা কতো বড় বা সাংসির উপরে মাচায় বেলের মুচি কত বেশি আছে ; সমাপ্ত-অসমাপ্ত বাঁশের খাড়া কতোটি -- ঘরের মানুষ আদৌ অলস না কর্মঠ, ধনী বা গরীব -- এসব দেখেই আন্দ্রারা বুঝতে পারে । দা, টাক্কল মরচে ধরা কিনা, সব খেয়াল করে আন্দ্রারা । ঘরের ভেতর সিম্নান নামে মাচা, মাচায় লেপ পাটি বালিশ । কাপড় বোনার নানান যন্ত্রপাতি । ঘরে ফেরার পথে রংকারায়কে আন্দ্রারা এই সবকিছুর বর্ণনা দিতে থাকে । লোকমুখে সাজেরুঙের বাপের সম্মতির কথা জানতে পারে রংকারায় । দশদিন পর দিন তারিখ ঠিক করে খবর পাঠিয়ে দেয় ।

রওয়ানা দেয় বিশ পঁচিশ জন আন্দ্রা যুবক নিয়ে । গ্রামের পাঁচজন মুরব্বীকে নিতেও ভুল করে নি । নিকট আত্মীয় মহিলারা কয়েকজন যায় । আন্দ্রারা ভরে নেয় একশো বিশ বোতল মদ, বড় একটা শুয়োর, একটা পাঁঠা, মোরগ । নারকেল, বাতাসা ও সন্দেশ নেয় । গ্রামের পুরোহিত তলবাংহা বাধা দিয়ে ছিলো পাঁঠা নিতে । পাঁঠার মাংস সুই খেমোতে নিলে নাকি দাম্পত্য জীবনে কলহ হয় । যুবক আন্দ্রারা তলবাংহার কথা শোনেনি ।

সন্ধ্যাবেলা তারা সবাই গিয়ে উঠে সাজেরুঙের বাপের বাড়ী । কনের ঘরে সরাসরি উঠার নিয়ম নেই । জিনিস পত্র সব কাকার বাড়ীতে নিয়ে রাখে । দু'জন আন্দ্রা কনের বাড়ী যায়, জিজ্ঞেস করে অবসর হয়েছে কিনা ।

অবসর জেনে, আন্দ্রারা জানে সর্দারের বাড়ী খমু পাড়ার চন্দ্রফা অপেক্ষায় ছিলো, এক বোতল দিয়ে প্রণাম করে আসরে আসার নিমন্ত্রণ জানায় ।

সাজেরুঙের বাপ নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে । সবাই সাজেরুঙের ঘরে গিয়ে জমা হয় । আন্দ্রারাও সেখানে যায় । কাকার বাড়ীতে জিনিসপত্র সামলে একা জরকামুনির

মা থাকে । সঙ্গে জরকামুনিও । পাড়ার সর্দার চান্দতা গাঁয়ের প্রত্যেককে নির্দেশ দেয় অতিথিদের আপ্যায়নের ভার বেটে নিতে । কোন অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত নয় । দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করাই হচ্ছে পূর্ব পুরুষদের নিয়ম । অতিথিদের নিয়ে সবাই খাওয়ায় । সন্ধ্যের একটু পরেই গাঁয়ের লোকরা কন্যার বাড়ীতে অতিথিদের খাঁইয়ে দাইয়ে পৌঁছে দেয় ।

সুইখেমো, মানে বিয়ে শুরু হয় । আন্দ্রা একজন পদ ফেলে কন্যার মা-বাপকে প্রণাম করে, দুই পাত্রে মদ দেয় । একে একে প্রণাম জানিয়ে কন্যার ভগ্নিপতি, বৌদি, দাদা, কাকা, কাকীমা প্রথম এদেরকে দেয় । তারপর আত্মীয়, প্রতিবেশীদের । যারা আসতে পারে নি, তাদের জন্যে ঘরে ঘরে ভোর রাতে পৌঁছে দেয় মদ । হাতে আগুনের বোন্দা থাকে, পথ আলোকিত করার জন্যে ।

পাটি বিছানো হয় ঘরের ভেতরে, মাঝখানে । পাটির উপর নতুন কাপড় পেতে দেওয়া হয়, কাছে একটা ডালায় চাল, কার্পাস, মরিচ, পাথর, তিল, লবণ ধরে থাকে এবং একটা লম্বা লোহা । পাগড়ি বাঁধা যুবকরা কুসুমল, চমপ্রেঙ বাজিয়ে বর আনতে যায় পাশের বাড়ী থেকে । বরের ডান দিকে একটা বক্ষ আবরণী থাকে । রিয়াংদের বিয়েতে কনে থাকে না ; কনের প্রতিনিধিত্ব ওই বক্ষ আবরণী ।

থাং নাইলে কাইঙ্গ নাং
তঙ নাইলে সিজনাং
থাংস্কাং বাধা তাখের দি
মনসা কাইকে আলোয়াসা
হৈরে সাউরে তাখে নাং দি

(মনস্থির করে এগিয়ে যাও, এলোমেলো চিন্তায় মন দিওনা । অথবা মনের খানিকটা ছেড়ে, খানিকটা টেনে রেখোনা) ।

গান গাইতে গাইতে এসে কনের ঘরের মাঝখানে পাতা পাটিতে বসায় জরকামুনিকে । বরের চারিদিকে ঘিরে বসে আন্দ্রারা । অচাই ডালা থেকে চাল এক মুঠো নিয়ে বলে, 'ভাইবোনেরা, দাদা, কাকারা, যারা এখানে আছেন ; তারা সবাই দেখছেন, দশ জনের সামনে রংকারায়ের ছেলে জরকামুনির সাথে কৌরেঙফার মেয়ে সাজেরুঙের বিয়ে হচ্ছে । আপনারা জানেন তো ? তাহলে হাত তালি দিন সবাই ।'

সবাই হাত তালি দেয় । অচাই বলে চাল থেকে ভাত হয় । সেই ভাত খেয়েই আমরা বাঁচি, বেঁচে থাকি । সেই চাল সাক্ষী রেখে সাজেরুঙ জরকামুনির আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসবে, আর জরকামুনিও সাজেরুঙের আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসবে ।

আন্দ্রারা বলে, হ্যাঁ ভালোবাসবে । অচাই আবার বলে, সবাই শুনছেন ? হ্যাঁ শুনেছি । সায় দেয় সবাই ।

অচাই তুলো হাতে নিয়ে আন্দ্রা আর অনুষ্ঠানের লোকজনদের দেখিয়ে বলে, এই তুলোর মতো চুল যখন সাদা হবে, দাঁত ভেঙ্গে ফোঁকলা হবে, বুড়ো হবে, তখনও পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে । স্বামী যদি একশিরা রোগে আক্রান্ত হয়, তবু স্বামী ছাড়তে পারবে না । স্ত্রীও যদি বন্ধ্যা হয়, তবু স্বামী তাকে ছাড়বে না ।

আন্দ্রা আন্দ্রীরা মাথা নাড়ে— 'ছাড়বে না' । সভাসদরা সবাই বলে, শুনেছি । অচাই তিল ধরে এবার বলে, 'তিলের তেল যেমন কর্কশ কিছুকে কোমল করে, তেমনি ভালবাসা দিয়ে রাগ ক্রোধ সব শান্ত করবে ।'

আন্দ্রা আন্দ্রীরা সবাই জবাব দেয়, 'রাজী ।'

রিসার উপরে একটা মরিচ রাখে, মরিচটা মুখে দিয়ে বলে—মরিচ গায়ে লাগলে যেমন জ্বালা যন্ত্রণা হয়, তেমনি স্বামীর দুঃখে স্ত্রীর যেন জ্বালা ধরে, স্ত্রীর দুঃখে স্বামীও যেন যন্ত্রণা বিদ্ধ হয় ।

এবার লবণ মুখে দিয়ে বলে 'লবণ ছাড়া যেমন কোন রান্নার স্বাদ হয় না, লবণ থাকতেই হবে সব রান্নাতে । লবণের মতো স্বামী-স্ত্রীকেও প্রতি কাজে সুখে দুঃখে এক সঙ্গে থাকে । একে অপরের লবণের মতোই হবে ।

অচাই এবার জলের ঘটি থেকে বরের মাথায় আর এক বক্ষ আবরণীর উপর ঢেলে বলে, জল নদীতে থাকে, নদী যেমন দীর্ঘ ও বড় হয়, নদীর জল কেউ ওজন মাপতে পারবে না -- তেমনি স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাও মেপে বা ওজন করে শেষ করা যাবে না ।

আন্দ্রা আন্দ্রীরা সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে, হ্যাঁ এমনি করেই ভালোবাসবে ।

বিয়ে শেষ হলে শুয়োর কাটা শুরু হয় ।

বিয়ের প্রথম রাতে জরকামুনি যখন শুতে যায় সাজেরুঙ থাকার আগুন ঠিক করে । থাকা মানে মাচার উপরে মাটি দিয়ে তৈরী উনোন । দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আশা, আজ পূর্ণ হচ্ছে । বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে জরকামুনির ।

সাজেরুঙ ভোরের রান্নার জন্যে লাকড়ি তৈরী করে, চরকায় সুতো কেটে, অন্যান্য কাজ শেষ করে যখন জরকামুনির কাছে আসে, তার মা বাপ তখন পাশের ঘরে ঘুমের ঘোরে ।

সাজেরুঙ কাছে আসতেই বুকে টেনে নেয় জরকামুনি । 'আজ আমার স্বপ্ন আমার হাতের মুঠোয় । জানো, আমার মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ পেয়েছি হাতে ।'

'বিয়ে হয়ে গেলো বলেই এসব বলতে পারছো । আমাকে বিয়ে না করেও অন্য কাউকে করলে ঠিক এই কথাই বলতে না ।'

জরকামুনি সাজেরুঙের মুখে হাত দিয়ে চাপা দেয় । 'আজ আর কথা নয় ।' 'আমার মাথার দিব্যি, ওয়াইসিরুঙের দিকে তুমি কোনদিন মন দাওনি ? বলো না ?'

'আরে, না, না ।'

'ঠিক ?'

'ওয়াইসিরুঙ আমাকে চেয়েছিলো সত্যি, আমি ওকে পছন্দ করতাম না । আর ওকে যদি চাইতামই, তাহলে ওকেই বিয়ে করতাম, তোমাকে নয় ।'

'তা ঠিক । তবু একটু আধটু —

'না গো, না । তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকেই পেয়েছি ।'

'আমার স্বপ্ন আজ স্বার্থক ।'

সাজেরুঙ ঘুমিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে । ঘুমোলে ওর নাক ডাকে ।

জরকামুনি একবার তার নবপরিণীতা বধুর দিকে তাকায় । চোখে ঘুম নেই । একদিন দুদিন নয় । তিন তিনটে বছর তাকে থাকতে হবে শ্বশুর বাড়ি । তিনবার জুম করা, তিনবার জুমের ফসল ঘরে তোলা । তিনটে শীতকাল আর তিনবার নিদান— কে জানে কত কঠিন হবে । শুধু তাই নয়, পরের বাড়ির মানুষকে আপন করে নিতে হবে । শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সুখে রাখতে হবে । কোন ত্রুটি বিচ্যুতি...... । জরকামুনি ভাবতে পর্যন্ত ভয় পায় । সাজেরুঙকে পাওয়ার সুখ ছাপিয়ে এই ভাবনা তাকে বিহ্বল করে তুলছে । তার মা বাপ কী করে এই তিন বছর কাটাবে ? টুকরো টুকরো স্মৃতিতে ভেসে যায় জরকামুনি ।

রিয়াংদের সমাজে বিয়ের পর তিন বছর জামাইকে খাটতে হয় শ্বশুড় বাড়ীতে । এ সময়টা কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় বরকে । এটাই নিয়ম । জরকামুনিও এ নিয়মের বাইরে যেতে পারেনি ।

ভোরে, সবার আগে, জরকামুনিরই ঘুম ভাঙে । তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে উনোন ধরায় সে । এসব এখন থেকে তাকেই করতে হবে ।

আগুনের আঁচ বা আলো শ্বশুর শ্বাশুড়ীর চোখে যাতে না লাগে, সে জন্যে পাছড়া বা কাপড় দিয়ে আড়াল করে । জামাই বৌ উঠোন সাফ করতে লেগে যায় মরং — গাছের ঝাড়ু নিয়ে । অন্ধকার তখনো কাটেনি । দাঁতন বানিয়ে, ঘটিতে গরম জল ভরে রেখে দেয় সাংসিতে । হুঁকোর জল পাল্টে দেয় । তামাক পাতা চিটার সঙ্গে মিশিয়ে ডলেমলে তামাক তৈরী করে রাখে জরকামুনি ।

উঠোনে শীতের আগুন জ্বালে, খুড়োর বাড়ীর শালা শালীরা তাতে আগুন পোহায় । বৌ তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে । আজ মাছ ধরতে যাবে নতুন দম্পতি । কি মাছ পাবে তার উপর নির্ভর করছে তাদের আগামী দিনের দাম্পত্য জীবন সুখের না দুঃখের । নবদম্পতির সঙ্গে যায় জরকামুনির শালা লাকারায় । খোয়াই নদীতে যায় । জল বড় ঠান্ডা, একেবারে বরফের মতো । মাটি দিয়ে নদীর ধারে ধারে বাঁধ তৈরী করে জল সেচতে থাকে জরকামুনি । ফেলুন দিয়ে মাছ ধরে সাজেরুঙ, মাছের চেংগাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাকারায় । চিংড়ি আর চাপিলা মাছ ধরে, কাঁকড়া উঠলেও ফেলে দিতে হয় । এদিন কাঁকড়া ধরা অমঙ্গল । লাকারায় অবশ্য কাঁকড়া ধরতে চেয়েছিলো, সাজেরুঙ বাঁ দিয়েছে ।

মাছ নিয়ে সাংসিতে ফেরে সবাই । বুড়োবুড়িরা সাংসিতে বসে আছে । ভিড় করছে পাড়া পড়শিরাও । সাজেরুঙ-এর বাপ খুব খুব খুশি । চাপিলা মাছ বেশি ধরা মানেই দাম্পত্য জীবন সুখের হবে । এটা তারই ইংগিত ।

মাছ ধরার অনুষ্ঠান শেষে বিয়ের রাতে মদ নিয়ে সবাই বসে যায় । বুড়োবুড়িকে চোঙ ভরে মদ দিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে এক এক পাত্র ক্রমাগত শেষ করতে থাকে । টং ঘরের মাচায় কয়েকটা বাঁশ ঘুণে ধরা । বদলাবার কাজে হাত দেয় জরকামুনি । এসব কাজ শেষ করে, বাড়ির সবাইর জন্য যে দা আছে, সেগুলি ধার দিয়ে দেয় । ছোট ছোট বাঁশ কেটে সূতো ভরার ববিন বানায় । কাপড় বোনার নানা যন্ত্রপাতিও তৈরী করে ।

বেতের দড়ি পাকিয়ে সিকে বানাতে জানে না । তাই শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে রণসায়ের

বাড়িতে শিখতে যায় । কৌরেঙফা জামাইকে ডেকে বলে, কুইনাইহা, ঘরের তুলীর ছন পড়ে গেছে, বৈশাখের ঝড়ের আগে কিছু ছন কাটা দরকার ।

আগুন মাসের শেষে জরকামুনি নিরুত্তর থেকেই সম্মতি জানায় । পরের দিন থেকে ছন কাটতে যায় । সংগে গেলো বৌ । পাহাড়ে গিয়ে কিছু ছন কাটতে পারে, বেত তৈরি করে বাঁধতে জানে না । জরকামুনি বেত দিয়ে ছন বাঁধে । মাথায় দুজনের পাগড়ি ।

জরকা মাথায় দেয় বোঝা, সাজেরুঙ মাথায় বেতের পাটির মতো দিয়ে খাড়া বওয়ার নমুনায় বয়ে বয়ে আনে । ছানির কাজে নামে জরকামুনি ।

ছানি শেষ হলেই আবার নতুন কাজ । পৌষ শুরু হলে দু'জনে পাহাড়ে যায় । জরকামুনি মাটির বন আল খুঁজে মাটিতে গর্ত করে । বৌ তখন কলার থুড়, পাতা যোগাতে ব্যস্ত ।

একদিন, বিকেল হতে না হতেই জরকামুনি ও সাজেরুঙ মিলে গাইল সিয়া নিয়ে ধান ভাঙতে শুরু করেছে, এমন সময়, বুড়ী এসে খবর দেয় সাজেরুঙের বাপ কৌরেঙফা মদের নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে আছে, আসতে পারছে না ।

আপন মনে ধান কুটে জরকামুনি । বুড়ী কোণাকোণি করে বলে । কত বড় ভাগ্য নিয়ে জামাই পাওয়া কে জানে । বুড়োটা নেশা করে কোন লুঙ্গায় পড়ল কিনা দেখার কেউ নেই । পরের ছেলে বুঝবে কী ! আজকাল নিজের ছেলেই ভাত দেয় না । পরের আশা কুকুরেই করে । কটাক্ষের ভাষা শাণিত তীরের মতো জরকমুনির মনে ক্ষত-বিক্ষত করে বিঁধে । প্রথমে সলজ্জ নীরবতায় ঠোঁট কাঁপে, লাজুক বিস্ময়ে চোখ বড় হয় । রাগে অস্বস্তিতে তারপর মুখটা থমথমে শক্ত । মুখের রঙে বুঝা যায় কতটুকু বিরক্ত । বুড়ী যত রাগে জরকামুনি ইচ্ছে করেই উদাস ভাব দেখায় । চাপা ক্রোধ রক্তে টগবিগয়ে ফোটে । মনে মনে বলে শ্বশুর বাড়ী স্বর্গপুরী তিন দিন হলে ঝাড়ুর বারি । সেই প্রবাদ যেন মনের মধ্যে জীবন্ত জ্বলে উঠে । জামাই খাটা না জেল খাটা । বাধা বাঁধন হারা জীবনের উদ্দমতা কোথায় উড়ে গেল টের পায়নি । পরের ইচ্ছা অনিচ্ছাতে জীবন এখানে নিয়ন্ত্রিত । মনটা বড় ব্যাকুল তসীরামের জন্য । ওর মত বন্ধু থাকলে মনের জ্বালা প্রকাশ করা যেতো । সাজেরুঙ দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে । মুগ্ধ তন্ময়তা নিয়ে আগের মতো চেয়ে থাকে না । দিনরাত খালি সংসার সংসার করছে । এই অসহনীয় বিদ্রূপের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই । মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা ভাষাহীন ভাবে বাজে । আগে সাজেরুঙ জরকামুনির একটু কষ্ট দেখলে বিচলিত হতো । এখন তার মন কঠিন কঠিন লাগে । নিরিবিলি পাওয়ার জন্য কত উৎকণ্ঠা ছিল সাজেরুঙের । ঘরে লাকড়ি থাকলেও লাকড়ির অভাব দেখিয়ে বনে যেতো মনের সব গোপন কথা খুলে বলার জন্য । কত সময় হারিয়ে গেছে মনে নেই । কথা তবু থাকতো, ফুরাতো না । সারাদিন বসে আলাপ করেও মনে হতো দিনটা বড় নির্মমভাবে ছোট । একটু অভিমান দেখলে হাহাকার করতো বুক । কত আব্দারে কত অনুরাগে বুক ভরা ছিল । সব শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন । সারাদিনের বাছাই করা সুন্দর কথাগুলো রাশি রাশি সাজিয়ে রাখতো । সেই মনোরম সময়ের পেছনে ঢাকা সমস্ত সংকীর্ণতা, সমস্ত নগ্ন বাস্তব যেন রাক্ষুসে দাঁত বের করে তাকে গিলতে আসে ।

মনে হয় বাপের বাড়ী এসে আস্তে আস্তে অহংকারী হচ্ছে সাজেরুঙ । এখন তাকে মেনে

নিতে খটকা লাগে । নিরিবিলি অবসরের চেয়ে সবসময় কাজের তাড়না সাজেরুঙের বোধ হয় ভাল লাগে । কাজের অছিলায় তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা কি না কে-ই বা জানে । শ্বশুর বাড়ীর কেউ তাকে আপন করবে না । এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু সাজেরুঙ অন্তত তার কষ্ট ব্যথা বুঝবে । এমনতরো আশা কারণে অকারণে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে । সারা বাড়ী যখন নিন্দায় সমালোচনায় মুখর, সাজেরুঙ বিরোধিতা না করুক কমপক্ষে নীরব থাকাটা জরকামুনি চায় । নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে, ভালবাসার মোহে ভুলে বিয়ে করাটা ঠিক হয়েছে কিনা । নিজেকে নিজে বুঝায় ভুলের মাসুল দিতে আরো কত দুঃখ আছে কে জানে । জামাই খাটার আরেক নাম তিন বছরের দাসত্ব । সারাদিন রক্ত জল করে খাটলেও শ্বশুর বাড়ীর মন জুগানো যায় না । উঠোনে ঝাট দিয়ে সাফ করে দাঁড়াতে কোমরে টন টন ব্যথা লাগে । বুড়ী তখন কিছু খড়কুটো হাতে নিয়ে বলে ইচ্ছা না থাকে তো ঝাট দিওনা, দোষ কাটানো কাজ আমার ভাল লাগে না । কখনো কাঁধ ফাটিয়ে জঙ্গল থেকে বাঁশ এনে ফেলেছে কি না ফেলেছে বুড়ী বিদ্রূপ করে বলে —ডিগা বাঁশ দিয়ে কি মাচা হয় । পাহাড় জুড়ে দুনিয়া শুদ্ধ লোকের জন্য পাকা বাঁশ মেলে, তোমার মেলে না । চোখ থাকলে তো দেখতে পেতে । এমনতরো গঞ্জনা তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে । তার স্বাধীনতা, তার ব্যক্তিত্ব দিন দিন খর্ব হচ্ছে মনে হয় । অসংখ্য ভাবনা মাথায় কিলবিল করে ভীড় জমায় ।

বুড়ী ডালা ভরে ধান ঝারে । চ্ছরাৎ চ্ছরাৎ ডালার তালে বক বক করে যাচ্ছে । কোন কথা মুখে আটকায় । কোন কথা কটু হয়ে বেরোয় । বুড়ীর কথার ঝাঁঝে, আর পিত্ত মোচরানো কথায় জরকামুনির রক্ত রাগে টগবগিয়ে উঠে । হাতের সিয়া দ্বিগুণ ক্রোধে দুমদাম গাইলে চলে । সমস্ত রাগ সিয়ার উপর ঢালতে চায় । ধান থেকে চাল না হয়ে সিয়ার প্রচন্ড আঘাতে খুদ তৈরী হয় । মুখে হুঁ হুঁ আওয়াজে রাগের বিস্ফোরণ ঘটে ।

বুড়ী বড় খিটে খিটে । মত মেলে না, মন মেলে না জরকামুনির সাথে । জরকামুনির উদাস ভাবের মধ্যে ফোটে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের রূপ । সেইরূপ দেখে বুড়ীর রোষ দ্বিগুণ বাড়ে । মুখ খিঁচিয়ে প্যান প্যান করে বুড়ী বলে—লজ্জা সরম বলতে কি তোমার কিছু নেই ? কতক্ষণ ধরে বলছি বুড়োটাকে আনার কথা । কানে তুলো ঢুকিয়ে আছ নাকি ? ওইদিকে বুড়োটা মরুক আর তুমি বসে বৌ এর রূপ দেখে মজে থাক ।

জরকামুনি রাগে কটমট করে । শক্ত করে জবাব দেয়- আমি পারব না । বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে । নাচের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলিয়ে দাঁড়ায় । আধা পাকা এলোমেলো চুলের খোপা বাঁধে কাত করে কানের পাশে । সাপিনীর মতো ফুসে ফুসে বলতে থাকে - পার না যখন খাও কেন ? পাতে বাড়া ভাত খেতে সরম লাগে না ! কদিন পরে তো বাপ হবে । দেখো না তোমার মত দুটি জামাই এই পাড়ায় আছে ওরা কি রকম চলে । বাপরে ! বাপ এমন নির্লজ্জ মানুষ কোথাও দেখিনি । তোমার মত মানুষের কাছে জেনে শুনে কেউ মেয়ে দেয় । পরের কথাবার্তা শুনে ভুল করে মেয়ে দিয়েছি । এখন মর্মে মর্মে বুঝছি । তোমার মতো অকর্মণ্য জামাই থাকার চেয়ে না থাকা ভাল । তুমি ছেড়ে গেলে আরো অনেক জামাই পাব । মানে মানে চলে যাও । আমার মেয়ের কপালে দুঃখ আছে । মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে, ভগবান নিশ্চয়ই তার কপালেও একটা জামাই লিখে থাকবে । যে মানুষ মান সম্মানের ভয় করে না, সে আবার মানুষ নাকি ?

লজ্জায়, অপমানে, রাগে জরকামুনির মাথা বন বন করে ঘোরে। চোখে হলুদ সর্ষে ফুল ফুটে। কোমরে হাত ধরে আগুন ঠিকরানো চোখে একবার তাকায় বুড়ীর দিকে, আরেকবার তাকায় সাজেরুঙের দিকে। সাজেরুঙ নির্বিকার। এত কথা এত ঘটনা ঘটছে কিছুই যেন সে জানে না। নির্লিপ্তভাব দিয়ে যেন বুঝিয়ে দেয় আমি কোন পক্ষেই না। সাজেরুঙের এই অদ্ভুত নীরবতা কি সুবিধাবাদ না মা বাপের প্রতি মৌন সমর্থন। প্রশ্ন জাগে জরকামুনির মনে। ক্রোধে ফাটে বুক। জবাব দেয় দৃঢ় কণ্ঠে—বার বার ভাতের খুটা দিচ্ছ। আমি কি তোমাদের ঘরে ভিক্ষা করে খাই, নাকি দয়া করে এক বেলা খাওয়াচ্ছ। নিজের রক্ত জল করা কামাই খাই। কারও পাতের ভাত খাই না। আমাকে তোমরা পেয়েছ কি। রিত্রাক (মেয়েদের কাপড়) পড়িয়ে আমাকে মেয়ে বানাতে চাও? আমার মতো ছেলে বলে সব নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি। অন্য কেউ হলে বাড়ীটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চলে যেতো। যত নীরব থাকি, তোমরা মনে কর তত বেশী বোকা। ঘোড়া দেখে সব খোঁড়া হয়ে গেছ। তোমাদের নিজেদের দা, কুড়াল নিজেরা শাণ দিতে পারনা। কেন দেবে! বিনা পয়সায় গোলাম আছি সব করে দেবো, চিন্তা কি! পুরুষের কাজ, মেয়েদের কাজ কোনটা আমাকে দিয়ে করাতে বাকী রেখেছ। লাকড়ি আনতে বললে তো, লাকড়ি আনলাম, তারপর বলছ, শুয়োরের খাবার তৈরী কর! করলাম। শালাশালীদের স্নান করাও, করিয়েছি। বললে ধান কুট। কুটছি। এখন বুড়ো মদ খেয়ে পড়ে আছে, আনতে হবে। ভগবান আমাকে এতটা হাত দেয়নি, আমি পারব না। কথায় কথায় বৌ ছাড়তে বলছ। ছিদ্র খুঁজছ কি করে তাড়ানো যায়। ঠিক আছে দেখি আমারও কিছু করার আছে কিনা! এক বৌ ছাড়লে কত বৌ!

সাজেরুঙ মুখ খোলে—কি করবে মা, কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এখন নিজের কপাল নিজেই চাপড়াব। যার সরম নেই, তাকে লজ্জা দিয়ে লাভ নেই। বৌ ছাড়তে চাইলে ছাড়াছাড়ি করে দাও। এমন স্বামীর দরকার নেই। সংসারে ভাত, কাপড় কোথা থেকে আসবে একটু খেয়াল আছে? মান সম্মান সব ডুববে। কয়দিন ধরে দেখছি মনটা পাখীর মত উড়ু উড়ু করছে ওর। যেতে পারলেই যেন বাঁচে। মা, পরের ছেলেকে আটকে কি হবে। গ্রামের দশ পাঁচ জন ডেকে ছাড়াছাড়ি করে দাও। মন যদি না যায়, জোরে আটকানো যায় না। বুড়ী বলে, কী করবে বলো। পোড়া কপালে তোমার এই লেখা ছিল বুঝি। জরকামুনি সাজেরুঙের দিক থেকে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি। মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। অ, তোমার মনেও বুঝি এই রকম খেলা চলছে। আগে অনুমান করেছিলাম তবে বিশ্বাস করিনি, এখন বুঝলাম তোমারই ইচ্ছা ছাড়াছাড়ি করার। ইচ্ছা থাকে তো আগে বললে পারতে। এই জন্যই তোমরা প্রত্যেক কাজে ছিদ্র খুঁজে বিদায় করার অজুহাত বানাচ্ছ। স্পষ্টভাবে বলে ছেড়ে দাও। আমার মত অকর্মণ্য জামাই নিয়ে তোমার বরাত খারাপ করার প্রয়োজন নেই। ক্ষমতা থাকে তো ভাল জামাই আন গিয়ে। দেশে-তো আমি একা না, আরও জামাই আছে। তোমার চেহারা ছবিও খারাপ না। ভাল পাবে। আজ সপ্তাহ খানেক ধরে বলছি ছেড়ে দাও। মুখে যেমন বলো, কই ছাড়না দেখি। রাগে বুড়ী মাথা ঝাকড়া দিয়ে বলে—আমরা কোন দুঃখে ছাড়তে যাব। তুমিই তো একটা কাজের কথা বললে ঝগড়া বাধাও। অজুহাত খুঁজে ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করছ। তুমি চাইলে, এক্ষুণি যেতে পার, আমরা ছাড়তে পারব না।

কথায় আছে খেতে না চাইলে ভাত ভালো না, থাকতে না চাইলে ঘর খারাপ । কথায় কথায় পানক সাপের মতো ফুঁসে উঠছ । আসল উদ্দেশ্যটা কি আমরাও কিছুটা বুঝি ! যাও, যাও, যা খুশী করগে । বুড়ীর চোখ রেগে লাল, চিবুকটা কাঁপে থর থরে ।

জরকামুনির ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গে । চোখ ছল ছল অপমানে রাগে । দাঁত কিড়মিড়িয়ে সিয়াটা ধপাস করে উঠোনে ফেলে বলে, চললাম । এত গঞ্জনা, ঝগড়া করে থাকতে পারবো না । পুরুষ হয়ে যখন জন্মেছি বৌ এর অভাব হবে না । এক খরমের খুঁটি গেলে কত খরমের খুঁটি । কথায় কথায় খুটা, কয়টা জামাই আসে দেখি । অবশ্য মেয়েকে দিয়ে বাজার পাতানো ইচ্ছা থাকলে জামাই এর অভাব হবে না ।

উঠোনের দক্ষিণ কোণে জরকামুনির কাকা শ্বশুরের বাড়ী । বুড়ো মৃত্তিঙ্গা বাঁশের বেত চিরে চিরে সমস্ত ঘটনা শুনছিল । জরকামুনির সেই ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে ডাকে নিজের বারান্দাতে বসেই ।

অ-রাঙ্গা জামাই, রাগ করে যাচ্ছ কোথায় শুনে যাও । একটু দাঁড়াও না, বাবা । কথা শুনতে আপত্তি কি !

জরকামুনি রেগে উত্তর দেয় — যেখানে খুশী যাব, তাতে তোমাদের কি । বলতে বলতে জোরে হাঁটে জরকামুনি ।

বুড়ো মৃদু হেসে শান্তভাবে বলে – ঝগড়া করেছ তোমার বৌ আর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে । আমার কি দোষ ! আমার কাছে এসে অন্তত ঘটনাটা বলে যাও । আমি তো কোন দোষ করিনি । আর তুমি কি মনে কর, প্যান প্যান করে সারা দুপুর তোমার বৌ, শ্বাশুড়ী মিলে যে আগুনে তোমাকে পুড়িয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি ? ঐ সব আচার ব্যবহার কোনদিন ভাল লাগে না । শোন, অত গরম হওয়া উচিত না । গ্রামে লোকজন আছে । অন্যায় করলে দেখবে । রাগ সামলে একটু ধৈর্য্য ধর ।

বুড়োর কথা শুনে মন্থর হলো জরকামুনির চলার গতি । বুড়ো সমাজের একজন সমজদার মুরুব্বী । এই গ্রামে কেন পাঁচ গ্রাম ঘোরে, বিচার বৈঠকে ওজন নিয়ে বসে । বুড়োর কথা অমান্য করে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না । তা ছাড়া বুড়োর সহানুভূতি আছে জরকামুনির জন্যে । বুড়োর ঘরে কোনদিন ভাল তরকারী হলে জরকামুনিকে না পাঠিয়ে খায় না । বুড়োর ঘরোয়া সমস্যা পর্যন্ত জরকামুনির পরামর্শ নিয়ে সমাধান করতে চায় । কোন জুমের পাহাড়ে কোন ধান দেবে, কোন টীলার অড়হর রোয়াবে ছোট হলেও সবই জিজ্ঞেস করে জরকামুনিকে । সেই হিসেবে পরস্পরের প্রতি একটা নিবিড় টান আছে ।

জরকামুনি রাগ সামলে বুড়োর কাছে গিয়ে বসে । বুড়ো কোন কথা বলে না । বাঁশের হুঁকোটা শুধু এগিয়ে দেয় । আপন মনে বেত চিড়ে । জরকামুনি তামাক টানে আর সব ঘটনা বলতে থাকে । বলে বলে জরকামুনির মনের জ্বালা কমে, বিমর্ষভাব অনেক কাটে । জ্বলন্ত অঙ্গারের তাপ হারানোর মতো ।

কৌশলে বুড়ো ধীরে ধীরে বুঝায় জরকামুনিকে । বুড়োর প্রশান্ত মুখের হাসি হাসি ভাব জরকামুনিকে কেমন নিস্তেজ করে দেয় । ধীরে ধীরে বুড়ো বলে, তুমি এতো বোকা আগে

ভাবিনি । জামাই খাটা আমাদের পূর্বপুরুষের রীতি । দাদাও যেমন জামাই খেটেছে, আমিও খেটেছি । ঝগড়া বিবাদ কি কম হয়েছে ? তাই বলে কী ছাড়াছাড়ি করেছি । আমার জীবনে যা হয়েছে তোমার তার কিছুই হয়নি । জামাই খাটার সময় আমার শ্বশুর সন্দেহ করত আমি বুঝি অন্য কোথাও প্রেম করছি বলে । সে নিয়ে কত গঞ্জনা । কোন কোনদিন থাল থেকে অর্ধেক ভাত খেয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছি । কত যন্ত্রণা ভোগ করে তিন বছর সংসার করলাম আমিই জানি । শ্বশুর শ্বাশুড়ী তারা মা বাপ । বকবে, মারবে, ভালবাসবে । এতে রাগের কী আছে । সব কথাই যে উচিত বলে তাও ঠিক না । বয়স বেশী হলে কত বাজে, বাহুল্য কথা বলে সব হিসেব করে চলা যায় না । একমাত্র ঔষধ তখন নীরবতা । মেজাজ আপনা আপনি খিট খিটে হয় । সব ব্যাপারেই মানুষ বুড়ো হলে মনে করে তাকে বুঝি অবজ্ঞা করা হচ্ছে । যেহেতু তারা তখন নিশক্তি । নিশক্তির কুযুক্তি ছাড়া কি আছে । কুযুক্তি মানেই খিট খিট মেজাজ । এক ঘরে থাকলে ঝগড়া বিবাদ হবেই । মুরগা, মুরগী, শূয়োর সবাই ঝগড়া করে । তাই বলে কী ঝগড়া সারা জীবন থাকে । পশু পক্ষীও যদি ঝগড়া বিবাদ ভুলতে পারে মানুষ হয়ে তুমি পারবে না কেন । আর ওরা যে বকাবকি করে তোমার ভালর জন্যেই । ওরা কদিনই বা বাঁচবে । ওদের বকাবকি শুনে গোসা করার কি আছে । তুমি পাগলামি করছ কেন । তুমি জান না, তোমার বৌটা ছয় মাসের একটা পবিত্র ভার পেটে নিয়ে কাজ করছে । এই সময় ওর ঝগড়া কলহ উচিত নয় । অন্য কিছু যেমন তেমন এই সমস্যা এড়াবে কেমন করে ।

জরকামুনি বলে, সব বুঝি । বুঝি বলেই সব নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলাম । গোসা না করে করব কী । এত কাজ করেও ওরা সন্তুষ্ট হয় না । জান ফাটিয়ে কতদূর থেকে লাকড়ি আনলাম । বলে কিনা কাঁচা লাকড়ি । ধানের বোঝা কতদূর থেকে বয়ে আনলাম । তাও বলবে, এত কম আনলে কতদিনে আনবে । বলুন, এসব কথা সহ্য হয় । পাড়ার সমবয়সীদের সাথে বসে একটু গল্প গুজব করলেই ওদের চোখে কটকটায় ।

কাকা শ্বশুর কথা লুফে নিয়ে বলে, শোন ! শোন, জামাই যারা কাজ করে তারাই কথা শোনে । যারা করেনা তাদের বলে কয়েও লাভ নেই । তোমারও আন্দাজ আছে কে কত কাজ করতে পারে । এই পাড়ায় তোমার মতো পরিশ্রমী কজন আছে । গ্রামের সবাই জানে শ্বশুর শ্বাশুড়ী বকে যাতে আরও ঘর গৃহস্থী সুন্দর সুশৃংখল করতে পার ।

কাকা শ্বশুর এবার জোরে জোরে কথা বলে । যাতে জরকামুনির শ্বাশুড়ী, বৌ শুনতে পায় । মৃদু ভৎর্সনা দিয়ে গোটা পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করে তোলে । তোমরা বড় বেশী বেশী শুরু করেছ । জামাইটাকে মনে করেছ একটা হাতী । ওর তো কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে । ছেলেটা কি করে না করে আমরা কি দেখিনা । এক পলক বিশ্রাম পায় না । এতো ভালো ছেলে জামাই পাওয়া তোমাদের ভাগ্য । দিন রাত প্রত্যেকটা কাজে প্যান প্যান কর, ওকে যেন কার্পাসের বীজ ছাড়ানোর চড়কিতে ঢুকিয়ে পীড়ন করছে । ওই রকম আচরণ কোন ছেলে সহ্য করে ! যাক, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাও । পাড়ার লোকেরা শুনলে কি বলবে ! লজ্জা সরম একটু তোমাদের থাকা দরকার । ঘরের ভিতর বুড়ী আর সাজেরুঙ । এত বড় ঘটনার জন্য তারাও প্রস্তুত ছিল না । জরকামুনির মনে আঘাত দিয়ে বুড়ী শান্তি পায়নি । মনে একটা খোঁচা দিচ্ছিল । অনেকক্ষণ

পরে বুড়ীর অনুতাপ হয় । বুড়ী বাইরে বেরিয়ে বলে ছেলে মানুষ রাগটা একটু বেশী । সারা সংসারের কাজ ও না করলে কে করে, আর আমি কড়া কড়া বলেছি ঠিক । আরও বলব । ওকে যদি না বলি তবে বলব কাকে ? বুড়া বয়সে মন মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে নাকি । জামাই যখন বেশী কষ্ট পায় তখন কি করে দুটি ভাত ফুটিয়ে খাওয়াব এই চিন্তায় অস্থির থাকি । পান তামাক খাওয়ার অবসর পর্যন্ত পায় না । সবার জন্যই সে কাজ করে । তাই বলে মাঝে মধ্যে শাসন টাসন করব না ? নিজের ছেলের চেয়ে ওকে স্নেহ বেশী করি । মরার সময় ছেলে না থাকলে সেইতো আমাদের দাহন করবে । বুড়ীর স্বরে ছিল ঝাঁঝের সঙ্গে স্নেহকাতর আবেগ । ঠোঁট ফুলিয়ে সাজেরুঙ ঘরের ভিতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে । বুড়ী তাকে বলে, কেঁদো না মা । জামাই যখন ঘরে আসবে না, আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব । যাও ওকে নিয়ে এস । রাগে চলে গেছে । নিজে থেকে আসতে সরম পাবে । বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ঠান্ডা করে আন গিয়ে । ম্লান মুখ, থর থর করে বুক কাঁপে সাজেরুঙের । অভিমানী সুরে বলে, থাক না অত দরদ দেখাতে যেয়ো না । আমার শরীরের এই অবস্থার মধ্যে যদি ও ছেলে মানুষী করতে চায় করুক গে । ও কি শিশু ! যে অবুঝকে বুঝ দিয়ে আনব ! বুড়ী বলে সব সমান হলে চলে না গো । একজন গরম হলে অন্যজন শান্ত হতে হয় । গোঁসার সময় কে যে কখন কি করে বলা যায় না । যাও ওকে নিয়ে এসো ।

সাজেরুঙের মন আগেই যাই যাই করছিল । লোক লজ্জায় ভয়ে এগোয় নি । এবার এগিয়ে গিয়ে জরকামুনির হাত ধরে টানে । জরকামুনির মুখ রাগের চেয়ে এখন অভিমানে লাল । ঝটতি হাত ছুটিয়ে বলে যাওনা ছাড়াছাড়ি কর গিয়ে । বিষণ্ণ মুখে খুশির বিদ্যুৎ চমকিয়ে সাজেরুঙ বলে—ঠিক আছে ঘরে গিয়ে সব কিছু বলবে এখন চল । তুমি কিচ্ছু বুঝ না । আমার বুকটা ধরাস ধরাস করে কেমন ব্যথা পাচ্ছি । আর আমাকে জ্বালিও না । চল বলছি । গোঁসার সময় না করে পারে না, ক্ষুধার সময় না খেয়ে পারে না । বুড়া বুড়ী ভাল মন্দ কত কথা বলে । তোমায় শত্রুতা করে তো কেউ বকে নি । চল চল গোমরা মুখে বসে থাকা ভাল লাগে না । শরীরে যতটুকুই মানে ততটুকুই কাজ করবে । কাজ তুমি একা কর । আমরা কেউ করি না । আমার এই শরীর নিয়ে কখনো বিশ্রাম পাই ? তুমি ঘরে না গেলে আমিও বাইরে বাইরে থাকব । দেখি কতক্ষণ থাকতে পার ? সাজেরুঙের অনুরাগের কাছে হার মানে জরকামুনি । আস্তে উঠে ঘরের দিকে সলজ্জ পদক্ষেপে এগোয় ।

কাকা শ্বশুর বারান্দায় বসে মিটি মিটি হাসে, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ দুটো চোখে এক অদ্ভুত চাহনি ।

রাগ তখন অস্তাচলে । জরকামুনির হঠাৎ মনে এল ঝগড়া কলহের কলরবে সবাই বুড়ো শ্বশুরের কথা ভুলে গেছে । সেই দুপুরবেলা বুড়ো মদ খেয়ে অচেতন । এখনও আসেনি হয়ত নেশার ঘোরেই বুড়ো জরকামুনিকে ডাকছে । নয়ত আসার পথে টাল মাটাল পায়ে টীলা থেকে গড়িয়ে লুঙ্গায় মুখ থুবড়ে বেহুস । জরকামুনির মন উদ্বিগ্ন । অজানা আশঙ্কা ভরা মনে হন হন করে হাঁটে । গ্রামের শেষ সীমানায় যে বাড়ী । সেখানে বুড়ো কৌরেঙফা অর্ধমৃতের মতো হাত পা ছেড়ে বারান্দার বেড়ায় শুয়ে । জরকামুনিকে দেখেই নেশায় রাঙানো মুখে খুশীর রেখা ফোটে । কাছে যেতেই আবার নিমেষে বুড়ো রেগে অগ্নিশর্মা । কেন এসেছ ? না এলেই পারতে ! এই পৃথিবীতে

আমার কেউ নেই । পথে ঘাটে লুঙ্গায় নালায় আমি মরে থাকব । শেয়ালে শকুনে আমাকে খাক । না না । আমাকে তুলতে হবে না । আমি মারা গেলে তোমাদের আপদ চুকবে । অভিমানে বুড়োর কান্না পায় । গলার মার্কিনের গামছায় খুটে চোখ মুছে ।

জরকামুনি বুড়োকে পিঠে তোলে । হাঁটুর নীচে জোড়ায় দু হাতে ধরে হাঁটে । বুড়ো এবার শিশুর মতো জরকামুনির গলা জড়িয়ে নিজের মাথা জরকার কাঁধে এলিয়ে দেয় । চোখ মুখে সারল্যের কোমলতা । আধাবুজা চোখ মেলে চারদিকে তাকায় অপূর্ব অহংকারে । এমন অনুগত দরদী জামাই কয়জনে পায় । নেশার ভান যতটা, ততটা নয় নেশা । তবু মাথা দোলায় কচি খোকার মতো খুশীতে । যৌবনে এমনি করে কৌরঙফা তার শ্বশুরকে মাতাল অবস্থায় নিয়ে যেতো । এই রীতি রিয়াং সমাজে আজও প্রচলিত । পুরনো ধারাবাহিকতার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি । যেতে যেতে কিছুদূর গিয়ে বলে রাঙা জামাই দাঁড়াও ! পোষমানা ঘোড়ার মতো জরকা দাঁড়ায় । কৌরেঙফা পেচ্ছাপ করতে নামে । আবার পিঠে চড়ে । কখনো রাস্তায় বসে ঘাসের ডগা দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে সময় কাটায় ।

এক কলকি তামাক টানার পথে যেতে, অনেকবার দাঁড়ায় । ইচ্ছে করেই দেরী । পাড়ার লোকদের বুঝিয়ে দেয় । তার কত প্রতাপ । পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হাত তালি দিয়ে হাসে । প্রায়ই চলে হাসির খেলা । বুড়োও হাসে, মিটি মিটি । জরকামুনিও রাগের মধ্যে, ক্ষোভের মধ্যে হাসে । দুর্বল মাতাল মানুষকে পাহাড়, বন্ধুর পথ পার করানোর উদারতা বুকের দিক দিগন্তে টপকে পড়ে ।

বেলা তখন ডুবু ডুবু । শুয়োর মুরগী ঘরে তুলে সাজেরুঙ । বুড়ী খুদ কুড়ার সাথে জল কচু কেটে মিলিয়ে কাঁধের গামলায় শুয়োরের খাবার বানায় । অগ্রহায়ণের বাতাস মাতাল জুমিয়াদের ঘরের মদের গন্ধ শুকে । নিরিবিলি রিয়াং পাড়ায় গাছ গাছালির ডালে সন্ধ্যা নামে পাখীর ডাকে । বুড়ো জরকামুনির পিঠ থেকে নেমেই পা ছড়িয়ে বসে বারান্দায় ' বুড়ীকে ডাকে, শুনছো অনেক পরিশ্রম করে এসেছি । শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করছে, এক কলস লাঙ্গি মদ বের কর দেখি । পরের ঘরে মদ খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না । নিজের ঘরে এক চুমুক দিলে নেশাটা বেশ জমে ।

বুড়ীর মেজাজ চড়ে । সেই দুপুর থেকে মদ টানছো, এখনো তোমার আশ মিটেনি । ঘরে জামাইকে কত বকাবকি করেছি, কত আগুন জ্বলেছে তার খবর রাখ কি ! সব তোমার জন্য । ছেলেটা গোঁসা করে বসে ছিল, কিছুক্ষণ আগে মাত্র শান্ত হয়েছে । বুড়ো ধমক দিয়ে উঠে । অ আমি না থাকলে বুঝি জামাইটাকে কষ্ট দাও । ওকে কিছু বললে আমার সহ্য হয় না । তোমার মেয়ে আমার কাছে এক ছটাক, আর জামাই এক সের । ইচ্ছে করলে তুমি আর তোমার মেয়ে দুজনেই বেরিয়ে যাও । আমার জামাইকে নিয়ে আমরা মহানন্দে থাকব । কোন অসুবিধা হবে না ।

আমার মনের পিয়াসা মিটে গেছে । রোজ বাইরে ঘুরে ফিরে মদ খাই । কিন্তু ওই রাজা জামাই, সারা জুমের পরিশ্রম করে শরীরটা জল করছে । ওকে নিয়ে বসে একদিন মদ খাব ফুর্ত্তি করে তাও বারণ করছ । যাও বলছি এক কলস বের কর । সবাইকে নিয়ে আজ একটু আনন্দ করব । অ সাজেরুঙ ! অ সাজেরুঙ ! কই ! আজ একটা মুরগী কাট দেখি না ।

বুড়ী তখন এক কলস মাইমি চালের মদ নামিয়ে রাখে বুড়োর সামনে । হাসি মুখে বলে

ঠিক আছে। জামাইটার মন এমনিতেই খারাপ আছে। ওকে খুসী করে খাওয়াও। সারাদিন ঝগড়া ঝাটি করে রেগে আগুন হয়ে আছে।

বুড়ো বলে ফুইনাইহা (রাজা জামাই)। কিসের রাগ টাগ। তোমার শ্বাশুরী তোমাকে খুসী করতে বলছে। সারা বছর দুঃখ কষ্ট করে জুম করেছ। আজ সবাই বসে একটু আনন্দ করি।

জরকামুনি লাঙ্গির কলসে পরিমাণ মতো জল ঢালে। চিকন একটা বাঁশের নল ডুবিয়ে বুড়োর সামনে এগিয়ে দেয়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে পান শুরুর আমন্ত্রণ জানায়।

বুড়ো লম্বা চুমুক দিয়ে টানার পর বুড়ী নল মুখে নেয়। নতুন জল ঢুকে কলসের মদ আর পঁচানো ভাতে পৌছে বুদ বুদ বেরোয়। ঘরের বাতাসে মিঠে গন্ধ মাখে। বাঁশের চিহ্ন দিয়ে কে কতটুক খায় মাপা হয়। ঘরের শালা শালীরাও ভীড় জমায়। সাজেরুঙ মুরগী কেটে পালক খসিয়ে মাংস রাঁধে। জরকামুনি নল মুখে দেওয়ার আগে বুড়ো বুড়ীকে প্রণাম করে।

এক কলস শেষ। আরেক কলস শুরু। বুড়োর চোখে রঙ লাগে। চোখে নয় কেবল। রঙের তরঙ্গ মনের মধ্যেও বইতে শুরু করে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি খুঁসী ছড়ায়। কলসে জল ঢালার কলকলানীতে। সাজেরুঙও টানে। টেনে আবার বাবাকে তাকায়, মাকে তাকায়, জরকামুনির রঙিন চোখে দৃষ্টি তার ডুব দেয়। মনের কোণে কোণে এক অচিন রসের ঢেউ চ্ছলাৎ চ্ছলাৎ চমকায়।

বুড়ো শিরদাড়া সোজা করে বসে বলে ফুইনাইহা! দিনকালের কথা বলা যায় না। আজকাল পাকনা গোটা যেমন ঝরে, কাঁচা গোটাও গাছ থেকে কখন ঝরে কেউ জানে না। তোমার মতো বয়সে শ্বশুরের সামনে রোজ নাচতাম। সে অনেক দিন নিজেও নাচি না, অন্যের নাচন দেখার সুযোগ হয়না। আজ একটু নাচ, আমি মাদল বাজাব।

জরকামুনির মুখ নেশায় রক্তিম। লাজে চোখ ছল ছল। মাথা নীচু করে বলে নাচা ভালো। কিন্তু সুন্দর করে নাচতে যে জানিনা। তার উপর গুরু জনদের সামনে নাচা সে মান্য মানতার একটা প্রশ্ন আছে।

ফুইনাইহা। মান্য অমান্যের কথা নয়। নাচ গান আমরা রিয়াং সমাজের রক্তে থাকে। যে একেবারেও কোন দিন নাচেনি সেও ইচ্ছে করলে নাচতে জানে। আমার নির্দেশে নাচলে গুরুজন অমান্য হয় না। গুরুজনের প্রতি সমীহ শ্রদ্ধা বাড়ে। আর আমি নিজেই ঢোল বাজাব। লজ্জা সরমের কি আছে। বলতে বলতে বুড়ো মাচা থেকে ঢোল নামিয়ে প্রস্তুতি নেয়।

বুড়ো কৌরেঙফার মেজাজ জানে সবাই। সাজেরুঙের মা নেশার ঘোরে। বুক তার দুরু দুরু। অজানা সংশয়। কখন নেশার ঘোরে রাগে দা হাতে নিয়ে ঘরের আসবাবপত্র কুপাতে আরম্ভ করে। সাজেরুঙ নিরীক্ষণ করে স্বামীর অসহায় অবস্থা। বাপকে ওই মূহূর্তে কিছু বলার সাহস নেই। তবু মাকে বলে—পরের ছেলে কিছু বলে না লজ্জায়। তাই বলে যা খুশী করাটা কি ঠিক।

কৌরেঙ ধমক দেয়— সাজেরুঙ! চুপ কর। এখানে কে পরের ছেলে! ফুইনাইহা? ও আমার নিজের ছেলে। তোর চেয়ে হাজারগুণ ওকে ভালবাসি। ভাল না লাগলে ঘুমোও গিয়ে।

সাজেরুঙও উত্তর দেওয়ার আগেই জরকামুনি নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় । বুড়ো মাদল বাজিয়ে গান শুরু করে ।

হাঁটু আর গোরালী	তা ক্রিদি তা লাচিদি
না কাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে নাচ ।	য়াসকু য়াক তা কলই দি ।
বাঁশী ছাড়া ঢোল ছাড়া	বাচাকল সাদি
নাচন ধরে সোহাগী জামাই	খামতাং ইয়াফ মাইয়
	সুমুল সু ইরাফ মাইয়
	আনি চামারুই ফুইনাইহা ।

কোমর দুলিয়ে, ঘাড় বাকিয়ে আঙুলে ঢেউ তুলে জরকামুনি নাচে । ঘুরে ঘুরে নাচে । আস্তে আস্তে সাজেরুঙও নাচতে যায় । বুড়ো বুড়ী একসাথে গান ধরে ।

গং গং গং	ভালুক ভালুক ভালুক
খমু কতর মা	গভীর বনে একা
সাইচুং তা থাংদি	যেয়ো না ।
গংবাই ওয়াই য়াকনা	বন্য ভালুক ধরে খাবে
পাড়া কতর মা	বড় পাড়ায় একা
সাইচুং তা থাংদি	যেয়োনা কুকুর কামড় দেবে
সুই বাই ওয়াই য়াক না	ঘাটে যেমন নিঃসঙ্গ
কাতি হাবালাং	চাপিলা মাছ থাকে
নুংব থাংখে আংব তংখে	তুমি গেলে তেমনি জ্বলব ব্যথায়
পান্ত সাই লাং লাং	

আনন্দে উদ্বেলিত বুড়োবুড়ী । গানের সুরে মদিরায় রঙ মাখে । যৌবনের চলে যাওয়া দিন এই মুহূর্তে যেন ফিরে আসে নিস্তেজ দেহের শিরায় । বিস্মৃত অতীতের সুখ স্বপ্নের আবেশ বিস্তার করে ; বাড়ী জুড়ে । ঘরের মাঝখানে উনোনে পোড়া কাঠের সোনালী আংরা ধিকি ধিকি জ্বলে । সেই আলোর ছটায় মানুষগুলো যেন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সোনালী স্বপ্নের নাচে বিভোর ।

বাঘ ভালুক গহন অরণ্য ছাড়া তারা বাঁচে না । সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসা, বিরহ মিলন সর্বত্রই অরণ্যের নিবিড় আবেশের পরশ মাখা । গহন অরণ্যে যখন জুমিয়া কাজ করতে যায়, বৌ থাকে ব্যাকুল অপেক্ষা নিয়ে । দুরু দুরু বুক কাঁপে বন্য জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় । ভালুক ভালুক গানে জুমিয়ানারীর চিরন্তন বুকের ব্যথা বাজে । নৃত্যরত জুমিয়াদের পোড়া পোড়া চোখ নিস্পাপ শিশুর সারল্যে ভরা । খুশীর মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল চোখগুলোতে কোথায় যেন অরণ্যে রোদনের বিষাদ লুকানো ।

গানে আছে ভিন্ন পাড়ায় বেড়ানোর বিপদ বার্তা । আসলে জুমিয়া নারী বা শহুরে নারী যেই হোক না কেন, ঈর্ষা নামক অনুভূতি সহজাত । সংশয় থেকে আপন করা হৃদয়ে অন্য কেউ ভাগ বসায় কি না, এই সংশয় সাজেরুঙের মনের কোণেও দোলা দেয় । যেমন করে তার মায়ের

মনেও একদিন ছিল । পাহাড়ী নদীর বুকে সাথী হারিয়ে চাপিলা মাছ বড় ব্যথায় চঞ্চলা হয়ে লাফায় । তেমনি জুমিয়া নারীও প্রেমিক হারিয়ে ছটফট করে । রাতের দিগন্তহীন আকাশে গানের সুর মিলায় । কৌরেঙফার আপন ভোলা মাদল বাজে । পাহাড়ী নদীর মতো আপন বেগে পাগলপারা এই জীবনের অন্তহীন ধারাবাহিকতার পরিবর্তনও হয় না ।

আষাঢ় শ্রাবণের নিদানের দিনে সারা পাহাড়ে হাহাকার নেমে আসে । প্রতি বছরই পাহাড়ী জুমিয়াদের অবস্থা এসময় খুব সঙ্গীন হয়, অবর্ণনীয় দুঃখে কষ্টে দিন গুজরাণ করে জুমিয়ারা । কৌরেঙফা বিছানায় শয্যাশায়ী । কেঁপে কেঁপে জ্বর আসে । বাড়ীর সব লেপ কাঁথা গায়ে দিয়েও বুড়োর কাঁপুনি থামে না । সারা বাড়ীতে এক মুঠো চাল নেই । সাজেরুঙও গর্ভবতী । এই মাসেই প্রসব করার কথা । গত বাজারে বড় আব্দার করে বলেছিলো গনিয়া মাছের শুটকি এনে দিতে । বাজারে আবার শুটকির কেজি কুড়ি টাকা । এত টাকা কোথায় পাবে ? ঘরের মুরগীগুলো এই নিদানের সময় বিক্রি করে শেষ হয়েছে । বুড়োর বড় ইচ্ছে, অচাই তলবাংহাকে অসুখটা দেখানোর । তলবাংহা পয়সা নেবেনা ঠিকই কিন্তু তলবাংহা এসে অন্তত একরাত খাবে । নিজেরা মকইদানা, বাঁশ করুল খেয়ে, সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায় । কখনো কচি চিনার ফল জুম থেকে এনে কাঁচা খেয়ে কোনরকম চলে ।

অতিথি খাওয়াবে কেমন করে ? তাছাড়া তলবাংহা এসে বলবে মুরগী কেটে পূজো দিতে । মুরগীই বা পাবে কোথায় ? দুশ্চিন্তায় মাথাটা ঝিম ঝিম করে । কোন উপায় না দেখে সাজেরুঙ গলায় কাঁচা টাকার যে দুটি মালা আছে তাই এগিয়ে দেয় নিজে । এই দিয়েই কিছু টাকা যোগাড় করো ।

মালা দুটি বড় পুরানো । সাজেরুঙের ঠাকুরমার আমলের । সাজেরুঙের বাবা অনেক অভাবে উপোসে দিন কাটিয়েছে, তবু কোনদিন বন্ধক বা বিক্রির কথা ভাবতে পারেনি । রূপাতে কোন ভেজাল নেই । একেবারে কাঁচা রূপা । সাজেরুঙের চোখ থেকে উষ্ণ দু ফোঁটা জল জরকামুনির হাতে টুপ করে পড়ে । বুড়ো গোঙাতে গোঙাতে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলে, কি করবে ? জীবন বাঁচলে মালার কাজ । জীবনই যদি না থাকে মালা নিয়ে হবে কি ? জীবন থাকলে কত গয়না আসবে যাবে । যাও, ফুইনাইহা, দুঃখ করে লাভ নেই । বন্ধক দিলে চারশো টাকার মতো পাবে সে দিয়েই সংসার চালাতে হবে । তার উপর, সামনে একটা বিপদ আসছে এজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে । কয়েকটা মুরগী, একটা শুয়োর লাগবে । আগে থেকেই ঘরে রাখা ভালো ।

জরকামুনি গঙ্গানগরে যতীন সাহার গদীতে বন্ধক দিয়ে চারশো টাকা পায় । তাই দিয়ে খরচ পত্র নিয়ে আসে ।

এক গভীর রাতে সাজেরুঙের প্রসব ব্যথা শুরু হয় । জরকামুনি তাড়াতাড়ি বাঁশের চোঙে সলতে ভরে ধরিয়ে অচাই তলবাংহাকে ডাকতে যায় । সঙ্গে শ্যালক লাফারায় । তালবাংহা এসেই, টং ঘরে ঢুকে কিছু তেল চেয়ে নিয়ে মন্ত্র পড়ে সাজেরুঙকে দেয় । সাজেরুঙ সারা পেটে সেই মন্ত্রপুত তেল মাখে ।

তলবাংহা কখনো মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে । 'হে বুড়া মা দেবতা । জঠর বন্দী, এই অনাগত শিশুকে মুক্ত আকাশের নীচে এই খোলা হাওয়ায় পৃথিবীতে সুস্থভাবে এনে দাও । সন্তান যেন পঙ্গু

না হয়, তলবাংহার মন্ত্র পাঠ শেষ। অনাগত শিশুর মতো রাতের জঠরে ভোর ছটফট করে ঘুম জড়ানো পাখীর ডানায়। তেল দিয়ে মন্ত্র পাঠের সময় একটু আরাম লাগছিল। প্রসব বেদনা থমকে থমকে বাড়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ খিঁচিয়ে সাজেরুঙ গোঙায়। সারা দেহ দলিয়ে বাঁকিয়ে উঠে প্রসব আকুলতায়। জরকামুনি সহ একজন ধাই শুশ্রূষায় ব্যস্ত। অনেক পরেও শিশু খালাস হয় না। তলবাংহা চিন্তমগ্ন। এত যন্ত্রণা পাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে মনে মনে। চোখে কৌতূহল আর সহানুভূতি। কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে বিড়বিড়িয়ে। সাজেরুঙের কানের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করে।

দশ মাসের ভিতর কারো কোন আদা হলুদ চুরি করেছ? বেদনাকাতর মুখ নেড়ে সাজেরুঙ উত্তর দেয় — না।

ভাল করে স্মরণ করে দেখো, গর্ভ অবস্থায় আদা হলুদ চুরি করলে শিশুর হাত পায়ের আঙ্গুল বা কোন অঙ্গ বাড়ে। তাতেই কিন্তু প্রসবে কষ্ট বাড়ায়। কিছুক্ষণ থেমে তলবাংহা আবার বলে গর্ভিণী হলে মেয়েরা টক তেতুল স্বাভাবিক ভাবেই ভালোবাসে। কিন্তু প্রসবের কদিন আগে যদি টক খেয়ে থাক তাহলে কিন্তু ফুলে পেঁচিয়ে শিশুটা বের হতে সময় নেবে। রক্ত জল হয়ে চাপ কম হয়।

এবার কিন্তু সাজেরুঙ নিরুত্তর। ফ্যাল ফ্যাল করে সম্মতি জানায়। ত্রুটি নির্ণয়ের গৌরবের ছটায় মৃদু হাসে তলবাংহা। সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে—ঠিক আছে, বেশী কষ্ট আর পাবে না, এক্ষুনি নদী দেবতার পূজো দিয়ে তোমাকে শান্তি দেব। সাজেরুঙ যেন আশ্বস্ত। তলবাংহার নদীপূজোর উপর গভীর বিশ্বাস। তবু যন্ত্রণা চেপে ঠোঁট কামড়ায়।

নদীর পূজো দিতে গেল তলবাংহা। মোরগ কেটে মন্ত্র পড়ে। মুরগীর পেছনের নাড়ি কেটে টেনে লম্বা করে বের করে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাড়ির দিকে। নাড়ির রঙ, আকার, সূক্ষতা, আর রক্ত দেখে বোঝে গর্ভিণীর যন্ত্রণার কারণ। কতক্ষণ সময় নেবে। শিশুটা ছেলে না মেয়ে। আয়ু কেমন দীর্ঘ। সকালে জন্ম নিলে আয়ু হবে দীর্ঘ। সন্ধ্যায় জন্ম নিলে আয়ু সংক্ষেপ। দীর্ঘ সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নদী থেকে তলবাংহা এলো। মুখে ছড়ানো আবিষ্কারের নতুন খুশী। এসেই বলে চিন্তার কারণ নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান জন্মাবে। আয়ু দীর্ঘ হবে। সন্তান হবে মেয়ে।

কিছুক্ষণ বাদে সূর্য উঠার সাথে সাথে জন্মালো একটা ফুটফুটে ছেলে।

কুমায়ুক মানে ধাই। কুমায়ুক নাভি থেকে ফুল কাটে ধারালো বাঁশের পিঠ দিয়ে। ফুল নিয়ে জরকামুনি সহ গেল গভীর বনে। দুটি বাঁশের খুটি পুঁতে ঝুলিয়ে রাখে ফুল। ফুলটা মাটিও ছোঁয়নি, বেশী উঁচুতেও থাকে নি। কারণ বেশী উঁচু হলে নবজাতকের জীবনে তুফান আসবে অনেক। আর যদি মাটি ছোঁয়। পিঁপড়ে ধরতে পারে পিঁপড়ে ধরলে চর্মরোগে ভুগবেই। কুমায়ুক ফিরে এসে এক কলস মদ দিয়ে হাত ধোয় ভাল করে।

এক টুকরা কাঁচা হলুদ, একটা ভাঙা ঝাড়ুর কাঠি সাজেরুঙের খোপায় গুজে দিল তলবাংহা। নাহলে বুড়াসা দেবতার নজর এড়ানো যাবে না। গলগলে রক্ত স্রাব থামবে না। রক্ত যদি মাথায় উঠে পাগলও হয়, মারাও যায়। কাঁচা প্রসূতি দেখলে বুড়াসা দেবতা রেগে উঠে।

তলবাংহার নির্দেশে স্তনের প্রথম দুধ বুড়াসাকে অর্পণ করে সাজেরুঙ । সারা দেহ ক্লান্ত, ফ্যাকাশে । শরীরের উপর অনেক ধকল গেছে । স্তনের অমৃত আঙুলে সিঞ্চন করে বুড়াসার উদ্দেশ্যে মাটিতে ফেলে । বিস্ময়, আনন্দ শিহরণের সাথে লাজের ছিটা মাখানো মুখটায় লাগে অদ্ভুত ঝলকানি । তলবাংহা ঝাড়ু, হলুদ স্তনের উপর মৃদু বুলায় । কলুষ বাতাস, অশুভ দৃষ্টি আর ভয়াবহ রোগের পরশ থেকে যাতে নবজাতকের অমৃত ভান্ড রক্ষা পায় । আরও নির্দেশ দেন তলবাংহা সাজেরুঙকে, শিশু ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলে যেন ন্যাকড়ায় আগুন ধরিয়ে বাইরে যায় । তলবাংহা হাসি খুশী । বারান্দায় তামাক টেনে বুড়োদের গল্পের আসর । তলবাংহা এক কলস লাঙ্গি মদ রাখে আসরের সামনে । সবাইকে প্রণাম জানিয়ে বিনীত কণ্ঠ বলে—ভুল ভ্রান্তি মানুষেরই হয় । বয়স বাড়ার সাথে সাথে আগের মতো সব মন্ত্র মনেও থাকে না । বলেছিলাম মেয়ে জন্মাবে । কিন্তু জন্মালো ছেলে । অবশ্য দশের কৃপায় বাকী কথা ঠিক ঠিক মিলেছে । এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য এক কলস মদ দিয়ে ক্ষমা চাইছি ।

পাড়ার মোড়ল মুরুব্বীরা ক্ষমা করার ভঙ্গীতে ঈষৎ মাথা নীচু করে । টটর ! টটর ! টটর তামাক চলে পরিবেশকে ঘরোয়া করে ।

বাঁশের নল কলসে ডুবিয়ে চুমুক টানে কেউ । কেউ আবার ঢেকুর তুলে । সবাই তবু চিন্তামগ্ন । শিশুটার কি নাম হবে ? কেউ বলে হরণজয় । কারো প্রস্তাব নামটা হোক লংকারায় । কারো মতে এবার প্রচুর বৃষ্টিপাতের বছর, তাই ওয়াতিরায় নামটা মানায় ভালো । ঝিনুক খোলা মুক্তার মতো চোখ । মুক্তারাম মন্দ হয় না । এমন সময় কুমায়ুক (ধাই) বুড়ী এলো বাঁশের হুঁকো টানতে টানতে । নিজে নিজে আপন মনে নাম খুঁজে পেয়েছে । জোর দিয়ে সব কথা এড়িয়ে বলে—না না, নামটা হবে রাংথাংহা । এই শিশুর জন্ম হচ্ছে ওর ঠাকুরমার রূপোর মালা বন্ধক দিয়ে । রাংথাংহা মানে রূপাহারা । সবাই সায় দেয় মাথা নেড়ে । যে যাই বলুক নাম চূড়ান্ত অনুমোদনের দায়িত্ব রিয়াং সমাজে কুমায়ুকের কাছে ।

নাম রাখার পালা শেষ । এবার বেইবুনামা অনুষ্ঠান । নবজাতকের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেবদেবীর কাছে মঙ্গল কামনার উৎসব । জরকামুনি অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত । চার টুকরা ফালা ফালা বাঁশের আগায় তুলা গুঁজে হাড়ির কালি মাখে । কালি মাখতে গিয়ে নবজাতক শিশুর দিকে এক ঝলক তাকায় । চোখে চোখ সাজেরুঙের । নিমেষে অদ্ভুত এক আনন্দ শিহরণ দুজনের মধ্যে বিবশ করে সঞ্চালিত হলো ।

উঠোনে তলবাংহার নির্দেশ মতো এক পংতিতে পুতে বাঁশের টুকরা । পংতির পাশে বুক চিতিয়ে পাতে আর্ধেক বাঁশের ফালা । চারটা মাটির ঢেলা রাখে । চারকোণা বেতের তৈরী থালাকে বলে য়ামফ্রাক মাইরাঙ । সেই থালায় আবার কলাপাতা । উপরে এক মুঠো ভাত । থালার চারপাশে সাতটা পাতার বাটিতে সাত মুঠো ভাত ছড়ানো ।

সাত বোনের পাহাড় নিয়ে এই পৃথিবী । সাত বোনকে স্তুতি জানালেই মানুষের কল্যাণ । আদি কালে রিয়াং জাতির বাস ছিল উত্তর পূর্ব পাহাড়ের শিখরে । বর্তমানে যা এখন বাংলা দেশের মায়ানী রিজার্ভের অংশ । উত্তর দিক থেকে বহমান অজস্র ছোট ছোট পাহাড়ী জল স্রোতের মতোই বহমান তাদের বংশ ধারা । দিগ থেকে দিগন্তে বিস্তৃত । যে সব নদী, পাহাড় পথে পথে কোলে নিয়ে

রিয়াং সমাজকে লালন পালন করেছে, তারাই এখন দেব দেবী। মানুষ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে জীবন শুরু হয় পাহাড় আর নদীর বন্দনা গানে। নবজাতক দোলনায়, সাজেরুঙ আরাধনায় মগ্ন। তলবাংহার চোখ দুটি নিশ্চল অথচ জ্বলজ্বলে। কপালের বলিরেখায় ফোটে দুর্বোধ্য অক্ষরে রিয়াং সমাজের বিস্মৃত ইতিহাসের এলোমেলো অতীত। কখনো গানের সুরে কখনো পাহাড়ী নদীর কলকলানির মতো অপূর্ব ছন্দে। সুরের আবেশে সমস্ত নদী যেন থমকে দাঁড়ায়। নদীর খরস্রোতা তরঙ্গ রূপসী দেবী হয়ে এক এক পা এগোয় নবজাতককে আশীর্বাদ করতে। তলবাংহার মন্ত্রধ্বনিতে ঘোষিত হয় জীবনের প্রথম সকালের কোন মঙ্গল শঙ্খ।

যাযাবরের মতো মানুষ পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটছে অনাদিকাল হতে খাদ্য আহরণে। নদীর উপত্যকায় পাহাড়ের ঢালুতে, কখনো নদীর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত উঁচু নীচু গহন বনভূমির বিচিত্র পশু পাখীর কলরব মুখর পরিবেশে চলছে জন্ম মৃত্যু, উৎসব বিপর্যয় সংসারের যত রকম খেলা। মানুষ জন্মেছে, মরেছে, কিন্তু কর্ণফুলী নদী এখনো বহমান পাহাড় বিধৌত শাখা প্রশাখা হাংগারী, বাংবারি, নাকাটি, কাংসারী, সনতুই ক্রাককুই, খেরওয়াই। এই সাতটি ধারার স্রোত নিয়েই জীবনের উৎসব মন্ত্র আজও উচ্চারিত। তলবাংহার উচ্চারিত মন্ত্রে সাত নদী, সাত পাহাড়ের কাছে মানুষের ঋণ, মানুষের কৃতজ্ঞতা বারে বারে ধ্বনিত।

আমা কাংসারী	খ্রে বাইসনি
আমা নাকাটি	খ্রে সুং গায়ে
আমা বাংবারি	রমদালি কাহামবাই
আমা হাংগারি	মাইদালি কাহামবাই
আমা সনতুই	চামুং রিঅ
আমা ক্রাকতুই	চামুং রিগায়ে
আমা নারওয়াই	নুং মু রি গায়ে
আমা খেরওয়াই	নি শা হাকরাই
নুকখা সালুলোবা	দ কালাভবারে
নুকখা হলুলোবা	থু লঙ ফু অ
তক বুলুক সানি	দশা খেমলে
তক খে গায়ে	য়াক খিল্
মাকু মাইসানি	কুং ফাং
ওয়াক খে গায়ে	ভাইং ফেইবা
খান্দ দশানি	থু তঙফু অ
খান্দ সুক গায়ে	দশা খে মাইয়া
কলম কমবুরুই	কাটি তুইয়ারী
কলং ক ই গায়ে	তুইতাম তঙফুঅ
হাদু দু বুরুই	দশা খে মাইয়া
হাদু ব গায়ে	

মা কাংসারি—
পায়ে পায়ে আনন্দ মধুর
ঝনন ঝনন বাজে কাসার ঘুঙুর ।।
মা নাকাটি—
ঝিলিমিলিঝিলি / আঁকাবাঁকা
রূপে রূপে অপরূপ রূপা ।।
মা বাংবারি—
টলোমলো তটিনী তোমার
শোভে অনুপম উপহার ।।
মা হাংগারি —
দু কুলে ছড়ায়ে কালো কেশের, মাধুরী
তৃষিত হৃদয়ে দিয়েছো অমৃতবারি
মা সনতুই —
উড়ু উড়ু বুক জুড়ে
কৃষ্ণনীল ওড়না ওড়ে ।।
মা ক্রাকতুই —
উদাস সুরে বাঁধন হারা
আপন বেগে পাগল পারা ।।
মা খেরওয়াই —
তরঙ্গে তরঙ্গে অপরূপ নেশা
সোহাগ বিধুর ভালোবাসা ।।
দেখেছি ভোরের মাটী, মায়াবী বাতাস
অস্তাচলে আবীর আকাশ
দীনজন আমি, মুরগী দিব হে কেমনে ?
বুলবুলি দিনু, লহো খুশী মনে ।।
চোখে পানি, থালে ভরা ভাত
ভোজন করিয়া নদী, কারো আশীর্বাদ ।।
শূয়রের মাংস দেবো, সাধ্য নেই মম
অর্থহীন, দীন আমি, দরিদ্র অক্ষম ।।
কচি করুলভোজী সেবুগে ইদুর
খেতে দেব আজ হে মধুর ।।
সম্মুখে জ্বলিছে তব সমুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা
শিশুপ্রাণে জ্বালো অনন্তপ্রদীপ শিখা ।।
হাঁটি হাঁটি পা পা চলন জানে না

সম্মুখে আবার ঢালু পাহাড়, আঙিনা ।।
পিচ্ছিল পতনে কোলে নিও তারে
মুছে দিয়ো তার ব্যথা সোহাগ-আদরে ।।
প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসাও মাটির ঢেলা
সোনার ফসলে ভরো সন্তানের থালা ।।
খুশি মনে তুলে নাও এই স্বর্ণবাটি
সোনার ফসলে সন্তানের গৃহ করো পরিপাটি ।।
টং ঘরে বড়ো খাড়া ওঠার সিঁড়িটা
মচকালে হাতে পায়ে দিও মোরে ওষুধ, ঈশিতা ।।
টাক্কলের খেলা পাহাড়ী শিশুর সাজে
ভয়হীন, প্রেরণা জাগায় সর্ব কাজে ।।
অবগাহনের ঘাটে কখনো তলায় যদি পাহাড়ী ছড়ায়
মুমূর্ষ শিশুকে বাঁচাও তোমার করুণাধারায় ।।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত । অচাই তলবাংহা ঘরের ভেতরে উঠে । তাকে ঘিরে পাড়ার লোকদের ভীড় । কেউ ভীড় জমায় প্রসূতির পাশে । নবজাতকের রূপ দেখে । মাংস, মদ, ভোজের সমারোহে বাড়ীটা গমগম । জরকামুনি কৃতজ্ঞতা ভরে এক কলস মদ অচাই তলবাংহার সামনে রেখে প্রণাম জানায় । মদের কলসে বাঁশের নল ডুবিয়ে টানে তলবাংহা । দেবদেবীরা সন্তুষ্ট কিনা তারই শেষ বর্ণনা চলতে থাকে ।

আকাশের কাছাকাছি উঁচুতে খমু পাড়া । খমুলুং থেকেই খমু পাড়ার নাম । খমুলুং মানে গহন বন । আম, কাঁঠাল, জাম্বুরা, গামাইর, চামল, কড়ুই গাছের শাখা প্রশাখায় গলাগলি পাহাড়ী কুঞ্জ । উঁচু হলেও পাহাড়টা বিস্তৃত সমতল । সারি সারি বাড়ী । শূয়োর মোরগের কলরবে উঠানগুলো মুখর । কোথাও মেয়েরা গাইল সিয়া দিয়ে ধান ভাঙে । কেউ আবার চরকা দিয়ে সূতো কাটে । কেউ বা মেলানো তাঁতে আপন মনে কাপড় বুনে । টং ঘরের বারান্দায় বসেই দেখা যায় পশ্চিমে ছড়ার বাঁক । দুখিনী কোন জুমিয়া নারীর চোখের জলের মতো তির তির করে বইছে নিঃশব্দে নীরবে । ছড়া পার হয়ে পশ্চিমে দুটো টীলা পার হলে পঞ্চজয় পাড়া । দক্ষিণে আবার টীলা ডিঙিয়ে গেলে আঁকা বাঁকা পথের পাশে বৃক্ষরাম পাড়ার বিশাল উঠান । উত্তরে অনেক দূরে ঝাপসা করে টীলার ঢালুতে বেড়ায় টাঙানো ভরত পাড়ার কাপড় চোখে ভাসে ।

খমু পাড়ার মাঝখানে বিরাট এক বুড়ী বট । গাছের ছায়ায় আসতে যেতে সবাই বসে গল্প করে । গাছটা কতদিনের পুরনো কেউ জানে না । বট গাছের পাশেই জরকামুনির শ্বশুর কৌরেঙফার বাড়ী । বটের ডালে দোলানো দোলনা । সাজেরুঙ তার ছেলে রাংথাংহাকে দোলনায় শুইয়ে ঘুম পাড়ায় । পাখীর ডাকে রাংথাংহা চমকে চমকে ওঠে ঘুম থেকে । সাজেরুঙকে বড় জ্বালায় ছেলেটা । সংসারে কাজকর্ম একেবারেই করতে পারে না ।

সাজেরুঙের নিজেরই যেন খেলার সাথী ওই ছেলেটা । কখন হাসে । কখন লোক চিনে । কখন কি খায় সেই গল্প বলে পাড়া বেড়ায় । পিঠে কাপড় বেঁধে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করলেও

রাংথাংহা ঘুমোয় না। দোলনা ঠেলে ঘুম পাড়ানী গান গায় সাজেরুঙ। গানের সুর থামলেই চোখ খোলে। সাজেরুঙ গেয়ে যায় হাজার বছরের প্রচলিত সেই ঘুমপড়ানী গান।

থুইয়া তা তঙজাদি	না ঘুমিয়ে থাকো না
আমি কাকাক্ মা	বুনো বিড়াল
তাওয়াই ফাইজাদি	কামড় দিয়ো না
আইনি গাদু হা	আমার খোকা,
থুইয়া তা তঙজাদি	না ঘুমিয়ে থাকেনা
তাউলেঙ গুরদামা	বনচিল আর এসো না।
র-অ তা ফাইজাদি	খোকা আমার—
পাড়া বাই চিংঅ	না ঘুমিয়ে থাকে না।
নারোয়াই ফাই পাইয়ো	পাড়ার কোণার ঘরে
থু-ইয়া তা তঙজাদি	অচিন অতিথি।
মুখাং রাংদে কিতিং হালে	আমার খোকা
রাং কুরুই ফ হাথি অংমাইনাইসে	না ঘুমিয়ে থাকে না
মুখাং তালদেই কুফুই হালে	মুখটা খোকার রূপার মতো
থুইয়া তা তঙজাদি	মুখ দেখিয়ে সওদা করা যেতো
আইনি পাদুহা ত তেখে	চাঁদ যেন দোলনায় দোলে
তাঙিয়া মাইখালে	খোকা আমার না ঘুমিয়ে থাকে না
চালাই পাইনি	আমার খোকা বড় হবে
গেবেং খুফালি	আমায় রাখবে সুখে।
রুংলাই পাইনি।	কাপাস আনবে ঘর ভরে
ক্মং মাইরুবাম	থাকবে থরে থরে
সাংলাই পাইনি	ধান জমবে গোলা ভরে
গেবেং ফা খুলাই	ধানের চূড়ায় মারুল ফুরে।
কতর লা পাইনি	দ্বিগুণ হবে মারুলে তীরে
ক্মঃ খুং সুরুই	উঠবে টুলী আকাশ জুড়ে।
লকলাই পাইনি	যত কুটুম ছড়িয়ে আছে
	খুঁজে খুঁজে আনবে কাছে
যাতি মাইদেই	আমার খোকা—
সিথুং লাইনি	ধান জমানোর ঝাড়ু যেমন
যাতি খুলদে	কুটুম যত করবে আপন
খথং লাই পাইনি	পাহাড় থেকে আনে যেমন
য়াফাই মাই খালাই	কাপাস ভরা খাড়া।
খে-লায়ে পাইনি	লাউ ভরা জল

য়াফাং তুই তুইলাউ	ঘর ভরা ধান
খে লাই পাইনি ।	খাবে দাবে সব
	মোদের জাতি মোদের কুটুম ।

ঘুম পাড়ানী সুর খমু পাড়ায় ঘুমের আমেজ আনে । হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসে মৃত্যুর বার্তা । প্রথমটা বুঝেনি সাজেরুঙ । উৎকর্ণিত হয়ে শোনে —

কেকাতা দাং দাং
কেকাতা দাং দাং
দাইন দাং চুলুক
দাইন দাং চুলুক
কেকাতা দাং দাং
কেকাতা দাং দাং

এমন সময় পাশের বাড়ীর বিধবা মেয়েটা, লোকে যাকে দরণ মা বলে ডাকে, সে খবর দিল সাজেরুঙকে, তোমার স্বামীর বন্ধু বিশ্বরাম মারা গেছে। সকালে ছন কাটা থেকে ঘরে ফিরে এক দুবার দাস্ত হয়েছে একটু জ্বর ছিল গায়ে । হায়রে হায় কচি যুবকটা চলে গেল । আমার মতো দুঃখিনীকে বুঝি ভগবানেরও অরুচি হয় । বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে সাজেরুঙের । যখন পাড়ায় কেউ মরে অমন তালেই ঢোলক বাজে ! ঢোলকের সাথে বাঁশীর করুণ সুরে সারা পাহাড় কেমন যেন বিবশ । সাজেরুঙ চট পট শিশুটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে । বিস্ফারিত চোখে ছোটে ঘরের দিকে । ঢোল, বাঁশী আর কান্নার মিলিত রাগিনী দূর থেকে দূরে মিলায় । পঞ্চজয় পাড়া, ভরত পাড়া, বৃক্ষরাম পাড়া থেকেও লোকজন আসে মরার বাড়ীর দিকে । চোখের সামনে বিশ্বরামের মুখটা বার বার ভাসে ।

নিজের টং ঘরে চাল রাখার মাচার পাশে শিশু বুকে নিয়ে লুকায় সাজেরুঙ ! সেখানেও গ্রাম পাহাড় গাছ গাছালি পার হয়ে মৃত্যুর মূর্ছনা তাকে বিহ্বল করে । কৌরেঙফা সহ জরকামুনি দু'জনে গেছে মরার বাড়ী । সাজেরুঙের মা-ও গেছে সেখানে । কখন আসবে জানে না । একমাত্র ছোট ভাই লাকারায় পাহাড়ে ছন কাটতে গেছে । ফিরতে ফিরতে বেলা ডোব !

যত সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে ঢোলকের রাগিনী তত স্পষ্ট । সঙ্গে পাহাড় জুড়ে অনেক নারী পুরুষের মিলিত কান্না । রাতভর চলে দাং দাং কেকাতা দাং দাং । রাতে জরকামুনি ঘরে আসে । বন্ধুর জন্য আফশোষে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস । ঢোলকের শব্দে ঘুম আসে না । কেউ মারা গেলে সারারাত ঢোল, বাঁশী বাজানো রিয়াং সমাজের রীতি । বিষণ্ন বাঁশীর সুর খমু পাড়ার ঘুম কেড়ে নেয় । বিষাদে সংশয়ে শিহরণে স্তব্ধ খমু পাড়ার মানুষ । নিঝুম রাতে ঝি ঝিঁ পোকার কান্না, কখনো নিশাচর পশুপাখী চলাফেরায় শুকনো পাতা মর্মরিত । সাজেরুঙের মা রাতভর আগুন জ্বেলে জেগে থাকে । বুড়োও ঘুমায়নি, বাঁশের হুঁকোয় টটর টটর তামাক টানে ।

ভোরের রাঙা সূর্য ওঠে আকাশে রাতের কান্নায় ক্লান্ত লাল চোখের মতো ! বেলা বাড়ে । বাড়ন্ত বেলায় ঢোলের রাত জাগরণী বোল পাল্টায় । দাং দাং কেকাতা দাং দাং ছেড়ে তক্‌খুমা তাউক্ ! তক্‌খুমা তাউক্ ! খমু পাড়ার মানুষেরা এই নতুন বোলের অর্থ মরাকে শ্মশানে আনার

ধ্বনি বলেই বোঝে। ছড়ার পাড়ে নদীর চরে সাজানো হলো কাঠের লাকড়ির চিতা। সাজেরুঙের বাড়ীর টীলা থেকে সব দেখা যায়। সাজেরুঙ অসহায় ভীত দৃষ্টিতে কোলে শিশু নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

স্তরে স্তরে লাকড়ি। ছয় স্তরের উপর শবদেহ। তার উপর বিশ্বরামের শবদেহ। সদ্য স্নাত দেহ নতুন কাপড়ে সাজানো। মুখটায় তখনো সজীবতা। জরকামুনি বন্ধুর মুখখানি শেষবারের মতো একবার দেখে। জামাই খাটার সময় বিশ্বরামই তার পরমবন্ধু। যার কাছে বসে সুখ দুঃখের কথা বলতো। যে বুঝতো দরদ দিয়ে জরকামুনির হাসি খুশী দুঃখ বেদনা, অভিমান ভালোবাসার প্রতি মুহূর্ত। পেছনে ফেলা দিনগুলো জরকামুনির ছবি হয়ে ভাসে। বিশ্বরামের মা কেঁদে কেঁদে পেছনে আসে পথে পথে তিল কাপাস মুঠো মুঠো ছিটিয়ে।

নদী, নালা বা ছড়া পার হওয়ার সময় সুতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়ায়। সামনে আবার সাদা মারকিন কাপড়ের ঝান্ডা পত পত উড়িয়ে শবদেহের মিছিলে চলে জরকামুনি। সে পতাকাটা শ্মাশানের পাশে মাটিতে পোঁতে। বিশ্বরামের মা এক স্তবক ফুল শবদেহের মাথায় রাখে। মৃতের থুতনি ধরে শেষ সোহাগের মূর্ছনায় ভেঙ্গে পড়ে। বুক চাপড়ায়। বালুচরে গড়িয়ে গড়িয়ে এলোমেলো চুল ধরে ছিড়ে প্রলাপে বিলাপে উন্মাদিনী।

সপ্তম স্তর লাকড়ি সাজানো হলো মৃতদেহের উপর। দাউ দাউ জ্বলে চিতার লেলিহান শিখা। মরা পোড়া গন্ধে বাতাস ছোটে হু হু করে। শ্মশানের ধোয়া কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশের স্বর্গের কাছে ওঠে। প্রকান্ড বাসুকী যেন উদ্যত ফণা তুলে ছোট এই খমু পাড়াকে গিলতে আসে। ধুম্রজালের পেছনে খমু-পাড়ার বিষণ্ণ মানুষগুলো। ভয়ে কাঁপন ধরা কাতর মুখ চোখে গভীর আশঙ্কার ছায়া। চিতার আগুনের বিশাল বুকে লকলকে আলিঙ্গনে বিশ্বরামের দেহটা যেন নিবিড় ঘুমে অচেতন।

মরা পোড়ানো শেষ। জ্বলন্ত অঙ্গারে তপ্ত শ্মশান ভূমি। বিশ্বরামের মা সহ প্রিয়জনরা সবাই জল ছিটায়। তবু শ্মশান ভূমি ঠান্ডা হয় না। এ যেন বিশ্বরামের মায়ের বুক দহন জ্বালায় দগ্ধ। জল সেচে ঠান্ডা করার চেষ্টা হচ্ছে। জরকামুনি আর অন্য যুবকরা তখন সিমালুং নক বানায়। শ্মশান ঘর। উঁচু মাচার উপর ছোট টং ঘর। মৃতের প্রাণ নাকি সেখানে বিশ্রাম করে। মৃতের অস্থিও ঝুলানো থাকে সেই সিমালুং নকে। কেউ সিমালুং নক একদিনে শেষ করতে পারে। কেউ আবার পারেও না। যারা পারে না তারা অন্তত আরম্ভ করে রাখে। জরকামুনিদের কিন্তু একদিনেই সিমালুং নক শেষ। সিমালুং নকে মৃতের উদ্দেশে সপ্তাহে একবার চোঙে জল পাতায় ভাত দেওয়ার রীতি। হারানো মানুষের স্মরণে এমন করেই স্বজনরা জল, ভাতের সাথে দু ফোটা চোখের জলও উৎসর্গ করে।

সিমালুং নকের মাচা পুরু নরম মাটি দিয়ে লেপা। পরদিন জীব, জন্তু, মানুষ, পাখী ইত্যাদির পদ চিহ্ন খোঁজে প্রিয়জনরা। আবিষ্কার করে বোঝে সেই প্রাণ কোথায় গেল। যে পাখীর চিহ্ন মিলে সেই পাখীর ডাকেই প্রিয়জনের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। মানুষের চিহ্ন দেখলে কেউ আবার বুক চাপড়ে কেঁদে বলে বৌদির ঘরে জন্ম নাও বা দিদির ঘরে জন্ম নিয়ো।

বিশ্বরামের মা পরদিন সিমালুং নকের কাঁচা মাটিতে আবিষ্কার করে চিলের নখের

আঁচড়। পা ছড়িয়ে ছড়ার পাড়ে বসে বিলাপ করে । নির্জন দুপুরে হরিণের শিঙের মতো পাতাহীন ধুসর ডালে বসা চিল দেখে বুক তার আরও ফাটে । উড়ে উড়ে কেঁদে কেঁদে আকাশ মুখরিত চিলের ডাকে । মায়ের ব্যথায় যেন খমু পাড়ার দুপুর ম্লান বিষণ্ণ । অচেনা, গভীর, অদৃশ্য দূরত্ব থেকে অচিন আহ্বান কাকে যেন ডাক দিয়ে যায় চিলের নিঃসঙ্গ গানে, দুঃখময় সুরে । খমু পাড়ার বাসিন্দারা উঁচু টীলা থেকে বুড়ীর বুক ভাঙ্গা হাহাকার যখন শোনে, তখনি আবার বেজে উঠে খমু পাড়ার বটগাছের পাশে

দাং দাং কেকাতা দাং দাং
দাং দাং দাং চুলুক দাং দাং ।

সর্বনাশী মাদল বোলে খমু পাড়ার বাসিন্দাদের বুক দুমড়ে মুচড়ে খান খান । এই গ্রামের অসহায় বিধবা দরণ মা-র সাত বছরের ছেলে নলজয় মারা গেছে । নলজয় ছিল ওই বিধবার নির্ধনের ধন । ভোরের দিকে দাস্ত বমি শুরু । দুপুরে মৃত্য । হঠাৎ নলজয়ের অকাল মৃত্যুতে খমু পাড়া কেমন যেন ভীত, বিস্মিত । নলজয়ের মৃত্যুর অনুষ্ঠান শুরু হলো । অনুষ্ঠানের সব দায়িত্বই প্রায় জরকামুনির । জরকামুনি প্রতিবেশী যেহেতু । আর কেই বা আছে ওই অসহায় বিধবার ।

চুল ছেটে মৃতদেহকে গরম জলে স্নান করালো জরকামুনি । বাড়ীর মধ্যে শুইয়ে রাখে নতুন কাপড় পরিয়ে । জরকামুনির শ্বশুর কৌরেঙফা এল প্রাণহরণকরী কালো বুড়াসা দেবতাকে অভিশাপ দেওয়ার অনুষ্ঠানে । যে দেবতা নিষ্ঠুর হাতে প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তাকে অভিশাপ দেয় গ্রামের বুড়ো মানুষ । একটা মুরগী ধরে আছড়ে আছড়ে মারে । আছাড় দেওয়ার সময় বলে

ব-ন অন্যায় খেইয়ে তুইনাংনাই	যে অন্যায় করে প্রাণ হরণ করে
ব-ন ফ ব তাউক মান খেইদি খে	তাকে অভিশাপ দিচ্ছি । এই মোরগের
খেইয়াক-থ ।	মতো যেন যন্ত্রণা পায় । আমার কথা
আইনি কক হাপুং অ তা ক্লাই থ !	টিলার মাটিতে মিশে হারিয়ে যাবেনা ।
তুই ব অ তা ক্লাই থ	নদী স্রোতে পড়লেও হারিয়ে যাবেনা ।
যে ব নলজয় তুইনাংনাই	আগুনেও পুড়বেনা এই অভিশাপ ।
বিনি শাও ক্লাই থ ।	নলজয়ের প্রাণ হরণকারীকে
	ভুগতে হবে । ভুগতে হবে ।

মুরগীটা চার টুকরায় কাটা হলো । চাল গুড়া পিঠা, মুরগী মাংস রান্না সব দু ভাগে ভাগ করে । একটা অংশ রাখে বেতে বানানো চারপায়া ঝাকায় যাকে বলে খাওলুং । অন্য অংশ রাখে বেতের যুটিহীন মাইচাম নামক ঝাকাতে । মাইচামে কলার পাতার আগায় মরার জন্য ভাত, অন্য খাওলুং নামক ঝাকায় । মরার কানে পাঙ্গা নামক রঙীন সূতো বাধা বাঁশের টুকরো ফুলের মতো গুঁজে দিল দরণ মা । দুই চোঙ জল, দুই চোঙ মদ, আর একটা ডিম দু'টুকরো উৎসর্গ করে দুজনকে । একজন হলো মরা, আরেকজন হলো লাউতাউ দেবতা । লাউতাউ দেবতার আরেক নাম নাপুকে অচাই ।

লাউতাউ দেবতা হলো মানুষের মৃত্যুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বীর দেবতা । রিয়াং সমাজের বিশ্বাস লাউতাউ দেবতা মৃত্যুকে ঠেকানোর সংগ্রাম করে । মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েই

নিজের দেহ উৎসর্গ করেছিল লাউতাউ । সেই লাউতাউকে খুশী করার প্রথা এখনো সচল রিয়াং সমাজের প্রতিটি মৃত্যুর সাথে ।

অনেক অনেক আগে পৃথিবীতে নাকি চারজন বিখ্যাত অচাই বা পুরোহিত ছিল । তারা হলো অচাই লিককাই অর্থাৎ গুণজানা অমঙ্গলকারী, অচাই সুনথা বা কুৎসিত. অচাই লুনখা বা আঙ্গুল ঝরা বিকলাঙ্গ ও অচাই নাপুকে বা পরোপকারী । কেউ বিশ্বাস করে ওরাই হলো যুগে যুগে বন দেবতা বুড়াসার বিভিন্ন অবতার । এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণে, মন্ত্রে নাপুকে অচাই । অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে নাপুকে অচাই মৃত্যুদূতের চলাফেরা, অভ্যাস, ব্যবহার সব জানতো । নিজের দেহ থেকে প্রাণকে আলাদা করে রাখার মন্ত্রও তার জানা । সেই জন্যই নাপুকে অচাই মৃত্যুদূতের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েছিল । সমস্ত রণ-কৌশল নাকি অচাই নাপুকের ছিল জানা । মৃত্যুদূতের নিষ্ঠুর হাত থেকে মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে আনার কঠিন শপথ গ্রহণ করে । বিনা কারণে, বিনা দোষে, বিনা অপরাধে মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আদিম কালেও মানুষ সোচ্চারিত তারই মূর্ত প্রতীক হয়ে অচাই নাপুকের কাহিনী রিয়াং সমাজে লালিত পালিত আজও ।

নাপুকে তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে বলেছিলো—মৃত্যুদূতের কত ক্ষমতা, কত তার যুক্তি, বুদ্ধি পরখ করে দেখব । আমি থাকব মরার মতো ভাণ করে । অচাই লিককাই তুমি বসবে আমার দেহের ডানে । নাড়ী টিপতে থাকবে । অচাই সুনথা বসবে আমার বাঁয়ে । অচাই লুনথা পায়ের পেছনে । শিয়রের উপর দিয়ে অপেক্ষা করবে আমার যত আত্মীয় স্বজন । কথামতো অচাই নাপুকে ছয়দিন মরার মতো থাকে । শরীর থেকে প্রাণটাকে নিয়ে যায় যমদূতের দরবারে । নিশ্বাস বন্ধ করে রাখে কঠিন যোগবলে । মৃত্যুকালীন অলঙ্কার আসবাব সবই ছিল সাজানো । সাতদিনের দিন দুপুরে নাপুকে অচাই-এর দেহ থেকে মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ফেনা বেরোয় । শুরু হলো কান্না । সবাই ভেবেছিলো অচাই বুঝি মারা গেছে । অন্য অচাইরা সহ লোকজন মিলে নাপুকের দেহটা চিতায় তোলে নদীর পারে । নাপুকের দেহ চিতায় তুললে কি হবে প্রাণ তার অন্য জগতে ভ্রমণ রত ।

অন্য দিকে নাপুকে অচাই এর প্রাণ মৃত্যুদূতের সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করে । জিতেও যায় ! বিজিত প্রাণ জয়ের গর্বে একটা পান মুখে দিয়ে চিবোয় । পানের পিক ফেলে । সে পিকটাই ভক ভক করে ফেনা হয়ে বেরোয় তার মুখে । গ্রামবাসীরা, অন্য অচাইরা ততক্ষণে চিতায় আগুন জ্বালে । আগুনের লক্‌লকে শিখা পায়ের দিক থেকে, মাথার দিক থেকে চড়চড় করে পোড়ে কিন্তু তখনো নাভি আর হৃদপিন্ডে আগুন পৌঁছেনি । নাপুকের প্রাণ ছুটে এসে দেহে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারেনা । আগুনের বিশাল কুন্ডের মাঝখানে তার দেহটা নিরিবিলি নিস্তেজ । নাপুকের প্রাণ দেহে । ঢাকা হলো না । নাপুকে না পারল বাঁচতে না পারল মরতে । নাপুকের প্রাণ এখনো প্রতিটি মৃত্যুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত দু'কুল হারা ঐ মহান অচাই আজও বেঁচে আছে রিয়াং সমাজের ধারাবাহিক আদিম বিশ্বাসে । নাপুকে অচাই এর স্মরণে । নাপুকের মৃত্যু বিরোধী যুদ্ধ উন্মাদনা উৎসাহিত করতে জীবনের প্রতি নিবিড় ভালোবাসায় মানুষ এখনো রিয়াং সমাজে "সামফ্রি বাচানাম" নৃত্য করে । দুজন মানুষ হাতে নেয় কাপড় বোনার শক্ত বাঁশের নল । যোদ্ধার মত

কাপড় আড়াআড়ি বুকে কাঁধে কোমরে জড়ায় । যুদ্ধের অবিশ্রান্ত তাল বাজায় দুজন । সঙ্গে বাঁশী নিয়ে সুর দেয় জীবনের চূড়ান্ত দুঃখ বিষণ্নতাকে সুরে সুরে মিলিয়ে । সঙ্গে কেউ আবার গান ধরে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে ।

তামা কাংসালে চে-রে খে বুসানাই কাংসারী তঙ
বরাতী চে-রে ম বুসানাই কাংসারী কুরুই
হাচিং দে সোয়াক বাই থাকুং দে ফা ওয়াকবাই
বর অ ককইয়ে ফব র স্লাবনাং সি নি ।
থাঙনাই কাইজনাং
তঙনাইলে ভাগ্য নাং
থাং মিকালে খেরুক মাইয়া
থাং সি থ বারশো ছালি ওয়া
বাতাংন ছুকুরুই দুক দুবাইখা রুবা মাইয়া ।

থাং সিদি জানি ভাগ্য করুই বা
তুইকই কইমদে কাচাও নাম সিদি।

ভাঙা কাসা ভাঙা পিতল
মেরামত করে কাসারী
মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন জীবন
কেবা পারে মেরামতি ।
হে মৃত্যু পথ যাত্রী
সম্মুখে দুরুহ নদী দুর্গম বালিয়াড়ী
পঙ্গু আমি সেই পথ কেমনে দিব পাড়ি
অনিত্য সংসার খেলাঘরে
কাজ নিয়ে কে থাকে সময় ফুরালে ।
যেতে নাহি দিব বলে
স্নেহ অধিকারে কাউকে রাখিতে নারে ।
ভরা পাহাড়ী নদী পথ ধরে
বারশো বাঁশের ভেলা যদি ছোটে
বেত নেই, দড়ি নেই, কি দিয়ে রুখিবে তারে !
তেমনি অসহায় নিরুপায় হয়ে দিশাহারা
ব্যথিত হৃদয়ে বেলা শেষে তোমাকে দেব ছাড়া

বেদনা ভরা গানের মুর্চ্ছনার সাথে যোদ্ধারা নাচে ! মরা ডিঙিয়ে এ পাশে ও পাশে লাফায় । হাত নাচিয়ে, কোমর দুলিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে উদাত্ত ভঙ্গীতে বন্য উন্মাদনার ঢঙ । ঢোল বাদকও যেন তার ঢোলের বোলে এক আদিম নেশা সঞ্চার করে । মৃত মানুষ রক্তহীন ফ্যাকাশে হাতে নাচের তালে যেন দোলে ।

নাচে গানে কান্নায় বিভোর সবাই । কান্নার সুরে ব্যাপ্ত আদিম বিশ্বাস ক্ষণিকের জন্য জীবন্ত হয়ে উঠে । অন্তহীন মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক দুরন্ত সংগ্রামে ছল ছল চোখেও যেন দৃপ্ত অঙ্গীকার ঝলকায় । সেই ঝলক নিয়ে নলজয়ের মৃত্যুতেও রিয়াং সমাজ ওই খমু পাড়ায় বিষণ্ণ অন্ধকারে বাঁচার জন্য নৃত্য মুখর । এই অনুষ্ঠানের নাম সামফ্রি বাচানাম ।

বিশ্বরাম, নলজয় দুজনের মৃত্যু দিয়ে মহামারীর ভয়াবহ সূচনা । দিনের বেলায় মানুষ বেরোতে ভয় পায় । ছড়ার ওপাড় কে যেন পরিচিত গলায় নাম ধরে ডাকে ! যারা ওই ডাক শোনে তারাই নাকি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ! দাং দাং কেকাতা দাং দাং ঢোলের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে শেষ হয়নি । শ্মশানের আগুনে তখনো ধিকিধিকি অঙ্গার । সিমালুং নকে লেপা মাটিতে পাখীর পায়ের দাগ তখনও মোছেনি । একদিনের দাস্ত বমিতে মারা গেল তখিরাম ! ঘন্টাখানেক বাদে দরণ মা নিজেই মারা গেল । দাং দাং কেকাতা দাং দাং দিবানিশি চলছে । বিরতিহীন সামফ্রি বাচানামার ভয়াবহ ইশারা বন পাহাড়ে দিগদিগন্তে বিষণ্ণ আতঙ্ক ছড়ায় । বাতাসের ডানায় হাহাকার । ছড়ার পাড়ে দাঁড়ায় সারি সারি সিমালুক নক । কোনটা সমাপ্ত কোনটা অর্ধসমাপ্ত । ছড়ার পাড়ে পত পত ওড়ে মৃত্যুর সাথে সাথে এক একটি সাদা ঝান্ডা ।

ঘরে ঘরে রাতভর গোঙানীর করুণ আর্তনাদ । কারো রক্ত আমাশয় । কারো কাঁপুনি জ্বর । চাপা কান্নার সাথে দীর্ঘশ্বাসে খমু পাড়ায় এক গণ শিহরণ । দিন পনেরো যেতে না যেতে আঠারটি মৃত্যু ! পুত্রহারা স্বামীহারা, পিতৃহারা, মাতৃহারা ভীত মানুষের চোখ মুখে আতঙ্ক । কারো ঘরে একেবারে সাফ কাঁদবার লোকটাও নেই । দরজা ফাঁকা । রাক্ষুসী বাতাস হু হু করে ছোটে শবদেহের মিছিলে মিছিলে বিষণ্ণ বাঁশি বাজিয়ে ।

জরকামুনির শ্বশুর কৌরেঙফার ছিল পুরনো কাঁপুনি ধরা জ্বর । মহামারীর পাশে পাশে টিম টিম প্রাণটা বাঁচিয়ে কোনরকম চলছে । ক'দিন ধরে বুড়োও এক ফোটা জল পর্যন্ত মুখে দেয় না । মুখে মাছি বসে । জীর্ণ শীর্ণ হাতে মাছি তাড়ানোর শক্তি নেই । ফ্যাল ফ্যাল করে কোল বসা চোখের বিবর্ণ মণি দুটো বের করে তাকায় । তবু বিবর্ণ চোখের মণি অন্ধকারে কালো মাণিকের মতো চকচকিয়ে ইশারা জানায় জরকামুনিকে ।

ইশারা বুঝে জরকামুনি বুড়োর কাছে গেল । জীর্ণশীর্ণ হাতের হিমস্পর্শে জরকামুনির হাত ধরে । ঢোক গিলে শুকনো গলা ভিজায় । বাবা ! মরণ আমার দুয়ারে । আমার মৃত্যুর পর এখানে থেকো না । বাড়ীর লোকজন নিয়ে উত্তর দিকে চলে যেয়ো । আমি বড় অমঙ্গলের আভাস পেয়েছি । যাবার আগে গ্রামের সবাইকে জানিয়ে যেয়ো । যারা আসতে চায় তারাও যাতে তোমার সাথে যেতে পারে । আরেকটা অনুরোধ । বুড়াসা দেবতার করুণা হলে হয়তো বাঁচতেও পারি । যদি পার মরণের আগে আমার কাছে একবার তফলমা গ্রামের অচাই তলবাংহাকে ডেকে আনো । এই গ্রামে এত মৃত্যুর কারণ জেনে নিও । ওর ভাল মন্ত্র তন্ত্র জানা । আগে ছিল আমাদের সমাজে তৌঙনাও অচাই । বিলোনীয়া বাড়ী, বগাফা গ্রামে । এখন তৌঙনাও থাকলে চিন্তার কারণ ছিল না । যাক সে কথা, দেখ তলবাংহাকে এনে কোন প্রতিকার করতে পার কিনা । সাজেরুঙ নরম হাতে বুড়োর মাথায় হাত বুলায় । ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে । সাজেরুঙ বুড়োর শীর্ণ পা দুটি টেপে ছল ছল চোখে । জরকামুনির শালা লাকারায় দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদে ডুকরে ডুকরে ।

জরকামুনি লাকারায় দুজনে অনেক দূরে তফলমা গ্রাম থেকে অচাই তলবাংহাকে ডেকে আনল । অচাই তলবাংহা যখন মৃত্যু ভয়ে ছেয়ে যাওয়া খমু পাড়ায় পৌঁছে তখনই শোনে রাতের অন্ধকারে ওয়াং পাখীর ডাক । ওয়াং হলো বড় চিলের মত নিশাচর পাখী । ওই পাখীর ডাক অমঙ্গল মৃত্যুর বার্ত্তা । পাহাড়ে ওয়াং পাখীর ডাক মানে রিয়াং গ্রামে ভয়াবহ মৃত্যুর শিহরণ । শিশুরা কান্না থামায় চোখ বুজে ওই আতঙ্ক সঞ্চারী ডাকে ।

বন কদমের শিকড়, রংগী গাছের ছালের কস ধুয়ে সেই জল বাড়ী বাড়ী বিলায় অচাই তলবাংহা । কেউ ভালো হয় । কারো রোগ বাড়ে । আনারসের পাতা ছেচে জল আরও কত কি । কেউ বিশ্বাস করে । কেউ আবার করেও না । না করেও উপায় নেই । যাবে কোথায় । এই অরণ্য বৈদ্য তলবাংহা মানুষের শেষ ভরসা । যেখানে আধুনিক চিকিৎসার কোন আলো পৌঁছে নি । ডাক্তার হাসপাতাল স্বপ্নের চেয়েও অলীক । অভাব অনটন, রোগ শোক দুঃখ ভয়াবহ ওয়াং পাখীর মতো মানুষের সঙ্গী হাজার বছর ধরে সেখানে মানুষের কাছে স্বস্তির বাতাস বয়ে আনে তলবাংহার মতো অজানা অচেনা মানুষ । তলবাংহা ছুটে গেল অজগরের কলিজা খুঁজতে অনেক দূরে ডাঙ্গাবাড়ী গ্রামে । অজগরের কলিজায় চিনার বীচি মিশিয়ে খাওয়াল অনেককে । অনেকেই কিছুটা সুস্থ হলো । কেউ বলে জলের দোষ, কেউ বলে অপদেবতার অশুভ নজর । কেউ আবার বলে মহাপাপের অজানা প্রায়শ্চিত্তের সংকেত ।

কৌরেঙফার শয্যার পাশে তলবাংহাকে ঘিরে জড়ো হলো সমস্ত গ্রামের মানুষ, যারা কোন রকম বেঁচে আছে । তামাক টেনে শুরু হলো এই মহাবিপদ থেকে মুক্তির জল্পনা কল্পনা । জটিল যুক্তি । বর্ণনা ভয় বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করে বুঝলাম না, পরশু গভীর রাত্রে এক ঝাঁক টিয়া পাখী আকাশে কলরব তুলে পাড়ার উপর দিয়ে উড়ে গেল । বিশ্রী কাকলী শুনে আমার ঘুম ভাঙে । তলবাংহা বিজ্ঞ বিষন্ন হাসি দিয়ে বলে— বড় অমঙ্গল । বহু জীবনহানীর নিষ্ঠুর সংকেত ।

আরেকজন পিছন থেকে জিজ্ঞেস করে দরণ মা মরার একদিন আগে একটা বটকল পাখী দুপুরে পেছনের দরজায় ঢুকে সামনের দরজায় বেরোয় । তলবাংহা কপাল কুচকে চোখ দুটি বড় করে বলে—এ তো সেমী করার লক্ষণ । সেমী মানে বিপদে পড়ে পাড়া ছাড়া । একজন প্রৌঢ় এতক্ষণ নীরব ছিল । মাথা নেড়ে সম্মতিতে কথার পিঠে কথা টেনে বলে সবই ঠিক । বিশ্বরাম মরার আগের দিনও নিজে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল ওর বাড়ীর সিম্বাক হঠাৎ মচাৎ করে ভেঙ্গে গেল কেন ? সিম্বাক মানে চালের ভান্ডার রাখার মাচা ।

তলবাংহা সহজভাবে উত্তর দিল । দানা শেষ তারই সংকেত আগাম জানান দিয়েছে । দেখা যাক আমার যত বিদ্যা আছে তাই দিয়ে এই বিপদ কাটাতে পারি কিনা । আমার হাতে দুটি মোক্ষম অস্ত্র আছে ! একটি বলাম রিমি পূজা অন্যটি নদীর পূজা । বলাম রিমি হচ্ছে অঞ্চল দেবতার পূজা । নিরাশ খমু পাড়ায় যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো আশার ক্ষীণ চমক লাগে । পরদিনই সারা খমুপাড়া বাঁশ পুতে ঘিরে রাখে । ছটা মোরগ বলি দিল ছটা ছোট ছোট বাঁশের কুঞ্জে । কয়েক বোতল মদ উৎসর্গ করে মন্ত্রের একটানা ধ্যানস্থ গুঞ্জরণ শুরু হয় । পাড়া ঘেরা বাঁশের খুটিতে পুরনো জালের টুকরা, ন্যাকড়া টাঙায় । পাঁচদিন ধরে বাইরের লোক পাড়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ । পাড়ার লোকও বাইরে যাওয়া নিষেধ । ঝান্ডার মতো উড়ন্ত ন্যাকড়ার সাজসজ্জা দেখে বোঝে এই

পাড়ায় মহামারী চলছে।

বলাম রিমি সমাপ্ত। অঞ্চল দেবতা খুশী কিনা কে জানে তবে কৌরেঙফার শরীর আরো অবনতির দিকে। আগে ক্ষীণ স্বরে কথা বলতে পারত। এখন তাও পারে না। কাছে পিঠের লোকও চিনতে পারে কিনা সন্দেহ। অনেক কষ্টে কৌরেঙফাকে বড় চাদরের পোঁটলায় নিয়ে বাঁশ বয়ে আনে তুই ওয়াক তাইং ছড়ায়। রিয়াং সমাজে চূড়ান্ত বিপর্যয় হলেই এই পূজোর আয়োজন চলে। তলবাংহা অচাই রোগীকে শোয়ায় ছড়ার পাড়ে। মুরগী জবাই, শুয়োর জবাই, চাল, নৈবেদ্য পাতায় পাতায় সাজানো। আদিম মন্ত্রের উচ্চারণ শুরু করে তলবাংহা মন্ত্রের মধ্যে একাগ্র চিত্তে ডোবে। কখনো কান্নায় নিজেই ভেঙে পড়ে। কখনো অভিমানের মতো অভিনয়। পবিত্র অথচ অন্ধ বিশ্বাসের তাড়নায় তাকে পার্থিব জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। অন্ধকার মৃত্যু মূর্ছনায় ঝিমানো খমু পাড়ায় সঞ্জীবনের দুরন্ত প্রচেষ্টা। ডাকিনীর রুক্ষ অট্ট হাসির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মানুষের প্রাণপণ লড়াই। উদার ছন্দে বন্দনা গানে নতজানু প্রণাম জানায় চিরদিনের পরিচিত নদী মাতার কাছে। মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ ভিক্ষার সমারোহে ছড়ার পাড় মুখরিত।

শ্রীকালাক্ষী, শ্রীকালাক্ষা	মা শ্রীকালাক্ষী
য়াফাং দুর্বা কাটৈ তঙনাইমা	নরম দুর্বাঘাসে চরণ তোমার
কুচুক কালাংসি কবং তুইমা	মহাশূন্যে অসীমে শিয়র তোমার
কসং কৈ লাং লাং হিঁঅ তঙনাইমা	অন্তহীন দৈর্ঘ্যে তোমার শয়ান
কেবেঙ ফুই লাং লাং হিঁ অ তঙনাইমা।	ষোলো মাস হেঁটেও অন্তে কেউ
সঙ তাচিৎ বাগরামা	পৌঁছতে পারে না !
বাচাই য়ে নাই ফাইদি	ষোলো দিন হেঁটেও তোমায়
আচুকয়ে চা ফাইদি	প্রশ্নের শেষ নেই।
রমদালি বনদি খেইয়ে	ভাত পানীর নৈবেদ্য গ্রহণ
মাইদালি বনদি খেইয়ে	করো। ডাইনে দা, বায়ে গঙ্গা
চন্তি য়াগরা গঙ্গা য়াকসি	হাতে উঠে দাঁড়াও
পিরথি নাইসি স্বরগ নাইসি	পৃথিবীতে পা রেখে স্বর্গ
সত্য খেম ইমা খেম	থেকে এই অসহায়
বার তীর্থ যতই তঙ	মানুষের প্রতি মুখ তুলে চাও।
দশা য়াক কারদি	সত্য করে দয়া কর
লা অ য়াক কারদি	আবর্জনাহীন নদীর মতো করে
তুইমাসিং তুই হামদে	মেঘহীন সূর্যের মতো
সালমাসিং সাল হামদে	সুস্থ সবল করো।

কৃতজ্ঞতার ঋণে ভারী হয়ে আসে জরকামুনির বুক। বিনীত হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। বুক ঠেলে আসে এক করুণ মরমী আবেগ, তবু বাঁচাতে পারেনি তার শ্বশুরকে।

কৌরেঙফার শবদেহে তখন চিতার উপর চিরদিনের ঘুমে। দাউ দাউ আগুনের পিপাসা ক্ষুধা, নিমেষে গিলে নিল শবদেহটাকে। সবাই বসল নদীর পাড়েই। সিদ্ধান্ত নেয় এই পাড়ায় থাকা

হবে না। গত রাত্রেও অমঙ্গলের বিশ্রী লক্ষ্মণ বুঝা গেছে। এক সাথে সমস্ত পাড়ার মুরগীগুলো রাত দুপুরে ডেকে উঠে। ঐ আতঙ্ক সঞ্চারী মুরগীর ডাকে মানুষেরা শোনে মৃত্যুর বিমূর্ত পদধ্বনি।

এত মৃত্যুর পর আর থাকা যায়না। সবাই হিসেব করে এই কদিনে মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। সবাই বলে যাও জরকামুনি তুমি পাহাড় খোঁজ করো গিয়ে। সঙ্গে বৌ ছেলেকে নিয়ো। দু এক বছরও থাকা যাবে না। দু এক মাসের মধ্যে ফিরে এসো। আমাদের যার যা আছে সাহায্য করবো। তুমি যাও।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে জরকামুনির টং ঘরে পাড়ার মুরুব্বিরা এসে জমা হয়। পাঁচ টাকা, সাত টাকা যে যা পারে দিয়ে যায় জরকামুনিকে। আসামের জঙ্গলে নতুন অরণ্য খুঁজতে যাবে জরকামুনি। সে পছন্দ করলেই, তবে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। চান্দমা তাকে বুঝিয়ে বলে, দেখো, উত্তরমুখী জঙ্গল সব সময় ভালো। তাই খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে। যাতে ভাতের কোন চিন্তা না করতে হয়। কাছাড়ে হাইলাকান্দির কাছে মিজোরাম সীমান্তে আমার খুড়তুতো ভাই থাকে। গ্রামের নাম রাইফেল মারা। তার বাড়িতে গিয়ে উঠবে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। পাঁচ সাত বছর আগে আমাদের নিতে এসেছিলো সে। আমরা তখন রাজি হইনি।

কৌরেঙফার মৃত্যুর পর গোটা সংসারটাই দিশেহারা। সারা বাড়ি জুড়ে এক বিষণ্ণ শূন্যতা। সাজেরুঙ-এর মা উনুনের পাশে, চোখ দুটি মরা মাছের চোখের মতো বিবর্ণ। মাথায় আধ পাকা চুল, খোপা হেলে আছে, একটু এলোমেলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়। পাশে লাকারায়, জরকামুনির শালা। সুদিনে দুর্দিনে বিশ্বস্ত অনুচরের মতো পিছে পিছে তাকেও ছেড়ে যেতে হবে কাল ভোরে। সাজেরুঙের ছেলেটা আধো আধো কথা বলে। বুড়ীর চোখের মণি এই ছোট্ট ছেলেটা। রোজ বুড়ী পিঠে শিশুটাকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। বুড়ীর হুঁকোটার দিকে ছেলেটা হাত বাড়ায়, আনন্দ পায়। বুড়ী তখন কলকেটা খুলে রাখে। বুড়ীর মুখের পান শিশুটা জিভ দিয়ে চেটে নিজের মুখে নেয়। না দিলেই অভিমানে গড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে। অ্যাতো মায়াজালে জরকামুনি আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে গেছে এর আগে অনুভব করেনি সে। এখানে মৃত্যু পাগলা নেকড়ের মতো প্রতি রাত্রে হানা দেয়। অভাব, অনাহার প্রতিটি মানুষের পেছনে ছায়ার মতো ঘোরে, দুরারোগ্য ব্যাধি এখানে চিরস্থায়ী আস্তানা গড়েছে, তবু এখানেই আছে অন্ধকারের গভীরে ভালোবাসা, সহানুভূতির এক নীরব কলরব। এই কলরব ছেড়ে, এই মায়াজাল ছিঁড়ে কী করে যাবে ? কিন্তু উপায় নাই ? পাড়ার লোকরা সবাই ছেড়ে যাবে। জরকামুনির পিঠে বোঁচকা, সাজেরুঙের পিঠে খাড়া কোলে শিশু নিয়ে যাত্রা করে। কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে যায় লাকারায়।

পথে এসে জরকামুনির মাথায় অনেক ভাবনা। মগজের ভিতরে যেন কয়েকটা পোকা ঘুর ঘুর করছে। কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। তার জামাই-খাটার দুবছর শেষ হয়ে গেছে। আর এক বছর কাটাতে পারলেই, তারপর ঘরে ফেরার পালা। এক বছর আগে একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিলো জরকামুনি। তার বাপ যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে। মা-ও মারা গেছে কয়েক দিন পর কাঁপুনি জ্বরে। বড় ভাই কোন রকমে প্রাণে টিকে ছিলো, শেষ পর্যন্ত পাড়া ছেড়ে

বলরাম পাড়ায় জুমিয়াদের পুনর্বাসন কলোনীতে চলে গেছে।

কলোনীতে জঙ্গল নেই, রুক্ষ ধূসর টিলা। চারধারে কাছে পিঠে জলের কোনো অস্তিত্ব নেই। কলোনীতে বীজধান, হালের গরু, ফলের গাছ কেনার জন্যে ঋণ পেয়েছে অনেক। কিন্তু চাষের সময় গরু পায়নি। যখন পেয়েছে তখন জমিতে লাঙ্গল চালানো যায় না। সময় চলে গেছে। বীজধানের টাকা পেয়েছে ধান কাটার সময়। এত টাকা নিজের হাতে ও কোন দিন পায়নি। সরকারী ঋণের অর্ধেক কিছু মুহুরীকে দিতে হয়, নইলে ঋণ পাওয়া যায় না। বাজার থেকে গরু কিনতে গেলে ছয়শো টাকায় গরু কিনে রসিদে হাজার টাকা লিখতে হয়।

লোকে বলে, কলোনীর লোকরাও ঘর তৈরী বাবদ বেশ টাকা পেয়েছিলো। পুনর্বাসনের কর্মচারীদের তিন ভাগের এক ভাগ, আর বিধু মুহুরীকে একভাগ দিয়ে তবে ঘরের টাকা পাওয়া যায়! যখন টাকা পায়, তখন আবার ছন বাঁশ কাটা পাওয়া বড় মুস্কিল। পাওয়া যায় না বললেই চলে। ওই টাকা তখন স্রেফ ভূখা পেটেই চলে যায়। টাকাও শেষ হয়ে যায়। এক সময় কলোনীও শেষ। তার পর আবার জুমের পাহাড় খুঁজতে চলে গেছে ধুমাছড়ার গভীর জঙ্গলে।

নিজের গ্রাম গলাছড়া ছিন্ন ভিন্ন। কে কোথায় ছিটিয়ে চলে গেছে কেউ জানে না। যারা আছে তারাও হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে না। জুম কাটা নিষেধ, আর জুম না কাটলে খাবে কী? জুম ছেড়ে সমতলে চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। জমি পাবে কোথায়? জমি পেলে হালের গরু, ধানের বীজ খোরাকী দেবে কে? তার উপর হালচাষ শিখতেও বেশ সময় নেবে।

আর ভাবতে পারে না জরকামুনি। তার চোখের সামনে সবকটি খোলা পথ যেন অচমকা শেষ হয়ে যায়। সে এখন কী করবে?

তবু, মনে ক্ষীণ আশা শেষ সলতের মতো জ্বলতে থাকে। চান্দফা রিয়াং-এর খুড়তুতো ভাই এর কাছে গেলে হয়তো সেখানে কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে? এই আশায় ভর দিয়ে হাইলাকান্দির দিকে রওয়ানা দেয়। যখন সে রওয়ানা দেয় তখন বাতাসে মরা পোড়া গন্ধ। মৃত্যুর বার্তাবাহী ঢোলকের ক্লান্ত নিনাদ ; পাহাড়ে পাহাড়ে স্বজন হারা সুরের বাঁশী। আতঙ্ক গ্রস্ত শিশুর মুখ মায়ের বুকে লুকানো, তাদের কাঁপন ধরা নিঃশ্বাস। সিমালুংনকের পাশে এলোমেলো চুল ছেড়ে চিলের ডাক শোনে, বানরের উলুধ্বনি শোনে, কান্নায় ভেঙে পড়া রমনীর ব্যাকুল ব্যাথা। দূরে দূরে গাছের ডালে গহন বনে প্রাণ কেড়ে নেওয়া ভয়াবহ ওয়াং পাখীর ভয়ঙ্কর ডাক।

কুল কুল নদীর স্রোতে তলবাংহার আকুল একাগ্র চিত্তের মন্ত্র গুণগুণ করে তখনো ধ্বনিত। মানুষের প্রাণ সংহারী সর্বনাশা রোগের বিরুদ্ধে এই মন্ত্র যুগ যুগান্ত ধরে ধ্বনিত হয়ে থাকে আজও। সব কিছু পেছনে ফেলে কদম কদম এগোয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জানা অজানা অচেনা অনাগত জীবনের পথ ধরে ধরে।

দুবছর পরে জরকামুনি ফিরে আসে আসামের জঙ্গল ঘুরে। সেখানে জঙ্গল আছে, তবে জুমের জন্য যে পুরানো জঙ্গল দরকার তেমন জঙ্গল পায়নি। তবু একটা বড় জঙ্গল ঘাড়মুড়া গ্রামের পাশে লঙ্গাই নদীর উপত্যকায় হাইলাকান্দি মহকুমায় পেয়েছে।

বৌকে নিয়ে সে ফিরে আসে। খমু পাড়ায় শত বাড়ী আছে, তারা যদি রাজি হয় তবে সবাইকে নিয়ে যাবে। কষ্ট না হয় হবে, তবু মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে থাকতে পারবে।

লরীতে উপরে বসে আসে ধর্মনগর থেকে । কুমারঘাটে দেখা হয় হাসমাই রিয়াং এর সাথে । সেও লরীতে উপরে বসে ছিলো । হাসমাই রিয়াং বয়সে জরকামুনির থেকে বছর দশেক বড়ো । গলাছড়ায় হাসমাই রিয়াং এর বাড়ি । দূর সম্পর্কে জরকামুনির খুড়তুতো ভাই সে । গাড়ির উপরে, যেতে যেতে অনেক কথা হয় । হাসমাই একটার পর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে । বোঝায় ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে চলো ।

জরকামুনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় । হাসমাই রিয়াং তখনো ঠান্ডা গলায় ভুলিয়ে যাচ্ছে জরকামুনিকে । সারা জীবন জুম করে আমরা বাঁচতে পারবো না । এ অসম্ভব ব্যাপার । তাছাড়া দিনকাল বদলে যাচ্ছে । এখন বাঁচতে গেলে নতুন কোনো বাঁচার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে । আমাদের বাপ ঠাকুরদা জুম করেই বাঁচতো —সে পথ ছেড়ে আমরা কী করে বাঁচবো । জরকামুনি না জিজ্ঞেস করে পারে না ।

এই পৃথিবীর সবকিছু বদলাচ্ছে । বাপ ঠাকুরদার বাঁচার প্রথাও বদলাবে । আর প্রাচীন রীতিনীতি আঁকড়ে ধরে রাখা কিছুতেই সম্ভব না । যেমন তোমার কোলের ছেলেটা সে কী সারা জীবনই এই অবস্থায় থাকবে ? তা তো নয় । সেও একদিন যুবক হবে, বিয়ে করবে বাপ হবে । সেও একদিন এমনটি করেই বদলাবে ।

হাসমাই জরকামুনিকে আরও বোঝায় । মানুষের জীবন যাত্রার প্রথা বদলায় । পাহাড় জঙ্গল দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে । আরোও ক'বছর পরে জুম চাষ আর থাকবে না, বন্ধ হয়ে যাবে । আচ্ছা, তুমি কি মনে করো, এই দেশের পাহাড়ী জুমিয়ারা দেশ ছেড়ে চলে যাবে ? কেউ কেউ হয়তো যাবে কিন্তু বেশীর ভাগই এই মাটিতেই থাকবে । নতুন বছর বাঁচার পথ খুঁজে বের করবে । তুমি যে জঙ্গল দেখে এলে সে জঙ্গল কী কোন দিন শেষ হবে না ।

জরকামুনি মন্ত্র মুগ্ধের মতো হাসমাই এর কথা শুনে যায় । বিড় বিড় করে উচ্চারণ করে, 'কই আর' পাঁচ বছরও থাকবে কিনা সন্দেহ ।

সেই যদি হয়, তাহলে তোমার ছেলেটা বড়ো হয়ে খাবে কী ? চলো, কথা শোনো, ঘরে চলো । আমাদের জীবন যাত্রার নতুন পরিবর্তন হচ্ছে—চলো ; গিয়ে দেখবে । তুমি চিনতেই পারবে না, আমাদের গ্রাম গলাছড়া যে কতো বদলে গেছে ।

যারা গ্রাম ছেড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গিয়েছিলো, ধীরে ধীরে সবাই ফিরতে শুরু করেছে । গভীর জঙ্গলের মাঝখানে বিরাট শহরের মতো উপনগরী তৈরী হচ্ছে । আগের জুমিয়ারা এখন সেখানে রাবার চাষের কাজ করে । কেউ কেউ আবার পাহাড়ের লুঙ্গায় বাঁধ দিয়ে জলা তৈরী করে মাছ চাষের জোগাড় করছে ।

নতুন গঠিত জেলা পরিষদ জুমিয়াদের এখানে নানান পরিকল্পনা নিয়েছে । হাজার হাজার বছর সভ্যতার আলো যারা পায়নি তাদের উন্নত করার জন্যে লক্ষ টাকা খরচ করছে ।

জরকামুনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—এখানে কী খেয়ে আমরা বাঁচবো ?

হাসমাই জরকামুনির পিঠে হাত রাখে । এখানে কাজের অভাব নেই । পরিশ্রম করে খোরাকের জন্যে আমাদের ভাবতে হয় না । টাকা পয়সা খোরাকির ঋণ সব জেলা পরিষদ থেকে দেয় । এজন্যে সুদ গুণতে হয় না আমাদের ।

রাঙাছড়া ফরেষ্ট অফিসের সামনে থেকে লাল মাটির নতুন রাস্তা গলাছড়ার দিকে চলে গেছে বিদ্যুৎ বাতির খুঁটি কাঁধে পাহাড়ি চমপ্রেঙের মতো তার । পাখি বসে, উড়ে যায়, বিদুৎ তারে তারে ঝংকার বাজে । সেই ঝংকারে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা মানুষের হৃদয় বীণা । লাল মাটির রাস্তা কলকল করে বহমান রাঙাছড়াকে পাশে রেখে বাঁক খেয়ে উপরে উঠে গেছে । জরকামুনির চোখ ধাঁধিয়ে যায় । দুবছর আগে যেখানে ছিলো গভীর জঙ্গল, বন্য হাতীর আস্তানা, আজ সেখানে কোন এক রূপকথার আকাশপুরী । বহু মানুষ পাহাড়ী-বাঙ্গালী সবাই নির্মাণ যজ্ঞে ব্যস্ত । টিলার ডান দিকেই থৈ থৈ কৃত্রিম জলাশয় । অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তিন বছর আগে ঐ জলাশয়ের লুঙ্গায় ছিল জালি বেতের কাঁটাবন । দক্ষিণ পশ্চিমে টিনের চারচালা ঘর । সামনে রিয়াং মেয়ে পুরুষ সার বেধে দাঁড়ান । প্রত্যেকের পিঠে কার্পাস তিল পাট ভরা খাড়া ।

সাজেরুঙ জরকামুনিকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে. এতো লোক কি মহাজনের পুরানা ঋণ শোধ করতে এসেছে ।

বিস্ফারিত চোখে বিস্ময়ে অভিভূত জরকামুনি কোন কথা খুঁজে পায় না । হাসমাই জরকামুনির হাত ধরে কাছে এগিয়ে দেখায়, নিখুঁতভাবে কার্পাস তিল ওজন হচ্ছে । দাম সহ রসিদের চিরকুট তুলে দেয় বিক্রেতার কাছে । হাসমাই জানায় এটা সরকারী দোকান । মহাজনদের হাত থেকে পাহাড়ীরা যাতে রেহাই পায় তারই ব্যবস্থা, বাজারের চাইতে বেশী দামে এখানে আমাদের ফসল বিক্রী হয় । ওজনেও কেউ ঠকায় না । দোকানে তেল, নুন, শুঁটকি, সুতো, কাপড় সবই আছে । বাজারের চেয়ে ভাল দাম ও বাজারের চেয়ে অনেক সস্তা । জরকামুনি জিজ্ঞেস করলো তা এতো ভাল মহাজন কে ? এলোই বা কোথা থেকে ?

হাসমাই হাসে । মহাজন বা মালিক কেউ নেই । এটা সমবায়ের দোকান । সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে তৈরী করেছি । দোকান চালাবার জন্যে টাকা দরকার । এই টাকার একটা বড় অংশ সরকার দিয়েছে ।

জরকামুনি ও সাজেরুঙ উভয়েই বিস্ময়ে বাকহারা । অবিশ্বাসের চোখে একবার দোকানের দিকে একবার হাসমাই রিয়াংয়ের দিকে তাকাতে থাকে ।

দোকান দেখে কিছু দূর যেতে হাতের বাঁদিকে টিলার উপর একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে । কারো গায়ে চাদর কারো কোলে শিশু । হাসমাই জরকামুনিকে দেখায় এই আমাদের হাসপাতাল, এখন আর অসুখ বিসুখ করলে আমরা অচাই মদ দিয়ে মুরগী কেটে চিকিৎসা করিনা । সবাই বিনা পয়সায় পাশ করা সরকারী ডাক্তারের চিকিৎসা পেতে পারে এখানে ।

সাজেরুঙ হাসপাতালের দিকে চেয়ে বিস্মিত । ভেতরে একটু কষ্টও পায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠে সে — চিকিৎসার এতো আয়োজন যদি আমাদের খমু পাড়ায় থাকতো—তাহলে এত লোক মারা যায় না ।

হাসপাতালের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলির অনেকেই সাজেরুঙ ও জরকামুনির দিকে কৌতুহলী চোখে [illegible] হাসমাই [illegible] ডগমগ । সে জরকামুনিকে আরো দেখাতে চায় । কতোখানি পরিবর্তন [illegible] চিহ্ন । মানুষের কল্যাণের জন্যে মানুষের অফুরন্ত প্রচেষ্টার ফসল । পাশেই [illegible] গরু, ছাগল, শুয়র, মুরগী । টিলার উপরে ঠিক কি

হচ্ছে নীচে থেকে তা বুঝা যায় না। অসংখ্য মোরগের কক ক্‌ক শোনা যায়। জরকামুনি সেই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, এক সঙ্গে এতোগুলো মুরগী ডাকা অশুভ লক্ষণ, পাড়া-ছাড়ার পূর্ব সংকেত।

হাসমাই দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে। না, না। ওখানে পশু হাসপাতাল। গরু ছাগল, পশু পক্ষীর চিকিৎসা হয়। আজ বোধ হয় ওখানে মুরগীদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

টিকা ? সে আবার কি গো ? সাজেরুঙ অবাক হয়।

ঝিমুনি রোগের সংক্রমণে যাতে মোরগ না মরে। তারই আগাম চিকিৎসা হচ্ছে। হাসমাই বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেয়। কৃত্রিম জলাশয়ের কাছে টুক টুক করে একটা যন্ত্র। চারদিকে বিস্তৃত দূরগামী লোহার রড। জরকামুনি হাসমাইকে জিজ্ঞাসা করে এখানে কি হয় ?

হাসমাই বলে, ওটা হচ্ছে স্থানীয় জল যন্ত্র দিয়ে তুলে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। চিরদিন নালা, ছড়ার জল খেয়ে রোগ শোকে ভুগতাম। এই জল বিশুদ্ধ করা হয় ঔষধ পত্র দিয়ে। সে জন্যে এলাকার অসুখ বিসুখ অনেক কমে গেছে।

যেতে যেতে পাহাড়টা যেখানে সমতল হয়ে এসেছে, ঠিক সেইখানেই লম্বালম্বি কয়েকটা ঘর। উঠোনে একদল ছেলে। সারি সারি দাঁড়িয়ে। নীল পেন্ট সাদা জামা সবার গায়ে। মাঝখানে একটা পরিষ্কার যুবক ধবধবে সাদা জামা ; সাদা পেন্ট মাথায় আবার সাদা টুপি। মুখে একটা বাঁশি; সূতোর দঁড়ি গলায় ঝুলানো। ছেলেরা বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে সামনের দিকে, আবার মাথার উপরে কান বরাবর তুলে দেয়। মন্ত্র মুগ্ধের মতো সাজেরুঙ ও জরকামুনি সে সব দেখে। তারা এর আগে এসব দেখেনি। এই তো কদিন আগে এপাড়া ছিলো জঙ্গল—এখন কেমন পালটে গেছে।

হাসমাই বলে এই হচ্ছে আবাসিক স্কুল। পাহাড়ের যেখানে স্কুল নেই সেখান থেকে এসে ছেলেরা এখানে পড়াশুনা করে, এখানেই থাকে। খাওয়া, পোষাক, বই খেলাধুলা সব সুযোগ এখানেই আছে।

সাজেরুঙের চোখ সরে না। কচি কচি ফুলের মতো পাহাড়ী শিশুগুলি কতো সুন্দর। আহাঃ। চোখগুলি উজ্জ্বল অনাগত পৃথিবীর স্বাগত সংকেত। এই গভীর অরণ্যের মাঝখানে যেন অসংখ্য জুম ক্ষেতের ফুলের কুসুম এসে এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

ইস্কুল ডানে রেখে তর তর করে নামতে লাগলো দক্ষিণে। সেখানে ছিল আগে কচুরী পানার ডোবা, শিয়াল কাঁটা বন। এখন সেখানে আলবাঁধা টুকরো টুকরো জমির বিরাট মাঠ। হাসমাই ঐ দিকে দাঁড়িয়ে বলে, এখানে ভূমি সংরক্ষণের কাজ করে জমি বেরিয়েছে। এই পাহাড়ের বিভিন্ন লুঙ্গায় অনেক জমি একেবারে সোনার ফলের মতো।

মাঠ পার হয়ে সত্যরাম রিয়াং-এর বাড়ীর পাশের টিলা। নারী পুরুষ মিলে বেশ কিছু লোক পাহাড় থেকে নামছে। প্রত্যেকের হাতে টিফিন কেরিয়ার, সাজেরুঙ চিনতে পারে ওরা সবাই গলাছড়ার লোক। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই হাসমাই জানায়—এরা সব রাবার বাগানে কাজ করে আসছে। এখন ওরা কাজে গেলে মাইছু নেয়না। কলার পাতা ভাত তরকারী সব টিফিন কেরিয়ারে করে নিয়ে যায়। সামনে আরো কিছু লোক সারি সারি ছোট ছোট অচেনা গাছে

নিরানী দেয় । নিরানো ঘাস আবার গাছের গুড়িতে জমা করে রাখে । হাসমাই পরিচয় করিয়ে দেয় ওটা রাবার বাগানের মালটিং । মালটিং হচ্ছে ঘাস নিরিয়ে গাছের গুড়িতে জমা করে গাছকে ঠান্ডা রাখা, আবার সারও দেওয়া । মালটিং করা দলের পিছনে জুম নিরানোর সময় যেমন মাদল বাজিয়ে গান গেয়ে প্রেরণা জাগায় কাজে, এখানেও একদল মাদল বাজায়, গান গায় ।

সন্ধ্যা নেমে আসে উপনগরীর বুকে । কচি কচি রাবার গাছে শাখা প্রশাখা নেচে উঠেছে মাথা দুলিয়ে জুমিয়া জীবন থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে আসা পাহাড়ী মেয়েদের চুড়ির টুংটাং শব্দে । সন্ধ্যার হাওয়া নেচে বেড়াচ্ছে উপনগরীতে ।

জরকামুনি হাসমাই, সাজেরুঙ তখন গলাছড়া পাড়ার দিকে হেঁটে যাচ্ছে । সাজেরুঙের কোলে তার আধো আধো কথা বলা শিশুটি । সাজেরুঙ তখনো ইস্কুলের উঠানে কচি কচি ছেলেদের কথা ভাবছে । কানে বাজছে দূর থেকে ইস্কুলের সেই ছেলে ভোলানো বাঁশির ডাক পাহাড়ের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত চির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা পাহাড়ের শিশুদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে । রঙ্গিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ । চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি । কোলের ছেলেটা তার এমনি করে বাঁশির ডাকে ছুটে যাবে । ইস্কুলের ময়দানে কচি হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুড়ে কচি ঘাস যেমন অপার বিস্ময়ে সূর্য্যের দিকে তাকায় ।

তিতাস থেকে ত্রিপুরা

মাখন পাহাড়ী এলাকার পুরোহিত। পাহাড়ে লুঙ্গায় টিলায় ঘুরে চলেছে অনেক বছর ধরে। সবাই তাকে লম্বাঠাকুর বলে জানে। বাপের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার রসুলপুর গ্রামে। বাপের নাম বসন্ত ঠাকুর। রসুলপুর গ্রামটি বর্ষার মরসুমে জলে কলাগাছের ভেলার মতো ভেসে থাকে। চারদিকে গাঙ বিল, বিরাট বিরাট হাওর। এই পাড়া ওই পাড়া, বাজার হাট, যেখানেই হোক নৌকা ছাড়া চলা যায় না। গ্রামের পাশেই তিতাসের মরা নদী। বর্ষা এলে চঞ্চলা বালিকার মতো বুকের ছলছল ঢেউ-এর আঁচল নাচিয়ে তিতাসের সাথে মিলে যেতো। নদী নালা গাঙ বিল জলে জলাকার। মানুষের জীবনধারার কলকল্যানিও একাকার হতো বিশাল জলরাশির তালে তালে বর্ষায় উজানো মাছের মতো।

জলের মাঝখানে বাড়ীগুলো দ্বীপের মালার মতো জেগে থাকে। বসন্তঠাকুর যাজনিক কাজে নৌকা নিয়ে বেরোয় সে-সব গ্রামে। রসুলপুরে শ'খানেক হাল্যাদাস তার যজমান। পশ্চিমে তিনটি মুসলমান গ্রাম। নাজিরাবাড়ী, ইসলামপুর, মণিপুর। নাম মণিপুর হলেও কোন মণিপুরী নেই। কবে কোন কালে ছিল জানা নেই কারো। তার পশ্চিমে নমসুদ গ্রাম। দত্তখলা। সেখানেও কয়েক বাড়ী শিষ্যসেবক আছে। তিতাসের উত্তর পাড়ে বাকাইল, খলাপাড়া, কুচুনি, বুড্ডা এলাকা জুড়ে বসন্তঠাকুরের যজমানি-সাম্রাজ্য। কেউ হাল্যাদাস, কেউ কৈবর্ত।

উৎসব পার্বণে নানা অনুষ্ঠানে ঠাকুর যেতো নৌকা নিয়ে। কিরায়া নৌকা তখন দৈনিক পাঁচ সিকা থেকে দু'টাকায় পাওয়া যেতো। মাঝিদের অনেকেই ঠাকুরের শিষ্যসেবক। চেনাজানা। নমসুদ মাঝিই ছিল বেশী। ঠাকুর না হয় কর্তা সম্বোধন করে প্রণাম জানিয়ে নৌকায় তুলত। কৈবর্ত, নমঃশুদ্রদের আলাদা আলাদা ব্রাহ্মণ ছিল। অনেকেই গ্রাম্য ঝগড়া দলাদলির প্যাচে পড়ে নিজেদের পুরোহিত ছেড়ে বসন্ত ঠাকুরকেই পুরোহিত মেনে নেন।

মাখনের বয়স তখন দশ বছর। বাপের সাথে নৌকা চড়ে ব্রতে শ্রাদ্ধে, বিয়েতে যেতো। কখনো দক্ষিণ দিকে সাডির পাড়া বা বরুন কান্দিতে কপালী গ্রামে। চান্দুরা বাজার ছিল গমগমে। এখনও সুন্দর কপালীর তেতলা বাড়ী স্বপ্নে দেখা রাজপুরীর মতো আবছা মনে ভাসে। কখনো যেতো কালীসীমা সাতগাঁও। নৌকা বোঝাই করে ফিরে আসতো চাল, কলা, নারিকেল, গামছা ধুতি নিয়ে।

ইস্কুলে যেতো অনেক দূরে, সাতগাঁও গ্রামের পুবে পসারচান ইস্কুলে। ইস্কুলটা বেসরকারী হলেও বড় কড়া। শশী পণ্ডিতের ভয়ে সারাটা ইস্কুল থরো থরো কাঁপতো। বেতের ঘায়ে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে যেতো। মুরুব্বী মাতব্বর যারা সমাজের হর্তাকর্তা, তাদের অনেকেই শশী পণ্ডিতের ভয়ে পড়া ছাড়ে। অন্য পড়া যেমন তেমন, শশী পণ্ডিতের পড়া না শিখে উপায় ছিল না।

কিন্তু বায়োস্কোপওয়ালা ডমরু বাজিয়ে যখন গ্রামে আসতো তখন মন টিকতো না। ছুটে যেতো পাশের বাড়ীর উঠোনে বায়োস্কোপের ছবি দেখতে। বায়োস্কোপের ভেতর দিল্লী শহর দেখা যেতো। আরো কত কি। একচোখ বন্ধ করে তাকালে অপরূপ দৃশ্য একের পর এক ভেসে যায়। যে দেখায়, পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা। নেচে নেচে গেয়ে, ছবির কল ঘুরায়। একটার পর একটা ছবি

আসে । তার হাতে বাজে একটা ডমরু । ডমরুর তালে তালে সে গান গায় । ছবি একটা আসে, একটা যায় । চাল বা তামার পয়সা দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দেখে । কোন কোন সময় নতুন বৌরাও আসতো লম্বা ঘোমটা টেনে । সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিও বেচতো বায়স্কোপওয়ালা । মাখন, হরি, রাধাচরণ যেমন যেতো তেমনি উঠোনে ভিড় করতো মেয়েরা । মাখন আর হরি যখন একচোখ বন্ধ করে তাকায় তখন বায়স্কোপের ফেরিওয়ালা গান গাইত --

দেখ সব নজর করে
কি সুন্দর দেখা গেছে
দিল্লী শহর আয়া পড়ছে
রাজারানী বইস্যা রইছে
কত সুন্দর দেখা গেছে ।
আরো দেখ নজর করে
গুনাই বিবি আইস্যা পড়ছে
বিবি কত সুন্দর আছে
দেখরে বাই নজর করে ।

সেই সব দৃশ স্বপ্নের মতো মনের পটে ভেসে থাকে । তন্ময় হয়ে থাকার সময় সুধন মাল আসে । মাখনকে ডাকে । বলে, ঠাকুর নিজে লিখাপড়া শিখতাছ, দেখনা আমার নাতিডারেনি ইস্কুলে পড়ান যায় । বংশেতো হগলতাই গণ্ডমুর্খ । ইডারেনি মানুষ করা যায় ।

সুধন মালের বংশে লেখাপড়া জানা কেউ নেই । রসুলপুরে সুধন দাস নামকরা । গ্রামের তিন ভাগের এক ভাগ তারই বংশাবলী । বড় দুঃখ মনে । কেউ নাম দস্তখত জানে না । নাতিটাকে কোনরকম লেখাপড়া শেখাতে পারলে যেন বংশের একটা মর্যাদা বাড়ে । নাতির নাম হরিচরণ । বয়সে ছোট হলেও মাখনের বন্ধু । মাঠে মাঠে এক সাথে গোল্লাছুট খেলে । উঠোনে উঠোনে হাডুডু । কখনো আমগাছে লাফিয়ে ওঠে, কখনো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দিন কাটায় ।

মাখন ইস্কুলে যায় । অথচ হরিচরণ তারই সঙ্গী হয়ে গণ্ডমুর্খ হয়ে থাকবে । এটা কেমন কথা । সুধন মাল তার নাতিকে ইস্কুলে পাঠালো মাখনের সঙ্গে । মাখনের তখন বড় অহংকার । অভিভাবকের মতো দায়িত্ব । বুঝদারের মতো সে হরিকে বুঝায়, গিয়া কইলাম মাষ্টারবাবুরে প্রণাম করিস । নাম জিজ্ঞাইলে, বাপের নাম জিজ্ঞাইলে ডরাইস না । চটপট উত্তর দিস্ ।

যথারীতি মাষ্টারের সামনে গিয়ে দুজন হাজির । মাষ্টারবাবু ব্রাহ্মণ । কুলীন বাড়ীর ছেলে । কেমন একটা তাচ্ছিল্য ভরে কথা বলে, গাবরের পুত আর চারালের পুতেরা লেখাপড়া শিখলে মাছ ধরব কেডা । বিদ্যা শিক্ষা করতে হইলে জাত বংশ দেখন লাগে । যারে তারে ইস্কুলে ঢুকাইয়া ইস্কুল নষ্ট করন যাইত না ।

লজ্জায় ভয়ে হরিচরণের চোখে জল আসে । মাখনের অহংকারও নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় । অপমানে লজ্জায় মাখন হরিকে নিয়ে ইস্কুল থেকে বেরয় ।

শশী পণ্ডিত ইত্যবসরে জানতে পারেন হরির পরিচয় । সুধন মালের নাতি । এলাকার

বড় জবরদস্ত লাঠিয়াল । রেগে গেলে উপায় নেই । রাগের চোটে আকাম কুকাম করতে পারে । কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে আবার মাখনকে ডাকে ।

-- সুধন মালের নাতিরে তুই লইয়া আইছস, হেই কথা কছনা কেরে । ঠিক আছে, কালকা থাইক্যা তার নাম ইস্কুলের খাতায় লেখুম ।

পরদিন সুধন মাল চান্দুরা বাজার থেকে নাতির জন্য নতুন জামা-কাপড় এনে দেয় । বাড়ীর লোকের আনন্দ আর ধরে না । কৈবর্ত বাড়ী থেকে প্রথম ইস্কুলে যাচ্ছে একটা ছেলে । পাড়ায় পাড়ায় নাতির কীর্তি প্রচার করে বেড়ায় সুধন মাল । ইস্কুলে ভর্তি করানোর কৃতিত্ব মাখনের । মাখন আর হরি দু'জনে মিলে ইস্কুলে যায় । মাখন ওপরের ক্লাসে পড়ে । কখনো সে হরিকে ভাইয়ের মতো পড়ায় । সন্ধ্যাবেলায় কুপি বাতি জ্বালিয়ে হরি যখন পড়ে, দাদু তখন কাছে বসে নাতির পড়া শোনে । ভুল শুদ্ধ বুঝে না । শুধু সুর তুলে নাতির ছড়া পড়া শোনে । বুকের ভেতর অদ্ভুত তৃপ্তি লাগে ।

দেখতে দেখতে সরস্বতী পুজো এলো । মাষ্টারবাবু ইস্কুলে বলে দিয়েছে পুজোয় চাঁদা দু' আনা করে আনতে । হরি গেল মায়ের থেকে দু'আনি নিয়ে ইস্কুলে দিতে । হাতের মুঠোর ভেতর থাকতে থাকতে দু' আনিটা বেশ গরম হয়েছে । সব ছাত্র মাষ্টারের কাছে দু' আনা করে জমা রাখে । মাখনও জমা দেয় । কিন্তু হরি যখন জমা দিতে গেল মাষ্টার সে পয়সা রাখলো না । ধমক দিয়ে বললো, তোর পয়সা দিয়া কি করুম । গাবর চারালের পয়সা রাইখ্যা পূজা করলে দেবীর পূজা করন যাইত না ।

মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করার সাহস নেই । যুক্তি খুঁজে পায় না । কৈবর্তের বুঝি সরস্বতী পূজা করার অধিকার নেই । থাকলে এমন কথা কি মাষ্টার বলতে পারে ।

বাড়ী এলো এক বুক অপমান নিয়ে । পুজোর দিন সকাল থেকেই উপোস থাকে অঞ্জলি দেবে বলে । স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ইস্কুলে যায় । অঞ্জলি দিতে দেবীর সামনে সবাই দাঁড়ায় । মাষ্টার ফুল, বেলপাতা আমের মুকুল মুঠো মুঠো ছেলেদের হাতে বিলায় । হরিও হাত বাড়ায় । মাষ্টার বলে, তুই পরে নিস্ ।

সবার অঞ্জলি শেষ । মাষ্টার হরিকে ডেকে বাসিফুল, শুকনো বেলপাতা, ওপর থেকে হরির হাতে ফেলে । পাছে কৈবর্তকে ছুঁয়ে জাত যায় । হরি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে ওঠে । মাখন প্রতিবাদ করে বলে, স্যার পচা মাংস খাওঅইন্যা কাউয়া মন্দিরে বইলে অশৌচ হয় না, মানুষের পোলা ধরলে পূজা নষ্ট হয় কেমনে বুঝি না ।

কে শোনে কার কথা । ঢাকের আওয়াজে সব চাপা পড়ে যায় । পরদিন থেকে হরি আর স্কুলে আসে না । মাখন তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ইস্কুলে এক নতুন অধ্যায় শুরু করে ।

এর মধ্যে যাজনিক কাজের শিক্ষা চলে একসাথে ।

সন্ধ্যেবাতি জ্বালাতেই খড়ম পায়ে দিয়ে পা ধুয়ে বসতে হতো ধর্মগ্রন্থ নিয়ে । খড়ম জোড়া ছিল ভারী কাঁঠাল কাঠের । পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আর মেঝো আঙ্গুলের ফাঁকে ব্যথা করত । মাদুর পেতে পুরোহিত দর্পণ পেতে যখন মাখন বসতো বাপ থাকতো জল চৌকিতে । তামাক টানতে টানতে ছেলেকে শিখিয়ে দিতো আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম-বিধি । গায়ত্রী মন্ত্র, সূর্য প্রণাম, চণ্ডীপাঠ

থেকে শনির পাঁচালী পর্যন্ত মুখস্ত করে শোনাতে হতো। কখনো আবার তিতাসের চরে গিয়ে কাশবন এনে বড় নিষ্ঠার সাথে ছেলেকে শেখাতো হস্তকুশ বানানোর কলাকৌশল। আড়াই প্যাঁচ দিয়ে গিট বাঁধা তখন বড় কঠিন মনে হতো।

কখনো আবার কলাগাছের ছাল দিয়ে ডোঙ্গা বানানো, মঠ বানানো, দুর্গাপূজার মণ্ডপ আঁকা, কুষ্ঠি বিচার, পঞ্জিকার লগ্ন ক্ষণ বিচার করা কোন কিছুই বাদ পড়ত না। কোথাও ভুল হলে বা একটু অন্যমনস্ক হলে বসন্ত ঠাকুর দুর্বাসার মতো গর্জে উঠতো, বাওনের ঘরে জন্ম লইয়া মন্ত্রতন্ত্র না শিখলে বেটা খাইবি কি কইরা!

শ্রাদ্ধের জায় লিখে দেওয়া বড় কঠিন। যজমানদের মধ্যে কেউ গরীব, কেউ ধনী। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দেয়া এক দুরূহ ব্যাপার। আঠার পুরাণ চৌদ্দ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় কত নিয়ম বিধি, তার চেয়েও দুরূহ লাগতো আভ্যদিক শ্রাদ্ধ, আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধের চুলচেরা নিয়মাবলী। পুষ্প পাত্রের মন্ত্র, পিতৃপুরুষের মন্ত্র, শান্তিজলের মন্ত্র পাঠের মধ্যে কেমন যেন একটা পবিত্র স্নিগ্ধতায় মন জুড়িয়ে যেতো।

মন্ত্র পড়লেই হয় না। নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে চর্চার দরকার ছিল। চর্চা করতো হাতে কলমে। শিখতে বেরোত বাপের সাথে গ্রামে গ্রামে। কখনো নৌকায়, কখনো পায়ে হেঁটে। দূর-দূরান্তের গ্রামে যজমানদের বাড়ী বাড়ী। কারো শ্রাদ্ধ, কারো বা বিয়ে, কারো বর্ত। দড়িতে ফাঁস লেগে কারো গরু মরলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতো। নতুবা অসুখ বিসুখে জর্জরিত যজমান বাড়ীর পাপ খণ্ডনের মন্ত্র পড়তো। এর মধ্যে ছিল মর্যাদায় ভরা এক সুখ, গৌরবের অনুভূতি।

কোন কোন সময় মুসলমানরাও আসতো। উঠোনের বাইরে থেকে জানান দিতো, কর্তা বাড়িতে আছেন নি?

বসন্ত ঠাকুর হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে জবাব দিতো, কেডাও, রমজান নি? আয়! আয়! বাড়ীত আয়।

এমন সোহাগ-সম্বোধন কোথায় পাবে। ঠাকুরের জলপড়া ছেলের গায়ে ছিটাবে। ঠাকুরে দোয়া করলে মঙ্গল হবে। এক অদ্ভুত বিশ্বাসের কাছে হিন্দু-মুসলমান কেন জানি নতজানু হয়ে থাকে।

থাকে বলেই মাছ, দুধ, কলা নিয়ে আসতো শিষ্যসেবক যজমানরা। উঠোনে ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে বসতো। তামাক টানতো। আউশের ক্ষেত কেমন, পাটক্ষেতের ফলন, বা বর্যালি ধানের ক্ষেতে কাকিয়া মাছ ধরার গল্প বলতো। গল্প নয়, আমেজ করা সুখ-দুঃখ মেশানো নিবিড় কোন রূপকথা। শুনতো সে-সব কাহিনী। আলাদা হুঁকো প্রস্তুত থাকতো শিষ্যদের জন্য। বিভিন্ন জাত অনুযায়ী। কোনটা হাল্যাদাসের, কোনটা কৈবর্তের। কোনটা নমসুদের।

মুসলমানদের হুঁকো থাকতো না। ছিল কল্কি ছিলিম। এতে তারাও অপমানকর কিছু ভাবতো না। সহজে সমাজের একটা নিয়ম বলে মেনে নিতো। স্নেহ দরদ মাখা সম্পর্কে এতে কোন সংশয় ছিল না। মুসলমানরা পিঁড়িতে বসে, চলে গেলে জল ছিটিয়ে পিঁড়ি আবার শুদ্ধ করে রাখতেন মাখনের মা।

হিন্দুরাও যেতো মুসলমানদের নানা অনুষ্ঠানে। ইসলামপুরে হোসেন মিঞার নাতনীর

সাদীতে, নতুবা বসির চাচার ঘরে জারি গানের আসর । শুনতে যেতো সবাই । মাখনও যেতো বাপের সাথে । মুসলমানরা ঘোষদের থেকে এনে মিষ্টি জলপানের ব্যবস্থা করতো আলাদা জায়গায় হিন্দুর জন্য । তৃপ্তির সাথে খেয়েদেয়ে হিন্দুরা ফিরতো যে যার বাড়ী । কেউ তুলতো ঢেকুর, কেউ ভাটিয়ালী গানের সুর । দূর থেকে দূরে বিলীন হতো মধুময় মিলন ব্যাঞ্জনা । তিতাস পারের গ্রামগুলি যেন নেচে নেচে উঠতো ছলো ছলো আবেগে ।

কখনো মাখন গেছে বাকাইল হাল্যাদাসদের গ্রামে বাপের সাথে । গেরস্থ বাড়ী । ব্রাহ্মণের প্রতি ছিল অগাধ সমীহ আর ভালোবাসা । গিয়েই হাত-মুখ ধুয়ে বসে পড়ত জলপান করতে । বোম্বাইয়া গুড়, বড় বড় সপরী কলা, চিড়া, ফুট খৈ, দৈ বিরাট থালায় সাজিয়ে এগিয়ে দিতো । হাপুস-হুপুস শব্দে জলপান শেষ হতো তৃপ্তির সাথে । তারপরে স্নান । স্নানের আগে তেল মাখা । বাটি ভরে সরষের তেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যজমানের ঝি না হয় বৌ । তেলের রঙ যেমন গন্ধও তেমন । দেখলেই ক্ষুধার উদ্রেক করে । পেটে, পিঠে হাত পায়ে, আঙুলে, নখে, কনুইয়ে মাখতে মাখতে সারা শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে । কোন কোন দিন তেলের চমৎকার গন্ধে লোভ সামলাতে পারত না বসন্ত ঠাকুর । খালি তেলই ফুরুৎ ফুরুৎ টান দিয়ে বাটি শেষ করতো । কোন কোন রসিক যজমান ঠাট্টা করে বলতো, ঠিক নি কর্তা । মাইনষে যে কয়, বাউনের তিন আঙুল কপাল বাদ দিলে আস্তা শরীলটাই বুলে পেট । কেউ খলো খলো হাসতো । মাখনের মুখ তখন কেমন যেন লাজিয়ে উঠতো ।

লেপেমুছে, জল তুলে, বাসন মেজে ঠাকুরদের রান্নার আয়োজন শুরু হতো । চাল, ডাল, তেল নুন সবজি দিয়ে সিদে সাজিয়ে দিতো যজমান বাড়ীর লোক । ব্রাহ্মণ মানুষ, নিজের হাতে রান্না করতে হয় । ঠাকুর যখন রাঁধে, বাড়ীর মেয়েলোকরা দাঁড়িয়ে থাকে পাশে । কি জানি ঠাকুরের কখন কি লাগে । বিভিন্ন ব্যাঞ্জনের গন্ধে বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠতো, বিরাট বিরাট পাথরের থালায় ঠাকুর আর ছেলে বসতো খেতে । ঠাকুরদের খাওয়া দেখে যজমানদের জিভে জল আসে । গ্রাসে গ্রাসে থালা শেষ । তারপর মিষ্টি দৈ । বাকাইলের ধনী যজমান উমেশ চৌধুরী খাইয়ে খুশী । ঠাকুরের খাওয়া দেখে বলতেন, কর্তা কোমরের চাবিটা খাড়া অইছে না । আরো কিছু লন । চাবি যদি খাড়া না অয় বাউনের খাওন কি পুরা অয় !

বসন্ত ঠাকুরও কম রসিক না । জবাব দেয় তেমনি, রাখ তোমার বাওন । আমরা কি খাই । ঠাকুর্দারা দুই ভাই মিল্যা বুলে আস্তা একটা পাঠা খাইতে পারত ।

উমেশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, এরপর পেট ফুইল্যা বেরাম ধরছে নি ?

-- ডাক্তারে দেইখ্যা কইছিল, আরে উমেইশ্যা, ইটা কি করছস । ঠাকুর্দা বুলে জবাব দিছিল -- ডাক্তারবাবু, বড়ি যাইবার জাগা থাকলে তো আরেকটা রসগোল্লা খাইলাম অইলে ।

ব্রাহ্মণদের পাতের প্রসাদের অপেক্ষায় থাকতো বাড়ী শুদ্ধ লোক । বুড়ো বুড়ি, ছেলে, বৌ সবাই মিলে অমৃতের মতো সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ মুখে নিতো । তাতেই কত পুণ্য, কত তৃপ্তি !

গামছায় পোটলা বেঁধে চাল ডাল সবজীর সিদে নিয়ে নৌকা করে বাড়ী ফিরতো । ঘরে তখন কত আনন্দ । তিন বেলা খাওয়া । যা পেয়েছে তা দ্রুত শেষ করতে না পারলে যেন বড় যন্ত্রণা । কাজেই নিঃশেষ করে খাও । এমনি ধারার চরিত্র । যেদিন নেই, সেদিন উপোস । মাখনের

মা তখন ছুটতো গ্রামে । দানা খুঁজতে যাওয়া মুরগির মতো । কারো ধান কুটতে, না হয় কারো কাঁথা সেলাই করতে বা কারো ধান সিদ্ধ করতে । যাতে কোনরকম রাতটা কোন কিছু দিয়ে কাটানো যায় । মাও জানত শুধু ভালো রান্না করে খাওয়াতে । সঞ্চয়বোধ একেবারেই ছিল না ।

এমনিতে কর্তা কর্তা করে সবাই । ঠাকুরের খড়ম ছুঁয়ে প্রণাম করার লোকের অভাব নেই । কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মণের রাক্ষুসে পেট কে পূরণ করবে । মাখনের বোন সুখদা উপাস সহ্য করতে পারতো না । খাওয়ার বেলা সীমা থাকত না । কিন্তু কথার বেলায় কৃপণ ভাব দেখাতো । ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মাকে প্রায়ই বলতো, পাইলে তো তিন দিনেরতা এক দিনে খাই । না পাইলে তো উপাস থাকন লাগে । কুদিনের লাইগ্যা একমুট চাল রাখন যায় না ।

বসন্ত ঠাকুর চটে গিয়ে জবাব দেয়, ভ্যান ভ্যান করিস্ না মাইয়্যা । বাওনে আবার জমাইব কি । শিষ্যসেবক যজমানরাই আমরার পোলা মাইয়্যা । হেরারে আশীর্বাদ কর । হেরা বালা থাকলে আমরাও বালা থাকুম । বেশী বেশী কইর‍্যা দিব ।

তবুও বিশ্বাস । অনুষ্ঠানের রীতিনীতি পালন হলে অভাব বুঝি দূর হবে । দেবদেবীরা খুশী হবেন । দুর্বার আশা নিয়ে বুলাবুলি পুড়তে যায় মাখন । কার্তিকের শেষ দিনে বুলাবুলি । বাড়ীর মেয়েরা তখন দরজা এঁটে ঘরের ভেতর বসে থাকে । মাখনের মা কুলা আর সবুজ ধানের ছড়া সাজিয়ে রাখে দরজায় । মাখন খড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে জমির আইলে পুঁতে রাখে । ঘর থেকে একটা করে মশা, মাছি, পিঁপড়ে মেরে সিম পাতার পুটলি বেঁধে খড়ের মুখে রাখে । আগুন জ্বেলে বাড়ীর দিকে দৌড়ায় । পেছন ফিরে তাকানো নিষেধ । কার্তিক মাসের পেত্নীর অশুভ দৃষ্টি পড়তে পারে । এসেই ধানের কুলায় গোছা দিয়ে মারতে মারতে সারা বাড়ী সাত পাক ঘুরে । -- বালা আইয়ে বুরা যায় । কার্তিক মাইস্যা পেরেত যায় । টেকা পয়সায় ঘর ভর । ধান চাইলে গোলা ভর ।

ধানের ছড়াটি এনে ঘরের মথনি পালায় বেঁধে রাখে ।

তবুও ব্রাহ্মণ ঘরের অভাব দূর হয় না । বিকট কোন ডাইনীর মত অভাব গোটা বাড়ীটাকে গিলতে আসে ।

বাড়ীর অভাব যখন রাক্ষুসে বাতাসের মতো হু হু করে ঢোকে পড়াশুনায় বসে না মন । সংস্কৃতের মন্ত্রগুলো নীরস কুড়ালের আঘাতের মতো মনে লাগে । ভালো লাগে না কোন কিছুই । রীতিমত খাওয়া যখন দিতে পারে না বাপের শাসন করার দোর্দণ্ড প্রতাপটাও যেন কেমন নিস্তেজ । - পড়াশুনা কর । বাওনের পুত অইয়্যা মুর্খ থাকলে মাইনষে কি কইব । এই জাতীয় কথা তখন মূল্যহীন প্রলাপের মতো মনে হতো মাখনের কাছে ।

যজমানের ছেলে হাছনী নমসুদ না হয় নন্দ দাসের সাথে ছুটে যেতো তিতাসের পারে । মরা গাঙের কিনারে কিনারে । কচ্ছপ, কাছিমের ডিম খুঁজতে । তিতাসের বিস্তীর্ণ চরে কাশবনের কাছে কাছে এঁটেল মাটি বা বালু খুঁড়ে গর্ত করতো কচ্ছপ । গর্তের মধ্যে ডিম ছেড়ে বালু দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতো । তখন আশ্বিন কার্তিক মাস । নদীর জল কমতে থাকে । পাড় ভাঙ্গার ভয় থাকে না । জলে ডুবিয়ে পলিমাটির আস্তরণ জমে না । তখনই কচ্ছপ ডিম পাড়ে । গর্তের মুখে মাটি চাপা দিয়ে কাছিম চলে যায় । কখনো গর্তের ওপর নখের আঁচড়ের দাগ থাকে । কখনো আবার

বৃষ্টিতে ধুয়ে নিয়ে যায় ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয় । তার আগেই মাখন ছুটতো ডিম খুঁজতে । ভোরের দিকে তিন বন্ধু মিলে জলের কিনারে কিনারে হাঁটত । যেতে যেতে কখনো পেয়ে যেতো কচ্ছপের গর্ত । খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতো এক একটা গর্ত থেকে বিশ পঁচিশটা ডিম । মাখনের উপোসী মুখটা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠতো অদ্ভুত খুশীতে । নন্দ জিজ্ঞেস করতো, ডিম পাইছনি ঠাকুরবাই । মাখন তখন জবাব দিত, ডিম না বেডা সোনার খনি পাইছি ।

বাড়ী এসে দেখে বুড়ো ব্রাহ্মণের মেজাজ চড়া । গামছাবাঁধা ডিমের পোঁটলা খুলতেই ব্রাহ্মণ খুশী ভরা চোখে তাকাতো । রাগের ছাপ মিলিয়ে গিয়ে খুশীর ঝলক ছড়িয়ে পড়তো মুখে । ছেলেকে শাসন করার নৈতিকতা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তো । আদরমাখা গলায় বৌকে বলতো, হুনছনি, পোলাডা রাইতঅ কিছু খাইছে না । কড়া ডিমের বড়া বানাইয়া দেওচাইন ।

কখনো ছুটত ভাদ্রের বাদলঝরা রাতে ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে । বৈশাখে বোনা বর্ষাল ধান জল বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে । দশ হাত জল গভীর হলে ধান গাছও বাড়ে দশ হাত । ধান গাছের ফাঁকে বা সাপলা ফুলের ফাঁকে ফাঁকে এক ঠোঁটের সুবল মাছের ঝাঁক ছুটে বেড়ায় । কেউ বলে কাকিয়া মাছ । নৌকায় মশাল দেখে দিশেহারা হয়ে মাছের ঝাঁক আসতো নৌকার পাশে । কুশা দিয়ে বিঁধে বিঁধে নৌকা ভরা শুরু হতো । রূপালী মাছের চেহারায় কেমন মোহময় রূপ ছিল কে জানে ! ঠাকুর বালক পেটের ক্ষুধা ভুলে যেতো । কখন ভোর হয়ে আসতো টেরই পেতো না ।

রাতে পেটে দানা যখন পড়ে না ঘুমও আসে না । ভোর হলেই ছুটে বিলের পারে পারে ।

রসুলপুরের চারদিক ঘিরে বিরাট বিরাট বিল । বর্ষার জলে পাড়ের কোন সীমা থাকে না । কার্তিক অঘ্রানে পাড়ের জল শুকিয়ে জমি বেরোয় । তিতাস নদী কতদিন ধরে বহমান কেউ জানে না । যুগে যুগে তিতাস গতিপথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরে সরে দৌড়ে । ফেলে যাওয়া পথ তখন বিশাল জলাশয় হয়ে থাকে । সেই মরা গাঙে মাছ জমে । পারে পারে দূরে দূরে হিজল গাছ, জারুল গাছ, আর করম গাছ । গাছের ডালে মাছরাঙ্গা, বক বাসা বাঁধে । জলের কিনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছনবন আর বল্লুয়া লতার দোলা । ফাঁকে ফাঁকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে তন্ময় হয়ে বকের ঝাঁক । অথৈ জলের মাঝে ভেসে ভেসে বেড়ায় বালিহাঁসের দল । কোথাও পানকৌড়ি ঝিনুক শামুক খুঁজে খুঁজে ডুব দেয় । আবার উড়তে উড়তে ডানে বাঁয়ে গলা বাড়িয়ে সঙ্গিনীকে কি যেন ইশারা জানায় । কখনো বা ফরালী কচুরীপানার ঝোপে ঝোপে ডানা ঝাপটে বড় নিচু হয়ে বাঁশের খড়ম পায়ে দিয়ে চলা কিশোরী বালিকার মতো পা তুলে তুলে ছোটে ।

তখন কার্তিক মাস । সন্ধ্যেবেলায় মাখনের সঙ্গী রমানাথ দাস, নন্দ দাস । পাখীর ফাই পাতে । তখন অনেক দূরে কৈবর্ত বউয়েরা তৈ তৈ তৈ ডাক দিয়ে ঝিল থেকে পালা হাঁস ডেকে আনে । দূরে দূরে মেঠো পথ ধরে ঘরেফেরা গরুর পালের পিছু পিছু রাখালেরা বাঁশী বাজিয়ে গান গায় । কেউ বা তখন নৌকা নিয়ে মাল বোঝাই করে বাড়ী ফেরে । কেউবা তখন জাল ফেলতে নৌকা নিয়ে তিতাসের দিকে যায় । কৈবর্ত পাড়ায় উলুধ্বনি দিয়ে সন্ধ্যের ধূপদীপ জ্বালায় কোন বালিকা বৌ ।

তখনই পাখি ধরার জাল পাতে জলের ওপর। তিনশ চারশ খোপ। উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক দিশেহারা হয়ে ঝাপ দেয় জলের ওপর। ঝোপে আটকায়, গলায় ফাঁস লাগে। পাখা যত নাড়ে গলায় ফাঁস ততো বেশী জড়ায়। ভোরে গিয়ে বড় ডুলা ভরে পাখী ধরে ব্রাহ্মণ কিশোর। কখনো পাড়েই বিক্রি হয়। কখনো ডুলা ভরে পাখী বেচতে নিয়ে যায় চান্দুয়া চড়ায়। নিজে পাখী বেচে না; বেচে কৈবর্ত সঙ্গীরা।

সব দিন পাখি মেলে না। তবুও পাখী ধরার পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরত যখন বসন্তের উপোসী মুখটায় অদ্ভুত এক প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়তো।

কখনো কার্তিকের শেষ রাত্রে বুড়ি ডুলা আর পেলইন জাল নিয়ে ছোটে ঝিলের দিকে। বোরো ধানের ক্ষেতের কোণায় জাল খেউ দিতো। শিং, মাগুর, লাটি উঠতো। ফুটকি বনে কচুরী পানার ঝোপে থাকত জিয়ল কৈ খইলসা মাছ।

ওই মাছ বিক্রি করাতো বন্ধুদের দিয়ে। খেজুর-গুড় খেতে খেতে বাড়ী ফিরতো এক সের চাল নিয়ে।

এত অভাব। তার মধ্যেও আবার আত্মীয় কুটুম যায় আসে। কেউ যায় নায়র। রসুলপুর থেকে পত্তন গ্রাম মাইল সাতেক দূর। মাঝখানে বিরাট একটা হাওর। পত্তন গ্রামে মাখনের বোন যশোদার বাড়ী। একদিন যশোদা এলো বাপের বাড়ী। এসেই দেখে বাপের বাড়ীর অবস্থা কাহিল। বাড়ী জুড়ে এক মুঠো চাল নেই। ভাঙ্গাটুটা খড়ের ছানি। কাকে ঠোকরানো চালার বাঁশ পাঁজরের মতো বেরিয়েছে। ঝকঝকে বাড়ীটার এখন লক্ষ্মীছাড়া ভাব। সন্ধ্যেবেলায় বাতি জ্বালবার লোক পর্যন্ত থাকে না। রিক্ত বাতাস শুধু হাহাকার করে ওঠে।

বাড়ীর বড় মেয়ে। আগে নায়র এসে সাধ মতো ভালো মন্দ খেতে পারতো। এখন ভালো মন্দ দূরের কথা পাতে একটা সেদ্ধ শালুক পর্যন্ত জুটে না। যে বসন্ত ঠাকুরের চোখ দিয়ে ব্রহ্মতেজ ঠিকরে পড়তো সেই ঠাকুরের চোখের কোলে ঘন ঘন উপাসের কালো ছায়া।

মায়ের অবস্থা আরও করুণ। গায়ে একটা লাল পাড়ের ধূসর শাড়ী। স্নান করতে গিয়ে ভিজালে বদলাবার উপায় নেই। একটা অংশ গায়ে জড়িয়ে আরেক অংশ বাতাসে মেলে ধরে শুকায়। যশোদা আগে এলে আব্দার অভিমান করতো, ফরমায়েস মতো কিছু না পেলে। এখন আব্দার থাক, একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। নায়র এলে বাপ যেতো চান্দুয়া বাজারে। নিজের হাতে বড় চিতল মাছ, ছিটের শাড়ী, পচ্ছন্দ মত তেল সাবান চুড়ি, জামাইয়ের ধুতি নিয়ে আসতো তাতেও কখনো কখনো যশোদার চোখ ভরতো না। নায়র থেকে ফেরার পথে তিলবাজাল চালের পিঠা, খেজুর গুড়ের চাকা, দৈ, মিষ্টি বেঁধে দিত বেহান বাড়ীর জন্য। এখন অবশ্য মায়ের জন্য কাপড়, মাখনের জন্য জামা, কিছু চাল ডাল নিয়ে নায়র আসে যশোদা।

নায়র আসা এখন এক বিড়ম্বনা। বাপের অসহায় কষ্ট দেখে নিজেরই অস্বস্তি লাগে। বাপও ভাবে নিজের মেয়ে হলেও এখন পরের বাড়ীর বৌ। তাকে উপাসে রেখে কষ্ট দিতে মন মানে না। তাছাড়া নিজের অভাবের কথা জামাই বাড়ীর লোকেরা জেনে গেলে মর্যাদার হানি হবে। কোনরকম মেয়েকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। দুদিন যেতে না যেতেই মাখন আনলো একটা কিরায়া নৌকা। মাঝি ঘাটে নৌকা বেঁধে ঠাকুর বাড়ী তামাক খেতে আসে। যশোদা বুঝে

মাঝিটা যে নমসুদ্র। হাটুর উপর ধুতি, কাঁধে গামছা গায়ে গেঞ্জি, মাথায় বাঁশের ছাতা। নাকের নীচে বিরাট গোঁফ। নৌকা বাঁধার সময় ধুতিটা মাথায় বাঁধে। সঙ্গে বাঁশের চোঙা। চোঙার গিটের একপাশে তামাক, অন্য দিকে টিক্কা। পদ্ম ফুল আঁকা টিনের বাক্সে কাপড় চোপড় ভরে যশোদা ফিরে যাওয়ার আয়োজন করে। বসন্ত ঠাকুর উঠোনে জল চৌকিতে বসে তামাক টানে। অসহায় মানুষ। কর্তব্য পালন করার মতো কোন ক্ষমতা নেই। এমন একটা ভাব। দুঃখে চোখ ছলছল। মেয়েটাকে একবেলা পেটভরে খাওয়াতে পারে নি। মাখন রওয়ানা হলো দিদিকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিতে।

প্রতিবেশী গুরুজনদের আর বাপের পায়ে মাথা ঠুকে ঘোমটায় চোখ মুছে মুছে ঘাটের দিকে নামে। মাখনের মা ছুটে গিয়ে যশোদার কনিষ্ঠা আঙ্গুলে কামড় দিয়ে থুথু ছিটায়, মঙ্গল কামনার ব্যাকুলতা নিয়ে। তিন কোশ জল ছিটিয়ে প্রণাম করে নৌকায় ওঠে যশোদা। আলতামাখা পা দুটো ধীরে ধীরে এগোয় নৌকার ছইয়ার ভেতরে। গৃহলক্ষ্মী যেন দেশান্তরী হচ্ছে বেদনা ভরা বুকে ধীর পদক্ষেপে। ছইয়া মানে নৌকার গোলাকার কোঠা। ছইয়ার সামনের দরজায় নীল রঙের ময়ূরপঙ্খী আঁকা। মাঝির দিকে শাড়ী জড়িয়ে পর্দা টাঙানো। মাঝির মুখ দেখা যায়। মাঝি কিন্তু দেখে না। যশোদা ঘোমটায় মুখ ঢেকে পাটাতনে বসে। বাইরে গলুইয়ে বসে মাখন। ময়ূরপঙ্খী নায়রী নৌকা বদর বদর এগোয়। অচিন গাঙের মাঝ দরিয়ায় মাঝি তখন ঘরের কথা ভাবে। অমন ঘোমটা টানা কলা-বউ তারই পথ চেয়ে গাঙের পারে বসে আছে। ভাবে বলেই নীল দরিয়ায় বিরহ ভরা ভাটিয়ালী গান গায়। ঝিরি ঝিরি বাতাসে পাল ওড়ে শোঁ শোঁ। ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাঁচে। কেউ বাসন মাজে। সব থামিয়ে শাড়ীর পর্দা টাঙানো নায়রী নৌকার দিকে চায়। বাপের বাড়ীর টানের এক ব্যাকুলতা তাদের বুকেও উথাল পাথাল ঢেউ তুলে।

মাঘ ফাল্গুনে খাল বিল শুকায়। বিল ভরে থাকে সিংরা লতায়। শ্যাওলা জমে সিংরা লতায় জট পাকিয়ে। কিশোর বালক-বালিকারা বালিহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে সিংরা পাড়তে বিলের জলে ঝাপাঝাপি দাপাদাপি শুরু করে। মাখন ঠাকুরও যায় সিংরা পাড়তে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের খুদ কুড়া থাকে না যখন শালুক সেদ্ধ করে এক আধ বেলা কাটানো যায়। জলে যখন সবাই নামে, কেউ ডুবে, কেউ সাঁতার কাটে, কেউ চীৎকার করে মহা উল্লাসে। শালুক খুঁজে। কেউ তুলে গাঙ কলা। অনেক মেয়ের মতো নন্দর বোন সুমিত্রাও যায় কলস নিয়ে। কলস উপুর করে বুকের নিচে রেখে কৈবর্ত বালিকা সুমিত্রার কি উদ্দামতা! মৎস্যগন্ধা কন্যা যেন জলকেলী করে। মাখন ঠাকুরকে কেমন যেন আত্মভোলা করে তুলতো। ঢেউ-এর দোলায় যৌবন দোলে। খলো খলো হাসে। কখনো জলের ঝাপটা দিয়ে ঠাকুরের মুখে ছিটায়। ভেজা শরীর আঁচলে জড়ানো দেহের ভাঁজে ভাঁজে জাগে বাঁধনহারা রক্তের ছলকানি। লজ্জা সরম ভুলে ছেলে ঠাকুরের কাঁধে হাত রেখে ভাসতে ভাসতে চলে। বাওনের পুত! দেস না কয়ডা সিংরা তুইল্যা। গুড়ি বানাইয়া তোরেও পিঠা খাওয়ামু। সুমিত্রার কণ্ঠস্বর তাকে অবশ করে তুলে। নিরাবরণ দেহের পরশে জাগে শিহরণ। পানকৌড়ির মতো জলে ডুবে সিংরা খুঁজে। সিংরা কাঁটার আঁচড় লাগে গায়। তবু মধুময় উপদ্রবের ছোঁয়ায় বুকের গহীনে কেন জানি উথালি পাথালি করে। না বলতে পারে না। কলের পুতুলের মতো সিংরা পাড়তে থাকে।

আসতে যেতে মাখন ঠাকুর নন্দর ঘরে যায় । সুমিত্রা বাসন মাজার ভান করে ঘন ঘন দেখা দেয় । ডাগর কালো চোখ ভরে থমকে থাকে কেমন ধরনের তন্ময়তা । মাখন ঠাকুরকে নিয়ে পাড়ার মেয়েরা নানারকম রটনা রটায় । কেউ বলে সুমিত্রার হাতের যতো কাঁচের চুড়ি মাখনেরই দেওয়া । কেউ বলে পেটুক ব্রাহ্মণ, পেটের দায়ে জাত মারতে বসেছে । কেউ বলে পীরিতির আঠা জাত বিচার করে না । লাগলে আর ছাড়ে না ।

বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ । তিতাস পাড়েও পিঠা ভাজে নমসুদ কৈবর্ত বৌরা । গন্ধে চারদিক ম ম করে । একদিকে আউস ধান কাটে । কেউ ধান মাড়াই করে । কেউ আবার ধান শুকিয়ে গোলায় তুলে । একই মরশুমে আবার হালও চালায়, আমনের বীজ বুনে । আইল বাঁধে । ধান রোয়া দেয় কেউ । মেয়েরা দক্ষিণা বাতাসের মুখে কুলা থেকে ধান ছাড়ে । বাতাসে উড়ায় ধানের চিটা, তুষা ধান । যখন বাতাস থাকে না ডালা দিয়ে ধান ছড়িয়ে দিয়ে, ঘুরে ঘুরে কুলা দিয়ে বাতাস করে ধান পরিষ্কার করে । গেরস্থের ঘরের ব্যস্ত মাস । হাড়ভাঙ্গা খাটুনি চলে নারী-পুরুষের । শক্ত সমর্থ্য শরীরগুলো বিশ্রামকাতর হয়ে ওঠে । উঠোনে যখন ধান শুকায়, হঠাৎ-বৃষ্টি আসে । হৈ হৈ করে শিশু বুড়ো নারী পুরুষ সবাই মিলে ধান জড়ো করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ।

তখন ভাদ্রের শেষ দিন, শুরু হয় বর্ত । কারো বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী বর্ত, কারো বাড়ী কানখাই ঠাকুরের বর্ত । কারো বাড়ী বুড়া-বুড়ি বর্ত । সিদ্ধেশ্বরী বর্ত করলে যার যেমন ইচ্ছা পূরণ হয় । ধনে জনে পূর্ণ হয় । কানখাই ঠাকুরের বর্ত করলে কান পচা লাগে না । কুষ্ঠ হয় না কারো । যাবতীয় চর্মরোগ রোধ করে । বুড়াবুড়ি বর্ত করে আরাধনা করলে শিশুরা দীর্ঘ আয়ু পাবে বুড়োবুড়িদের সঙ্গে ।

সোনাধনের বাড়ী জুড়ে গমগম । মেরা পিঠা, পাটি পিঠা, পুলি পিঠা তালের পিঠা বানানোর আয়োজন । সোনাধনের বৌ আর মেয়ে সুমিত্রা দুজনে দুই উঠোনে সিঁদুর দিয়ে বুড়োবুড়ির মূর্তি আঁকে । মাস কলাই, মুগ, সরিষা, বুট, মটর, তিল, আমন ধান, সিমের বীচি আট ধরণের বীজ অঙ্কুরিত করে মূর্তির চারদিক ঘিরে সাজিয়ে রাখে । নন্দর মা তখন পরস্তাব বলে । সুমিত্রা তখন চুপি চুপি ভালো ভালো পিঠা লুকিয়ে গামছায় বেঁধে রাখে ধানের ডুলায় ।

সন্ধ্যেবেলায় যখন মাখন ঠাকুর ভাটিয়ালী গান গেয়ে গ্রাম থেকে বাড়ীর দিকে ফিরে, রাস্তার পাশে জাম্বুরা গাছের তলায় সুমিত্রা অন্ধকারে পিঠের পুটলি নিয়ে অপেক্ষা করে । ব্রাহ্মণ ছেলে । প্রকাশ্য ঘরে ডেকে খাওয়ালে জাত যাবে । তা ছাড়া মাখনও ইতস্তত করবে । মাখন যখন কাছে আসে, ঝোপের আড়াল থেকে বেরোয় সুমিত্রা । চাপা গলায় বলে, বাওনের পুত, ছোট-জাতের হাতের রান্না তো কোনদিন খাইছ না । খাইয়্যা দেখ কেমন লাগে ।

মাখন প্রথমে হতচকিত হয়ে যায় । সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝে মুচকি হেসে বলে, তোমার হাতের তিতা পিঠাও তো মিঠা লাগব ।

ধান কুটতে গিয়ে নন্দর পিসির সাথে সুমিত্রার ঝগড়া বাঁধে । কথার পিঠে কথা । এক সময় রাগের চোটে মুখ ফসকে খুটা দেয় সুমিত্রাকে, ছিনাল মাইয়্যা, বাওনের পুতে পীরিত কইরা চুড়ি দিছে হেইডা যেমন মাইনষে জানে না ।

সুমিত্রা ফুলে ফুলে এমন একটা ভাব দেখায়, জানে জানুক, বলে বলুক । সব আন্দাজে পল

বাওয়ার মতো ব্যাপার । সঠিক করে কেউ দেখেনি কিছু । না দেখেলেও বিশ্বাস করে সহজ ভাবে সবাই । সুমিত্রার সেই প্রতিবাদহীন নীরবতা, পাড়াপড়শীদের কাছে সন্দেহ ঘনিয়ে তুলে ।

মাখন যখন এত কানাঘুষা শুনে, লজ্জাও লাগে ভয়ও করে । বিশেষ করে নন্দর বাপ সোনাধন । কি রাগী মানুষ । হাল বাইতে যাওয়ার সময় নন্দর মাকে বলেছিল নাস্তার জন্য সাগরগঞ্জের আলুসেদ্ধ পাঠাতে । দেরী দেখে হাল ছেড়ে বাড়ী এসেই পাজইন দিয়ে নন্দের মাকে গরুর মত পিটে, বলে, কথার এদিক সেদিক অইলে পিঠের চামড়া তুইল্যা লামু । ক্যারে পুতেরে দা আলু পাঠাইলি না ।

তখন থেকে সোনাধনকে ভয় করে মাখন । তার উপর এলাকার মোড়ল । কখন জানি কি মনে নিয়ে কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে । ভাই ভাতিজা ছেলে মিলে গোটা ত্রিশেক লাঠিয়াল বেরোয় এক ডাকে এক ঘর থেকেই ।

অন্যদিকে ছেলেবেলা থেকে নন্দর সাথে খেলতে, দৌড়তে মাছ ধরতে একাত্ম হয়ে ঘুরেছে । সেই স্থলে ওই বাড়ীর লোকেরা কি ভাববে যদি এই শোনে ।

মনের দুঃখে নন্দর বাড়ীতে যাওয়া ছেড়েই দিল মাখন । ছাড়লেও কি মন মানে, সুমিত্রার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে । সুমিত্রাকে ভালোবাসে. ভালো লাগে এমন কথা বলার সাহস নেই । ভুলতে চায় সুমিত্রার মরমী আব্দারগুলো । যত ভুলতে চায় তত বেশী শরীর মন সুমিত্রার দখলে যায় । মাঠে, গাঙে, বিলে শুধু সুমিত্রার ডাগর চোখের চাউনি যেন করুণ হাতছানি দেয় । অভাব অনটনের মাঝে মাঝে বুকে তুফান ওঠে অন্য এক অভাবের তাড়নায় ।

বর্ষার থৈ থৈ জলে তিতাস মেঘনার গাগট বোয়াল লাটি শৌল রুই ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে বিলে, মরা গাঙে । বাসা বাধে, ডিম ছাড়ে । কোথাও কোথাও কচুরীপানা শ্যাওলা ইচাবন জমে দ্বীপ হয়ে মাঝে মাঝে ভাসে ।

একটা দুটো বিল নয় । অনেকগুলো বিল । চাতল বিল, রোয়া বিল, বাঘজোড় বিল । বিলের মালিক সরকার । ইজারা রাখে মহাজনরা । শ্যামাবাবু, বাঞ্ছারাম সরকার, বিপিন সরকারের মতো লোকরাই এখানকার বড় মহাজন । সারাটা বছর মরা গাঙে লোক খাটায় । কাটা গাছ, বিশেষ করে জারুলের ডাল, হিজলের ডাল কেটে গাঙে ফেলে । গাছের ডালপালায় শ্যাওলা জমে । শ্যাওলার খেতে মাছ জমে । তখন নৌকা বাওয়া নিষেধ ।

সারাটা বছর মাছ আমদানী হয় নদী নালা থেকে বিলগুলির দিকে । পারের জমি ডুবে । মহাজনরা লাঠিয়াল পাঠিয়ে নৌকা দিয়ে বিল পাহারা দেয় । বিলের পারের জমিতেও মাছ ধরতে দেয় না । মাছ ধরা দূরের কথা গরু নামিয়ে স্নান করাতেও দেয় না । জাল বড়শী কেড়ে নেয় । গরু ছিনিয়ে নেয় । কেউ আবার পাখী শিকারেও নিষেধ করে । একটা বাঁশ পুঁতে জলের মাঝখানে রাখে । বুঝা যায় পাখীর ফাঁদ পাতা নিষেধ । দত্তখলা গোয়ালখলার কৈবর্ত নমসুদরাই ছিল মহাজনদের সেরা লাঠিয়াল । মহাজনের কর্মচারী লাঠিয়ালরা ছাড়া বন্দুক হাতে নৌকা দিয়ে টহল দেয় । দোর্দণ্ড প্রতাপ তাদের । ওদের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই ।

আশ্বিনের শেষে মরা নদীর মুখে সাতক থেকে আনা নলের বাড়ি দিয়ে মুখে বান্ধ দেয় । অঘ্রান মাস এলেই বিলের পারে খলা বানায় মহাজনরা । বিরাট বিরাট বেঁরজাল নিয়ে মাছ ধরতে

নামায় জেলেদের। কাতল, চিতল, রুই, গনিয়া, টেংরা, বজরী, পুটি, গাগট, শোল, গজার কোন কিছুই বাদ পড়ে না। ঝিলের পারে খলার ওপর শামিয়ানার মতো জাল টাঙ্গিয়ে রাখে। কাক চিলের হাত থেকে বাঁচাতে।

নারী পুরুষ কাজ করতে বসে। বিধবাদের সংখ্যাই বেশী। প্রথম আঁশ ছাড়ায় পুরুষেরা। বিরাট বিরাট বটি দা নিয়ে খচ্ খচ্ আঁশ ছাড়ায়। আঁশ ছাড়ানো মাছ ছুঁড়ে দেয় আরেক বিধবার কাছে। ওরা মাথাটা আলাদা করে। অন্যরা আবার সেই মাছের পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে। কাটা মাছ রোদে শুকোতে দেয় পুরুষরা মাচার ওপর। মাছের গন্ধে মাছি ভনভন করে। পচা মাছের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়ায়। তার মধ্যে শত শত লোক দিনরাত অবিশ্রান্ত কাজ করে যায়।

জল শুকোতে আরম্ভ করলেই আমাশয়, ওলাওঠা এখানে স্থায়ীভাবে বাসা বাধে। মানুষ মরে বিষ-দেওয়া জলের মাছ মরার মতো। ঔষধ পথ্য বড় বিরল। ডাক্তার বৈদ্য নেই বললেই চলে।

এমনি একটা বিলের নাম বাঘজোড়। ইজারা রাখে বাঞ্ছারাম সরকার। চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ জন মেয়ে-পুরুষ বাঞ্ছারামের খলায় রোজ কাজ করে। খলায় যখন কাজ চলে লোকজন খলাতেই খায়, ঘুমায়। যজমানি দিয়ে বসন্ত ঠাকুর চলতে পারে না। অনাহারের জ্বালায় দিশেহারা। বাঞ্ছারামকে বলে কয়ে কোনরকম মাখনকে খলায় পাচকের কাজে ঢুকিয়ে দেয়।

ভোরের আকাশে যখন ক্লান্ত জেলের চোখের মতো তারাগুলো বিবর্ণ হয়ে ওঠে মাখন তখন খলায় উনুন ধরায়। মাছ ধরার জেলেরা ডুলা নিয়ে বেরজাল কাঁধে করে বিল গাঙে ছোটে। কয়েক খেউ দিয়েই তাদের ক্ষুধা বাড়ে। ক্ষুধা কি সাধারণ ক্ষুধা। সময়মত খাওয়া না পেলে ঠাকুরকে পযর্ন্ত গিলে খাওয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়। তাড়াহুড়ো করে কড়াই, হাঁড়ি উনুনে চাপায় ঠাকুর। সঙ্গে যোগালী চারজন মেয়েছেলে। আগে ছিল তিনজন। ঠান্ডার মা, তুফানী দাস আর সীতা। মশলা বাটার জন্য পরে এসে যোগ দেয় সুমিত্রা। শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা খলার কাজে আসবে কোনদিন ভাবতে পারে নি। সুমিত্রারও ধারণা ছিল না মশলা বাটার কাজে এলে নিজের দুঃখে ফাটা বুকটাকেই বাটতে হবে।

সুমিত্রা আগের চেয়ে আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। পিঠে বিশাল ঝরনার মতো ছড়ানো চুলের রাশি। মশলা বাটে, হাতের চুড়ি ঝমর-ঝমর বাজে। ঠাকুরের বুকে যেন মিষ্টি সুরে একটা ঘুঙুর বাজে। রঙ কালো ; তবুও দেহের গড়নে ছড়ানো ভরানো যৌবনের বেসামাল ভাব। ঠাকুর প্রথম দেখতেই মনে মনে কঠিন শপথ নিয়েছিলো। যত কলাকৌশলই দেখাক না কেন, এবার সে শক্ত হবে। কিন্তু বললে কি হবে। শক্ত জমে যাওয়া মাখন অমন যৌবন উনুনের পাশে থেকে থেকে না গলে পারে না।

মাছ কাটুনি তুফানি বলেই ফেলে, ঠাকুরবাই ! মশলা বাটুনির চাওনডা কইলাম বালা না ! সাবধানে থাইক্য। সুমিত্রাও শুনতে পেয়েছিল। পেঁয়াজের বা রসুনের ঝাঁজে, নাকি পীরিতির জ্বালায় কাঁদে কে জানে। দিবানিশি শুধু চোখের জলই ফেলে। ঠান্ডার মা অভিজ্ঞা নারী। হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ব্যথা জাগাতে ভালবাসে। সুমিত্রাকে বাসন ধুতে গিয়ে বলে, বাওনের পুত সুন্দর গান

গায় । তুই আইবার পর দেখি গান ছাইর‍্যা দিছে । বুঝিনা লো পুরুষের মন কোন দিক দিয়া খেউ মারে ।

দেখতে শুনতে ঠান্ডার মা শান্তশিষ্ট । অল্পবয়সী বিধবা । ভরা যৌবনে বিধবা হলে কত জ্বালায় মানুষ জ্বলে পোড়ে । স্বামীর নাম রাইচান দাস । গোয়ালখলায় কৈবর্ত পাড়ায় বাড়ী ছিল । বেটে খাটো দুঃসাহসিক জেলে । পেয়ারী মহাজনের মহালের জেলে হয়ে রাতভর মেঘনার বুকে নৌকা নিয়ে খেউ মারতো । কি বর্ষা কি শীত, তিতাসের বুকে না, মেঘনার মোহানায় বের জাল টানতে ছুটতো । বিরাম ছিল না ।

মেঘনার জল নীল । আরশির মতো স্বচ্ছ । জলের নিচে স্রোত বড় বেগবান । মেঘনা যখন খুশী নৌকা ভরে কাতল, চিতল, রুই, মিরগা উঠিয়ে দেয় । কখনো আবার মেঘনা ক্রুদ্ধ রাক্ষসী । তুফান এলে নৌকা ডোবে । শত শত লোক বোঝাই লঞ্চ পর্যন্ত টেনে মুচড়ে অতল তলে গ্রাস করে নিয়ে যায় । কখনো মাস্তুল ভেঙ্গে ছোট ডিঙ্গি নৌকার অসহায় জেলেকে পর্যন্ত পাল সহ গিলে গিলে অজগরের পেটে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা করে ।

ঠান্ডার মা যখন গোয়ালখলার কৈবর্ত পাড়ায় বিপদনাশীনির পুজো দেয়, রাইচান তখন ঘন বর্ষায় মেঘনার বুকে জালের খেউ মারে । ভৈরবের কুরে জাল আটকে যায় । নিচে ডুবে জাল না ছাড়ালে কিছুতেই জাল আসে না । অন্য জেলেরা ভয়ে কেউ নামতে রাজী নয় । ভৈরবের কুর বড় মারাত্মক । চক্কর দিয়ে জলের স্রোত ওখানে ঘোরে । বড় বড় বেপারী নৌকা পর্যন্ত কোন কোন দিন সোজা করে ডুবিয়ে দেয় । মেঘনার অতল গহ্বরে গলুই পর্যন্ত পুতে রাখে । কুর না যেন, কয়েকটা মত্ত হাতির শক্তি নিয়ে জল সেখানে উন্মত্ত হয়ে নাচে । দুনিয়ার যত মাছের ঝাঁক কুরের মধ্যে ঘোরে । কোনরকম একটা খেউ মারতে পারলে, দশ খেউয়ের মাছ এক খেউয়ে ওঠে । কুর যেন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গ । ভিতরে মৎস্যনারীরা খেলা করে । সেই দুর্গে ঢুকে মৎস্যরানীর দেখা পাওয়া জীবন বাজী ধরলে সম্ভব ।

কেউ নেমে জাল ছুটাতে সাহস করে না । এ ওর মুখের দিকে তাকায় । রাইচানের অত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভালো লাগে না । কৈবর্তের পুত অইয়া কুরে নামতে ডর লাগলে কেডা যাইব এই কাম করত । ঝাপ দেয় কুরের ভিতর । জাল ভাঙা নৌকার ডুবন্ত গলুইয়ে আটকে গেছে । গলুই থেকে জাল খুলতে গিয়ে নিজেই জালে জড়িয়ে যায় । নিশ... আটকে সেখানেই মারা যায় রাইচান ।

দুদিন পর মহালদার এসে ঠান্ডার মা... ...র জানায় । ঠান্ডার মার আর কেউ নেই । তিন মাসের শিশু ঠান্ডাকে নিয়ে বিলের খলায় খলায় মাছের পেট কাটা, মাথা আলগা করার কাজে ঢোকে । মানুষের দুঃসময় এলে একসাথে বিপদ আসে অনেক দিক থেকে । বাঘজোড় বিলেই কাজ নেয় । পুরুষেরা মাছের আঁশ ছাড়িয়ে মাছ ছুঁড়ে দেয় বিধবাদের কাছে । বড় বটিদা নিয়ে বিধবারা মাছের গলা কাটে, পেটের নাড়িভুড়ি বের করে । তখন রাত দুপুর, ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু । কোলে আবার শিশু । ঘুমের ঘোরে মাছের গলা কাটতে গিয়ে কোলের ঘুমন্ত শিশুকেই কেটে ফেলে । তখন থেকেই বাঘজোড় বিলের আরেক নাম পোনা কাটা খলা ।

দুঃখ ভরা বুক চাপড়ে চাপড়ে ঠান্ডার মা ...লায় খলায় কাজ করে ।

সন্তান স্বামী সব হারালেও যৌবন আছে । কখনো কখনো স্বামীর সুখভরা স্মৃতি উঁকি দেয়

মনে । ভালোবাসার মর্ম তাকে কাঁদায় বলেই সুমিত্রার না বলা ব্যথা বুঝতে পারে । বিচ্ছেদের গান তাকে উতলা করে । বুকে ওঠে শূন্য এক হাহাকার ।

সুমিত্রা একদিন ভোরবেলা উনুনের পাশে ঠাকুরের কাছে মিনতি করে বলে, অনেক দিন ধইর‍্যা ঠাকুর তুমি গান গাও না । আইজকা বিচ্ছেদের গান গাওন লাগব । ঠাকুর নির্বাক । চুপ করে আপন মনে লাকড়ি ঠেলে ঠেলে বিড়ি টানে । সুমিত্রা নাছোড়বান্দা । চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নিঃশব্দে ঠাকুরের পায়ের কাছে পড়ে । আবেগ জড়ানো গলায় আবার মিনতি করে, ঠাকুরবাই ! অবলা মাইয়্যা অইয়া একটা কথা কইলাম । হেইডা বুঝি তোমার মনে লয় না । ঠিক আছে, কালকা থাইক্যা রসুই ঘরে থাকতাম না । খলার কাজে যামু । শান্তিতে থাইক্য তুমি । অভিমানে ব্যথায় কাতর চোখের মধ্যে ছিল ব্যাকুল বাসনার এক আর্তি । সেই আর্তির সামনে ঠাকুরের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে অদ্ভুত আবেগে । সুমিত্রার কান্না জড়ানো কণ্ঠের শব্দগুলো বুকে বটি দায়ের আঘাতের মতো লাগে । দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর গলায় সুর তোলে—

শ্যাম বিনোদিয়া
হায়রে, রস বিনোদিয়া
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে
আইলা কি লাগিয়া ।
ছুইওনা ছুইওনা শ্যাম
দূরে গিয়া বসো
কালিন্দি যমুনার জলে
ছান করিয়া এসো
তোমার অঙ্গ দেখি ছিন্ন ভিন্ন
পায়ে শিশিরের রেখা
মাথার উপরে ময়ূরের পাখা ।

জেলেরা কাছে পিঠে কেউ নেই । একেবারে স্বাধীন বাঁধন হারা সুর । গানের এক মরমী মূর্চ্ছনায় বিভোর হয়ে ওঠে রসুই ঘর । দেখতে দেখতে সুমিত্রা অন্য এক পৃথিবীতে চলে যায় । ঠাকুরের মাথায় ময়ূরপাখা খোঁজে । কখনো আলিঙ্গনে বিভোর হয়ে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে । লজ্জা সরম উড়ে গেছে উনুনের ধোঁয়ার মতো । এত দিনের হারানো সুর নতুন বেগে ছুটে চলে । বর্ষার টলোমলো তিতাসের বেগবান ধারার মতো । ঠাকুর যেন এক নতুন অবতার হয়ে দু'বাহু তুলে নাচ শুরু করেছে । লোকজনের সামনে ঠাকুরের সাথে সুমিত্রা কথা বলতো না । তবে ঠাকুরের সাথে সুমিত্রার বায়াপির কথা তখন খলার মুখে মুখে রসের কথা হয়ে ঘুরে বেড়ায় ।

বাঞ্ছারাম মহাজন কার্তিক মাসে বিলের খলায় গঙ্গা পূজার আয়োজন করে । মাখন ঠাকুরই পঞ্জিকা দেখে দিন তারিখ বেছে নেয় । তিথি অনুযায়ী বাঞ্ছারামের বৌ, ছেলে, মেয়ে, জামাই দল বেঁধে আসে । গ্রামের মোড়ল আত্মীয় স্বজনরাও এসে ধূমধাম করে ভিড় জমায় । মাটির বেদী বানিয়ে মূর্তি বসানো হয় । ঢাকীরা বাজায় ঢাক । মোড়লরা তামাক টেনে গল্প বলে । কেউ আবার পানের থালার পাশে বসে পান চিবোতে থাকে । নতুন ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বাঞ্ছারাম

ব্যস্ত । অখিল সরকার আর গিরিশ মোড়ল গাঁজায় দম টেনে বিভোর হয়ে বসে ।

বাঞ্ছারামের বৌ ঘোমটা টেনে উলুধ্বনি তোলে । সেদিন মাছ ধরা নিষেধ । কর্মচারী, জেলে, ভালো কাপড়ে সেজেগুজে, চুল পরিপাটি মাথায় এদিক ওদিক ঘোরে । বিলের মধ্যে মাছ । বাইরে থেকে হিসাব করা কঠিন । গঙ্গার পেটের খবর কেউ জানে না । গঙ্গা খুশী হলেই ঢেউ ভরে ভরে সোনা রূপা দেবে । গঙ্গা যদি কোন দোষে রেগে ওঠে, সর্বনাশ । মাছ ধরা দূরের কথা ওলাউঠা বসন্ত আর দুর্যোগ আসবে, কেউ আটকাতে পারে না । শুচি শুদ্ধ না হয়ে বিলে যাওয়া নিষেধ । মহাজন বাড়ীর বৌ, মেয়েরা সোনার গয়না ঝকমকিয়ে বিলের দিকে তাকায় । তুফানি, সীতা, সুমিত্রা ওরা তখন লাজুক চোখে মহাজন বাড়ীর বৌ মেয়েদের রসুই ঘরের আড়াল থেকে দেখে । বড় লোকের বউ মেয়েদের কত সুখ জানি । বসে বসে খায় । জলে কাদায় পা ডোবে না । ঐশ্বর্যে ভরা মন্থর রাজসিক চাল চলন বিস্ময় জাগায় । এমন সময় ঠান্ডার মার আঁচল কে যেন পেছন থেকে টানে । মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখে মাখন ঠাকুর । সাবান, সুবাশী তেল ঠান্ডার মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, ঠান্ডার মা, লুকায়া লুকায়া জিনিসটাইন দিয়া লাও । চতুর মহিলা ঠান্ডার মা । এত ধূম ধামে হৈ চৈ-এর ফাঁকে চুপি চুপি প্রসাধনের সাখগ্রীগুলো স্নানের ঘাটে সুমিত্রার আঁচলে চাপিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুর কইছে, মন বাইন্দ্যা রাখিস । চুলের কাঁটা পাইবা, আলতা পাইবা । ডিম -- সাবানঅ কিন্যা দিব । গাঙ বিলের বদ্ধ জলে বর্ষার প্লাবন নামার মতো সুমিত্রার ম্লান মুখে হাসির রেখা ফোটে । মহাজন বৌদের চেয়েও নিজেকে সুখী লাগে । তুবও একটা লাজের ছটায় ঠোঁটের কোণায় শাড়ীর আঁচল চিবিয়ে বলে, দিদিলো ঠাকুরবাই খাওন খাইবার সময়নি পাইছে ?

ঠান্ডার মা তখন গুনগুনিয়ে ভাটিয়ালী সুরে গান ধরে । একসময় খলার কাজও শেষ । মাখন কাজের খোঁজে নমসুদ পাড়া আর কৈর্বত পাড়ায় ঘুরে ফিরে আবার ।

তবু আনন্দ ওঠে ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখ নৌকা বাইচে । ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তিতাস নদীর ওপর । মেড্ডার কালভৈরবের ঘাট থেকে শুরু, শেষ হয় কুরুইল্যা খালে শিমূলকান্দির পাশে । রসুলপুর থেকে মাখন ছোটে দল নিয়ে সরঙ্গা নৌকা করে । নৌকার মাঝে রামপুরের কৈবর্ত সর্দার হৃদয় নাগ । বৈঠা ধরে পঞ্চাশ জন । কারালী হলো রামচরণ । নৌকার যে হাল ধরে তাকে বলে কারালী । রঙ বেরঙের নৌকা । রসুলপুর, গোয়ালখলা, পত্তন, হরিণবেড়, হরিপুর গ্রাম থেকে আসে সরঙ্গার নৌকার ঝাঁক । কোন নৌকায়, ঠিকরা, সানাই, ঢোলক বাজিয়ে গান গায় । কেউ আবার পাতাসী নৌকা নিয়ে আসে দক্ষিণ থেকে বিশেষ করে কুড়ি, ধরকার বৈশ্যাল, সাড়ির পাড়া, বরুনকান্দি ।

কেউ আবার নৌকায় ওঠে গাঁজা টানে । দর্শকরাও থাকে । ছইয়া নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে তিতাসের বুকে ভাসতে ভাসতে । আনন্দবাজার তখন আনন্দমুখর । কেউ আবার গামলা বাইচে । মাটির গামলায় ভাসতে ভাসতে ছোটে । কেউ দৌড়ে ছুঁচলো মুখের কুশা নৌকা নিয়ে । লালপুর, সরাইল, কালিকচ্ছ, বাকাইল, কুচুনি, বুড্ডা থেকে মেয়েরা থাকে ছইয়া নৌকায় চড়ে । তিতাসে ওঠে হাজারো মানুষের কলরব । মাখন তখন গান ধরে—

তুমি কেন দেওর অইলানা

রঙিলা ভাসুরও
তুমি কেন দেওর অইলানা ।
তুমি যদি হইতায় দেওর
খাইতা বাটার পান
রঙ্গে রসে কথা কইতাম
জুড়াইতাম পরান ।

সঙ্গে বাঁশী, সানাই বাজে । বাজে হৃদয়ের জ্বলন্ত তন্ত্রী । তিতাসের পাড়ে পাড়ে জাগে মুখরিত চাঞ্চল্য । গানের তালে তালে বৈঠা বাঁওয়ার তালিম দেয়—ভালো হৈ রে হৈ ।

কেউ বলে ব্রক্ষ্মণবাইড়্যার এস ডু'র মেলা । কেউ বলে নৌকা বাইচ । প্রতিযোগিতা শেষ হলে কাপ মেডেল খাসি পুরস্কার । ভাদ্র-রোদ বড় প্রখর । কখনো আবার আকাশ থেকে মেঘ পড়ে ঝিরিঝিরি । দর্শকরা কেউ ছাতা মেলে । কেউ আবার নৌকায় ঘুরে ঘুরে পান বিড়ি বিস্কুট বেচে । মাখনের দল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয় । একটা রূপার কাপ নিয়ে বাড়ীর পথে নৌকা ছাড়ে উদ্দাম নাচন নেচে । নৌকা বদর বদর রসুলপুরের দিকে এগোয় ।

জল ছাড়া মাছ বাঁচে না । গাঙ-বিল-হাওর ছাড়া কৈবর্ত নমসুদরাও জীবন বাঁচাতে পারে বলে ভাবতে পারে না ।

পাশাপাশি পাড়া । মিশ্র বসতি সাধারণত থাকে না । আপন আপন জাতিগোষ্ঠী নিয়েই তাদের সমাজ, জীবনের প্রবাহ । মাছ ধরে, মাছ বেচে । কৈবর্তের সঙ্গে মাছ ধরার কায়দাকানুনে নমসুদদের বিস্তর ফারাক ।

নদীর চরে বিষকাঠালি গাছের বন । অনেকটা মরিচ ক্ষেতের মতো । রাধাচরণ নমসুদ, মাখনের বন্ধু । বিষকাঠালির বন তুলে কাঠের পিড়িতে ছেঁচে ছেঁচে মেশায় চুনজল । দুজনে স্যাঁতসেঁতে কচু বনে ঘোরে । যেখানে কেঁচোর মাটি দলিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতো স্তম্ভ হয়ে উঠেছে, কাঠালি বিষের ঝাঁঝাল জলের রস সেখানে ছড়িয়ে দেয় । মাটির ভেতর থেকে কিলবিল করে কেঁচোর ঝাঁক বেরোয় । কেটে কেটে জিরের টুকরো বাঁশের গুছা নামের মাছ ধরার ফাঁদে ঢুকায় । বিলের জলে গুছা পাতে । বর্ষায় ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে মাতোয়ারা কই মাছের ঝাঁক গুছার ফাঁদে ধরা দেয় । ঝাঁকে ঝাঁকে ।

কখনো আবার চোঙার মতো বাঁশের বেলুন । চান্দুরা বাজারে ওষুধ বিক্রেতার চিৎকার করার টিনের চোঙের মতো আকারে । একদিকে মোটা, অন্যদিকে সরু, কৌণিক । অনেকটা শঙ্কুর আকৃতি । দল বেঁধে কোমর জলে হাঁটে, গোল বিশাল বৃহদাকার পথে । পা যেখানে ডোবে, কাদার মধ্যে গর্ত হয় । ঘুরে ফিরে সেই পথের দাগে বেলুন দিয়ে চাপ দিলে শিং মাগুর ঢোকে । ডুলা ভরে শিং, মাগুর ধরে । নমসুদদের মাছ ধরার এই পদ্ধতি মাখন ঠাকুরও দেখতে দেখতে শিখেছে । তবে শিং মাছের ঘাই খেয়ে দুদিন জ্বরেও ভোগে । পুঁটি মাছের চোখ টিপে লাগায় রস । শামুকের জল মাখে, চুনের প্রলেপ লাগায় । ব্যথা তবু কমে না ।

নৌকায় চড়ে কেউ ফেলে খরা জাল । ত্রিভুজের মতো তিনটি বরাক বাঁশের নীচে বিরাট জাল ঝুলতে থাকে । বিলে-গাঙে জাল ফেলে জাল তোলে । মাছের খেউ ওঠে নৌকা ভরে ।

মাছের নেশায় ভোঁদরের মতো দিনরাত বিলে বিলে ঘুরে বেড়ায় মাখন ঠাকুর । মাখনের কাকা অতিষ্ঠ হয়ে বলে ওঠে, বাওনের পুত ! চাড়ালের লগ ধরছ । বুঝবা দিন কেমনে যায় । উপেক্ষা করে বর্ণ হিন্দুরা নমসুদদের বলে চাড়াল । কৈবর্তদের বলে গাবর । চাড়াল আর গাবর নিয়েই মাখন ঠাকুরের পৃথিবী ।

কৈবর্ত বাড়ি না হয় নমসুদ বাড়িই তার ঠিকানা । পাড়ায় পাড়ায় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের সাথেই মিশে থাকে । ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে, লাফিয়ে ছোটে পাড়া থেকে পাড়ায় ।

রসুলপুরের মাঠে বিকেলে গরু চড়াতে গেছে পূর্ণ দাস । বিলের পারে জারুল গাছের নীচে বসে গল্প করে তার ছেলে গোলকবাসী । কখন তাদের হালের কালো বলদটা হারিয়ে গেছে জানে না । খুঁজতে খুঁজতে তিনদিন পার হয় । তবু গরুর খোঁজ মেলে না । ইসলামপুর, নাজিরা বাড়ি, মণিপুর ঘরে ঘরে হন্যে হয়ে ঘোরে গোলকবাসী । গরু পাওয়া দূরের কথা । নানারকম কথা শোনে গরু খুঁজতে গিয়ে । কেউ বলে চান্দুরা বাজারে চুরি করে কেউ হয়তো গরুটা বেচে দিয়েছে । কেউ বলে ইসলামপুরের কাদির মিঞা সেদিন এসেছিল রসুলপুরে । লোকটা গরু চোর । দূরের কোন গ্রামে নিয়ে গরুটা বেচে দেওয়া অসম্ভব নয় । আবার বিজ্ঞের মতো সোনাধন দাস বলে, গরু টুকাইয়া পাইবা কই ? নাজিরাবাড়ী হাসমতউল্লার ঘরে গত কালকা বিরাট সিন্নি গেছে, দেখ হেইখানেনি গরুটা কোরবানি দিছে ।

গিয়েওছিল নাজিরাবাড়ি । গরুর কোনো হদিশ পায়নি গোলক দাস । শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে এলো বসন্ত ঠাকুরের কাছে । সব শোনে বসন্ত ঠাকুর । বলে, দেখ, ভাল কইর‍্যা একটা কলকি নারায়ণের পূজা দে । গরু ক্যারে, নাও হউক, সোনার গয়না হউক, হগলতা চুরি অইলেও ফির‍্যা পাওন যায় । ডাকের কথায় কয়, কলকি নারায়ণের সেবা দিলে বুলে হারাইন্যা ধন ঘর লয় । কাটা মাথা জোড়া লয় । আপুতার পুত হয় ।

----কর্তা কলকি নারায়ণ পূজা দিতে কি লাগে !

— বেশি কিছু লাগত না । সোয়াসের বাতাসা, সোয়া পন কলা, তিনটা রাখাল, তিনটা পাজন, আর ধূপবাতি তিনটা, এইই । দিনটা খালি শনি-মঙ্গলবার অইলে সারে।

গোলকবাসী আয়োজন করে কলকি নারায়ণ সেবার ! উঠোনেই আসর । মঙ্গলবারে গোধূলিবেলায় । ব্রাহ্মণ লাগে না পূজার । তবু নিয়মকানুন, আচার অনুষ্ঠান দেখতে মাখন ঠাকুর যায় । তিনজন রাখাল অমরচান, রাধাচরণ আর ব্রজবাসী বসে উঠোনে । মাঝখানে তিনটে পাজইন বসানো ত্রিভুজের মতো করে । ত্রিভুজের তিন কোণায় এক এক কলকিতে তিন ছিলিম তামাক । থালায় কলা, বাতাসার ভোগ । তিনটে সরষে তেলের প্রদীপ বসায় । একজনে পরস্তাব বলে । পরস্তাব মানে একটা গল্প । গল্প শুরু করে ব্রজবাসী । উঠোনে আরো পনেরো বিশ জন লোক । সবাই তখন নীরব । গল্পের আসর জমে । বিজ্ঞের মতো বলে যায়, 'এক বাওন যজমান বাড়িতে গেছিল শ্রাদ্ধ করতে । শ্রাদ্ধে পাইছিল একটা গরু । যজমানের বাওনে কইছে, গরুটা যে দিলা, রাখালি করব কেডা । তোমার গরু তুমি দিয়ো না । যজমানে কইছে, কর্তা ইটা কি কন । রাখাল যদি না থাকে আমার ছোট পোলারে রাখাল কইর‍্যা লয়া যান । হের পরেদা যজমানের ছোট পুতরে বাওনে মুনি কইর‍্যা বাড়িতে আনছে । মুনির কাম কইর‍্যা দিন যায় । গরুরও রাখালি

করে । একদিন দেখে গরুটা হারাইয়া গেছেগা । তখন করন কি । তিন রাখাল মিল্যা কলকি নারায়ণের সেবা দিছে গাছ তলাতে । কলকি পাইব কই, ঠাকুরের আসর পাইব কই । তিন রাখালে পাজন পাইত্যা আসন বানাইল, দুর্বা ঘাসের চটদ্যা তামুক আর টিক্কা বানায় । কলকি পাইছিল এক গিরস্থের কাছ থাইক্যা । খুইজ্যা । হেইরকম পূজা দেইখ্যা ঠাকুরের মন গলছে । গরুটা কতদূর পরেই দেখে বাড়িত আইয়া পড়ছে ।' এমনি করেই পূজা শেষ । উঠোনে কলকি নারায়ণের ধ্বনি ওঠে তিনবার ।

বলো, বলো, কলকি নারায়ণ প্রীতে
বল হরি, বল হরি,

মাখন জানে পূজার আচার । হারানো গরু পেলেও না পেলেও অদ্ভুত এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে কলকি নারায়ণের এমন তরো আসর প্রায় বাড়িতেই জমে । এতেও যার সন্তুষ্ট নয় তারা তিননাথের মেলা বসায় ।

ঢাক, করতাল, খোল নিয়ে আসর জমে । থালা ভরে কলা, বাতাসার প্রসাদ । এক একজন ওস্তাদ গাঙ্গা মলতে । কেউ আবার ছিলিম ভরে গাজার ওপর টিককা ধরায় । ছিলিমের ন্যাকড়া ভিজিয়ে টান মারে । কেউ বলে মহাদেবের নেংটি । মহাদেবের নেংটি শুকিয়ে গেলে আবার ভিজায় । ছিলিম হাত থেকে হাতে ঘোরে । বড় ভাই রাধাচরণও আসারে বসে দম মারে । অন্যদিকে তাকিয়ে ছোটভাই প্রাণনাথ হাত বাড়ায় কলকি নিতে । সবাই মহাদেবের ভক্ত । ধর্মতত্ত্বের অত সার মর্ম বুঝে না । দম দিয়ে বিভোর হয়ে থাকে । অন্য লোকে গিয়ে আনন্দধারায় ডুবে থাকে । টিককা পুড়ে টিককা জ্বলে । গানও চলে, দমে বিভোর প্রফুল্ল গাইনের গলার স্বর চড়িয়ে ।

তিন পয়সাতে হয় যার মেলা ।
কলিতে হয় ত্রিনাথের মেলা ।
সাধুরে কই এক পয়সার সিদ্ধি আইন্যা
তিন কলকি সাজাইও
ওরে গাজায় মারছে দম বলছে বোম বোম
ভ্রমে ভবে ভোলানাথ
কলিতে হয় ত্রিনাথের মেলা ।
সাধুবাই এক পয়সার তেল কিনিয়ে
তিন বাতি জ্বালাইও
ওরে বাই বাতি জ্বলছে ধীরে
নিভে নারে এ কিরে আজব লীলা
এক পয়সার পান কিনে
তিন খিলি বানাইও
ওরে সাধু গিরি পানের খিলি
বসে বাজায় একতারা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা ।

গাজার দম দিয়ে তিননাথ ভোলানাথ। মাখন, নন্দ, রাধাচরণ। নিভে যাওয়া বাতি দেখেও মন নিভে না। যখন সেটা বুঝতে পারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে। দুজন যায় মাখনকে পৌছে দিতে। মাখনও বাড়ীর দরজা থেকেই ফিরে আসে রাধাচরণকে পৌছে দিতে। রাধাচরণও দরজায় গিয়ে আবার আসে মাখনকে পৌছে দিতে। কেউ কেউকে পৌছে দেয় না। শুধু রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। তবু তিন ভোলানাথের ভোলা পথের দিশা মিলে না। ভুল যখন ভাঙে তখন আবার হাসে। খেতে গিয়ে জিভটা যেন কড় কড় ভিতর দিকে টানে। মনে হয় খাওয়া হয় নি। এক থাল শেষ, দুই থাল শেষ। তবু মনে হয় খাওয়া হয়নি। অদ্ভুত নেশা মানুষকে শুধু ভোলায়। কেউ ভোলে দেহের ক্লান্তি, কেউ ভোলে অভাবের জ্বালা, কেউ ভোলে পীরিতির জ্বালা। সহজ কথায় ভুলে থাকার নেশা। সব ভুলে থাকার নেশার নাম-ই ভোলানাথের নেশা, ওই ভোলার পথে কৈবর্ত, ব্রাক্ষ্মণ নমসুদ এক সাথে বিচরণ করে। গ্রাম থেকে গ্রামে ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে চলে নমসুদরা। মাঝির কাজ জানে ওরা। কৈবর্তদের মতো বের জাল, বড় জাল, জগৎবের জাল, কাছিম জাল বা অড়হড়িয়া জাল ধরা নমসুদরা ততটা অভ্যস্ত নয়। কৈবর্তরা পৃথিবীটাকে বের দিয়ে মাছ ধরতে চায়। নমসুদরা চায় ছোট গন্ডীর মধ্যে জাল বাইতে। দুই জনগোষ্ঠীর মন দরিয়ার মতো স্বচ্ছ সরল। অতশত প্যাচপোচ বোঝে না। শরীরে আবার অসুরের মতো শক্তি। যে দিকে যায় একদিক করে আসে। জাঙাল ভাঙা জলের স্রোতে ধারার মতো।

মাখন তাদের ওপর ভরসা রাখে। আপদে বিপদে বুক ভরা সাহস নিয়ে পাশে দাঁড়াতে জানে। পালাবার কৌশল ঈশ্বর তাদের রক্তে দেয়নি। তাই মরতে জানে মারতে জানে মাথা নত করে নিজে বাঁচতে জানে না।

সহজ সরল মানুষ বলেই মহাজনদের ফাঁদে ওরা ধরা দেয়। এক তোলা সিদ্ধি একটা আস্ত খাসি, সঙ্গে দশ বিশ টাকা পেলে পৃথিবীটাকে কাত করে দিতে কসুর করে না। গাঙ দখল, জমি দখলে লাঠিয়াল হয়ে কত লোক মরে সেই হিসেব রাখে না। বরং সেই মৃত্যু বীরের ইতিহাস হয়ে রূপকথার মতো গ্রামে গ্রামে ছড়ায়।

কার্তিক মাসের অভাব বড় কঠিন। এক মুঠ ধান থাকে না কৈবর্ত নমসুদদের ঘরে। জলেও তখন মাছের আকাল। কার্তিক মাসে শিশির আসতে না আসতেই শুরু হয় মরা গাঙের মুখ বাঁধার আয়োজন। গাবের মটকি জ্বাল দিয়ে জাল রাঙানোর কাজ, জাল বোনা, নৌকা মেরামত সব এক সাথে। কারো ঘরে কানা কড়ি থাকে না। সারা বছর রোজগার করলেও দিন আনে দিন খায়। সঞ্চয় বলে কিছু জানে না। ঘরে খোরাক যখন থাকে না কেউ ছোটে জমি বন্ধক দিতে। কেউ ছোটে গরু বেচতে।

সুমিত্রার সঙ্গে যেমন নিবিড় সম্পর্ক তেমনি নন্দর সাথে ঘনিষ্ঠ বায়াপিও কম নয়। নন্দর বাপ সোনাধন মাখনকে ছেলের মতো ভালোবাসে। আপদে বিপদে কাজে কর্মে মাখন ঠাকুরকে পাশে পাশে নেয়। ভাল মন্দ পরিবারের সব কিছুতে সোনাধন মাখনের পরামর্শ চায়। মাখনেরই পরামর্শে সোনাধন গেলো বিপিন মহাজনের ঘরে। আগাম ঋণ চাইতে আর কাজকর্মের বন্দোবস্ত করতে।

বিপিন মহাজন বৈঠকখানায় বসে। হাতের আঙুলে নীলা লাগানো সোনার আংটি। ঘরে

একটা পালঙ্ক। সিংহের পায়ের মতো পা। গড়গড়া সামনে রেখে তামাক টানে। কৈবর্ত মোড়ল সোনাধন ধাড়ি পেতে বসে। নন্দ আর মাখনও সঙ্গে। সোনাধন কাচুমাচু করে এক ভূমিকা দিয়ে প্রস্তাব করে ঋণের—বাবু! আপনারা অইলেন দশের মাথা। কথা অইল কোন রকম একটা মহল বানাইতাম। টেকা পয়সা নাই। ভোলার জোয়ার আইবার আগে কিছু ঋণ টিন যদি দেন। তবে ঠাকুরে বাচাইব আর কি। ছাওয়াল লইয়া অখন অক্করে মরতাম পড়ছি।

বিপিন মহাজন কম কথা কয়। রাশভারী লোক বলে, চাতল বিলডা ডাইক্যা আনছি। হেই বিলে তোমারে মাছ ধরতাম দেমু। মহাল বানাও জাল নৌকা কিন্যা। তবে কইলাম দামদর অখন ফুরান যাইত না। সময় অইলে ইতান ঠিক করুম। ঋণ চাও ঋণ দেমু। তবে কথা অইল, তোমার বাই ভাতিজা মিল্যা লোকজন কম না। দেখ কোন রকম অবন্যা'রেনি জমিন থাইক্যা তুলন যায়। তিন কানি জমিন বন্ধক দিছিল। সুদের কথা বাদ দেও। আসলতাই উসল করতাম পারি না। দুই বছর গেলগা, অখনও খালি আইজ দেমু কাইলকা দেমু করে। তুমি যদি আমার লাইগ্যা হাটু জলে লাম, আমিও তোমার লাইগ্যা বুক জলে নামুম।

সোনাধন জবাব দেয়, বাবুর আশীর্বাদে, অখনও ডাক দিলে বিশ ত্রিশটা লাঠি বার অইব। বাবুর আদেশ পাইলে অবন্যা'র মতো ফকিরনির পুতরে তুইল্যা দেওন কোন ব্যাপার না। বাবু যদি কন, কাইলকা সকালে তার মাথাটা লয়া আমু।

কার্তিক মাসে খালে বিলে গাঙে জল শুকায়। চর ভেসে ওঠে। হাল চালিয়ে জমি চাষ করে। খেসারী কলাই বীজ বোনার আয়োজন শুরু। অবনী সরকার রসুলপুরের বাসিন্দা। গরীব জেলে। তিন কানি জমি বন্ধক দিয়েছিলো বিপিন মহাজনের হাতে। ঋণ শোধ করতে পারেনি। হিসেবে ঋণের অর্ধেক দিয়েছে। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসেব করায় ঋণ শোধ হয় না।

অবনী ভোর বেলা জমিতে হাল নিয়ে নামতেই সোনাধনের দল লাঠি বল্লম নিয়ে ছুটে আসে। অবনীর হাতের পাজইন ছিনিয়ে পাজইন দিয়েই গরুর হাল আর অবনীকে পিটতে শুরু করে সোনাধন। হালটাল ছেড়ে অবনী আইলের কাছে পড়ে যায়। অসহায় ভাবে অবনী কোনরকম রক্তের জখম সহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার দিকে দৌড়ে।

বিজয়ী বীরের মতো সোনাধন গিয়ে হাজির বিপিন মহাজনের কাছে। বিপিন সব শুনে খুব খুশী। একটা খাসির দাম গাঁজার পোঁটলা, সঙ্গে কিছু নগদ টাকা দিয়ে বলে, যাও সোনাধন চিন্তা কইর্য়া না।

সোনাধন একটু ভীত। থানায় গিয়ে অবনী কি করবে কে জানে। তাছাড়া ওদের এক জাতভাই নতুন হাকিম হয়ে এসেছে। বিপিনবাবুকে বলে, বাবু, নতুন এস ডু বুলে নমসুদ। হেই বেডানি পুলিস পাঠায়া মাইর ধইর করে।

বিপিন হাসল এক অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টিতে। —ইটা কি কস্ সোনাধন। নমসুদ্যার পুত এস ড় অইছে। তারে নমস্কার করব কেডা। ব্রহ্মণবাড়ীয়া গিয়া শোইন্য। হগগলতে কয় চারালের পুত এস ড় অইলে দেশটা চলব কেমনে। রবীন্দ্র নমসুদ অখন অইছে রবিবাবু। মানব কেডা। হের বাপে সারা জীবন মাছ বেচছে। শরীলে অখন নখদা আচড় দিলে খড়ি মাটীর দাগ বয়। হেই বেডার ডরে তুমি মর ক্যারে।

বিপিনবাবু কি যাদু জানে কি জানি । মামলা মোকদ্দমা কিছুই হল না । জমি বেদখল হয়ে বরং অবনী দেশান্তরী হয়ে গেল ।

ভোলার জোয়ার আসার দিন গুনে বসে রয় সোনাধন ।

ভোলার জোয়ার হলো কার্তিক মাসে গাঙে বিলে মাছ আমদানীর জোয়ার । নদীর জলে জোয়ার আসলেই মাছ গিয়ে মরা গাঙে বিলে উঠবেই । যেদিন জোয়ার আসে তার আগেই বাঁশের চাটাই, খুটির বাঁশ, নারিকেলের দড়ি সব প্রস্তুত । কেবল জোয়ারের অপেক্ষা । জোয়ার আসতে না আসতেই পূর্ণিমার রাতে লোকজন নিয়ে ছোটে সোনাধন । সঙ্গে তার ছেলে নন্দ আছে । আর তার বন্ধু মাখন ঠাকুর । বিরামহীন ভাবে লোকজন কাজে নামে । কাঠের মুগুর দিয়ে খুঁটি পুঁতে বাঁশের চাটাই পাতে । নিশ্ছিদ্র না হলে হরহর করে বেরিয়ে যাবে । কত সাবধানতা । শীতে শরীর হিম হয়ে আসে । তবু মহালের কাজের ধারা যন্ত্রের গতিতে এগিয়ে চলে । মরা নদীর মুখ এমনি করেই বন্ধ রেখে মাছ আটকে রাখে । Pinki Pal.

মাছ ধরার মরসুম আসতেই সোনাধনকে ডেকে বিপিন মহাজন জানিয়ে দেয় —বিলের মধ্যে লাইম্য না । লামতে চাইলে দামদর ফুরায়া লাম । তিন মুনি, তুমি নিজে, নৌকা দুইটা, আর জাল—দিন পঞ্চাশ টাকা দেমু । পোযায়নি দেখ ।

বাবু আর বাড়াতে রাজী নয় । সোনাধন বলে, ইটা কি কন! তিন মুনির খাওন খরচ লয়া দেওন লাগে ত্রিশ টাকা দিন, আমি পামু কি, জালের ভাড়া কি, নৌকার ভাড়া গেল কই ।

অবশেষে বাবু ষাট টাকাতে কোন রকম ওঠে । সোনাধন দেখে দামদর করে লাভ নেই । অনিচ্ছায় হলেও বাবুর প্রস্তাব মেনে নেয় ।

সোনাধনদের সাথে মাখন ঠাকুর খলায় কাজ করে । ক্ষিদের তাড়নায় মন্ত্র তন্ত্রের কথা মনে নেই । নন্দ, সোনাধন, রাধাচরণদের সাথে চাতল বিলে মাখনও থাকে । পৌষের শীতে পৃথিবীটা জড়োসড়ো । সন্ধ্যে হতেই বাড়িতে লেপ মুড়ি দিয়ে মহাজনরা বিছানায় ঢোকে । কেউ আবার শখ করে গরম গরম মাছ ভাজা খায় বাংলা মদের সাথে । চাতল বিলের কর্মচারী দামী শাল গায়ে জড়ায়, নাক কান মাথা মাফলার দিয়ে ঢাকা । হিসেবের খাতা নিয়ে বসে । মহাজনরা বৌ নিয়ে লেপের নীচে মহাসুখে প্রেমের কথা কয় । মাঠে ধান নেই । বাতাস ঘোড়ার মতো ঠাণ্ডার চাবুক হাতে দিক দিগন্তে ছোটে । খালি পায়ের মানুষ পেলেই সপাং সপাং মারে ।

বিলের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ওপরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা ওড়ে । গাছ গাছালির পাতা থেকে টুপ টাপ শিশির পড়ে । কৈবর্ত বৌ-এর ঘরের মানুষ তখন বাইরে খলার কাজে । শীতে কাঁপা শিশুদের জড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমায় । গায়ের উত্তাপ লেগে লেগে পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। সারাদিন গাইল সিয়া মারতে মারতে হাত পা অবসন্ন । বিছানায় শুতে না শুতে চোখ বুজে আসে । তবু দুঃস্বপ্নের চমকানিতে ঘুম ভাঙে। খলার মানুষ তখন খলা থেকে বেরোয় রাত দুপুরে । সারা গায়ে তেল মেখে । চাদর কাপড় কিছুই নেই । কালো ঠোঁটে ঠাণ্ডা লেগে থির থির কাঁপে। কোন রকম জল গামছা কোমরে জড়িয়ে বিলের জলে নামতে যায় । নামার আগে দু' হাতের তর্জনীতে জল ছুঁয়ে কর্ণমূলে স্পর্শ করে । তারপর শীত উপেক্ষা করে জলে ঝাঁপ দেয়। পাঁচ হাত সাত হাত নীচে ডুবে জলের ভেতরে বান্ধের চাটাই পরীক্ষা করে। কোথাও কোন ফাঁক

ফোঁকর আছে কিনা । দম ফুরাবার আগেই মাথা বের করে । ফাঁক ফোঁকর পেলে ওপরে নিয়ে বান্ধে চাটাই-এর বেড়াতে মুগুর দিয়ে আঘাত করে। ফাঁক ফোঁকর থাকলে হুরহুরিয়ে বিলের মাছ বেরিয়ে যাবে। কোথাও আবার বাঁশের চটী ভেঙে গেলে মেরামত করে নতুন চটি লাগায়। জলের নীচে মাটি কাদায় হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে যখন ফাঁক খোঁজে, কারো হাতে শিং মাছের ঘাই লাগে । কখনো বড় মাছ কাতল রুই লাফ দেয়। ফুসফুসের কাছে তিন সের চার সেরের মাছ যখন আঘাত করে, বুকের হাড় ভাঙতে পারে। এমন করে এই শীতের রাতে দুবার করে পরীক্ষা করতে হয় বান্ধের মুখ।

কখনো বিলের বুকে নৌকা নিয়ে ছোটে । দুটো ডিঙ্গি নৌকা পাশাপাশি চলে । নৌকার ওপরের কিনারাকে বলে বাতা । চলতে গিয়ে বাতায় বাতায় ঘষা খায় । অসতর্ক হয়ে থাকলে হাতের আঙ্গুল ছেচে গুড়া করে দিতে পারে ।

দশটা জেলে বৌ যেমন মানুষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাত কাটায় । সোনাধনের মেয়ে সুমিত্রার বিয়ে হয়নি । তবু ওই মাখন ঠাকুরের জন্য বুকটা কেমন ধরাস ধরাস কাঁপে । বলতেও পারে না । বোঝাতেও পারে না । না বলা একটা ব্যথা বুকের ভেতর সিয়ার মতো দুমদাম আঘাত করে বাজে শুধু ।

অগ্রহায়ণ মাস এলেই তিতাসের মানুষের ঘরে দু এক মুঠ ধান ওঠে । সেইটুকুনিয়েই শুরু হয় উৎসব । একদিকে চলে আমন ধান কাটার আয়োজন । সকালের বাসী ভাত, কেউ বলে করকড়া ভাত, কাকিয়ার শুটকী পোড়া, মরিচ পোড়া দিয়ে এক পেট ভাত খেয়ে ধান কাটতে যায় । এক এক দলে পনের বিশজন থাকে । মাথায় গামছা পরনেও গামছা । কোমরে তামাক টিককার পুঁটলি । রাধাচরণের জমিতে ধান কাটা শুরু । রাধাচরণ খড়ের বেনীতে আগুন ধরিয়ে হুঁকোসহ এগোয় সবার আগে । পেছনে পেছনে যুবকরা কাঁধে বাঁশের ভার রশিসহ চলে । কাস্তে চলে যন্ত্রের মতো, কার আগে কে মুঠ বাঁধবে । যাদের মুঠ বাঁধা শেষ, তারা তখন আইলে বসে কেউ গান গায় । কেউ তামাক টানে, কেউ আবার হাসানোর গল্প বলে ।

রসুলপুরের মাঠের চাষীর কানে আরেক গ্রামের ধান-কাটা চাষীর গান ভেসে আসে । বিরাট মাঠ, কেউ বলে তিতাসের হাওর । কেউ আবার সদ্য কাটা ধানের মাঠে টুকরী নিয়ে শামুক দিয়ে হিজা খোঁজে । হিজা মানে কাঁচির ফাঁক দিয়ে কাটার সময় বাদ যায় কোন একটা ধানের ছড়া । গরীব বিধবা, অসহায় গরীবরা খুঁজে আনে সেই ধান । শামুকের মুখে ধান ছড়ার ডগায় টিপ দিয়ে হিজা কাটে । টুকরী ভরে । কেউ আবার ধানের ন্যাড়া কেটে জ্বালানী জমায় । কোথাও আমন কাটা ধানের ক্ষেতে স্যাঁতসেতে জমিতে শালুক কুড়ানী মেয়েরাও থাকে । কেউ আবার পাশের বোরো ক্ষেতের মাঝে জিয়ল মাছ খুঁজতে পেলইন নিয়ে ব্যস্ত ।

তখন অমাবস্যার প্রতিপদ তিথিতে শুরু হয় হরি পরমেশ্বর ব্রতের আয়োজন । চান্দুরা বাজার থেকে মূর্তি কিনে আনে ঘরে ঘরে । মূর্তির অর্ধেক গৌর বর্ণ অর্ধেক নীল বর্ণ । বাড়ীর মেয়েরা আগের থেকেই উপোস থাকে । পরদিনের পরদিন কাল্পনিক কানাই বলাই গড়ে দুটো ছোট ছেলে ডেকে । উঠোনের কোণে । কৃত্রিম জমি বানায় । কানাই বলাই খালি লাঙল দিয়ে চাষ দেয় । মৈ চালায় । সেখানে ধান বোনে । পাকা ধানের গোছা কাটার ভঙ্গীতে খালি হাতে অভিনয়

করে । আগের দিনের পাতা দৈ কানাই বলাই-এর মাথায় মাটীর ভাণ্ডে রেখে নাচে । মেয়েরা তখন দল বেঁধে উঠোনে গান ধরে —

বলাই দাদা লাটুম দেও আমারে
কি অপরূপ দেইখ্যা আইলাম খেলার মাঠে
কানাই মাইর‍্যাছে লাটুম
বলাই রইছে চাইয়্যা
স্বর্গে থাইক্যা মারে লাটুম
চান্দে আইয়্যা পড়ে ।
গূঢ় সিংহনাদ বাজে
গহীন মনেরে ।

মাখন, নন্দ, রাধাচরণ দাওয়ায় বসে তামাসা দেখে । গানের সুরে নিজেরাও গুনগুনিয়ে সুর ধরে । পাতিল ভাঙার পর শুরু হয় নবান্ন খাওয়ার আয়োজন । কিন্তু মাখন ঠাকুর সব উপভোগ করলেও খাওয়া নিষেধ । ছোটলোকের রান্না খেলে পাছে লোকে কিছু বলে । খেতে বসে সুমিত্রার মুখ দিয়ে গ্রাস ঢুকতে চায় না ।

মাখন ঠাকুরের মুখটা করুণ হয়ে কেন জানি মনে ভাসে ।

পর পর দু বছর বন্যা । মাঠে ফসলের কোন চিহ্ন নেই । বাজার হাটে চালের আকাল । তিন টাকা মনের চাল হঠাৎ শ্রাবণ ভাদ্র দুমাসে ষাট টাকা সত্তর টাকায় পৌঁছে । যজমানদের অবস্থা বড় শোচনীয় । খুদ কুঁড়া ফেন একমাত্র সম্বল । মোটামুটি বছরের খোরাক পায় । তার ঘরেও মিষ্টি আলু কিনে চিকন করে কেটে মুঠো চাল মিশিয়ে সেদ্ধ করে খায় ।

যে নদীয়া দাস সারা বছরের খোরাক পেয়েও বছর বছর মন ত্রিশেক ধান বেচতে পারে । এই আকালে তার ঘরেও বীজ ধান নেই । নদীয়ার বৌ বিলে গিয়ে. সাপলা খোঁজে । সাপলাও প্রায় শেষ । শিকড় বাকড় উপড়ে এনে সেদ্ধ করে খায় । বিল খালে গাঙ-কলারও আকাল । গ্রামের চারদিকে সাজনা পাতা, বগী পাটের পাতার কোন চিহ্ন নেই । ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ খিদের জ্বালায় পাতা তুলে সেদ্ধ খায় ।

তার ওপর তুফান হলো দু'বার । গাছ গাছালি কলাগাছ সব ভেঙ্গে তছনছ । কেউ কচি কলা-পাতা চিবিয়ে খিদে মেটায় । ডিমাই শাক, লাউপাতা খেতে খেতে কারো পেটে শক্ত বেরাম ধরে । মানুষও মরে । ঔষধ পথ্যের খবর নেই । থাকলেও ঔষুধ কেনার সঙ্গতি কার আছে । ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া শহরের কুসুম এম.বি. নন্দলাল এম. বি. তখন ভরসা । কিন্তু যাওয়ার সার্মথ্য কই ।

ভেটের চাল, মানে সাপলা গোটার চালও তখন পাওয়া মুস্কিল । তুবও খুঁজে খুঁজে খায় কেউ । নন্দ দাসের বিরাট বাড়ী, লোকজন অসংখ্য । বিরাট কড়াই উনুনে চাপিয়ে ধানের কুড়া সেদ্ধ করে । মেরা পিঠা বানিয়ে খায় ।

সেদ্ধ করার লাকড়ি পাবে কোথায় । চারদিকে জল আর জল । কেউ ঘরের বেড়া ভাঙ্গে, কেউ ঘরের চালের রোয়া-খাপ খসিয়ে উনুন ধরায় । কচু বলে কচু নেই । একেবারে সাফ । কচু সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হচ্ছে সবাই । সেদ্ধ বলতে সেদ্ধই । কারো ঘরে লবন নেই । বাজারে

আছে। তবে দাম, প্রতি সের আঠারো টাকা। তাও আবার সস্তা দামের লবনের রঙের মতো সার মেশানো লবণ। অসুখ বিসুখ ব্যাধি মানুষের দেহে বাসা বাঁধার মতো সব আয়োজন শুরু।

ঘরের ভিতরে জল কমে না। স্যাঁতসেতে অবস্থা। কারো ঘরে হাঁটু সমান জল। মাছ ঢোকে। মাছ খেতে সাপও ঢোকে। বিছানা থেকে চল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাছ মারে। আলুনি মাছই কারো সম্বল। যাত্রামোহন দাসের ঘরেও জল। ঘুমন্ত বাচ্চাটি কখন জলে পড়ে যায়। মাছ ভেবে চল দিয়ে ঘাই মারে। বাচ্চা মারা যায় অমনি।

ডেকচি সহ ভাত চুরি তখন প্রতি পাড়ায় ঘটনা। ধরা পড়ে কেউ। পড়লে খিদের জ্বালায় মরার আগে মারপিটেই মরে। ঘরে ঘরে মানুষ মরে। পোড়ানোর লোক নেই। দুজন পুড়ে এলে গ্রামে দেখে আরো পাঁচজন মারা গেছে। দাহ করার লাকড়ি কোথায়। জলের মধ্যেই ভাসিয়ে দেয়। কাক চিল শকুনেরা ঠোকরাতে ঠোকরাতে কিম্ভুত কিমাকার করে ফেলে মনুষ্য দেহগুলো। ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস নাড়ীভূড়ি জলে পচে। দুর্গন্ধ বেরোয়। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু মৃতদেহ ভাসে।

সমাজেও তখন নিয়ম কানুন ভেঙ্গে গেছে। পরান দাস অনাহারে অচল। বিছানায় লেপ্টে থাকে। যুবতী মেয়ে গিরিবালা যায় রমেশ মহাজনের ঘরে। সোয়া সের চালের বিনিময়ে মেয়েটির ওপর চলে রাতভর ধর্ষণ। অভিযোগ করার কেউ নেই। থাকলেও বিচার করবে কে।

খিদের জ্বালায় সুন্দরী দাস টিকতে পারে না। ছুটে যায় ইসলামপুরে মন্নাফ মিঞার ঘরে। পেটে ভাতে থাকতে থাকতে মন্নাফের ঘরেই পেটে বাচ্চা ধরে। চারদিকে খাবার খাবার একটা হাহাকার।

কালিচরণ গেছে নাজিরা বাড়ীর মোল্লার ঘরে কাজ করতে। কোনরকম দুর্ভিক্ষটা কাটিয়ে দেয়। অভাব শেষ হলে ফিরেও আসে। জাতে তখন তার প্রবেশ নিষেধ। কলমা পড়ে কালিচরণ দাস তখন কালিচরণ মুসী হয়ে গেলো।

আশুগঞ্জের সরকারী গুদামের চাল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গুদামের চাল বোঝাই হয়ে জাহাজ ছোটে মেঘনার বুকে ঢালতে। কেমন পৃথিবী কে জানে।

তখন মহাজনদের পোয়াবারো। সস্তায় জমি কেনার হিড়িক পড়ে। কানি প্রতি বিশ টাকা ত্রিশ টাকা জমি বিকোয়। অন্যদিকে জমিদাররা লোক পাঠায় সৈন্যদলে মানুষ ভর্তি করতে। অভাবে তাড়নায় কেউ যায়। যুদ্ধে প্রাণ যাবে ভয়ে কেউ কেউ যায় না।

আকাশে থেকে থেকে যুদ্ধের বিমান ওড়ে। কোন দেশে যুদ্ধ! তিতাসের মানুষ মরে কেন কে জানে।

মাখন ঠাকুর অসহায়। চোখে অন্ধকার দেখে। দিকদিগন্ত জুড়ে খিদের আগুন দাবাননের মতো দেশটাকে গ্রাস করে ফেলে। চাল, কাজ খুঁজে খুঁজে দেশ থেকে দেশে ঘোরে।

মাখনের বাবা তখন একেবারে অচল। একটা খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে বাঁচার উপায় নেই। মাখনের মা শুনেছে হরিচরণের ঘরে নাকি রান্না হয়। ছুটে যায় সেখানে দুটো ভাতের আশায়।

হরিচরণ যেমন কৃপন তেমনি তার মেজাজ কড়া। ত্রিপুরা পাশের পাহাড়ী দেশ। সেখানে যায় বেপার করতে। মটকা ভরে শুট্‌কি আর সিদল নিয়ে ভোর বেলায় ছোটে। চান্দুরা

বাজার হয়ে বামুটিয়ার পথ ধরে আগরতলা রানীরবাজারে যায়। চাল ধান সেখানে সস্তা। কাঁঠাল তো প্রায় মাগনা পাওয়া যায় বললেই চলে। গভীর রাতে হাঁটতে হাঁটতে চলে, কাঁঠাল নিয়ে বাড়ী পৌঁছতে।

পৌঁছেই দেখে বাড়ীতে ভিড়। কেউ উঠোনের কোণে। কেউ বারান্দার পাশে। কেউ বা রান্নাঘরের আবর্জনার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অধিকাংশই সধবা। জ্বলজ্বলে ক্ষুধার্ত চোখ রাতের অন্ধকারে ঝলসে ওঠে পেত্নীর মতো। সঙ্গে জীর্ণশীর্ণ লেংটা শিশু।

কাঁঠাল খেয়ে বাকল যখন গরুর গামলায় রাখতে যেতো, বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যেতো। ঝগড়া বাধতো জানোয়ারের মতো। হরির মা যখন মাড়ের ভাতে মাড় ঢালতো, ইচ্ছে করেই ভাতের গোলা ছেড়ে দিতো। মাড় যখন বাইরে দিতে যায়, টিনের থালা নিয়ে এগিয়ে আসে সবাই, কাকে দেবে কাকে দেবে না। মাখনের মাও লজ্জা সরম বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো চুপি চুপি। টিনের থালায় কয়েক ফোঁটা মাড় পড়তেই দৌড়ে ছুটতো। কি জানি কেউ যদি কেড়ে নিয়ে যায়। ওই কয়েক ফোটা মাড় কত দুর্লভ, কত আনন্দের। শুকনো মুখগুলোতে আনন্দের ঝিলিক হানতো অদ্ভুত এক খুশীতে। ভাতের গন্ধে মানুষ এত পাগল হতে পারে ভাবা যায় না

চুরিও হতো প্রচুর। কারো ঘরে চুরি হলে পরদিন ধরে ফেন খুঁজতে যাওয়া লোকদের। প্রচন্ড মারের চোটে কেউ মারাও যেতো। নিজের খিদের জ্বালায় নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি দরদও হারিয়ে যায় মানুষের। মানুষ তখন মানুষ নয়। কেউ কোলের সন্তান ধনীদের দরজার ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতো। গরু ছাগলও মরে অহরহ। তবুও দুঃখের সায়রে তিতাসের কোন মাঝি গান গায়—

মরায় জ্বালাইরে
ও স্বদেশ ভাই
সেই মরা লয়া
আমি কোন দেশেতে যাই।

সরকারী উদ্যোগে মেড্ডা গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হয়। খিচুরী রান্না হয় পঞ্চাশ জনের। লোকজন টিনের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হাজার খানেক। এই নিষ্ঠুর প্রহসনে জর্জরিত মানুষ তবুও কেন জানি কথা বলে না। পাড়ায় পাড়ায় রাতভর হরি সংকীর্তন বসতো আগে। দুর্ভিক্ষের ছায়া বিস্তার হলে কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না। শেয়াল কুকুরের কীর্তন সারা রাত বিভীষিকা সৃষ্টি করে রাখে।

মাখন ঠাকুর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ভিক্ষে মাগে। কখনো সন্ন্যাস গায়, কখনো ভজন। গান ভালো লাগলে কেউ এক মুঠো দেয়। যাদের সঙ্গতি নেই তারা দেয় না। গান শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চোখের জলে সহানুভূতি জানায়।

দেখতে দেখতে আসে আশ্বিন মাস। দুর্ভিক্ষ কবলিত তিতাসের পারেও ঢাকের বাজনা বাজে। তিতাসের জলে পচা গলা মৃতদেহের ভেলার মিছিল ছোটে। তখনই অষ্ট গ্রামের যোগেশ দেব যাত্রাগানের পালা বানায়।

মিষ্টি গলা। লোক কাঁদাতে পারে মাখন। পেয়ে গেলো ছোকরা দলে নাচার সুযোগ।

সিলেট থেকে বায়না পেয়েছে যাত্রাদল । সেখানে মাখন যায় যাত্রাদলে অভিনয় করতে । মাখন ঠাকুর মনসার পাট করে । নেচে নেচে গান গেয়ে দর্শকদের মন নাচায় । অষ্টমী পূজার দিন চন্দ্রধর পালা । সমসের নগর বাগানে । মঞ্চে উঠেই দেখতে পায় তার কাকা দর্শকদের ভিড়ে । সমস্ত কেরামতি দেখিয়ে অভিনয় করে । দর্শকদের দরদ ঢালা বাহবা কুড়ায় ।

মঞ্চ থেকে নেমেই কাকাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে তার বাপ মারা গেছে । ম্যানেজার দুদিন আগেই জানত । তবুও জানায়নি পাছে বায়না নষ্ট হয় । দ্বীপান্বিতা পর্যন্ত তার থাকার কথা ছিল । সামান্য কিছু টাকা নিয়ে দুঃসংবাদে মুষড়ে ছোটে রসুলপুরের দিকে ।

অভাব কমতে থাকে । তবু আশ্বিনে দুর্ভিক্ষের রেশ কিছুটা আছে । তখনই এলো রূপচান দাস সোনাধনের ঘরে । কাঁধে চাদর, হাতে ছাতি, পরনে নতুন ধুতি দেখেই সোনাধন অনুমান করে লোকটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে । কিন্তু এত অভাব কাটতে না কাটতেই বিয়ে দেবে কেমন করে । সোনাধন তখন উঠোনে গাবের জল ডেকচিতে বসিয়ে সেদ্ধ করে । সুমিত্রা ঘাটে কাপড় কাচতে ব্যস্ত ছিল । আগন্তুককে দেখে কিছুটা অনুমান করলেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি ।

উঠোনে গিয়েই রূপচান ডাক ছাড়ে, সোনাধনবাই বাড়ী আছ্নি ।

সোনাধন জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলে, আয়েন আয়েন ! কি মনে কইর‍্যা গরীবের বাড়ীতে আইছেন ।

ঘর-দুয়ার তেমন গোছানো নয় । উঠানে ভাঙা ডুলা । বেড়াতে কাপড় মেলা । বাঁশের আরাইলে জাল টাঙানো রোদে । উঠোনে ধান সেদ্ধ কবার উনুনে লাকড়ি ছড়ানো । এক কোণায় গোয়াল ঘরের পাশে বাছুর বাঁধা ।

জল চৌকিতে বসেই অভাব কাটানোর গল্প বলে । নিজে কত কষ্ট পেয়েছে তাও বলে । আগামী বছর ঠাকুরের কৃপায় কেমন কাটবে । আরো অনেক কথা ছেড়ে মূল কথায় আসে, আইলাম বাই, তোমার মাইয়্যাটার একটা সম্বন্ধ লইয়া । পাত্রটার বাই অবস্থা বালা । জমিন আছে নাইলেও দোনের কাছাকাছি । খাওইন্যা নাই ঘরে । গেল ভাদ্র মাসে দুই কানি জমিন কিনছে । দেখতে খুব সুন্দর । তোমার মাইয়্যাটার লগে মানাইব ভাল । চিন্তা করলাম মাইয়্যাটা এই ঘরে গেলে সুখে থাকব । অন্তত ভাত কাপড়ের অভাব জীবনে কোনদিন অইত না । দোষের মধ্যে দোষ অইল বউটা মরছে দুইটা পোলা আর একটা মাইয়া রাইখ্যা । পনও আশা রাখি খারাপ পাইতা না । বিয়ার খরচ কুলায়াও টেকা পয়সা কম থাকতো না ।

সোনাধন কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করে, পাত্রটা কেডা বয়স কেমন ।

— পাত্র অইল আমার নিজের শালা, বয়স চল্লিশের বেশী অইত না । চিন্তা-ভাবনা কইর‍্যা জানাও । শুভ কাম কইলাম এই মাসেই করন লাগব ।

সোনাধন উত্তর দেয়নি । শুধু সম্মতি সূচক নীরবতা জানিয়ে দেয় মনের ইচ্ছা ।

কাপড় রোদে ছড়ানোর সময় ভাল করে সব কথা শোনে সুমিত্রা । বিয়ের কথা বিশ্বাস করতে পারে না । তবু বুকের ভেতরটা কেমন যেন চমকে ওঠে । থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে আপত্তি জানাতে । সাহস হয় না । আর আপত্তি জানালেও শুনবে কে । ধন, দৌলত, পণ দিয়ে মেয়ে বেচাকেনার সংসারে কার ব্যথা কে বুঝবে । যে বোঝে সে এখন দূর

দেশে। "মন বাইন্দ্যা রাখিস" বলে বাঘজোর বিলের খলায় কদিন কথা দিয়েছিল। সে কথা তাবিজের মতো বুকে বেঁধে রেখেছে। গোয়ালখলায় বিয়ে হলে ভাত কাপড়ের অভাব থাকবে না ঠিক। চিন পরিচয় নেই, এক পরপুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে ভাত কাপড়ের বিনিময়ে। ভাবতে সমস্ত গায়ে শিহরন জাগে। ব্রাহ্মণ ছেলেটা কত সহজ সরল। সিংরা লতার ফাঁকে বিলের অথৈ জলে অতীত শৈশবে খেলার ছলে যে ভালোবাসা অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজকে বিশাল বৃক্ষের শিকড় হয়ে মনের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইচ্ছে করেই বিয়ের একটা প্রস্তাব শুনে উৎপাটিত করা যায় না।

মনের দিকে দিগন্তে একটা ক্রোধ আর করুণ ব্যথা জমাট বাঁধছে। প্রকাশের পথ খুঁজে পায়না। দূরের আকাশে উড়ন্ত মেঘের মতো শুধু চোখের চাউনি কি যেন খুঁজে বেড়ায়। দিশেহারা পালভাঙা নৌকার মতো মন কোন দিকে ছোটে। বৈঠা ধরে পারের কিনারা করতে পারে না। অকূল দরিয়ার কিনারা সেই ঠাকুর। কোন দেশে সখীর নাচন নাচতে গেছে কে জানে। কাকে জিজ্ঞেস করবে তার ঠিকানা।

কোন একদিন ফিরে আসবে নৌকার পাল উড়িয়ে। ঘাটের পারে ভাটিয়ালী গান গাইবে। বাসন মাজার সময় কে আসবে তার ব্যাকুল বুকে একটু প্রেমের চাওয়া চাইতে। জাম্বুরা গাছের তলায় জোনাকীরা মিট মিটে আলো জ্বেলে থাকবে। কে তখন সোহাগ করে আধো অন্ধকারে মরমী হাতের ছোয়ায় চুলের মাঝে বিলি কাটবে।

ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি লাগে। কেমন উদ্বেগে মন স্থির রাখতে পারে না। পথ চেয়ে বসে থাকে দূরে ভাসমান নৌকার দিকে অধীর আগ্রহ নিয়ে।

বিয়ের কথা যেদিন শোনে, সেদিন থেকেই কেমন যেন আনমনা। চুল বাঁধে না। লোকের সাথে কথাও বলে না। পাড়ার বান্ধবীরা ডাকতে এলে শুয়ে থাকে বিছানায় ঠিক যেন গাছ থেকে খসে মাটিতে নেতিয়ে থাকা লতা। মা যখন দশবার ডাকে বড় অনিচ্ছায় একটা জবাব দেয়। স্নানের ঘাটে গেলে ঘাটেই থাকে ফিরবার কথা মনে থাকে না। বাসন মাজতে গেলে বাসন ঘষতেই থাকে। ধান সেদ্ধ যখন দেয়, আগুন নিভে গেছে তবু লাকড়ী ঠেলে। সব সময় কিসের এত তন্ময়তা। জলের ঘাটে গেলে হারানো দিনের সিংরা খোঁজা স্মৃতি জীবন্ত হয়ে আসে। কখনো বাঘজোড় বিলের খলার শ্যাম বিনোদিয়ার গান মনটাকে খামচে ধরে।

দূর থেকে কেউ যদি ভাটিয়ালী গানের সুর তোলে, মনে হয় মাখন ঠাকুর বুঝি আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভুল ভাঙে। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা দারুণ ব্যথা লাগে। দূর থেকে দূরে ডিঙ্গি নৌকা পাল উড়িয়ে যায়। বালিহাসের ঝাঁক দূর থেকে দূরে আকাশে মিলায়। মনে হয় বালিহাস হয়ে কেন জন্মালো না। ডানা মেলে উড়ে উড়ে যেতো দূর দেশে যেখানে মাখন ঠাকুরের সুর বাতাসে ভাসে।

গ্রামের কেউ বলে মেয়েটাকে ভূতে ধরেছে, কেউ বলে শত্রুতা করে তাবিজ করেছে। যারা জানে তারাই শুধু বলে পীরিত রোগের জ্বালায় জ্বলছে।

দেখতে দেখতে বিয়ের সানাই বাজে। আত্মীয়স্বজন এসে বাড়ী গমগম। পণের টাকায় বাড়ী জুড়ে অভাবের কোন চিহ্ন নেই। মেয়েরা বসে পানের বাটা ভরে সাজায়। কেউ বিয়ের শাড়ী

কাপড় মেলে পরখ করে । কেউ ব্যস্ত ধানর্দুবা ঘট সাজানোর আয়োজন করতে । কেউ আবার বিকেল থেকেই উনুনে ঢোকে । কয়েকজন আবার মশলা বাটতে গিয়ে গল্প তোলে, জামাই কইলাম দেখতে খুব সুন্দর অইলেও বয়স কোন কমনা ।

পুরুষেরা কলার পাতা কাটায় ব্যস্ত । কেউ আবার দুমদাম লাকড়ী কাটে । নন্দ বন্ধুদের দিয়ে উঠোনে বিয়ের কুঞ্জে কলা গাছ পোতে । কেউ আবার পাড়া ঘুরে ঘুরে চাটাই, ডেকচি, কড়াই খোঁজে ।

দেখতে দেখতে গোয়ালখলা বরের দল এলো নৌকায় । সঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক । মাথায় মুকুট পরে বর নামে । পাশে হ্যাজাক বাতি ধরে বরকে দেখায় । উলুধ্বনি ওঠে সোনাধনের বাড়ী জুড়ে । বিয়ের পিড়িতে বসে জামাই । কনেকে নিয়ে হাতে হাত বাঁধা হলো । এবার শুরু সাত পাকে বাঁধার পালা । কনের বাড়ীতে আত্মীয়কুটুমরা কনের পিড়ি তুলে বরের চারদিকে ঘুরায়, কনে তখন ফুল ছিটায় । বরকে তুলে রাখে বরের কুটুমরা । দল বেধে মেয়েরা গায়, বাজনার সাথে সাথে—

ধিক ধিক আমার এ জীবনে
ও সই প্রাণনাথ বিহনে
ও সই প্রাণনাথ বিহনে
ও সই সুজন বন্ধু আসিল না কেন
কোন দুঃখ দেয় নাই বন্ধুর সরল প্রাণে
ওগো তবু কেন ভুলে রইল ।

সুমিত্রার বুকে তখন দহন জ্বালা । প্রাণনাথ দূর দেশে এক মুঠ ভাতের খোঁজে ঘুরছে । সুজন বন্ধু আসবে কেমন করে । যাত্রা পালায় মনসা পাট নিয়ে চাদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবায় । নিজের অজান্তে এতদিনের জমানো মনের ধন ডুবছে কোন গাঙে সেই কথা কি মাখন ঠাকুর জানে । ওই বিয়ের গানে অবলাপ্রাণ বিকল করে । হাতে হাতে বাঁধা নয় এ যেন লোহার বেড়া পড়া । নিজেকে নিজে বলে গাঙের ঘাটে গলায় কলস বেঁধে কেন সে মারলো না ।

মালা বদল করতে গিয়ে আধবোঁজা চোখে মেলে তাকায় । তাকাতেই যেন পায়ে শিহরণ জাগে । গাল তুবড়ানো বর । বয়স একবারে বাপের সমান না হলেও খুব একটা কম নয় । বরের কিন্তু কুচকানো চাঁমড়া ভাজ তুলে চোখ দুটিতে খুশির ঝিলিক মারে । কেশহীন রক্তের ধারায় কপালের শিরাগুলো ভাসমান । মাথায় মুকুট, টাক আছে না পাটের মতো চুল বোঝা যায় না । আতঙ্কভরা কৌতূহলে সুমিত্রার মনে উদ্বেগ জাগে ।

মাখন ফিরে দেখে গ্রামটা অনেক বদলে গেছে । চেনা চেনা মুখ অচেনা লাগে । প্রায় মানুষের গায়ের রঙ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে । অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও দীর্ঘ অনাহারের ধারা তখনো পুরোপুরি কাটেনি । যুবকদের কোটরাগত চোখের কোলে দুঃখী দুঃখী ছাপ । যৌবন তাদের বাসী ফুলের মতো ঝিমানো । চিনা পরিচয় মানুষদের খবরাখবর নেয় মাখন । কেউ আছে, কেউ নেই । রূপকথার রাক্ষসীর পেটে যাওয়ার মতো গোটা গ্রামের চেহারা । দুর্ভিক্ষের নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত দেশ । বেড়া ভাঙা ঘরদুয়ার । কারো ঘরের চালা একবারে নেংটা । আচ্ছাদনহীন

রোয়াক, বাঁশ পাঁজরের মতো বেরিয়ে আছে। কোন ঘর ছন্নছাড়া। মানুষজন নেই। ভিটের মাটিতে ঘাস গজানো। অভাবের সময় যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে ভাতের খোঁজে। এখনো ফেরেনি। কালাচান দাস তিনটে ছেলেমেয়ে মরার পর নিখোঁজ। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এমনিতে ছিল রাতকানা। রশি পাকিয়ে বিক্রি করে সংসার চালাতো। জয়চরণ একতারা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতো বাউল গান গেয়ে। পথের পাশেই খেতে না পেয়ে মারা গেছে।

বটগাছের তলায় কীর্তন গাইতো আনন্দ সাধু। আনন্দ সাধুর গান শুনে বিধবা, বুড়োরা ঘরে থাকতে পারতো না। লোকটা নাকি ঘরের ভেতর উপোসের যন্ত্রণায় মরে। মরার দুদিন কেউ খবর পায়নি। দুর্গন্ধ বেরোলে গ্রামের লোকরা গিয়ে দেখে। মরার মুখের কাছে পচা ভাতের থালা। এক গ্রাস কি দু গ্রাস খেয়েছে কি না কে জানে। এখনো অবশ্য বটের তলায় কেউ কেউ কীর্তন গায়। লোকে বলে, আফশোস করে আনন্দ ছাড়া কীর্তনে আনন্দ আইব কেমনে দা—

মাখনের বাপ বসন্ত ঠাকুরও মারা গেছে অনাহারেই। উপোসে থাকতে থাকতে দেহ তখন দুর্বল। মাখনেরা কোনরকম দশ গ্রাম ঘুরে অনেক রাতে চাল যোগাড় করে। বসন্ত ঠাকুরের আবার সর্দি কাশি। ঘন ঘন হাঁচি উঠতো। রাত দুপুরে মাখনের মা উনুন ধরায়। বসন্ত ঠাকুর খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারেনি। মুঠো মুঠো কাঁচা চাল চিবাতে আরম্ভ করে এমন সময় হাঁচি ওঠে। গলায় আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে।

অভাব থাকলেও বাড়ীর কর্তা একজন ছিল। ভালমন্দ দেখতো বলতো। মাখনের বাপ হারিয়ে গাছকাটা ডালের বাসাভাঙা পাখীর অবস্থা। শাসন, ধমক দেওয়ার কেউ নেই। একটা শূন্যতা বাড়ীজুড়ে ঘুরে ফেরে। মাখনের মার অবস্থা কাহিল। হতভম্বের মতো আধপাকা চুল ছেড়ে গালে হাত দিয়ে বারান্দায় বসে। কখনো বসন্ত ঠাকুরের জলচৌকি থেকে, ধর্মের বই নাড়াচাড়া করে বিলাপে বুক ফাটিয়ে কাঁদে। নিরিবিলি ঘরটায় বুড়ো যেন হঠাৎ খিটখিটে মেজাজে ধমক দেবে এমনি এক সর্তকতায় মাখন থাকে। অভ্যাসের তাড়নায় সর্তক হয়ে থাকলেও কেউ যখন কিছু বলে না, মনটা এক দুঃখানো ব্যাথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

শোকের জ্বালা যখন জ্বলে অন্য এক জ্বালা এসে বুকে আগুন ধরায়। ঘরে বাইরে অশান্তি। ঘর থেকে বেরোলেই এক অসীম শূন্যতা চারদিক থেকে জাপটে ধরে। মনের মানুষ খোঁজে। কোথায় গেলে পাব মনের মানুষ। বুকের পিঞ্জরা খালি করে পাখী গেছে উড়ে। অন্তরে বাহিরে শেকল ছেঁড়া পাখীর খোঁজে দিশেহারা। হতাশায় বুকের ভেতর মোচড়ায়। কি যেন একটা বুক ঠেলে গলায় এসে আটকায়। পাখীর খোঁজে ক্লান্ত চোখের উঠোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গুনগুনিয়ে গায় --

সোনার ময়না পাখীরে আমার
সোনার ময়না পাখী।
কোন দ্যাশেতে গেলাই উইড়্যারে
আমায় দিয়া ফাঁকি
মন দিলাম প্রাণ দিলামরে
আর কি রইল বাকী।

গান মনে আসলেও গাইতে পারে না। আবেগে জড়িয়ে থাকে। কতোদিন বাইরে থেকে থেকে সুমিত্রাকে দেখার জন্য মন আকুলি বিকুলি করে। করলে কি হবে দেখা এখন সহজ নয়। কোনদিন যদি দেখাও হয়, পুরানো দিনের মতো কি মন খুলে কথা বলা যাবে! তবু ভাবে একবার গিয়ে আসবে ওদের বাড়ী। গেলে লাজুক লাজুক চোখ তুলে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকা তো আর কোনদিন পাবে না। ঘন ঘন কে আসবে বাসন মাজার অছিলায়! অনেক ভেবে গেল ওদের বাড়ীর পাশের পথ দিয়ে। সুমিত্রাদের বাড়ীতে ঢোকার পথে দুটো কলাকাছ পোঁতা। সবুজ রঙ নেই। ছেঁড়া ফেড়া শুকনো পাতা বাতাসে কাপে বিবর্ণ ভালোবাসার রঙ নিয়ে। সুমিত্রার বিয়ের দিনের কলাগাছ এমনভাবে উপহাস করবে জানা ছিল না। বিকেলের রোদ তখন মুছে যায় যায় অবস্থা। উঠোনের কোণায় আতপ চালের গুড়ি গুলিয়ে আকা আল্পনা। এতদিন পরেও বহু মানুষের পায়ের ধকল নিয়ে কোন রকম আছে। আল্পনার ম্লান আচড় দেখে ভাবে। ওই আল্পনার ওপর দিয়ে আলতা মাখা পা দুটো ফেলে ফেলে কত ব্যথায় জানি চলে গেছে সুমিত্রা। বিয়ের আসরে ঘোমটা টেনে যখন মালা বদল করে, একবারও কি মাখন ঠাকুরের শুকনো মুখটা উঁকি দেয়নি মনে। সুমিত্রা যদি সত্যি সত্যি চিনে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই চোখের কোণে চিক চিক করবেই।

পথে যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ওদের বাড়ীর কোনায় জাম্বুরা গাছের পাতা যেন ফিস ফিসিয়ে কথা কয়। মনে মনে বলে যে যাই কওক, জাম্বুরা গাছ তুমি তো হগগলতা জানো। ক্যারে চুপ কইর‍্যা রইছ। রাতভর রাস্তায় পায়চারী করে মাখন। বিলের বুকে গাঙের ঢেউ ছুঁয়ে আসে কোন এক মাঝির নিশুতি রাতের গান। মরমে বড় ব্যথা জাগায়। বিচ্ছেদ ভরা গান শুনে ভাবে—সুমিত্রা কোন পুরুষের বক্ষে ডুব দিয়ে আপন মানুষ পর করেছে কে জানে।

দেশে যখন আকাল। কে ধার ধারে পূজা-অর্চনার। মাখনের অবস্থা শোচনীয়। কোনরকম বাপের শ্রাদ্ধের কর্ম-ক্রিয়া শেষ করেছে। কাজকর্ম নেই। বাঁচার উপায় ভিক্ষে করা ছাড়া অন্য কিছু দেখে না। কার্তিক মাসে গ্রামের কেউ কেউ হাল চষে রবি ফসলের জমি বানায়। ইচ্ছে হয় হাল চাষ করতে। কিন্তু ব্রাক্ষ্মণ মানুষ শত অভাব থাকলেও লাঙল ধরতে পারে না। যদি ধরে সমাজ সেটা বরদাস্ত করবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে ঘর থেকে বেরোয় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। গলা যখন মিষ্টি, গান গেয়ে পেট চালানো কঠিন হবে না। ভজন, সন্ন্যাস গান, বিচ্ছেদগান, আর কীর্তনের গানই পুঁজি। ভিক্ষে তখন সাধারণ ঘটনা। অভাবের তাড়নায় তখন অনেকেই ভিক্ষে করে। মাখন ঠাকুর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়ায়। যতো চলে ততো ঝুলিতে পড়ে। আজকে যদি বাকাইল যায় একমাস সেদিকে মুখ ফেরায় না। কোনদিন কুচুনি, বুঢ়ঢা, বরুণকান্দি। কোনদিন সাডির পাড়া। কখনো দত্তখলা, সব গ্রামেই যায়। নিজের গ্রামে ভিক্ষে করে না। একতারা নিয়ে বেরোয়, কাঁধে ঝুলি ঝুলিয়ে। রাতের শেষ তারাগুলো আকাশে ফিকে হয়ে আসে। কখনো শিশিরভেজা মাঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোণাকুণি ছোটে।

গ্রামে ঢুকেই গলা ছেড়ে গায়।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ

লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ।
যে জন ভজে গৌরাঙ্গের নাম
সে যে আমার প্রাণ রে ।

যেখানে যায়, ঠাকুর মানুষ কাঁদায়। প্রাণভরে ঠাকুরকে দেয় । যারা দিতে পারে না তারা শুধু কাঁদে। গান শুনে কাঁদে না শুধু, কেউ ভাবে বসন্ত ঠাকুরের ছেলে শেষ পর্যন্ত ঝুলি নিয়ে বুঝি বেড়োল। কেন দেশের হাল এমন হলো, বলে কাঁদে। মাখন উদাস, বাধা- বাঁধন হারা । কে কি ভাবে ভাবার দরকার নেই। গান শোনে, ভাল লাগে কিছু দিয়ো । ভালো না লাগে দিয়ো না। এমনি এক নির্বিকার চলায় চলে। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘোরে । মন বলে চলো একদিন গোয়ালখলা ভিখ মাঙতে যাই। মনের আরেক দিক বলে এত গ্রাম থাকতে গোয়ালখলা কেন? সুমিত্রা আছে বলে যাওয়া? বেচারী সুখে আছে, থাকুক। অযথা গিয়ে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু যেতে ইচ্ছে করে। ঘোমটা টেনে কোনদিন যদি ভিখ দিতে আসে একবার হলেও তার মুখটা তো দেখা যাবে । কতদিন ধরে দেখা হয়নি।

অবিরত দ্বিধা দ্বন্দে মন ভারাক্রান্ত । সুমিত্রা নামটা দূরে থাক, গোয়ালখলা শব্দটা শুনলেই চমকে ওঠে। কি রহস্যময় ওই গোয়ালখলা। কার ঘরের ঘরণী হয়ে উঠোনে ধান সেদ্ধ করে। শাঁখাপরা কোমল হাতে কার কাপড় কাচে। মাখন যদি উপোসের জ্বালায় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে, সে দৃশ্য দেখেও কি ধনীর বউ হয়ে থালাভরে মাছ মাংস খেতে পারবে। একবার কি মুখের গ্রাস খসে পড়বে না। কত নিঠুর হয়েছে দেখেই আসি।

মাখন গেলো গোয়ালখলা। তখন দুপুর। গ্রামটি অনেক বড় । এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘরে ঘরে ঢুকে যেতে দিনের অর্ধেক লাগবে। এর মধ্যে যদি সাক্ষাৎ হয় হবে। না হয় আরেক দিন লাগবে। আর যদি ইত্যবসরে শ্বশুর বাড়ীর কোন আত্মীয় বাড়ীতে গিয়ে থাকে তাহলে সব বিফলে যাবে। বাড়ী সঠিক চেনে না। জিজ্ঞেস করতেও মুখে আটকায়। কেউ কিছু ভাবতে পারে। মাখন গোয়ালখলাতে ঢুকতেই গ্রামে সাড়া জাগে। বিশেষ করে মেয়েরা তার গান শোনার জন্য উদগ্রীব। এক বাড়ীতে গেলে বাড়ীর বউ, ঝিরা ভিড় জমায়। কেউ বলে,— ঠাকুর একটা সন্ন্যাস গান গাইন, কেউ বলে, বিচ্ছেদের গান জানলে একটা শোনান।

যেতে যেতে একটা টিনের বাড়ীতে ওঠে । বাড়ীর নমুনা দেখে বোঝা যায় সম্পন্ন পরিবার । বাড়ীতে বিরাট গোয়াল ঘর । কত গরু আছে কে জানে । উঠোনের কোণের কয়েকজন মেয়েলোক একসাথে গাইল চিয়ায় ধান কুটে । কেউ ডালা দিয়ে ধান ঝাড়ে । ব্যস্ত বাড়ী । উঠোনে গিয়েই প্রাণ ঢেলে গলা ছাড়ে মাখন—

অনাথের নাথ গৌরারে
তুই আমারে পাগল করলি রে গৌরা ।
দয়া না করিলে
অনাথেরে দিয়া কোল
আমায় সায়রে ভাসাইলি রে
সমুদ্রের ফেনা হইয়া রে গৌরা

ঘুরি ঘুরি বাঁকে বাঁকে
আমার বাইও নাই
বান্ধবও নাই রে
ডেকে জিজ্ঞাস করে ।

ভিড় জমে চারদিকে । এর মধ্যে ঘোমটা টানা এক বউ । মুখ দেখা যায় না । ঠোঁটের ফাঁকে আঁচল চিবিয়ে দাঁড়ায় । দরজার আড়ালে থেকে শুধু মুখটা বাইরে থেকে দেখা যায় । ছল ছল ডাগর চোখ দুটি । কথা বলে না । শুধু চোখ দেখেই মাখন তাকে চেনে । শৈশবে শালুক খুঁজতে যাওয়ার বয়েস থেকে দেখা চোখ । ভুল হতে পারে না । কপাটে রাখা হাতে সোনার ঝলমলে চুড়ি । চুড়ি দেখে ঠাকুর ভাবে—সোনা-রূপার ঝলমলানির সুখে আপন যদি পর হয় । কিসের এত রঙ তামাসার ভালোবাসা । যাক পরের বউ । ইচ্ছে খুসী চলবে । তার কেন মাথা ব্যথা । কোনদিন বলার অধিকার ছিল । যেদিন ছিল সেদিন । সেই অধিকারের দোহাই দিয়ে এখন কিছু বলতে গেলে গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখবে ।

এত কথা ভাবনার পরেও মনে হয় মাখনের, ওই ছল ছল ডাগর চোখের গভীরে কত না-বলা কথা যন্ত্রণায় ধুঁকছে ।

ঠাকুর যখন গান শেষ করে ভিক্ষের ঝুলির মুখ খুলে এগিয়ে দেয়, সুমিত্রা ছুটে আসে অবিশ্বাস্য ভাবে । ঠাকুরের হাত ধরে টেনে বলে, থও তোমার ভিক্ষার ঝুলনা । দুই একটা আলাপ আছে । কয়দিন খইর‍্যা খাইছ না কে জানে । ভাত বাইড়্যা, পেট ভইর‍্যা খাইয়্যা যাও । চাইয়ো আবার ছোট জাত দেইখ্যা ঘিন্না কইর‍্য না ।

সুমিত্রা হাতের মুঠিতে ঠাকুরের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নেয় । সুমিত্রার দরদমাখা আব্দারে ঠাকুর হার মানে । এত সহজ ভাবে ঠাকুরকে আপন করে নিতে পারবে ঠাকুরের ধারণা ছিল না ।

কাঁসার থালে ঠাকুর বসে খেতে । সুমিত্রা কাছে দাঁড়িয়ে খাওয়ায় । ঠাকুর চোখে তাকায় না, মনে ভাবে পাছে যদি কুচিন্তা আসে ! আরেকজনের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে লাভ নেই । এর চেয়ে ভালো নিজের যাতনা নিয়ে নিজেই চলি । ওর যদি মঙ্গল চেয়েই থাকি তাহলে ওকে শান্তিতে থাকতে দিলেই শান্তি ।

এমন সময় এক প্রৌঢ় এসে ঢুকে ঘরে । বলে, অতিথি অইল নারায়ণ । কি খাওয়ামু কন । কোনরকম জল বাত খাইয়্যা যাইবেন ।

বুঝিয়ে দিলেন তিনিই বাড়ীর কর্তা । সুমিত্রার ঘরের মানুষ । নিজে তামাক সাজিয়ে হুঁকো টানতে টানতে বুড়ো বাইরে যখন যায় তখনই ঢোকে খিটখিটে এক বুড়ী । ঢুকেই বলে, হুনছনি বৌ, বাওনের পুত্তরে যে খাওয়াইতেছ মানয়ে কি কইব । এই পাপটা নিব কেডা । পাইয়া পরের ধন বাপেপুতে কীর্তন ।

সুমিত্রা প্রায় রেগে বলে, পাপ নিলে আমি নিমু, তোমার অত কুটনামি কইর‍্যা লাভ কি । তোমার কামে তুমি যাও । কেউ এক বেলা খাইলে, তোমার অত জ্বলে কেরে । তোমার খায়নি কোন ! সুমিত্রার স্বামী বাইরে থেকে বলে, খামখা তুমি আবার দরবার কর কেরে । বেটির মনে

ধরছে খাওয়াইছে । ভ্যান ভ্যান কইর‍্যা লাভ কী । বাওনের পুতের কি পেট নাই ।

বুড়ী চটে জবাব দেয়, মানষের সামনে তোমার বউটা যে কি কয় শাসন করনা কেরে । বড় বইন দুইদিন আইছি নায়র হেইডা সহ্য অয়না তোমার । বুড়া বয়সে কম বয়েসী বউ পাইয়্যা বউ-এর কথায় নাচ । লাজ লাগে না । বউটা যে তোমারে আঁচলদা ঢাইক্যা রাখছে হেইটা কি আর বুঝ ।

সুমিত্রা — তোমার বইন থাকলে কইলাম আমি আর থাকতাম না । মুখ সামলাইতে কও ।

— দিদির কথা কইওনা, আম পাকলে মিডা, মানুষ পাকলে তিতা । মানষে যে কয় হেইডা এমনেই কয় ?

কথার ধারা কোনদিকে বইছে ঠাকুর বুঝে না । না বুঝলেও বউ-এর প্রতি স্বামী যে অনুগত বুঝতে কষ্ট হয় না । বুড়ী মুখরা ঠিক । বিদেশী অতিথির সামনে এমন ব্যবহার উচিত না । কিন্তু স্বামীটাও যেন নধর বউ পেয়ে কড়া কথা বলে না । কি জানি বুড়া বয়সে কচি বউ পেলে মানুষ কেন স্ত্রৈণ হয় ।

ঠাকুর খেয়েদেয়ে পথ ধরে । সুমিত্রা কাছে এসে ঝুলনায় সের দু এক চাল দেয় । ঠাকুরকে ঘরের কোণে সবার আড়ালে জড়িয়ে ধরে বলে, একটু আদর কইর‍্যা যাও । বাওনের পুত মনডা লয়া গেছ । কি জ্বালায় জ্বইল্যা মরি । টের পাওনা । যাও । তবে কইলাম আবার আইবা ।

সুমিত্রার এই লুকোচুরি খেলা দেখার জন্য আড়ি পেতে দরজার কিনারে লুকিয়ে ছিলো ননদ । ভাই বউ যে এইধরনের একটা কিছু করবে আগেই অনুমান করেছিল । তার শ্বশুর বাড়ীও রসুলপুরে । বিয়েটা হয় তারই স্বামী রূপচান দাসের দৌলতে । বিয়ের আগেই সুমিত্রা মাখনের সম্পর্ক নিয়ে চলে কানাঘুষা । ভেবেছিলো বিয়ের জল পড়লে মতিগতি পাল্টাবে । কিন্তু কই, পরিবর্তন কিছুই দেখেনা । বরং দুদিনের জন্য নায়র এসে তাকেই অপমানিত হতে হলো । চাপা ক্ষোভ নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে এই দৃশ্য যখন দেখে প্রায় চীৎকার করে ভাইকে, দেইখ্যা যা'রে মনবাই, তোর অতিথ নারায়ণের কান্ডটা দেইখ্যা যা । ছিনাল বেটীর রঙ তামাসা দেখ আয়া ।

সুমিত্রার জামাই ভ্রূক্ষেপও করে না । নির্বিকার ভাবে হুঁকো টানতে টানতে জবাব দেয়, বেটী আইতের দরবার হুইন্যা লাভ নাই ।

সুমিত্রার ননদ ভাইকে বিশ্বাস করাতে না পেরে আরো দ্বিগুন জ্বলে ।

— মনাবাই, আগে তো এমন আছলানা । কি ওষুদ করছে বেটীয়ে, অখন বউ ছাড়া চোখে দেখনা । মইজ্যা রইছ বউ পায়া । বড় বইনের কথা অখন বিশ্বাস করবা কেরে ।

ভাই তখন বলে, অত পের পেরি করিস না ।

বড় বোন রাগে, ক্ষোভে অপমানে লাল হয়ে আসে । এই দুপুরবেলা পুটলা একটায় লাল পাড়ের শাড়ী, সেমিজ বেধে কাউকে কিছু না বলে হন হনিয়ে নিজের শ্বশুর বাড়ী যায় । রাগটা এতো বেশী । চুল বাধে বাড়ীর রাস্তার মুখে । ভেবেছিলো মনাবাই বুঝি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করবে । না কেউ এলো না ।

পর দিনই বিচার জমায় রূপচান । উপেন ঠাকুর মাখনেরই কাকা । দেবোত্তর জমি নিয়ে

পুরনো বিরোধ আছে মাখনের সঙ্গে । এই সুযোগে উপেন ঠাকুর তৎপর হয়ে ওঠে । নিজেই নৌকা পাঠিয়ে গ্রামের মাতব্বর মোড়লদের খবর জানায় । জাত বেজাত সবাই ভীড় জমায় অন্নদা ঠাকুরের উঠোনে । কৈবর্তের ব্রাক্ষ্মণ, নমসুদের ব্রাক্ষ্মণ অনেকেই আসে বিচার সভায় । নমসুদ আর কৈবর্ত মোড়লরা হাতে লাঠি নিয়ে ঢোকে । দন্ডবত জানিয়ে সামনে বসে । লাঠি হাতে নিয়ে বিচারে আসা মোড়ল গিরির চিহ্ন । সভায় সভাপতির আসনে বসে মহিম ঠাকুর । মাখনকেও ডাকা হয় । মাখন এসে একটা কোণায় চুপচাপ বসে ।

মহিম ঠাকুর জিজ্ঞেস করে, আইজকের বিচারটা কিয়ের লাইগ্যা ডাকছ কও । ভাবটা এমন তিনি কিছুই জানেন না । একেবারে নিরপেক্ষতার ভান করে মন দিয়ে শোনেন।

রূপচান দাস প্রণাম জানিয়ে করজোড়ে বলে, দশজন অইল পরমেশ্বর, ব্রাক্ষ্মণ বৈষ্ণব হগগলেই আইছেন । কইতে সরম লাগে, না কয়াও পারিনা । আমার বৌ গেছিল নায়র গোয়ালখলা । বসন্ত ঠাকুরের পুত হেইখানে গিয়া শালার বউ এর লগে যে কুকাম করছে দশজনের সামনে কই কেমনে । বাওনের পুতে যদি ইতান করে আমরা যাইমু কই ।

বিবাদীর বক্তব্য কেউ জিজ্ঞেস করলো না । মোড়লরা নিজেদের মধ্যে কানা-কানি করে অনেকক্ষন । পান তামাকও চলে এরই মধ্যে । দুজন তিনজন মাথা নীচু করে গূঢ় কোন রহস্য নিয়ে যুক্তি পরামর্শ চালায় । এক কোণায় যুবকদের দল । বাপ কাকারা সবাই আছে । মাথাটা কোনরকম অন্যদিকে ঘুরিয়ে তামাক টানে । কেউ আবার ভ্রূক্ষেপহীন ভাবেই তামাক টানে ।

অনেকক্ষন পর বিবাদীকে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই মহিম ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বলে, এই সব হুন্যা, বিবাদীর কথা না জানলেও অইব । মাখনরে একঘরে করন ছাড়া উপায় নাই । আগুন পানি বাদ করতে অইব । তার হাতের জল দ্যা কেউ পূজা করতে পারত না, তে আগুন চাইলেও দেওন যাইত না ।

সভা গুনগুনিয়ে ওঠে । অন্নদা পন্ডিত অখিল সরকারকে বলে, জাত দিছে বাওন লয়া কি কামে লাগবে । বাওন অয়া নমসুদ বাড়ী দাস বাড়ী খায় ।

উপেন ঠাকুর কথার মধ্যে ঢোকে, হে খালি খায়নি । নমসুদ কৈবর্ত মাইয়্যারার লগে থাকে, ঘুমায় । এইটার কোন জাত আছেনি । এই জাত দেওয়া লয়া সমাজে চলব কেউ । ঘরের আড়ালে মেয়ে লোকরা সব শোনে । কেউ আবার তামাক টানে ।

মহেশ দাস কৈবর্ত মোড়ল বলে, কৈবর্ত বাড়ীর লগে বায়াপ বন্ধু আছে, চলে, ঘুমায় হেইটাও ঠিক । কিন্তু আকাম কুকাম করতে চোখে কখন দেখছিনা, কেমনে কই ।

নদীয়াবাসী দাস, বলে—আপনারা অইলেন সমাজের মাথা, বালা কোনডা বুরা কোনডা হগলেই বুঝেন । আপনারার কথা ফালান যাইত না । দেখেন কোন রকম প্রায়শ্চিত কইর‍্যা টইর‍্যানি সমাজে লওন যায় । নাইলে গরীব মানুষ বাঁচব কেমনে ।

এমন সময় যজ্ঞেশ্বর দাস কৈবর্ত মোড়ল তার ছেলে দাঁড়িয়ে বলে, সভাপতি যদি অনুমতি দেন, তাইলে একটা কথা কইতাম চাই ।

— 'কও কও' । মোড়লরা প্রায় এক সাথেই বলে ।

আপনারা দশ থাইক্যা দেশ থাইক্যা বাদ দিতেন পারেন । আমরা কইলাম পারতাম না ।

চলন লাগব তারে লইয়্যা । বিবাদীর কথা না হুন্যা বিচার অয় কেমনে, সাক্ষী ছাড়া বিচার ত্রিভুবনে কোনদিন হুনছিনা । একজনের উপরে আরেকজন মিছা কথা কইলেই, আপনারা একটা রায় দিয়া লাইবেন । আপনারা এই রায়ডা বিবেচনা কইর‍্যা আবার দেখেন ।

যজ্ঞেশ্বর মোড়ল উঠে হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে কয়েক ঘা মেরে বলে, তোরে ডাকছে কেডা ইখানো, আগাগুড়ি না বুইজ্যা কথাত ঢুকছচ কেরে । সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবকরাও প্রতিবাদ করে । —ইডা কোন তালের বিচার ।

মাখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মুরুব্বিরা কন ! কইলে জাত যায়, না খাইলে জাত যায় । কৈবর্ত বাড়ীত খাইছি কয়া কাউরে কিছু করছি না । দশের পায়ে পইর‍্যা কয় প্রায়শ্চিত করুম কেমনে, আমি গরীব মানুষ । আমার কেউ নেই, মিছা কথা কইলে ঠাকুরে আমার বিচার করব ।

কেউ শোনে না মাখনের বক্তব্য । যারা শোনে তারা বিচারে কেউ নন । দশ থেকে সমাজ চ্যুত হলো মাখন । কিন্তু যুবকরা হাল্যা দাস, কৈবর্ত, নমসুদ একসাথে পরের শনিবারেই শনি পুজো করে সাতটা আটটা বাড়ীতে । সব পূজার ঠাকুর হলো মাখন ।

তখন অঘ্রাণ মাসের শেষ পৌষের শুরু । মাঠে মাঠে ধান কাটা শেষ । রসুলপুর থেকে ধান কারবারীরা ছুটে পাশের পাহাড়ী দেশ ত্রিপুরার দিকে । রসুলপুর, দত্তখলা, বরুনকাদন্দি, সাড়ির পার থেকে ভোর হতে না হতেই মাছের ভার নিয়ে চান্দুরা বাজার হয়ে সীমান্তের গ্রাম বামুটীয়ায় ঢুকতো । হয় কেউ মোহনপুর বাজারে না হয় রানীরবাজারে মাছ শুটকী বেচতো । বেচে রাত কাটাতো বামুটীয়ার মেখলী বাড়ী । মণিপুরীদের তখন মেখলী বলতো । লম্বা লম্বা বিরাট বাড়ী । বারান্দাও বড় বড় । বারান্দায় কোমর তাঁত পেতে মেয়েরা কাপড় বোনে । কপালে চন্দন তিলক কাটা । খোপায় রঙবেরঙের ফুল । উঠোনে ঝকঝক কাসার বাসন । বাড়ীগুলোর চারদিকে সুপারী গাছে ঘেরা । মোষ পালে বেশী । রাসের গান গায় মেয়েরা । একদিকে মাকু চলে হাতে মুখে তাদের ঢেউ খেলানো দীর্ঘ সুর । বাড়ীগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । মাছ খায় । মাংস খায় না । হাঁস, মুরগি, ছাগল শুয়োর কেউ রাখে না । গ্রামের পাশে কারো আখ খেত । বড় বড় মহিষ নিয়ে আখের কলু ঘুরায় । মাছ বেপারীরা ভিড় করতো কলুর পাশে । প্রাণভরে আখের রস পান করতো । কোন কোন সময় নিজেরাই আখের খেতে ঢুকে আখ কেটে কলুতে ঢুকিয়ে রস নিঙরায় । আপত্তি করে না । দাম চাইতো না কেউ । আসতে যেতে মাছ বেপারীরাও একটা বড় মাছ দিয়ে দেয় । কয়েকটা শুটকী পেলে তারা কত খুশী । বামুটীয়া, রাঙ্গুটীয়া সোনাতলা, তারানগর, ফটিকছড়া মণীপুরী বাড়ীতে রাত কাটায় ।

নিজের রান্না নিজেই করে দল বেঁধে । বাসন, কলার পাতা, চাল কোন কিছুর অভাব নেই । মাগনা পাওয়া যায় ।

বিপদ শুধু ওদের শুচি বায়ু । বাঙালীর ছায়া লাগলে কাকালের জলের কলস অশুদ্ধ হয় । জল ফেলে জল আনে ।

বোয়াল মাছ ভালোবাসে । কেউ তাদের ঠাট্টা করে পচাবোয়াল ডাকে ।

এতে তাদের মনে লাগে । লাগলেও প্রকাশ করে না ।

চিড়া মুড়িও ভাজে তারা । মুড়ির স্বাদ অপূর্ব । কোন কোন দুষ্ট বেপারীরা ছেলেমেয়ে

ক্ষেপায় । ছড়া বলে—

মণিপুরি দাদি
চিড়া খাইয়া পাদি
চিড়া নাই ঘরে
মণিপুরী মরে ।

ছেলেমেয়েরা ক্ষেপে লাল হয়ে ছড়া বলে নেচে নেচে ।—

পেট মোটা বাঙ্গাল
পুটি মাছের কাঙ্গাল
পুটি নাই ঘরে
বাঙ্গালী পইড়া মরে ।

ই এর উচ্চারণ ও হয়ে যায় । বেপারীরা খলখলিয়ে হাসে ।

সকালে যায় দল বেঁধে ধান কিনতে । পাহাড়ীরা সহজ সরল । পোরা নামক বাঁশের টুকরী দিয়ে ধান মাপে । উঠোনে মাচার ওপর ধানের গোলা । যে কিনে সেই মাপে । ধারেকাছে কেউ পাহারা দিয়েথাকে না । অবিশ্বাস বলে কোন কিছু আছে এটা তারা জানে না । লোভী ধান বেপারী যারা সুযোগ বুঝে চার পোয়া মাপতে ছয়পোয়া মাপে । মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে এটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর । কোন কোন ধান বেপারী আবার পাহাড়ীদের কাপাস, তুলা কিনে আনে ।

কেউ আবার ধান বেপার ছেড়ে চুড়ি, চুলের পেটা, চিরুণী, পুঁতির মালা, রঙ বেরঙের প্লাসটিকের প্রজাপতি, সুবাসি তেল সাবানে ঝুড়ি ভরে ফেরী করতে যায় । ফিরে আসার সময় দুই পোয়া ধানের জিনিষ বেচে বার পোয়া ধান আনতে পারে । মেয়েরা ফেরীওয়ালা দেখলেই ভিড় জমায় । রূপার সিকি আধুলির মালা পরে বুক ঢেকে । টুং টুং মালা বাজে, যখন চুড়িওয়ালা কাচের চুড়ি পরায় । তাতেই ফেরিওয়ালার মন জুড়ায় । তিতাসের বেপারী তখন পাহাড়ে ভালোবাসার সওদা খোঁজে ।

দেশে এসে বেপারীরা নানা রকম গল্প ছড়ায় । বাজার হাটে মাখন সব শোনে ।

রাতে ঘুম আসে না অনেক দিন ধরে । মাখনের মেসতুতো ভাই খবর পাঠিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে খোয়াই মহকুমাতে যাওয়ার জন্য । সেখানে একটা পাহাড়ী ইস্কুলে বেসরকারী একটা শিক্ষকের কাজ ঠিক করেছে । বেতন খুব বেশী না হলেও কোন রকম সংসার চালানো যাবে । তবু দ্বিধা যাবে কিনা যাবে ।

দেশ বিভাগ হতে না হতেই চারদিকে হিড়িক পড়ে কার আগে কে পালাবে । দণ্ডখলার বড় মহালদার মহানন্দ মাল প্রতাপশালী লোক । কোন দিন মাথা নত করেনি কারো কাছে । সে-পর্যন্ত চলে গেছে আত্মীয়স্বজন নিয়ে । এখন ত্রিপুরারাজ্যে তেলিয়ামুড়ার পাশে মোহরছড়া গ্রামে বাড়ী করেছে । বাকাইল গ্রামের উমেশ চোধুরীর ধনসম্পত্তি কোন কম না । সেও এখন আগরতলা রামনগরের বাসিন্দা । লালপুরের তরণী দাস, ক্ষিতীশ দাস বড় বড় মাতব্বর মুরুব্বী তারাও গেছে ত্রিপুরার কমলপুরে । গোয়ালখলার রাবণ দাস, ধনে জনে বিরাট পরিবার নিয়ে পাড়ি দিয়েছে

তেলিয়ামুড়ার কালীটীলায় । এই দেশ থেকে পাশের পাহাড়ী দেশে লোক ছুটছে হাজার হাজারে নয়, বলা যায় লাখে লাখে ।

কি ধন আছে ওই পাহাড়ঘেরা ছোট্ট রাজ্য জুড়ে । বাঁশবনে পাহাড়ের চূড়ায় গাছগাছালির কি দূরান্ত আহ্বান । মানুষকে ভুলিয়ে নেয় ।

স্রোতে যখন বাঁধ ভাঙে কেউ আটকাতে পারে না । ভোর হলেই প্রতিদিন চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি, আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে শিশু, বৃদ্ধ, নারী, দলে দলে ছোটে । পাহাড় ভরে প্রকৃতির কলা বাগান । খাওয়ার কোন লোক নেই । গাছের কলা গাছেই পাকে । বনের পাখীরা খায় । খেয়েও শেষ করতে পারে না । গাছের ডাল ভরে কাঁঠাল ঝোলে । পচে পচে ঝরে । কে খাবে এত কাঁঠাল । ঘর বানাবে, বাঁশ কাঠের অভাব নেই । বন পাহাড়ে সুন্দী, সেগুন, রঙ্গী, রাতা, চামল, জারুল, থরে থরে সাজানো । এখানে একটা লগীর বাঁশ খুঁজতে গেলে কত কষ্ট । ওই পাহাড়ী রাজ্যে বাঁশই কত জাতের । বরাক, মাকাল, দলু, রূপই, মিরতিঙ্গা, কালী বাঁশ, কাটা বাঁশ, মূলি বাঁশ পাট খেতের মতো ঘন ঘন হয়ে আছে ।

এক কানি জমির জন্য কত ঝগড়া-ঝাটি । ওখানে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট বিরাট হাওর । ওইখানকার লোকে লুঙ্গা বলে । বুটাং গাছের বন, নল খাগড়ার বনে ঢাকা । জঙ্গল কেটে আবাদ করলে দ্রোন জমি বের হয় সোনার থালার মতো । বারো চাষ তেরো মৈ দিয়েও এখানে জমিতে ধান হয় না । ওখানে কোনরকম একটা চাষ দিয়ে, মাটির ডেলা ভাঙার জন্য একটা মৈ যেমন তেমন দিলেই হয় । কিছু ধান ছিটিয়ে দিলেই কাজ শেষ । কয়েক বছরের ফসল এক ফসলে আসে । তাছাড়া পাহাড় থেকে শিরা উপশিরার মতো অসংখ্য নদী, ছড়া তর তরিয়ে নীচের দিকে নামে । মাঠে মাঠে দৌড়তে দৌড়তে বড় নদীতে মেশে ।

গরু, ছাগল, মোষ পালাও সহজ । ঘাসের কোন অভাব নেই । সারা বছর বনে পাহাড়ে চরে ভরে খেতে পারে । দুধ আছে প্রচুর । ওখানকার আদিবাসীরা দুধকে গরুর পুঁজ মনে করে । গাই দোহায় না কোনদিন । ইচ্ছে মতো দোহালেও কেউ আপত্তিও করে না ।

ওখানে গিয়ে রাজধানী আগরতলায় কলেজ আছে । সেই কলেজ টীলায় নাম লেখাতে পারলেই সব ঝামেলা চোকে । পরিবার প্রতি পাঁচ কানি জমি দেয় । তাছাড়া ঘর বানানোর টাকাতো আছেই । উপরন্তু পরিবার পিছু মুরগী, হাঁস, ছাগল, গরু বিনে পয়সায় জোটে । যতদিন এসব হবে না ততোদিন শিবির গড়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় । এত সুখের দেশ কোথায় পাবে ।

কেউ কেউ আবার ওই দেশে গিয়ে ফিরেও আসে । নানা রকম গল্প বলে । ওই দেশের পাহাড়ে ডাইনী ঘুরে বেড়ায় । মানুষ পেলে ঘাড় মটকে কোন জঙ্গলের কাটা বনে নিয়ে রাখবে কেউ জানে না । পাহাড়ীরাও তাবিজ কবচ জানে বলে থাকতে পারে । পাহাড়ীরাও নাকি মানুষ খায় । বছরের কোন একটা উৎসবের দিনে ঢোল বাজিয়ে পাহাড় থেকে দল বেঁধে সমতলে নামে । ধারালো বল্লম আর টাক্কাল নিয়ে মানুষ শিকার করে । বল্লমের আগায় শিশুর মাথা গেঁথে নাচতে নাচতে আবার পাহাড়ে ওঠে । কোন কোন পাহাড়ী নাকি বাপের শ্রাদ্ধ করে মরা বাপের মাংস রেঁধে ।

কেউ আবার বলে ওই রাজ্য জুড়ে কলা আছে প্রচুর । কিন্তু ওই কলা খেলে কালা জ্বর

হয় । পেট ঢাকের মতো ফোলে । শরীর পাট-কাঠির মতো জীর্ণ হয়ে মারা যায় । একজন দুজন মরে না ঝাঁক ঝাঁক মানুষ মশা মাছির মতো মরে । জঙ্গলে দিনের বেলা বাঘ এসে মানুষ মারে । কোথাও আবার বন মহিষের তাড়া খেয়ে নতুন বাঁধা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয় ।

সেই শরনার্থী শিবির আরো ভয়ঙ্কর । মৃত্যু সেখানে লেগেই আছে । মাখন চান্দুরা বাজারে গিয়ে শোনে রাই দাস বৈষ্ণবীর গান । বৈষ্ণবী গিয়েছিলো কলেজ টীলার সেই শিবিরে । অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে । চান্দুরা বাজারে ডুপকী বাজিয়ে ভিক্ষা করে আর গায়—

মনরে কলজ টীলা গিয়া
সোনার দেহ নষ্ট করলাম
বাঁশের মাচায় শোইয়া
মনরে কলজ টীলা গিয়া

নবদ্বীপ দাস মাখনের যজমান ফিরে এসে গল্প বলে । কইও না ঠাকুরবাই আগের দিন নিছে লরী ভইর‍্যা মানুষ । ফালায়া দিছে গন্ডাছড়ার কেম্পে, পরদিন গিয়া দেখে, মানুষ নাই, খালি চাইর দিকদ্যা চুল পইড়্যা রইছে । পাহাইড়্যারা জঙ্গলতে লাইম্যা হগাল মানুষ খাইয়া লাইছে ।

এই সমস্ত কথা গ্রাম জুড়ে রটে । মানুষের কাজকর্ম নেই । দিনরাত শুধু ওই পাহাড়ঘেরা দেশ নিয়ে জল্পনা কল্পনা । মেয়েলোকেরা বিলের পাড়ে গান গায় । করুণ সুরে—

যেই বনেতে পশু পাখী চইর‍্যা না খায় ঘাস
সেই বনেতে দিলা আইরাম সীতা বনবাস ।

বনবাসে যাবে কেন । পথ ঘাট চেনে না । মানুষজন জানে না । তবু প্রতিদিন মানুষ দেশ ছাড়ে । মাখন মনটাকে শক্ত করে । সব চলে গেলেও একা থাকবে । অচিন দেশে গিয়ে পথে ঘাটে মরার চেয়ে শত অভাব থাকলেও এই দেশেই থাকবে ।

বলা যত সহজ করা তত সহজ নয় । কোন পাখি-শিকারী ডুলা ভরে পাখি ধরে । আনতে আনতে ডুলার কোন ফাঁক দিয়ে সব পাখি ওড়ে । তেমনি রসুলপুরের অবস্থা । মুখে বলে কেউ যাবে না । অথচ আস্তে আস্তে গ্রাম খালি হয়ে গেল । চারদিকে নিঃশব্দ এক হুড়াহুড়ি । কার আগে কে পালাবে । গরু, ছাগল, বাজারে বিকোয় জলের দরে । কেউ বেচে খাট পালঙ । কেউ বেচে নৌকা জাল । কেউ আবার নৌকা বেচলেও জাল বেচে না ।

দলে দলে ভিড় জমায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাইগ্রেশন অফিসে । ঘুষ দিয়ে, কার্ড করে । কেউ আবার আখাউড়া সীমান্ত চৌকিতে দারোগাবাবুকে খুশী করার জন্য কেচি সিগারেট কিনে প্রস্তুতি নেয় ।

যাদের বুদ্ধি আছে তাদের কথা আলাদা । গোপনে ছেলে পাঠিয়ে না হয় ভাই পাঠিয়ে সস্তা দরে জমি কিনে বাড়ী বানিয়ে সব পাকাপাকি করে । তারপর আস্তে ধীরে দেশ ছাড়ে । গেলেই হয় না । ত্রিপুরার কোথায় কোথায় গাঙ বিল আগেই খোঁজ নেয় । তার পরে পাড়ি । কেউ গেছে মেলাঘরে রুদিজলার পারে, কেউ গেছে উদয়পুরে মহাদেব দীঘির পারে । উদয়পুরে কাকড়াবনে ডাকমা জলা, হুরি জলার পারে আত্মীয় কুটুম নিয়ে বস্তি বাঁধে কেউ ।

কারো কারো ইচ্ছা দেশ ছাড়লে দেশের কিনারে থাকবে । যাতে ওই দেশে গিয়েও এই

দেশের খবর মিলে। সীমান্ত বরাবর চারিপাড়া, গজারিয়া, জয়পুর, শানমুরা, লঙ্কামুড়া, কালিকাপুর গ্রামগুলোকে বেছে নেয়।

এই সমস্ত খবর রটে। লাগে নায়র যাবার হাড়াহুড়ি। বাপ যাবে দেশ ছেড়ে শেষবার দেখে যাই। কেউ ভাবে মেয়ে জামাই দেশ ছাড়বে মেয়েটাকে একবার দেখে আসি। রজনী সর্দারের ছেলের বউ দাবী জানায়, যামুগা যখন জন্মের লাইগ্যা শেষবারের মতো মা বাপেরে দেইখ্যা আই। বেটামানুষ তোমরা যাইতে পারবা আইতে পারবা। আমরা গেলেতো আর আইতে পারতাম না। নদীয়া দাসের বউ যায় মেয়েকে দেখতে বরুনকান্দিতে। বলে, যাইমুগা যখন মাইয়্যাডারে শেষ দেখন দেইখ্যা যাই।

গ্রামের দেশের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে ওঠে মাখন। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উড়ো উড়ো মন। কোথাও গিয়ে শান্তি মেলে না। রাত্রিবেলা মা ছেলেতে বসে যুক্তি করে। কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

যজমান বিপ্রচরণ দাসের দেওয়া ভিটেতে ছিল মাখন। সেই সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর করে লিখে দেওয়ার কথা ছিল। দলিল লিখে দেওয়া তো দূরের কথা গোপনে চান্দুরা বাজারের হাসান মিঞার কাছে বিক্রি করে দেশ থেকে পাড়ি দেয়।

হাসান মিঞা বড় আড়তদার। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। রব ওঠে সামনের মাসে জোর করে উচ্ছেদ করবে। কিন্তু বাধা হলো ইসলামপুরের বসুমিয়া। মাখনকে এসে বলে, ঠাকুরবাই, চিন্তা কইর‍্যানা। আমরা থাকতে এমন কোন বাপের পুত আছেনি তোমরাকে তুইল্যা দিতে পারে। হাসান মিঞা জাইত্যা বাই অইলেও ছাড়তাম না। ইনসাল্লা আমরা বাইচ্যা থাকতে তোমরারে দেশ ছাইড়্যা যাইতে দিতাম না। আল্লা মামুদের দোয়ায় আমার বাড়াতে কি লাডি কম আছে।

বসুমিঞা বিরাট সম্পত্তির মালিক। প্রতিপত্তি প্রভাব কম না। যৌথ পরিবার। চল্লিশ পঞ্চাশ লোক একসঙ্গে খায়। লাঠিয়ালের সংখ্যাও কম না। ভরসা রাখে মাখন ঠাকুর। কিন্তু বিপদ হলো ভিটেমাটি থাকলেও থাকবে কেমন করে। শিষ্যসেবক যজমানরা প্রায় সবাই চলে গেছে। সমাজ বলে কিছু নেই। মানুষের যখন জন্ম, মৃত্যু বিবাহ বলে ব্যাপার আছে, সমাজ ছাড়া চলবে কি করে।

এইদিকে ত্রিপুরা থেকে মেসতুতো ভাই আবার লেখে, শিক্ষকতার কাজ ঠিক করে রেখেছে। সময় মত নির্দিষ্ট দিন তারিখে যেন পৌঁছে।

রাতে ঘুম আসে না। নতুন দেশ সম্পর্কে অজানা আশঙ্কা, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন, দেশমাটী ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সব মিলিয়ে একটা উদ্বেগ ভরা রাত। পাড়া পরশীরা এসেছে বিদায় দিতে। চিড়া-মুড়ি পুটলায় বাঁধে। ভোরে পেটে কিছু দিতে চায়। কেন জানি মন মানে না। গরীব মানুষ; আছে কি। নিবেই বা কি। থাল, কাঁথা, পাটাপোতা আর বাপের রাখা পুরোহিত দর্পণ, নিত্য কর্ম পদ্ধতি বোচকায় বাঁধে।

পয়সা কড়ি বলতে বাঁশের চোঙায় মায়ের জমানো কিছু খুচরো পয়সা। সব মিলে পোনের যোল টাকা হবে।

কাকা-কাকীদের প্রাণাম করে । গ্রামবাসীরাও কাঁদে বিদায় দিতে । মাখনের মা দরজায় তিনবার ছুঁয়ে প্রণাম করে । ভিটে ঘাস-মাটির বহু পুরুষের টান ছিন্ন করে যাওয়া । বুক ফাটে দুঃখে । ভিটের মাটীতে ছুঁয়ে কপালে ধুলো মেখে বলে, মাগো তুই থাক, আমি সায়রে ভাসলাম, দেখি কুলের লাগাল পাই কিনা । আড়ষ্ট গলায় কিছু বলতে পারে না । পায়ে যেন কে আঁকড়ে ধরে । চিরদিনের চেনা দুর্বাঘাসের ডগাও বিমর্ষ । কিছু বলতে চায় । বোবা হয়ে থাকে বলে না । গাছগাছালির ডালপালা নড়ে না । দুঃখে স্থির । ঘর থেকে বেরোয় — বগলে বুড়ির পুটলা. হাতে লাঠি । পেছনে মাখন । যাকে পায় তাকে জড়িয়ে ধরে পথে পথে কাঁদে । মাথায় বোঝা । আরো ভারী । সঙ্গে গ্রামবাসীরা সাত গাঁও পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায় । রাস্তার মোড়ে সোনাধন, আর সুমিত্রার মা । সুমিত্রার বিয়ের পর আসা যাওয়া, কথাবার্তা বন্ধ ছিল । মাখন বোঝা নামিয়ে দুজনের পা জড়িয়ে কাঁদে । তারাও কাঁদে । মাখনের মা সুমিত্রার মাকে জড়িয়ে জাপটে ধরে বলে, সুমিত্রার মা, মনে কোন দুখ রাইখ্য না, কত কষ্ট দিছি মনে ।

যেতে যেতে বাঘজোড় বিলের উত্তর পাড় ধরে হাঁটে । বালি হাঁসেরা মুখ তুলে চায় । কে থাও কচুরীপানা নড়ে, সিংরা লতায় বাতাস দোলে । সবাই যেন বলতে চায় ঠাকুরবাই, আমরারে রাঃখ্যা কই যাও । শৈশবের বিস্মৃত স্মৃতি যেন আজ একসাথে কথা কয় । মাখন আর বুড়ি জল ছুঁয়ে প্রণাম করে । পাশেই পসার চান ইস্কুলের ফাঁকে হারিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রামবীসরা বিলের পারে দাঁড়িয়ে থাকে । ছিন্নমূল দুটি মানুষ চোখ থেকে হারিয়ে গেলেও বিষন্ন হয়ে থাকে গ্রামবাসীদের মন ।

ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় নামে । মির্জাপুরের পথ ধরে ধরে পাঁচসাও পৌছে । রাস্তায় অর্ধচন্দ্রের মতো পুল । এক মাইল দু' মাইল গেলে বুড়ি হাঁপিয়ে বাঁকা কোমর সিধে করে দাঁড়ায় । দু' চোখে খোঁজে নতুন দেশের ঠিকানা । যখন বোঝে আরো দুর, হাঁটুতে দুহাত ভর করে দাঁড়ায় । কখনো বসে জিরিয়ে নেয় । আবার ব্যথায় টনটন অচল পা দুটিতে জোর আনে । হাঁটে নতুন উদ্যমে । মনে মনে বলে, যাওয়া যখন লাগব রইয়্যা কি করুম ।

পথের পাশে পাঁচ গাঁওয়ের বটগাছ । পাশে পুকুর নির্জন দুপুরে বড় বিষন্ন হয়ে দাঁড়ানো । মা ছেলে বোঝা নামিয়ে বসে । পুটলার চিড়া চিবোয় । ঢকঢক পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে মুখ মুছে আবার হাঁটে । বাপরে আর কত আটুম, হরসপুর আর কত দূর রইছে । মাখন মায়ের অবসন্ন অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । চল মা আর বেশীদূর আডন লাগতনা আয়া পড়ছে ।

হরসপুরের পাশে লোহর নদী, কলকল করে বইছে । কোন দেশের জল কোন দেশে যায় কে জানে । পাশে একটা ভাঙা দালান বাড়ী । লোকে বলে দেওয়ান বাড়ী । ওখানে নাকি মানুষ খেতো — দেওয়ান বাড়ীর লোকরা । নদী পার হয়ে যখন হরসপুর পৌছে বেলা তখন মাথার ওপর ।

ইষ্টিশনে গিয়ে শাস্তাগঞ্জের টিকিট কাটে । মাখনের মা কোনদিন রেলগাড়ী দেখেনি । বিস্ময় ভরা চোখে দু হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে গাড়ীতে ওঠে । দীর্ঘ সেই যন্ত্রদানবের পেটে কিলবিল করে মানুষ । তাদের মতো ছিন্নমূল কেউ হয়ত থাকতে পারে । ভাবতে ভাবতে বুড়ির কুলকিনারা মিলে না ।

রেলের বাঁশী বাজে করুণ ধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে । বিরঙ্গী তিতাস, গাঙ বিল, মাঠ মানুষ, গাছালির বুক ফাটা কান্না যেন একসাথে রেলের বাঁশী হয়ে বাজে । দমক্ দমক্ ইঞ্জিন আওয়াজ করে ধূয়ার কুন্ডলী আকাশে উড়ে । পেছনে বিচ্ছেদ ব্যথার বার্তা নিয়ে ধূয়া যেন উড়ে যায় ফেলে আসা গ্রামে দেশে । ছিন্নমূল মানুষের বিষন্ন নিশ্বাস নিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যায় ।

মাঠ, নদী, বিল, চেনা অচেনা মুখ সরে দাঁড়ায় । ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে মাটিটাকে জাপটে ধরে চুম্বন করতে । জিজ্ঞেস করতে চায়, মাটি যদি মা হয়, জন্মভূমি যদি স্বর্গের চেয়েও বড় তাহলে কোন দোষে আমাকে ঘর ছাড়ালে ! রেলগাড়ীর মন্থর ঝাঁকুনিতে বুড়ির চোখ জুড়িয়ে আসে । আবার ঘরের কথা মনে হতেই চমকে ওঠে ঘুম ভেঙে । বিশ্বের যত দুশ্চিন্তা চোখে জড়ো হয়ে ঘুম কেড়ে নেয় ।

সন্ধ্যে সাতটায় সান্তাগঞ্জে এসে পৌঁছে । প্লেট ফর্মে কাঁথা বিছিয়ে কম্বল কাটে । সারাদিন ক্লান্ত, একমুঠ চিড়া খেয়ে একলোটা জল ডগডগ গিলে লম্বা হতেই চোখ বুঝে আসে । চোখ বুঝেই বলে, বাবারে তোরে লইয়া সায়রে ভাসলাম, কই যামু, কই থাকুম ঠিকানা নাই । তোরে জন্ম দিয়া একদিনও শান্তি দিতাম পারলাম না । আমার জানি মরণ কেমনে হয় ' ঠাকুর তুমি একটা গতি কইর । চিন্তা করিস না, ভিক্ষা কইরা খাইস, পরের ধনে লোভ করিস না ।

মা যখন ঘুমে, মাখনের কানে তখন ইষ্টিশনের পাশ থেকে খোল-করতালের আওয়াজ ভেসে আসে । মাকে রেখেই মাখন গান শুনতে যায় । মহাজনের গদিঘরে কীর্তন চলছে । যেতে না যেতেই মাখনকে গজা নিমকি, মিষ্টি খেতে দেয় । চিন পরিচয় নেই অথচ এত আদর, অবাক হয় মাখন । ক্ষুধার সময় অমৃতের মত লাগে সব ।

হবিগঞ্জের সুর টেনে একজন বলে—

— বাবুরে, তোমার বাড়ী কোবায় ?

— ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সাব-ডিভিশন ।

— গান জানেন নি ?

— হ থুরাথুরি জানি ।

—ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার মানুষ অইলে গান না জাইন্যা পারে নি ! একটা গান গাওন লাগব কইলাম । আয়েন ভিতরে আইয়া একটা গান গাইন ।

ইতস্ততঃ করে না মাখন । কেউ সাধাসাধি করবে তারপর গাইবে এমন নয় । পেট ভরে যখন খাইয়েছে অন্ততঃ গান গেয়ে তার ঋণ শুধতে হবে । কোন কথা নেই আসর পেয়ে গান ধরে মাখন ।

কি কর বসিয়ে—মন দুরাচার
শ্রীচৈতন্য চিত্ত চিন্ত নাম ।
এল দিন গেল দিন—
অঙ্গ অবশ হইলে লইতে
পারবে না রে ।।
শ্রীচৈতন্য হরি

উদয় নদীয়াপুরে
নিতাই এসে নামে বিলায় ঘরে ঘরে ।।

সধবা বিধবা সবার চোখে জল, মাখনের নিজের চোখেও । দেশের মাটিতে —এই বুঝি তার শেষ গান গাওয়া । শ্রোতারা মুগ্ধ । গদিতে মহাজন গদ-গদ । মাখনের হাতে পাঁচটাকা দক্ষিণা ধরিয়ে দেয় । খোঁজ খবর নিয়ে মাখনের মাকে প্লাটফর্ম থেকে তুলে আনে । বুড়ি পেট ভরে দৈ চিড়া খেয়ে ঘুমায় । যেন মরুভূমিতে জল পড়ে ।

সকালে বাল্লার গাড়ী ছাড়ে । মহাজনের লোকেরা তাদের গাড়ীতে তুলে দেয় । সকাল বারটায় তারা বাল্লা ষ্টেশনে পৌছে । সামনে খোয়াই নদীর ওপর গোদারা । খোয়াই শহরের নামই ছিল বাল্লা বাজার । বাজারে একজনকে জিজ্ঞেস করে, আমরা রামচন্দ্রঘাট যামু মদনার চরে । নীলমোহন কবরার বাড়ী । লোকটা দক্ষিণে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেয় । মাখনেরা পায়ে হাঁটার পথ ধরে চলতে থাকে । গনকি, জ্যাম্বুরা, মহাদেব টিলা সব বাঙ্গালী বাড়ী । অনেক আগে আসা লোকজন । তারপর সোনাতলা কালীবাড়ী । কোণাকোনি খোয়াই নীলমোহন কবরার খামার, সেখানে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে আসে । মায়ের পা নদী পার হয়ে ফোলা, শরীর চলে না, নদীতে কোমর জল । মাকে কোলে নিয়ে পার হয় ।

মদনার চর থেকে পরদিন আবার যাত্রা শুরু সর্বংছড়ার দিকে । পরিচিত মাসী সর্বংছড়ার পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে যায়, মায়ের পা ফোলা তবু হাঁটে নীলমোহন কবরার বাড়ীর পথে । বিরাট বিরাট টিনের ঘর, দূর্গা পূজার মন্ডপ, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মানুষটি নীলমোহন । জীবনের প্রথম দেখা পাহাড়ী । নাক বোঁচা । ভাঙা বাংলায় কথা বলে । বুঝতে অসুবিধা হয় না মাখনের । এমন সুন্দর মানুষটির চেহারায় কোন হিংস্রতার ছাপ খুঁজে পায় না মাখন । এদের নিয়ে অনেক রসের গল্প শুনেছে, কিছুই বুঝে না সে, শুধু বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মাখন নীলমোহন কবরার দিকে । লোকটার নির্মল হাসি দেখে মনে হয় মানুষ কত সরল আর পবিত্র । মাসী পরিচয় করিয়ে দেয় । নীলমোহন নাতি বলে সম্বোধন করে তাকে ।

এবার বনের পথ ধরে গৌরাঙ্গটিলা, সামনে ধলাইছড়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ, দুদিকে ঘন বাঁশ বন পার হয়ে আলেপসা গ্রাম । কিছু আবাদী জমিজমা । মাঝখানে পায়ে-চলার পথ । লোকজন কাজ করে বেগুন আলুর ক্ষেতে । বাড়ীর বেড়ায় শাড়ী কাপড় ছড়ানো, তারপর গৌরাঙ্গটিলা । পাহাড়ী তালুকদার নব তালুকদার এই বিরাট হাওরের মালিক ।

গৌরাঙ্গটিলা পার হয়ে কল্যাণপুর চা বাগান । শ্রমিকরা গাছের গোড়া সাফ করছে । পার হয়ে দ্বারিকা পুর । মণিপুরী গ্রাম, টিনের মন্দির মন্ডপ । সুপারী গাছের চূড়া, মাঝে মধ্যে দু এক বাড়ী বাঙালী । সুবল মহাজন আর মধু মাষ্টারের বাড়ী, বিরাট মাঠ, কুঞ্জবন নামে এক গ্রাম । যেন সাজানো বাগান । পুবদিকে মুসলমান আর কিছু বারুজীবী, পশ্চিমে মুসলমান আর কিছু মণিপুরী বাড়ী ।

মণিপুরী বাড়ী দিয়ে কোণাকোনি গিয়ে কয়েকটা শীল বাড়ী । পশ্চিমের কোণে বিপিন শীল, যোগেশ শীল, ব্রজেন্দ্র শীলদের নতুন বাড়ী । মাখনেরা যোগেশ শীলের বাড়ী বিশ্রাম করে । বেলা প্রায় তিনটা বাজতে সর্বং-এর মাঠে পৌছায় । গোপাল দেববর্মার বাড়ীর পাশে মাঠ, ধান

নেই । হৃষ্টপুষ্ট মোটাসোটা ন্যাড়া । দেখেই বোঝা যায় উর্বর জমি । মনে আশার সঞ্চার হয় । আশ্বাস জাগে, বোঝে বাঁচা যাবে । চতুর্দিকে দেববর্মা বাড়ী । মাঝখান দিয়ে তির তির করে ছুটে চলছে সর্বাংছড়া পাহাড়ী বালিকার মত । মা-ছেলে প্রণাম জানায় ।

ছড়া পার হয়ে টিলা । রহিসিপাই পাড়া । সেখানে রাজারামের টংঘরে রাত কাটে তাদের । পিঠা খাওয়ায় রাজারাম, মাষ্টার তুমি আইছে আমরার সঙ্গে মিলিয়া থাক্‌ব । তোমারে বেজান আদর করব । তুমি চিন্তা কইর না । আলাংকা কলা কাঠাল খাইত পারব, তুমি খালি পুলাপান পড়াও, হরিণ খায়য়াইব, তুমি মুরগী খায়নি । খাইলে মুরগীও আনত পারে, বাঘের ডাক হুইন্যা ডরাইও না, আইরের সুটকী খাইত পারব, ছড়াত মাছ ধরতে পারব, মাস্তরী করব, কিচ্ছু চিন্তা কইর না ।

মাখন পরদিন সর্বং গোলটিলা ইস্কুলে যায় । সেখানে পুজোর আয়োজন চলছে । রঙ-বেরঙের পাছড়া পরা মেয়ে, মাথায় গেন্দা ফুল, খোপায় চুলের কাঁটা কানে ঝুমকা । যেন একদল প্রজাপতি ভিড় করে আছে । নেতা মুক্তা জমাদার, কালু দেববর্মা যদু দেববর্মা ব্যান্ড পার্টি নিয়ে আসে । পুজোয় ব্যান্ডপার্টি বাজানো সোজা কথা নয় । নতুন বাজনা শিখেছে তাই বাজানোর এত শখ । শ তিনেক লোকের সমারোহ, কি সুন্দর পরিবেশ ! কে বলবে এরা মানুষ খায় ! মেয়েদের কারুর বুকে টাকার মালা, গলায় ঝুলছে রঙ বেরঙের পুঁতি । স্বাস্থবতী ফর্সা । কারুর হাত ভরে কাঁচের চুড়ি ফুলের কাজ করা রিসা । নীল ভ্রমরের নীলা লাগানো বক্ষ আবরণীর আঁচল, এত সুন্দর রুচি যাদের তাদের নামে কে বদনাম ছড়ায় ।

সবাই ফুল আনে, কেউ চাল এনে স্তুপাকার করে । কলা, আম, কমলা জমে ঢিপির মত । কৌতূহলী চোখে নতুন ঠাকুরকে দেখে সবাই । —তুমি নি নতুন ঠাকুর ! কেউ বলে তুমি নি নতুন মাস্তর । কেউ বলে আপনে থাক আমরার গ্রামে, লেখা পড়া শিখত চায় । পোড়া পাড়ার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মুক্তা জমাদার বলে, মিলেটারী আইয়া গ্রাম পুড়াই দিছে, আমরা ইস্কুল খুলবার দাবী করছে বইল্যা । আমরাও ছাড়ছে না । মিলেটারীর লগে লাগছে, আরও লাগব । তোমারে লামের সঙ্গে দেখা করাইব । মাখন জিজ্ঞেস করে, লাম আবার কেডা ।

মুক্তা জমাদার হাসি খুশী ছড়ানো মুখে বলে, আমরা কানা মানুষরে রাস্তা দেখাইবার মানু । হেই মানুর নাম লাম কয় । তুমি জানো নি ! না জানলে আস্তে আস্তে জানব । বাঙলির মধ্যে কিছু খারাপ মানু আছে, তারার লগে তুমি মিশতে পারত না । আমরা দিয়া তুমি বাঁচতে পারব । আগে থাকি জানাই দিছে কিন্তু ।

কে সেই লাম জানার জন্য মন আকুপাকু করে । জিজ্ঞেস করতেও সঙ্কোচ লাগে । পাছে অন্য কিছু ভাবে কিনা । মুক্তা জমাদার, পাড়ার সর্দার । প্রচন্ড প্রতাপশালী । এলাকার ইস্কুল তার হাতেই গড়া । লামকে চেনেনা মাখন ঠাকুর । তবে বোঝে নিরক্ষতার জমাট অন্ধকারে লাম ঘুরে ঘুরে বাতি জ্বালে ।

যদুরাম তখন চেষ্টা করে লামের পরিচয় জানাতে । —রাজা কইছে ইস্কুল দিত পারতনা । লাম কইছে ইস্কুল আমি করব । পারলে আটকাও । রাজা মেলেতারি পাঠাইছে । আগুন দিয়া মানু মারছে । লাম মাস্তার তুকায়া আরো আনে । তুমার মসা না লামকে জানে নিশি মাস্তর । নিশি মাস্তর পইলা আইছে এই ইস্কুল পড়াইত । নিশি মাস্তর পড়াইতে পড়াইতে বুড়া

অয়া মরছে। লামে তারে কই থাকি আনছিল কইত পারত না। তুমিও আমরারে নিজের মানু লাখান দেখব।

ডালা ভরে প্রসাদ জমানো। লাইনে ছেলে মেয়েদের দাঁড় করিয়ে মাখন ঠাকুর অঞ্জলি শুরু করে। মন্ত্রের উচ্চারণের গম্ভীর পরিবেশ। পবিত্র এক স্নিগ্ধতা চারদিকে ব্যপ্ত। উপনিষদের কোন পুণ্য সকালের মতো পাহাড়ে দিগ-দিগন্তে ছড়ায় এক নতুন আবহাওয়া। সর্দার, ছেলে বুড়ো সবাই বিস্ময় ভরা খুশীতে তাকায় ঠাকুরের দিকে। মন্ত্র শেষ হতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সন্ধি দেববর্মা এসে বলে, তুমি মাস্তর অত মন্ত্র জানছে কেমনে। কম বেটা না। বাপরে, গরীব অইলে কি অইব তুমি লেখাপড়া জানে। তোমারে মাস্তার বানাইব, দেশের বামুন বানায়া পূজাও করব।

নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এখানে। কেউ টানে এদিকে, কেউ টানে ওদিকে। মুক্তা সর্দার বাঁশের হুঁকো টেনে মেয়েদেরকে ককবরকে বলে, যাও, তোমাদের মাষ্টারকে পিঠা খাওয়াও।

মুক্তাজমাদার তাকে নিয়ে যায় নিজের বাড়ীতে। একটা আলাদা ঘর তুলে মা ছেলেকে থাকতে দেয়। ওরা নিজেরা থাকে মাচার ওপর ঘরে। বাঁশপাতার ছানি দেয়া ঘর। পাড়ায় পনের বিশটা বাড়ী। সবাই মাখনের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে অল্প দিনে।

উঠোনে গোলাভরা ধান। গোয়াল ঘর আছে। থাকলেও গরু বাঁধে না। ইচ্ছে মতো লতাপাতা খেয়ে বনে বনে চড়ে। প্রথম বাছুর জন্ম দিলে কয়দিন বেঁধে রাখে। দুধ দোহায় না। দুধ খেলে নাকি জ্বর হয়। দুধকে কেউ বলে গুরুর পুঁজ। খেতে ঘিন্না করে। তবু গরু বাছুর কেন পালে যুক্তি বুদ্ধি মাথায় আসে না। মুক্তা সর্দার মাখনকে ডেকে বলে, মাষ্টার তুমি যত পারে দুধ খিরাও, আমরা দুধ খাই না। অভাব থাকলে গরু বেচতে পারে খালি। গোয়ালঘর বানাইছে বাঘে না খাইবার লাগি।

বাড়ীর চারদিকে আম, কাঁঠাল, আনারস, কলার ছড়াছড়ি। কেউ খায় না, কত খাবে। গাছে পাকতে পাকতে ঝরে পড়ে। গরু শুয়োরে খায়। বুনো সজারুরা আনারসের বাগানে ঘোরাফেরা করে।

মুরগি, ছাগল, শুয়োরে গলগল করে বাড়ী। সবাই মহাসুখী। স্বাদে গন্ধে অন্যরকম খাওয়া এখানে খায়। আগুনিয়ার বৌ মাখনকে ডেকে বাড়ীতে বসায়। কলার পাতা ভরে আওয়ান বাঙ্গই খেতে দিয়ে বলে, খাও মাষ্টার, পিঠে তুমি কোনদিন খাইছ না। বিন্নি চাল সেদ্ধ করে হলুদ পাতার মতো বনের থরাই পাতা দিয়ে পুটলা বেঁধে আগুনে পুড়ে আওয়ান বাঙ্গই বানায়। সঙ্গে আবার গোদক। সহজ সরল রান্না। বাঁশের চোঙে সিদল, সিম, মরিচ ঢুকিয়ে আগুনে সেদ্ধ করে। আরেকটা বাঁশের টুকরা দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে গোদক বানায়। তেল মশলার ব্যাপার নেই। কি অপূর্ব স্বাদ। —বাচই, আরেকটু দিবানি। মাখন চেয়ে নেয়। বাচই মানে বৌদি।

রাত্রে যখন শুতে যায়, প্রথম প্রথম ঘুম আসতো না। নিশুতি রাতে হরিণ ডাকে। কখনো বানর ডাকে দুঃখী মানুষের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ দিয়ে। হঠাও রাত দুপুরে শোনে হৈ চৈ। চারদিকে খালি টিন পেটানোর আওয়াজ। মুক্তাসর্দারের মেয়ে রঙমালা ডেকে বলে, আতা তুমি দরজা খুলিস না, বাঘ আইছে। জানালা দিয়ে মাখন তাকিয়ে দেখে আগুনের মশাল হাতে, টাক্কাল হাতে, কেউ আবার টিন পিটে বাঘ তাড়ায়।

সন্ধ্যা হলেই পাড়া জুড়ে একটা কলরব ওঠে । রঙমালা প্রেমমালার গাইল সিয়া দিয়ে ধান কুটে । বিশ্বচন্দ্রের বৌ তখন চকথী নামক চরকা চালিয়ে তুলার বীজ ছড়ায় তাদের টংঘরে ।

চানছরি, পাড়ার মধ্যে সুন্দরী । যুবকরা এসে সারা বাড়ী জুড়ে গান বাজনার আসর পাতে । কেউ বারান্দায় টুং টাং শব্দে পাহাড়ী চমপ্রেঙ বাজায় । দেখতে অনেকটা গীটারের মতো যন্ত্র । কারো মুখে সুমুল বাজে । কেউ বাজায় দাংদু । ফুঁ দিয়ে মেয়েদের বাজানোর বাজনা । চানছরি চাঁদের মতো মুখ তুলে ফিক-ফিক হাসে । হাতে চলে দুং দুং আওয়াজে তূলা ধুনার ধনুক ।

কসম্‌তী কালো মেয়ে । বাপ ওয়াখিরাই যখন সুরেশের বাড়ীতে বসে, ককবরকে মন শিক্ষার গান শোনে । কসম্‌তী তখন লাঙ্গি মদের কলসে বাঁধা কলা পাতার ঢাকনা খোলে । তিন চারজন যুবক যুবতী মিলে বাঁশের ছোট 'চুঙ্গই' নামক নল দিয়ে গলা ভরে লাঙ্গি টানে ।

মুক্তাজমাদারের ঘরে পান্ডা জমায় কোন কোনদিন । পান্ডা হলো মদের আসর । বয়স্ক বুড়োবুড়ী মিলে একসঙ্গে মদ খায়, দেশের হালচাল নিয়ে গল্প বলে । কেউ আবার বুড়ো বয়সে ঢোল বাজিয়ে নাচে ।

কখনো শিকারে যাওয়ার বারুদ বানায় । প্রত্যেকের ঘরেই বন্দুক, ধনুক আছে । লোকে বলে গ্রামে গ্রামে লামের তৈরী বন্দুক কমিটি থাকে । মুক্তারাম সর্দার নাকি ওই রকম একটা বন্দুক কমিটির সভাপতি । লামের নির্দেশে গরীব মানুষের ওপর কেউ অত্যাচার করলে বন্দুক কমিটি গর্জে উঠতো । মাখন -- লামকে নিয়ে ঘরে ঘরে গল্পে শোনে । তবে চোখে কোনদিন দেখে নি । শুধু এইটুকু জেনেছে অসহায় মানুষের বুকের বলের আরেক নাম লাম । কিছুদিন আগে নাকি লাম রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলো । এখন অবশ্য সেই যুদ্ধ বন্ধ । তবু পুলিস মিলিটারী এসে মাঝে মধ্যে লামের দলের লোক খোঁজে । মাখন বারান্দায় মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়ে ছাত্র পড়ায় । পড়াতে গিয়েও বাধা হলো ভাষার । যা বুঝাতে চায় ছাত্ররা বুঝে না । মুস্কিল হলো তারা যে বোঝে না খুলেও বলে না । মাখন বুঝলো এদের পড়াতে গেলে ভাষা শিখতে হবে । পাড়ার বন্ধু বৈশারায় তাকে ককবরক শেখায় । ছাত্রদের কাছেও শিখে । কোথায় যাও—বড় থাং, আমি ভাত খাই — আং মাই চাও । তোমার নাম কি—নিনি মুঙ তাম । প্রথম এই কয়টা বাক্য শিখেই ভুল ভাল বকে । কেউ তখন হাসে । মুক্তা জমাদার ঠাট্টা করে বলে, মাষ্টার, আমরা তিপরা মানু বাঙলি কথা কইবার মতো, তুমিও ককবরক আথার পাথার কয়, কইতে কইতে তুমিও শিখব । বড় নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় নিয়ে ককবরক শিখে ফেলে । ছাত্ররাও তখন ভিড় জমায় । যাদের অবস্থা ভালো, এক ভার করে বছর চুক্তি ধান দেয় । এক ভারে তিন মন ধান । যারা পারে না তারাও পড়ে বিনে পয়সায় । টাকা পয়সা না দিলেও কেউ [illegible] এনে মাষ্টারের বাড়ীতে পৌঁছে দেয় ।

লক্ষণ দেববর্মা আসে রূপরাই গামের উঁচু পাহাড় থেকে । লোকে বলে অচাই । কারো অসুখ বিসুখ হলে মুরগী কেটে কাছিম কেটে মদ দিয়ে পুজো দেয় । কারো বাড়ী বিয়ে হলে দিন তারিখ দেখতে গেলে তাকেই ডাকে । দশা, দিশা সবকিছু ঠিক করতে গেলে লক্ষণ আসে ।

মাখন যখন রামচন্দ্রঘাট মাসীর বাড়ী বেড়াতে যায়, মা'র তখন গা কেঁপে ম্যালেরিয়া জ্বর আসে । রাত দুপুরে অচাইকে ডাকবে কে । বিশ্বচন্দ্রের মেয়ে প্রেমমালা আর মুক্তার মেয়ে রঙমালা

এসে বুড়ির সেবা যত্ন করে। নিজেদের জানামতো শেকড় বেটে রস খাওয়ায়। প্রেমমালার কথা একটু আলাদা। রঙ তার ফর্সা। ফর্সা বলাও ঠিক নয়, বলা যায় আগুনের রঙ গায়ে মাখা। চোখ ছোট তবু ওই চোখ দুটিতে সব সময় ফাঁদ পেতে রাখে। মাষ্টারকে আসতে যেতে তাকিয়ে থাকে অদ্ভুত এক মমতায়। মাষ্টার যদি চোখ তোলে, অস্তাচল সূর্যের রঙে রঙিয়ে ওঠে প্রেমমালার মুখ।

পাড়ার দক্ষিণে টীলার নিচে একটা কুয়ো। রাত দুপুরে কলস ভরে সেখান থেকে জল আনে। মাখনের মা'র মাথা ধুয়ে দেয়। হাত পা টিপে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে।

জ্বরের ঘোরে বুড়ি তখন প্রলাপ বকে। প্রেমমালার বুক ভয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠলেও বুড়ির কিনারা ছাড়ে নি। পরদিন মাখন আসে গুঙরাই গ্রামের চন্দ্রধনকে সঙ্গে করে। সব শুনে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে প্রেমমালার দিকে তাকিয়ে বলে, ককবরক ভাষায়, আমি না থাকার সময় মরণ কালে মায়ের মুখে তুমিই জল দিতে। বুড়ি মরেনি তুমি আছো বলেই। তোমার ঋণ শোধ করার শক্তি আমার নেই।

প্রেমমালা মাথা নুইয়ে বাঙালী বুড়ির মাথায় পাহাড়ী হাতের দরদমাখা আঙুল দিয়ে বিলি কাটে। চেহারায়, জীবন ধারণে, আচার অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা। তবু হৃদয়ের কোন এক জায়গায় কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। এত দরদ সহানুভূতি দেখে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। নির্বাক হয়ে দাঁড়ায় মাখন।

পরদিন হঠাৎ ডাক পড়ে মাখনের। মুক্তারাম সর্দার গ্রামে বসে সিদ্ধান্ত করেছে এবার থেকে গ্রামের পুরোহিতের কাজ তাকেই করতে হবে। লাম নাকি খবর পাঠিয়েছে। তামার পাতের ব্রাক্ষ্মণদের বাতিল করে নতুন ব্রাক্ষ্মণ নিতে। আগে রাজার মনোনীত ব্রাক্ষ্মণ ছাড়া শ্রাদ্ধ শান্তি হতো না। অচাই দিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি করলেও ব্রাক্ষ্মণ না এলে শুদ্ধ হয় না। রাজার সনদ লেখা থাকতো তামার পাতে। ওই তামার পাতের ব্রাক্ষ্মণদের কত কদর।

শ্রাদ্ধে আনতে গেলে হেঁটে যেতো না। তারাই যেন রাজা। পাছড়ার দোলন বানিয়ে ব্রাক্ষ্মণ বসতো। দুজন পাহাড়ী গিয়ে দোলনা কাঁধে নিয়ে আসতো ব্রাক্ষ্মণকে। সঙ্গে থাকতো শীল আর কর্তার জন্য শ্রাদ্ধ বাড়ীর সামগ্রী আনার লোক।

নিজেরা দুধ ঘি খায় না। কিন্তু তামার পাতের ব্রহ্মণ গেলে ঘি, দুধ, মাছ, মাংস আগে থেকে যোগাড় করে না রাখলে বিপদ হতো। খোয়াই শহরে নিকুঞ্জ ঠাকুর, অমিয় ঠাকুর, তারাই ছিল তামার পাতের মালিক। ঠাকুরের রান্নার সাজসরঞ্জাম আলাদা। নিজেরা মশলা খায় না কিন্তু ঠাকুরের জন্য হলুদ, আদা, জিরা, মেথি, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচি আলাদা রাখা চাই ই।

শ্রাদ্ধে লেপ, তোষক, মশারি, দামী সুন্দী কাঠের খাট চাই। কাসার বড় বড় থাল থাকবেই। তার ওপর ভূমিদান গোদান করতে হবে।

এখনো রূপকথার মতো লোকে বলে, তামার পাতের ব্রাক্ষ্মণ পাহাড়ী যজমানের ঘরে এসে দেখে দুধেল গাই। ঠাকুর তখন মন্ত্র পড়ার সময় নাকি বলতো, তিপরার মা স্বর্গে যায় ফির‍্যা ফির‍্যা চায়।

যজমান জিজ্ঞেস করতো, ঠাকুর কিতা অইছে।

ঠাকুর বলতো, এত মন্ত্র পড়লাম তোমার মা দেখি স্বর্গে যায় না। একটা বড় দুধের গাই না

দিলে বুলে যাইত না ।

—তে অত কয় কেনে, গাই চাইলে গাই দিব । কোন রকম উদ্ধার করতো পারেনা নি ।

এমন প্রতারণার অনেক ঘটনা পাহাড়ীদের মুখে ছড়ায় । কখনো যেতো গয়া কাশী, পাহাড়ী যাত্রিকদের নিয়ে, পাঁচশো টাকা লাগলে বলতো দু হাজার লাগবে । তীর্থ থেকে ফিরে এসে ঠাকুররা দ্রোন দ্রোন জমি কিনতো ।

গরীব কোন পাহাড়ী যদি শ্রাদ্ধ করে তাহলে ঠাকুরকে আনতে পারে না । পয়সা কড়ি নেই । কিন্তু ডালা ভরে চাল, ডাল, তেল, খাকুলু পৌছে দেওয়ার নিয়ম ছিল । তাহলে ঠাকুর বাঁশের চোঙায় শান্তিজল দিত । সেই জল ঘরে ছিটিয়ে শুদ্ধ হওয়ার নিয়ম ছিল ।

মাখনকে পেয়ে সবাই খুশী । একটা আস্ত সুপারী, একটা পান দিয়ে । মাখনের কাছে গিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি দিন তারিখ জানতে চায় ।

তিতাস পাড়ের মাখন ঠাকুর তখন আনন্দে আত্মহারা । সর্বং, গুংরাই, খেসরা বাড়ী, চেলা কাহাম, রূপরাই বাড়ী, সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটে পুজো পার্বণ করতে । কারো কাছে কোন দাবী নেই । যে যা দিতে পারে তাতেই খুশী । লাভ তার একটাই, যেতে যেতে গ্রামে গ্রামে বন্ধু বাড়ে । মানুষ চিনে । পাহাড় পর্বতের অন্ধকারে দিন রাত শুধু মানুষের ভালোবাসা কুড়ায় । এতেই তার আনন্দ । কোথাও পাতে ধর্মমায়ের সম্পর্ক । কোথাও পাতে ধর্মের বাপ ।

পৌষ সংক্রান্তির মেলা জমে তীর্থমুখে । পাহাড় ডিঙিয়ে মাখন যায় সেখানে । শীতের রাতে ডম্বুর প্রপাতের জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে । পাঠা বলি, মুরগি বলি সব কিছুই হয় । মেলায় গিয়ে দেশ বিদেশের লোকেরা পরস্পরকে চিনে জানে । পাহাড়ীদের নিয়ম আছে মানত করে সেখানে গেলে নতুন অচেনাকে ধর্মের আত্মীয় বানাতে হবে । নইলে আশাপূর্ণ হয় না । মা হারা ছেলে পথের চেনা মেয়েকে ডেকে প্রণাম করে ডম্বুরের জল ছুঁয়ে শপথ করে, আজ থেকে তুমি আমার মা । কেউ খুঁজে বানায় বাপ, কেউ খুঁজে বানায় দিদি । এই কারণেই তীর্থমুখের আরেক নাম মিলন মেলা ।

মাখন যায় নিজে ব্রাক্ষ্মণ হয়ে মনের মানুষ খুঁজতে । তিতাস পাড়ের শেকড় ছেঁড়া ঠাকুর এই দেশে শেকড় গাড়ে পাহাড়ে উপত্যকায় ।

মাথার চামর দুলিয়ে ফুল ঝাড়ু বন থাকে পাহাড়ের ঢালু বুকে । চৈত্র মাসে শুকিয়ে তিল দানার মতো হয় । তার আগেই মাঘ ফাল্গুনে কাটার সময় । দল বেঁধে মেয়েরা যায় ভোরবেলা । পাহাড়ের গায়ে গায়ে দা দিয়ে কেটে মুঠি বাঁধে । কেউ মাথায় বোঝা করে আনে । কেউ পিঠের খাড়ায় ভরে নিয়ে আসে । রঙমালা, প্রেমমালা রোদে শুকায় । পুরুষরা সেগুলো সুন্দর করে বাঁশের বেতে বেঁধে বছরের জন্য ঘরের উপর রাখে ।

মাঘ ফাল্গুনে মেয়েরা যায় বন সব্জী খুঁজতে । পাহাড়ের প্রকৃতির দান এমন । কেউ চাষ করতে হয় না । এমনিতেই লুঙ্গা জমিতে গানদুরুই নামক বনভুগী, কোথাও আবার বুনো লাইশাক ওরাই পাতায় বন ভরা । কেউ তখন বনের পাশে জলের ডোবায় “থরাই” তারা বনে ঢোকে । কারো ভালো লাগে জালি বেতের মতো পাতা লতা আনতে । চাখুই খেতে ভালো লাগে । চাখুই হলো বাঁশ পুড়ে ঘন বুননের বেতের ঝাকার ছাকা জল । সাথে সব্জী সেদ্ধ দেয় । সঙ্গে যদি পাহাড়ী ধইন্যা পাতা মুইচিং থাকে স্বাদ হয় অপূর্ব । রাম কলার থোর আনতে যায় অমাবস্যা, পূর্ণিমায় ।

কলার গাছের ভিতরের নরম বুক যাকে বলে লাইফাং খায় কেউ । তামাসা করে কেউ তখন গান গায়, কেউ আবার খলো খলো হাসে । হাসি নয় পাহাড়ী ঝরনার কোন কলকলানি । মাখন ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে । "নখাই" নামক খাড়া থেকে মাখনের বারান্দায় দিয়ে যায় , মাষ্টার তুমি গোদক নাইলে চাখুই খাইয়ো ।

গাছে গাছে তকছা লাংচাক পাখী ডাকে । ওই পাখীর গানে প্রেমের ভাষা বলে । যারা বোঝে তারা তন্ময় । যারা বোঝে না তারাও চমকে ওঠে । কিসের যেন একটা দোলা লাগে মনে । লোকে বলে ওই তকছা লাংচাকের ডাক শুনে পুরানো প্রেমের বিস্মৃত অতীত কথা কয় । বুড়ী জুমিয়া নারী হাতের টাক্কাল থামিয়ে আনমনা হয় । হারানো যৌবনের কোন প্রেমিক যেন দূরের পাহাড় থেকে ডাক ছাড়ে ।

নির্জন দুপুরে পাতাহীন গাছ হরিণ শিঙের মতো । গাছ থেকে উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল যখন ডাক ছাড়ে মনে বড় আঘাত দেয় । সুখের যত পুরানো কথা ফিরে আসে মনে ।

এমনতরো পাহাড়ে সুখী মানুষ দুঃখী হয় কেমন করে । মাখনের এক সঙ্গী নাম বৈশারায় । প্রথম প্রথম মাখনকে সে ককবরক ভাষা শেখায় । ককবরক ভাষা শেখার সুবাদে বন্ধু পাতে দুজনে ।

পাড়ার লোক জমে "ইয়ার খামারি" (বন্ধুত্ব পাতানোর উৎসব) অনুষ্ঠানে । জল, পাথর, কাপাস লোহা ছুঁয়ে শপথ করে । একজন আরেকজনের বিপদে থাকবে মাথার চুল কাপাসের মতো সাদা হওয়ার পরেও । কেউ কারো সুদ খাবে না ।

বৈশারায় দেখতে বেঁটে মোটাসোটা । খেরামবুক পোকার ডাকে বনচ্ছায়ায় সন্ধ্যা যখন নামে, পাহাড়ী বৌরা তখন কেউ চিয়ক্ চিয়ক্ ডেকে মুরগি ঘরে তোলে । কেউ তখন পাহাড় থেকে লাকড়ী বোঝা পিঠের খাড়ায় উচু করে ক্লান্ত পায়ে নামে ।

তখন বৈশারায় ছোটে । বাড়ী বাড়ী লাঙ্গি মদের নেশায় । তককী রায়ের বাড়ী না হয় খেরজু বুড়ার বাড়ী । লাঙ্গি বেচে তারা । লাঙ্গি আবার যেমন তেমন হলে চলে না । পৌষের খচাক ধানে চাল ভিজিয়ে তৈরী । সেটাই তার পছন্দ । কোনদিন দাম দেয় । কোনদিন দেয় না । নগদ দিতে না পারলেও তার কাছে লোকে লাঙ্গি বেচে । লাঙ্গির দাম শোধ করতে গিয়ে বৈশারায় পাঠায় বৌকে লাঙ্গি বেপারীর ঘরে কাজ করতে । ওর বৌ নখাতি রোজ স্বামীর সাথে ঝগড়া বাঁধায় । তবু লোকের কাছে ঋণ নিয়ে চলা ভালো লাগে না । বাধ্য হয়ে লাঙ্গির দাম দিতে গিয়ে পরের বাড়ী কাজ করে । কোন সময় জুম বাছাই করে, কখনো জুমের কাপাস তুলে, কোন সময় ডোবার ভিজে ভিজে কিরিচ পাট ছাড়ায় ।

নিজে বড় অলস । একদিন কাজ করলে তিন দিন বসে থাকে । ছেলেমেয়েরা উপাসেই থাকে বেশী । এমনি সব সময় মাথা বেদনা, শরীর বেদনা বলে শুয়ে শুয়ে থাকে । আসল কথা রাতভর লাঙ্গি খেলে পরদিন নেশার চোটে বিছানা থেকে উঠতেই পারে না । জুম কাটতে গিয়ে আধা কাটে আধা কাটে না । চার পুড়া ধান জুমে খুচিয়ে বোনার সময় তিন ভাগের এক ভাগ খোঁচায় । তাই আবার বাছানির সময় এলে অর্ধেক জঙ্গলে থাকে । যা থাকে কাটতে গিয়ে অর্ধেক বন শূয়োরে খায় । কেবল বৌ-এর কৃপায় কোনবকম কিছুটা তুলে আনতে পারে । জুমের ফসল আধা পাকতেই মহাজন ঘরে ছোটে ঋণ আনতে ' ফসল তার জুমে থাকতেই বিকায় । ঘরে এসে

পা দিয়ে মাড়াই করে। তখন তা থেকে লাঙ্গি বানানো শুরু হয়।

ধান কাটার মরসুমে বৌকে পাঠায় কাজে। নিজে খালি খায় আর ঘুমায়।

সারা বছর কাজ করে বৌ ভাবে পরনের "রিগনাই কিচিক" ছেঁড়া কাপড় বদলাবে। কিন্তু মহাজনরা নাছোড়বান্দা। গোপাল ঘোষ, বিনোদ গোসাই এরাই মহাজন। ফসল কাটার মরশুম এলে ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ে ঢোকে। কাপাস, ধান, তুলা, তিল সব কিছু ঋণ আদায়ের নামে নিয়ে আসে। ওদের ঘরেই খায় ঘুমায়, আবার ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় ঋণের ফাঁদ পেতে। অবস্থা আগে যেমন পরেও তেমন। বৌ তখন বলে, সারা বছর পরিশ্রম করে নতুন কাপড় দূরে থাক একটা বেলা পেট ভরে খাওয়ার কপাল হলো না। বৈশারায় কাজে কর্মে বেশ তৎপর হয় তখন।

হলে কি হবে। গোপাল ঘোষ বড় চতুর। কোন ফাঁকে জানি তার বাড়ীটাকে সাদা কাগজে লিখে নিয়ে গেছে। বাঁচার কোন উপায় নেয়। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো আঠারমুড়ার গহন জঙ্গলে মুঙ্গিয়াবাড়ী পাড়ার কাছে। নতুন কোন পাহাড় আবাদ করতে।

পাহাড়ীদের জমি যেতে থাকে বাঙালী মহাজনদের ঘরে। ঘিলাতেলী, বাঘবেড়া পাড়া, ওয়াতিরুং টিলায় আস্তে আস্তে পাহাড় কমে। নতুন করে ওপার থেকে আসা মানুষের ভিড় জমে। বৈশারায়ের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনে মাখন ভাবে কি বিচিত্র পৃথিবী।

মাকে এসে বলে, হুনছনি মা! বৈশারায় গ্রাম ছাইড়্যা গেছে গা। মহাজনরা এমন বেইমানি করত পারে বিশ্বাস করন যায় না। যে পাতে খায় হেই পাতে হাগে। গরীব বেচারার ভিডাডা বুলে কাগজ কইর‍্যা লইছে। দশ টেকার দাদন পাইত্যা এক মন পাট নিলে, হেরা বাঁচব কেমনে।

মাখনের মা—দেশেও ইতানের জ্বালায় মরছি। ইখানো আয়াও হেরার স্বভাব যাইত না। তিপরারা যদি জাগা না দিত তাইলে খাইত কই। হের লাইগ্যা আওনের সময় পূজার দিন, রাজারামে কইছিল বাঙালির মধ্যে খারাপ মানুষ আছে, তারার লগে চইল্য না। বাবারে, বৈশারায়ের চোখের পানি এমনে যাইত না। সুদ খাওন্যা হগল বুঝব, যেদিন ঠাকুরে বিচার করব। এই রকম ধর্ম ডাকাতি কইর‍্যা কয়দিন চলবে, ঠাকুরে ঠিকই দেখে।

মাখনের মন ভালো লাগে না। বৈশারায় অলস হলেও মানুষটা ছিল প্রাণবন্ত। মদ খেতো ঠিক তবুও মনটা ছিল বড়। মাখনকে ককবরক সেই শিখিয়েছিল। ভাষা জানার সুবাদ নিয়ে লোকের কাছে এত প্রিয় হতে পেরেছে একমাত্র বৈশারায়ের সাহায্যে।

ওই বৈশারায় এই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। আঠার মুড়ার কোন জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, ভালুকের সাথে দিনরাত থাকতে হবে। জানে না, জঙ্গল আবাদ করে কখন আবার কোন রকম জমি বেরোবে, জুমের ফসলে ঘর ভরবে। মহাজনরা সেখানে গিয়ে হাজির হবে। আবার এই অবস্থা হবে, তখন এরা যাবে কোথায়। জটলা বাঁধে হাজারো প্রশ্ন। বৈশারায়ের বৌ এক আদর্শ মহিলা। বেচারী এত হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কোনদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পারেনি। নিজে খেতে পায় না। তবুও যেদিন ওদের ঘরে মুরগি পুড়িয়ে ঝাল মরিচের মছডেং বানাতো, পাতায় করে পাঠিয়ে দিতো মাষ্টারের কাছে।

দেশ হারানোর জ্বালা এখনো ধিক ধিক জ্বলছে মনের দিক দিগন্ত জুড়ে। একই যাতনা বৈশারায়ের মনে জুমের আগুন হয়ে কি জ্বলে না। ভিটে মাটি ছাড়ার দুঃখবোধ পাহাড়ী হোক বাঙালী হোক কারো বুকে শূন্য হাহাকার না উঠে পারে না।

কার্তিক মাস। বৃষ্টি একটু আধটু হয়। পুরানো জুমের মাটিতে ঘাস, নতুন লতা পাতা

গজায় । তখন হরিণ শিকারে বেরোয় অনেকে ।

মাখনকে ভালোবাসে বিদ্যাবাগী । বনে বনে হরিণ, খাট্যা হরিণ, কালেশ্বর হরিণ, বুনো শুয়োর, বনছাগল শিকার করে দিন রাত ঘোরে । জুমচাষ করে না বললেই চলে । বৌটা কর্মঠ । কোনরকম জুম ক্ষেত সামলায় । ঘরের পুরুষ বিদ্যাবাগী গাদা বন্দুক হাতে বনেই থাকে শিকারের খোঁজে খোঁজে । শিকারে গেলে সঙ্গে এক জন যোগানী লাগে । সবসময় কার এত অবসর যে কাজকর্ম ফেলে শিকার খুঁজে বেড়াবে । একদিন সঙ্গে থাকে কেউ । শিকার না পেলে হতাশ হয়ে ফেরে । আরেকবার যেতে চায় না । নতুন কাউকে তখন খোঁজে । নতুন সঙ্গীও দুদিন গিয়ে আর যেতে চায় না ।

কোন সঙ্গী না পেয়ে মাখনের কাছে এলো, মাষ্টার চলো না আমার লগে শিকারে যাইত । লগে গেলে যেছা ভাবে অইলেও একটা না একটা হরিণ তো পাইব ।

মাষ্টার বলে, কোনদিন গেছি না, কেমনে যাই কও ?

— আরে চলনা । আমি তো লগে আছে, তোমারে বন্দুক মারাও শিখাইব । গেলে বুঝ পাইব ।

— পামু না পামু আন্দাজে গিয়া কি লাভ অইব ।

— আরে কি কয় মাষ্টার, গত কাইল, জুমে হরিণ পায়ের পারা দেখিয়া আই'ছে । আইজকে যেছা মতেই পাইয়া থাকবো ।

মাখন গামছা গায়ে, জামা গায়ে দিয়ে হাতে একটা টাক্কল নিয়ে সঙ্গ ধরে । পাবারও লোভ আছে, তার চেয়েও শিকারের একটা দুঃসাহসিক অভিযানের ইচ্ছাও প্রবল । অভিজ্ঞতা না থাকলেও সহজেই রাজী হয়ে যায় । শুয়োর বেরোয় ভাদ্র মাসে । জুমে ধান, ধানের কচি করুল খেতে শুয়োর বেরোয় ।

আবার মাঘ ফাল্গুনে জুমে ফসল থাকে না । লুঙ্গায় কচুবনের ক্ষেতে নামে শুয়োর । এই মাঘ ফাল্গুন চৈত্রে বৈরা, আমলকী, এওলা গোটা ধরে । হরিণরা জুটে গাছের নীচে নীচে । গোটার গন্ধ খুঁজে খুঁজে পাট পচানো পাহাড়ী ডোবায় শেওলা চাটতে বালেশ্বর হরিণ নামে । জলে জলে মুখ ডুবিয়ে শেওলা খায় ।

সদ্য ফেলে আসা জুমের টংঘরের পাশে জুম ধানের তুষ জমে । তখনো বনমুর্গি, মথুরা পাখীরা ঝাঁক বেঁধে নামে । সবকিছু বিদ্যাবাগীর জানা ব্যাপার ।

সূর্য যখন ডোবে ডোবে তখন হরিণ জঙ্গল থেকে বেরোয় ঘাস খেতে । নতুবা ভোরের দিকেও নামে । বেলা তিনটার মতো হবে । মাখন ছোটে বড় মুড়ার দিকে । রূপরাই গ্রাম পার হয়ে গভীর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একটা বৈরা গাছ পেয়ে গেলো । নিজেই বৈরা গাছের নীচে সবুজ জঙ্গলের ডাল পালা কেটে ঝোপ বানায় । ঝোপের নীচে দু'জনে ঘাপটি মেরে বসে থাকে হরিণের অপেক্ষায় ।

তখন কথা বন্ধ, একেবারে চুপচাপ । কাশতে হলে মুখে কাপড় দিয়ে থাকে । গায়ে পোকামাকড় মশা বসলে থাপ্পর দিলে শব্দ হয় বলে হাত দিয়ে মুছে ফেলে । এমন করে দুদিন গেল । কিছুই পেল না । তৃতীয় দিন সন্ধ্যা যখন হয় হয়, দেখতে দেখতে একটা হরিণ আসে । প্রতি পদক্ষেপে সর্তক দৃষ্টি । কান উৎকর্ণিত । পাতা বা কাঠ ঝরতেই মুখ তোলে । চার দিকে চায় অদ্ভুত মায়াবী দৃষ্টি মেলে । আবার বৈরা গোটা কুড়িয়ে চিবো:তে চিবোতে একেবারে কাছে আসে ।

আর যায় কোথায় । দড়াম করে একটা শব্দ হলো । লাগল কিনা কি জানি । এক লাফে হরিণটা লুঙ্গার দিকে ঝাপ দেয় । বেশ কিছু দূর গিয়ে জিভ বের করে মানুষের সুরের মতো করুণ এক কান্নার সুরে কাঁদে । মাখন আর বিদ্যাবাগী কাছে যেতেই মায়াবী চোখ দুটো স্থির করে মাথাটা লুটিয়ে পড়ে ।

তখন একটা মায়া লাগে মাখনের । তবে ক্ষণিকের জন্য । দু পা জুড়ে বেঁধে মাঝখানে বাঁশ ঢুকিয়ে দুজনে বয়ে আনে গ্রামে । তখন কি আনন্দ । মাখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হরিণ শিকারের কাহিনী বলে ।

বিদ্যাবাগী কিছুটা মাংস কেটে মাখনকে দেয় । বাকীটার কয়েক টুকরা আত্মীয়-স্বজনদের বিলায় । বিরাট অংশটাই বেচতে নেয় বাজারে ।

তখন বর্ষাকাল । ঝুকি উঠে যুবকদের । সবাই যাবে দল বেঁধে হরিণ শিকারে । বেশ কয়েকদিন হলো হরিণের মাংস পেটে পড়ে না । বাজারে জানান হয় তাদের, যাদেরকে গ্রামে পাওয়া যায়নি । বাজার থেকে সুরা গন্ধক, ঘরের কাঠের আঙরা মিশিয়ে ভাজে কড়াইতে রাত্রিবেলা । তূলানন্দের ঘরে । সবে বসে গল্প করে লাঙ্গি টেনে টেনে । মাখনও যায় তাদের বাড়ী । বন্দুকের বারুদ তৈরী হয় ।

পরদিন মোরগের ডাকে ঘুম থেকে ওঠে । মাখনের কেমন উত্তেজনা । অর্ধেক রাতেই ঘুম ভাঙে সকালের অপেক্ষায় । ঘনঘন বিড়ি টানে । তূলানন্দ ডেকে ডেকে সবাইকে জড়ো করে । পিঠে সবার মাইচু । সঙ্গে নুন মরিচ । হাতে বন্দুক, কারো হাতে তীর ধনুক । ত্রিশজনের দল ছোটে । তুলানন্দ, বিদ্যাবাগী, বিশ্বকান্ত তারা অভিজ্ঞ । শিকারের গোলাবারুদ বানানো জানে । গাদাবন্দুকও বানাতে পারে । কোন জন্তুর কোন দিকে চলা, কিভাবে মারলে মরবে তাও বোঝে । কালেশ্বর, চামসিঙ্গাল হরিণ, পুরনো জুমের অড়হর ক্ষেতে আসে । পুরনো জুম হলেই হয় না । নিগূঢ় জঙ্গল হতে হবে ।

পায়ের দাগ খোঁজে সন্ধানী চোখে । নির্দিষ্ট একটা পাহাড় বেছে চারদিকে ঘুরে ঘুরে খোঁজে । মাখনও পায়ের দাগ দেখলে সেই পথ অনুসরণ করে । পায়ের নতুন দাগ বা পুরানো দাগ চেনাও কঠিন । দ্বিধা থাকলে সব জড়ো হয়ে পরীক্ষা করে । পায়ের দাগ ধরে যেতে যেতে মাঝখানে ছড়া । তখন দাগের দিশা থাকে না । ছড়ার পাড়ে খাড়া পাথরের টীলা । তখন যেতে যেতে বহু দূরে দূরে হরিণ আসা-যাওয়ার পথ বের করে । কোথাও মাটি সামান্য ধ্বসে পড়ে, কোথাও পায়ের দাগ । মানুষ যাওয়া কোথাও খুব কঠিন ।

দলপতিরা সে সব পথের চিহ্ন দেখে বুঝে । মাখন বিস্ময় ভরা চোখে তাকায় । কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই । পাহাড় ঘিরে চারদিকে বেড় দিয়ে দাঁড়ায় । আঁকাবাঁকা ছড়ার মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে । দলপতিদের হাতে পেম্পু বাঁশী । বাঁশের গিট একটা রেখে অন্যদিকে তাক্কল দিয়ে ফাড়ে যাতে গিট কাটা না যায় । সেই পেম্পু বাশীতে ফুঁ দিলে অবিকল হরিণের মতো আওয়াজ । বন থেকে বনে বহু দূরে থেকে সুর শোনে বোঝে কোনদিকে হরিণের পায়ের দাগ আছে । হরিণরা শোনে মৈথুনের আহ্বান । কামাতুরা হরিণীর ডাকের মতো শোনায় ।

হরিণ যখন দৌড়তে দৌড়তে আসে মরা বাঁশ ভাঙার আওয়াজ ওঠে । প্রহরীরা তখন তীর ধনুক তাক করে নতুবা উচিয়ে বসে । সবাই নীরব । কাশির শব্দ পর্যন্ত নেই । যার কাছে যায় সেই শোনে । হরিণের পেছনে গুলি বা তীর লাগলে মরে না । সামনে, বুকে লাগলে পড়ে যায় । যদি

ফসকে যায় আবার সেই দিকে বেড় দেয় ।

হরিণ হয়রান হয়ে জিভ বের করে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে ব্যস্ত তখন গুলি করে মারে । শিকারীদের পেট চো চো করে । ফেরার ইচ্ছে ও আছে । কথা বলার শক্তি পর্যন্ত নেই ।

হরিণ ধাওয়া নয় । এ যেন যুদ্ধে যাওয়া । কোন অসর্তক মূহূর্তে বাঘ, ভালুক ঘাড়ের ওপর ঝাপ দিতে পারে । শিকারে গিয়ে নিজেই শিকার হয় কখনো । বিরাট খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে পা ফসকে গিয়ে কেউ অঘোর বনেই মরে । কেউ আবার পায়ে বিষাক্ত বুনো কাঁটা ঢুকে অচল হতে পারে । কখনো পাহাড়ের বিষাক্ত সাপের ছোবল খেয়ে নীল হয়ে পড়ে থাকে । শিকারীর দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে পাহাড়ী বৌদের বুক দুরু দুরু । মদ বানানোর পিঠা বানাতে বানাতে প্রিয়জনের স্মরণে যুদ্ধের গান গায় । যোদ্ধার বিরহী বৌ আজ শিকারীর বিরহী বৌ ।

প্রেমমালা তখনো টংঘরের সাংসিতে বসে সূতা কাটতে কাটতে গান ধরে—

হাতুতক্ কলম মাই-মুই পিং জ্যাগই
পাগড়ী পুহরালিয়া সবুজ পাগড়ী পুহরলিয়া
হাতুতুক কসক গুরমু পিং জ্যাগই
মাকরাই গুরুগলিয়া সবুও রাকুবাই গুরুগলিয়া,
তুই গেরেং গেরেং গাতি চাজ্যাগই
রিহিনই খনালিয়া যাদু রিহিনই খনালিয়া
গবতি হলংসা বাংমানি বাগই
রুকথারুই সালিপলিয়া মবুদ রুকথারুই
সালাপলিয়া

উচু কাউন ধার্নের আড়ালে পাগড়ী
দেখার ইচ্ছে থেকে নজরে আসে না ।
আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি
বুনো মেহেদী বনে ঢাকা থাকে
তোমার চলা চরণ দুটি ।
তোমার আওয়াজ শোনার
প্রতীক্ষায়, উতল হয়ে থাকি
পাশের ঝর ঝর ঝরণা
শুনতে আমায় দেয় না ।
দৌড়ে যাই ধারালো নুড়ি
পা খুঁচিয়ে আটকে ধরে ।
আবছা চোখে কুয়াশা মাখে
প্রিয় তোমার মুখ দেখা হয় না ।

প্রেমমালা গান গাইলে কি হবে । মাখন তার কাছে মারীচের মতো মরীচিকা । প্রথম যেদিন সরস্বতী পুজোয় মন্ত্র শোনে সেদিন থেকেই এক ভোলা ভোলা ভাব । আলেয়ার মতো দেয় ধরা দেয় ধরা । তবু যেন দূরে থাকে ।

মাখন বোঝে প্রেমমালার মনের গতি । বুকের ঘা এখনো দগদগ করে । কত দিন আগের সেই বাঘজোর বিলের কৈবর্ত বালিকা সুমিত্রার বুকভাঙ্গা কান্না মনে যেন বহু দেশ পার হয়ে এখনো বুকে বাজে । সেই ঘা শুকোতে না শুকোতে আরেকটা ঘা খাবার জন্য বুক পাততে কষ্ট লাগে । মেয়েরা শুধু ভুল করার জন্য জন্ম নেয় । প্রেমমালার প্রেমতরঙ্গে ডুব দিয়ে ঠাকুর যদি ডুবে মরে । কে আসবে তাকে টেনে তুলতে ।

ক্লান্ত শিকারীরা যখন বাড়ীর কথা ভেবে আনমনা হয় বউ-এর মুখটা আবছা হয়ে চোখে ভাসে । মাখনের চোখে ভাসে রিক্ত ব্যাথার জ্বালা ।

তখন কেউ প্রহরায় ঢিলে হলে সবাই এসে প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে যায় । বনে এসে বউ এর কথা ভাবতে গিয়ে হরিণটা ফসকে গেছে । এতদিনের হাজিরা তোমাকে দিতে হবে । অত যদি ইচ্ছা না থাকে তবে এলে কেন । মাখনকে কেউ কিছু বলে না, বিকেল হয়ে আসে একটি হরিণ পেতে । সন্ধ্যে বেলা পেলে করার কিছু থাকে না । হরিণ মারার পর ছড়ার পারে মাইচু খুলে খেতে বসে । হরিণ পেলেও আনন্দ থাকে না । ক্লান্তিতে অবসন্নতায় দেহ আর চলে না । এতবড় হরিণ বহনের লোক থাকে না যে আনবে বিশমাইল উৎরাই চড়াই পার হয়ে ।

কেটে কুটে একটা হরিণকে দশভাগ, পোনের ভাগ করে কাঁধে নেয় । রাত গভীর হয় । পথে শুকনো লাকড়ী জ্বালিয়ে পথ দেখে হাঁটে । বাড়ীতে পৌছতে পৌছতে ভোর হয় । কেউ ক্ষুধার চোটে বাড়ীতে এসেই এক ঘরে উঠে হরিণের পা পুড়ে খায় সবাই মিলে । সমান ভাবে বন্টন হয় । তবে মাথাটা নেয় যে গুলি করে । পুর্বপুরুষের নিয়ম এটাই । কেউ বেচে কেউ খায় । কেউ শুকিয়ে চুলার উপর টাঙিয়ে রাখে । যাতে পোকায় না ধরে । মাখন ঘরে ফিরে মহানন্দে । তার অংশটা দুভাগ করে । একভাগ নিজে রাখে, বাকীটা পাঠায় প্রেমমালার ঘরে ।

আশ্বিনের শেষ দিকেই শুরু । পাহাড় থেকে বাঁশ ছন কাটার আয়োজন । পাহাড় থেকে রুই, মিরতিঙ্গা মুলি চলু কেটে নামায় ছড়া দিয়ে । খোয়াই শহরে বা তেলিয়ামুড়ায় মহাজনরা ফরমায়েস দেয় । কেউ আবার বেত চিরে ঘরে বসে বড় বড় ঢোলের মতো ধান রাখার ঢোল বানায় । কেউ আবার সামনে গরম আসছে নেউলি বুনার জন্য তৈরী হয় । নেউলি মানে বাঁশের মসৃণ পিঠের বেতে তৈরী ধারি । ধারি বানিয়ে বাজারে বেচে । কেউ আবার বনকর বাবুর খাজনা দিতে না পেরে জেলে যায় । দা, কুড়াল কেড়ে নেয় কারো । মাখন যায় পাহাড়ে তাদের সঙ্গে । প্রথম প্রথম পাহাড়ে উঠতে ভয় করে । ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে পথ । বুটাং গাছের বন । কেউ আবার বুটাং কেটে কেটে শুকিয়ে বাজারে চালান করে । বুটাং গাছের বেড়া ঘরে দিলে অনেকদিন টিকে । ঘুনে সহজে ধরে না । বুটাং গাছের পাতা গায়ে লেগে কখনো জ্বলুনি ধরে । তবু বনে যায় পেট পালতে । নইলে খাবে কী ?

বাঁশ চালান যায় কল্যাণপুরে । না হয় খোয়াই শহরের পাশে । মাইচু নিয়ে পাহাড়ে ওঠে । সারাদিন বাঁশ কাটে । কাটা বাঁশ উড়ে এসে পড়তে পারে । এক কোপে কাটা বাঁশে পা পড়লে অচল হতে হয় । অন্যনমনস্ক হলে নিজের টাক্কল নিজের পায়েও পড়তে পারে । স্বর্ণমুনি পাহাড়ে গিয়ে হাত থেকে টাক্কাল ছুটে পা কাটে । সঙ্গীরা তাকে কাঁধে করে বাড়ী এনেছিল । কত কারিটাপ ঔষধ দিয়েও ভাল হয়নি । এখনো ঘরে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে । অথচ বাড়ীতে রোজগার করার কেউ নেই । সপ্তাহ ধরে শুধু বাঁশ কাটে । কেউ মহাজন ঠিকেদার থেকে অগ্রিম নেয় । কেউ আবার নেয় না । একসাথে বাঁশ দিয়ে একবারে টাকা পায় ।

বাঁশ জমিয়ে রেখে একদিনে নামায় । ত্রিশ চল্লিশ জন মিলে ছড়ায় কোথাও কোদাল নিয়ে বাঁন্দ দিয়ে জল ফুলিয়ে ভেলা বাঁধে । জল বাড়লে টানতে টানতে নৌকার গুণটানার মতো টেনে নামায় । যেদিন নামায় পরদিন রবিবার । কল্যাণপুরের বাজার । হাতে মোটা পয়সা আসে । যারা অগ্রিম নেয় তাদের দাম ফুরানো থাকে । যারা নেয় না, দর কষাকষি করে বাজার যাচাই করে । কেউ চাল, কেরোসিন, নিয়ে বাড়ী ফিরে বাঁশ কামলার দল । কেউ আবার মহাজনের ঋণ শোধ করে খালি হাতে বাড়ীতে আসে বিষন্ন মুখে ।

কারো বাড়ীতে গোটা পরিবার অধীর অপেক্ষায় থাকে । উনুনে হাঁড়ি চড়াবে বলে । যাদের আছে তাদের কথা আলাদা । যাদের নেই বিপদ তাদের । সবদিন মহাজনের কাছ থেকে টাকা পায় না । সেদিন বাড়ীর অবস্থা বড় করুণ । বাঁশ কামলা বড় বিমর্ষ হয়ে ঘরে যায় ধীরে ধীরে । বাড়ীতে এলে শুকনো উপাসী মুখের সামনে দাঁড়ায় । পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহটার পেটে কিছু পড়ে না । না খেয়েই ঘুমায় । বাড়ীতে অশান্তির আগুন জ্বলে । চন্দ্রবদন এমনি এক বাঁশ কামলা । বাজারে মিরতিঙ্গা বাঁশ দিয়েছিলো । তেলিয়ামুড়ার সারদা বাবুর কাছে । সারদা বাবুর কর্মচারী বাঁশ নামলে নেয় কিন্তু পয়সা দেয় না । সারদা বাবুর অপেক্ষা করতে করতে রাত অনেক হয় । সঙ্গীরাও সবাই সওদা ছেড়ে বাড়ী ফিরে । চন্দ্রবদনও ফিরে অনেক রাতে শূন্য চালের থলি নিয়ে ।

আসতেই বউ ঝগড়া বাঁধায় । চাল যদি আনতে না পারে আগে কেন খবর দিলে না । ধার করে ছেলেগুলোকে খাওয়াতাম । কথা থেকে কথা বাড়ে । রাগের চোটে জোরে থাপ্পর মারে বউকে । বউ এখনো কালা হয়ে আছে । আবার যেদিন বেশী পায় বৌকে বলে লাঙ্গি নিয়ে আয় । কিছু পয়সা হাতে থাকলে যন্ত্রণা বাড়ে । খরচ করে নিঃশেষ করতে না পারা পর্য্যন্ত এক দারুন অশান্তি ।

পৌষের সংক্রান্তি শেষ । পরদিন প্রেমমালা কলাপাতায় বেঁধে বিরনচালের আওয়ান পিঠা নিয়ে এলো মাখন ঠাকুরের ঘরে । মাখন তার বুড়ি মাকে নিয়ে উঠোনের কোণায় গাইল সিয়া দিয়ে ধান কুটে । বাড়ীঘরে যখন বউ নেই । কি করবে নিজেই ধান কুটে । প্রেমমালার বড় কষ্ট । মাখনের ঘামে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে বলে, আতা, অত কষ্ট করছ কেন । আমাকে বললে কি দু তিন পোরা ধান কুটে দিতে পারি না ।

মাখন ঠাকুরও জবাব দেয়, প্রেমমালা কথা ঠিক, একদিন না হয় তুমি এসে ধান কুটে দিয়ে যাবে । সারাজীবন কে আসবে আমার ধান কুটতে !

প্রেমমালা বোঝে কথার গভীরে কিসের যেন ইঙ্গিত । আওয়ান পিটার মচা বারান্দায় রেখে মাখনের কাছে যায় । মাখনের সিয়াটা কেড়ে নিতে চাইলে মাখনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় কিছুটা । কেমন একটা মাখামাখির মতো ব্যাপার । মাখন শেষ পর্যন্ত না বলতে পারে না । এক সকাল কাজ করে প্রেমমালা । মাখন তখন বসে বসে তাকিয়ে দেখে । প্রেমমালা হুঁস হুঁস মুখে আওয়াজ দিয়ে সিয়া মারতে থাকে । সিয়ার তালে তালে বুকের রিসা শিথিল হয়ে আসে কখনো । সিয়া থামিয়ে রিসা বাঁধতে মাখনের দিকে লাজুক চোখে চায় । আগুন রাঙা ঠোঁটের কোণায় লুকোচুরি খেলে এক হাসি । হাতে চুড়ি ঝমর ঝমর বাজে । কখনো খোপার চুল খুলে উড়ে গিয়ে কপালে লতা হয়ে আল্পনা আঁকে । ওই রূপে তখন প্রেমমালাকে কত সুন্দর দেখায় । মাখনের চোখে ধান্দা লাগে রূপের ঝলকানিতে । না বলা মনের কথা মনের মাঝেই দলিয়ে পাকিয়ে ওঠে ।

আবার দেখতে দেখতে গম্ভীর হয় মাখনের মুখ। এক সরল পাহাড়ী মেয়ে ভালোবাসতে গিয়ে কোন কাঁটা বিছানো পথ ধরবে। বলা যায় না, কিসের মধু সংকেত বয়ে আনছে এই শীতঝরা পৌষের সকালে। নাকি সর্বনাশের কোন আভাষ।

প্রেমমালা ধান ঝাড়ে কোমর দোলে দোলে ডালা নাচে। নাচন যেন চলে মাখনের হৃদয়ে তাল ঠুকে ঠুকে। কাজ শেষ। তুষ কুড়া বাতাসে উড়িয়ে প্রেমমালার চুলে মাথায় ভরে। অনাগত ভবিষ্যতের কোন এক ব্যস্ত ঘরণীর কোমল ছবি মনের পটে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

প্রেমমালা চলে গেল। ফর্সা পায়ে ঝরণায় নামতে যাওয়া কোন এক বনপরীর মতো মুর্চ্ছনা তুলে। মাখন বিভোর হয়ে চেয়ে রয়।

মাখনের বড় সখ জুম চাষ করবে। জমিজমাও যখন নেই জুম ছাড়া উপায় কি। ছাত্র পড়িয়ে কদিন চলবে। পেটের খোরাক হলেও আনাজ সবজীর জন্য কতদিন পরের ওপর নির্ভর করবে। গুঁরাই বাড়ীর মধুমঙ্গল জুমের যত বীজ ধান সে দেবে। মুক্তারাম সর্দার বলেছে এই দুটা কুলাঙ কিনে জুম কাটতে সাহায্য করবে। তবু দ্বিধা পারবে কি পারবে না।

কুলাঙ মানে শ্রম বিনিময় প্রথা। দল বেঁধে শ্রম বিনিময় চলে। চন্দ্রধনের জুমে সবাই একদিন কাটবে, চন্দ্রধনও যাবে রাজারামের জুমে। যাদের জুম নেই, অথচ প্রাপ্য মিলিত শ্রমটা বেরবে অন্যের কাজে। তাকেই বলে কুলাঙ বেচা।

দিন তারিখ ঠিক করে জুম কাটতে চলে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে। মাখনের সঙ্গে জনা বিশেক যুবক। ভোর থেকে মচা ভাত পিঠের খাবার ভরে জুমিয়ারা পশ্চিম রূপরাই গ্রাম পার হয়ে আরো ভেতরে বড়মুড়ার গহন বনে। জঙ্গল যতো পুরানো জুম ততো ভালো হয়। গায়ে তাদের কাটা কাপাসের জামা জুতাই। হাতে টাক্কল।

পাশেই জঙ্গল চিহ্নিত করা সিজন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে কর্ম কলরব। বাঁশ কাটে, গাছ কাটে। পাহাড়ে শুইয়ে রাখে কাটা জঙ্গল। শুকিয়ে পাতা খর খর হলে তখন আগুন দেবে। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ আওয়াজে দুর্গম জঙ্গল চোখের নিমেষে মাথা নুইয়ে ঢালুতে পড়ে। কেউ ক্লান্তির মধ্যে গান ধরে। কেউ আবার রূপকথার গল্প বলে। কাটা বাঁশ গাছ উড়ে উড়ে পাহাড়ে নেতিয়ে পড়ে। টাক্কল চলার ঠকাঠক ছন্দে মাখনের মনে জাগে নতুন জীবনের অচেনা শিহরণ।

মাখনকে নিয়ে জুমিয়া যুবক একাকী যায় নীচে। ছড়ার জলে চিংড়ি আর কাঁকড়া ধরতে। ছড়ার গর্তে পাথরের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে লাটি, চিংড়ি, ধরে। সবাই যখন ব্যস্ত তখন বাঁশের চোঙে গোদক বানায়। প্রথম পর্বের কাজ শেষ করে গাছের নীচে বসে মচাভাত খুলে। মাখন তখন গোদক বিলায়। কেউ খেয়ে বাঁশের হুঁকোতে তামাক টানে। কেউ আবার এক সঙ্গে বড় একটা পাথরে ঘষে ঘষে টাক্কাল শান দেয়। দুপুরে চিলের ডাক বা বনের ঝিঝি সংসার-এর একটানা ডাক শুনে বোঝে দুপুর সময় কত।

সন্ধ্যে বেলায় রং সারুই পতঙ্গের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে বন মুখর। তখন ছুটির ঘোষণা। জুমিয়ারা ঘর ফেরে দল বেঁধে। আসার সময় কেউ আনে কলা পাতা, কেউ আনে বনের আনাজ সবজি।

মেয়েরা ঘরে থাকে ব্যাকুল অপেক্ষায়। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচরানো নিষেধ। কাঁটা ফুটতে পারে পায়ে। তুলাধোনা নিষেধ। তুলার মতো উড়ে গিয়ে বনের বাঁশ জুমিয়ার বুকে যদি বিঁধে যায়।

প্রেমমালার মনটা কাঁপে থরো থরো। নতুন জুমিয়ার বিপদ আশংকার দুর্ভাবনায়। এরই মধ্যে সন্ধ্যে হওয়ায় গান ধরে উদাসী সুরে। সামনে জুমে যাবে জুমের ধান খুঁজতে। না হয় জুমে বাছনির কাজে জোড়া জোড়া যুবক যুবতী জুম পুড়তে প্রেমের গান গাইবে। বিরহের সুরে বন কাঁদাবে। নতুবা হৃদয় ভাঙ্গা ব্যথায় ছল ছল চোখে দূরে যে প্রেমিক অন্য প্রেমিকার পাশে বসা তাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

প্রেমমালা স্বপ্নে বিভোর তবু সংশয়ে ভরা মনে গান ধরে আপন মনে—

অ মনাই নন হাম জাকতুই
অ মনাই নন হাম জাকতুই
বুইন্য হামজাকয়া।
নন হামজাকমা বালা
নন সুইফুরু
আন সুইয়ানি কাইতুছা
বর্ধি লাংতুন।
অ মনাই মহাভারত পড়ি মানঅ
কপাল লে পড়ি মানইয়া
নন সুইমানি রাং চাকনি কলম
আনঅ সুইমানি ওয়াফি।

ওরে মনা তোমায় ভালোবাসি
ওরে মনা তোমায় ভালোবাসি
অন্য কেউ আমায় চিনে না।
তোমার কপাল লিখতে গিয়ে
বিধি কেন আমার নামটা লিখল।
সেই নিঠুর বিধি কেন মরে না।

ওরে মনা মহাভারত পড়তে পারি
কপাল কেন পারিনা।
তোমার কপাল লেখা
সোনার কলম দিয়ে,
আমার কপাল লেখা
বাঁশের কাঠি দিয়ে।

বাঁশ ঝাড়ে, আমলকী বনে, রঙ্গী, রাতা গাছের পাহাড় পার হয়ে আসে জুম থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত অবসন্ন মাখনের কানে। মনে হয় তিতাস পাড়ের বহু বছর আগে হারানো মানিক নতুন পাছরা পড়ে তারই পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।